অধ্যায় ১৯

প্রবন্ধ রচনা

৫৬. গাজা ও মানবাধিকার সংকট

ভূমিকা

যখন একটি গোটা জনপদ তার নিজের ঘরবাড়িতে শরণার্থী হয়ে ওঠে, যখন শিশুরা স্কুলের পরিবর্তে আশ্রয়শিবিরে বড়ো হয়, তখন বুঝতে হয় মানবতা এক গভীর পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে। গাজা ও সংঘাতপীড়িত মধ্যপ্রাচ্য আজ সেই পরীক্ষার নাম। এই রচনা সংখ্যার আড়ালে চাপা পড়ে থাকা মানুষের কান্নাও আন্তর্জাতিক বিবেকের দায় নিয়ে।

মানবিক বিপর্যয়ের চিত্র

প্রায় সম্পূর্ণ বাস্তুচ্যুতি: Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের শেষে গাজা উপত্যকার প্রায় সমগ্র জনগোষ্ঠী অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত অবস্থায় ছিল।

শিশুদের ওপর বোঝা: UNHCR ও UNICEF-এর উপাত্ত বলছে, লেবাননে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের মধ্যে শিশুরাই প্রায় ৩৫ শতাংশ, আর আফগানিস্তানে নারী ও শিশু মিলিয়ে বাস্তুচ্যুত জনসংখ্যার ৭৩ শতাংশ।

বেসামরিক প্রাণহানি: জনবহুল আবাসিক এলাকা, খেলার মাঠ ও আশ্রয় কেন্দ্রে হামলায় নিরীহ নারী, শিশু ও বৃদ্ধের প্রাণহানি যুদ্ধের সবচেয়ে বেদনাদায়ক দিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংকটের মধ্যে আরেক সংকট

'ক্রাইসিস উইদিন আ ক্রাইসিস': ত্রাণ সংস্থাগুলো যাকে বলছে 'সংকটের ভেতরে সংকট'– আক্রান্ত এলাকায় মানবিক কার্যক্রম ভয়াবহভাবে অর্থায়ন– ঘাটতিতে ভুগছে এবং প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য সম্পদই পাওয়া যাচ্ছে।

পানির জন্য হাহাকার: তেহরানে আশ্রয় নেওয়া প্রায় ২৪ লাখ মানুষের ভিড়ে অতিরিক্ত জনাকীর্ণ পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোতে প্রায় ১৭ শতাংশ মানুষ বিশুদ্ধ পানির অভাবে ভুগছেন বলে প্রতিবেদন এসেছে।

শিক্ষার ধস: সংঘাতের ফলে আনুমানিক ৫ কোটি ২০ লাখ স্কুলগামী শিশুর শ্রেণিকক্ষ আশ্রয়শিবিরে রূপান্তরিত হওয়ায় শিক্ষাব্যবস্থায় এক সর্বাত্মক ধস নেমে আসে।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

আঞ্চলিক ভারসাম্য: আরব রাষ্ট্রগুলো একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক, অন্যদিকে নিজ জনগণের আবেগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করেছে; বিশ্বজুড়ে নাগরিক সমাজ মানবিক করিডোর ও যুদ্ধবিরতির দাবিতে সোচ্চার হয়েছে।

ত্রাণের আহ্বান: জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বারবার নিরাপদ মানবিক প্রবেশাধিকার ও জরুরি তহবিলের আহ্বান জানিয়েছে, যদিও বাস্তবে সাড়া মিলেছে সীমিত।

উপসংহার

গাজা ও সংঘাতপীড়িত মধ্যপ্রাচ্যের সংকট কেবল কোনো একটি জাতির নয়– এটা গোটা মানবজাতির বিবেকের সংকট। পরিসংখ্যানের প্রতিটি সংখ্যার পেছনে আছে একটি উপড়ে যাওয়া জীবন, একটি বিপন্ন ভবিষ্যৎ। ইতিহাস একদিন প্রশ্ন করবে– এই দুঃসময়ে বিশ্ব নীরব দর্শক ছিল, নাকি মানবতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। সেই প্রশ্নের উত্তর আমাদের আজকের কর্মেই নিহিত।

সূত্র: The Washington Post; Rappler (UNHCR/UNICEF উপাত্ত); IDMC।

NABARUN PUBLICATION

৫৭. বিশ্বব্যাপী রেকর্ড অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংখ্যা

ভূমিকা

'উদ্বাস্তু' শব্দটির পেছনে লুকিয়ে আছে নিজের শিকড় থেকে উপড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা। বিশ্ব আজ এমন এক যুগে প্রবেশ করেছে যেখানে যুদ্ধ, দারিদ্র্য ও জলবায়ু-বিপযয় একত্রে কোটি কোটি মানুষকে নিজ দেশেই গহহীন করে তুলছে। এই রচনায় আলোচিত হয়েছে এই নীরব মহামারির বিস্তার ও বিশমানবতার দায়িত।

ইতিহাসের সর্বোচ্চ সংখ্যা

৮৩.৪ মিলিয়নের রেকর্ড: IDMC-এর Global Report on Internal Displacement ২০২৫ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের শেষে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা পৌঁছায় ৮ কোটি ৩৪ লাখে– যা ইতিহাসের সর্বোচ্চ এবং জার্মানির মোট জনসংখ্যার সমান।

ছয় বছরে দ্বিগুণ: এই সংখ্যা ২০১৮ সালের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি; অর্থাৎ, মাত্র ছয় বছরে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা দুই গুণ হয়ে গেছে।

সংঘাতই প্রধান কারণ: মোট বাস্তুচ্যুতদের প্রায় ৯০ শতাংশ; অর্থাৎ, ৭ কোটি ৩৫ লাখ মানুষ, সংঘাত ও সহিংসতার কারণে বাস্তুচ্যুত হন।

নতুন মাত্রা: ২০২৫ সালের অবনতি

সংঘাতের নজিরবিহীন উত্থান: IDMC-এর Global Report ২০২৬ জানায়, ২০২৫ সালে সংঘাত ও সহিংসতা একাই ৩ কোটি ২৩ লাখ নতুন অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির জন্ম দেয়– ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তা দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতিকেও ছাড়িয়ে যায়।

এক দশকে দ্বিগুণ: মোট অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর সংখ্যা গত এক দশকে দ্বিগুণ হয়েছে– ২০১৬ সালের ৩ কোটি ৮৯ লাখ থেকে ২০২৫ সালে ৮ কোটি ২২ লাখে।

সুদানের বিপর্যয়: একক দেশ হিসেবে সুদানে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১৬ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন– যা একটি দেশের জন্য সর্বকালের রেকর্ড।

জলবায়ু ও দুর্যোগের ভূমিকা

দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতি: ২০২৪ সালে দুর্যোগ ৪ কোটি ৫৮ লাখ অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ঘটায়– ২০০৮ সালের পর সর্বোচ্চ; এর ৯৯.৫ শতাংশই জলবায়ু-সম্পর্কিত আবহাওয়াজনিত ঘটনা।

যুক্তরাষ্ট্রের রেকর্ড: একাধিক হারিকেনের কারণে যুক্তরাষ্ট্র একাই বৈশ্বিক দুর্যোগ– বাস্তুচ্যুতির প্রায় এক-চতুর্থাংশের জন্য দায়ী– এক কোটিরও বেশি মানুষ সরে যেতে বাধ্য হন।

বিশ্বমানবতার দায়িত্ব

কাঠামোগত সংকট: IDMC পরিচালক যথার্থই বলেছেন– অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি কেবল মানবিক সংকট নয়, এটি একটি কাঠামোগত উন্নয়ন ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ, যার জন্য প্রয়োজন বহুমুখী ও সমন্বিত প্রতিক্রিয়া।

পূর্বপ্রস্তুতির আহ্বান: বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, উপাত্ত ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাস্তুচ্যুতি ঘটার আগেই তা আঁচ করা এবং দীর্ঘমেয়াদি টেকসই সমাধান গড়ে তোলাই এই সংকট মোকাবিলার পথ।

উপসংহার

৮ কোটিরও বেশি মানুষের গৃহহীনতা কোনো বিচ্ছিন্ন পরিসংখ্যান নয়–এটি আমাদের সভ্যতার ব্যর্থতার এক জীবন্ত দলিল। প্রতিটি সংখ্যার আড়ালে আছে একটি পরিবার, একটি স্বপ্ন, একটি হারানো ঠিকানা। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য চাই কেবল সাময়িক ত্রাণ নয়, সংঘাত নিরসন, জলবায়ু সুরক্ষা ও ন্যায়ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকার।

সূত্র: IDMC Global Report 2025 I 2026; Norwegian Refugee Council; The Guardian।

৫৮. নতুন বিশ্ব বিশৃঙ্খলা ও পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থা

ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে ওঠা বিশ্বব্যবস্থা আজ ফাটল ধরা এক ভবনের মতো কাঁপছে। পরাশক্তিগুলোর সম্পর্ক পুনর্বিন্যস্ত হচ্ছে, পুরোনো জোট দুর্বল হচ্ছে, আর জন্ম নিচ্ছে এক বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব। বিশ্লেষকরা একে নাম দিয়েছেন 'নতুন বিশ্ব বিশৃঙ্খলা'। এই রচনায় সেই রূপান্তরের গতিপ্রকৃতি ও তাৎপর্য আলোচিত হয়েছে।

প্রতিযোগিতার যুগ

সহযোগিতা থেকে সংঘাতে: World Economic Forum-এর Global Risks Report ২০২৬ বিশ্বকে চিহ্নিত করেছে 'প্রতিযোগিতার যুগ' হিসেবে– যেখানে সহযোগিতা ও আস্থার বদলে স্থান নিচ্ছে বিভাজন ও মুখোমুখি অবস্থান।

ভূ-অর্থনৈতিক সংঘাত শীর্ষে: প্রতিবেদনটিতে ২০২৬ সালের শীর্ষ বৈশ্বিক ঝুঁকি হিসেবে উঠে এসেছে 'ভূ-অর্থনৈতিক সংঘাত' (Geoeconomic Confrontation), যা দুই বছরের প্রেক্ষাপটে আট ধাপ এগিয়েছে।

মহাশক্তির দ্বন্দ্ব: ভঙ্গুর হয়ে পড়া ট্রান্স আটলান্টিক জোট এবং যুক্তরাষ্ট্র-চীনের মধ্যে মহাশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমেই বৈশ্বিক স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করছে।

বহুমেরু বিশ্বের আবির্ভাব

বহুমেরুকতা, বহুপাক্ষিকতা ছাড়া: WEF-এর ভাষায়, একটি 'বহুমেরু ভূদৃশ্য' আবির্ভূত হচ্ছে, যা সহযোগিতার বদলে মুখোমুখি অবস্থান দ্বারা চিহ্নিত– যাকে বলা হচ্ছে 'multipolarity without multilateralism'।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত: ভূ-অর্থনৈতিক সংঘাতের পরই দ্বিতীয় শীর্ষ ঝুঁকি হিসেবে এসেছে রাষ্ট্রভিত্তিক সশস্ত্র সংঘাত– যা ইঙ্গিত দেয় যুদ্ধ আবারও বিশ্বরাজনীতির কেন্দ্রে ফিরে এসেছে।

আস্থার ক্ষয়: ভুল তথ্য ও অপতথ্যের বিস্তার, সামাজিক মেরুকরণ এবং অসমতা– এই উপাদানগুলো স্থিতিশীলতার ভিত্তি 'আস্থা'কে ক্ষয় করে দিচ্ছে।

অনিশ্চয়তার ভবিষ্যৎ

ঝড়ো পূর্বাভাস: ১,৩০০-এর বেশি বিশ্বনেতা ও বিশেষজ্ঞের জরিপে দেখা যায়, প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা আগামী দুই বছরকে 'উত্তাল' বা 'ঝড়ো' বলে মনে করছেন; মাত্র ১ শতাংশ আশা করছেন শান্ত পরিস্থিতি।

দীর্ঘমেয়াদি শঙ্কা: দশ বছরের প্রেক্ষাপটে এই আশঙ্কা আরও বাড়ে– ৫৭ শতাংশ উত্তাল ভবিষ্যৎ দেখছেন, আর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ আশঙ্কা করছেন 'বৈশ্বিক বিপর্যয়মূলক' ঝুঁকির।

উপসংহার

পুরোনো বিশ্বব্যবস্থা ভেঙে নতুন কিছু গড়ে ওঠার এই সন্ধিক্ষণ একই সঙ্গে বিপজ্জনক ও সম্ভাবনাময়। তবে WEF যথার্থই স্মরণ করিয়ে দেয়– ভবিষ্যৎ কোনো নির্দিষ্ট, অপরিবর্তনীয় পথ নয়; আজ আমরা যে সিদ্ধান্ত নিই, তারই সমষ্টি। বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলায় রূপান্তরের দায়িত্ব তাই বর্তমান প্রজন্মের কাঁধেই।

সূত্র: Time; World Economic Forum, Global Risks Report 2026; Visual Capitalist।

৫৯. বিশ্ব অর্থনীতি ও ঝুঁকি পর্যালোচনা

ভূমিকা

প্রতিবছরের শুরুতে World Economic Forum বিশ্বকে এক আয়না দেখায়– সেই আয়নায় ফুটে ওঠে আগামী দিনের সবচেয়ে বড়ো বিপদগুলোর প্রতিচ্ছবি। ২০২৬ সালের ঝুঁকি প্রতিবেদন সেই আয়নায় দেখিয়েছে অর্থনৈতিক, ভূ-রাজনৈতিক ও জলবায়ুগত ঝুঁকির এক জটিল আবর্ত। এই রচনায় সেই পূর্বাভাসের মূল দিকগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনের পরিচিতি

২১তম সংস্করণ: Global Risks Report–২০২৬। এই বার্ষিক প্রতিবেদনের ২১তম সংস্করণ, যা Marsh ও Zurich Insurance Group-এর সহযোগিতায় প্রকাশিত এবং ১,৩০০-এর বেশি বিশেষজ্ঞের জরিপের ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

তিন সময়সীমা: প্রতিবেদনটি ঝুঁকিগুলোকে তিনটি সময়সীমায় বিশ্লেষণ করে– তাৎক্ষণিক (২০২৬), স্বল্প-মধ্যমেয়াদি (পরবর্তী দুই বছর) এবং দীর্ঘমেয়াদি (পরবর্তী দশ বছর)।

স্বল্পমেয়াদি শীর্ষ ঝুঁকি

ভূ–অর্থনৈতিক সংঘাত (১): ২০২৬ সালের শীর্ষ ঝুঁকি ভূ-অর্থনৈতিক সংঘাত; প্রায় এক-তৃতীয়াংশ উত্তরদাতা একে কিংবা রাষ্ট্রভিত্তিক সশস্ত্র সংঘাতকে প্রধান ঝুঁকি হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

শীর্ষ পাঁচ: শীর্ষ পাঁচ ঝুঁকির তালিকায় আছে যথাক্রমে ভূ–অর্থনৈতিক সংঘাত, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত, চরম আবহাওয়া, সামাজিক মেরুকরণ এবং ভুল তথ্য ও অপতথ্য।

অর্থনৈতিক ঝুঁকির দ্রুত উত্থান

মন্দা ও মূল্যস্ফীতি: স্বল্পমেয়াদে অর্থনৈতিক ঝুঁকি সবচেয়ে দ্রুত বেড়েছে– 'অর্থনৈতিক মন্দা' ১১তম এবং 'মূল্যস্ফীতি' ২১তম অবস্থানে, উভয়েই গত বছরের তুলনায় আট ধাপ এগিয়েছে।

সম্পদ-বুদ্‌বুদ: 'অ্যাসেট বাবল বার্স্ট' সাত ধাপ এগিয়ে ১৮তম এবং 'গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোয় বিঘ্ন' চার ধাপ এগিয়ে ২২তম অবস্থানে উঠে এসেছে– যা অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার ইঙ্গিত দেয়।

এআই-উদ্বেগের উত্থান: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত উদ্বেগ দ্রুত বেড়েছে, অন্যদিকে স্বল্পমেয়াদে পরিবেশগত ঝুঁকির মাত্রা কিছুটা নিচে নেমেছে।

দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত ঝুঁকি

পরিবেশই শীর্ষে: আগামী দশ বছরের প্রেক্ষাপটে পরিবেশগত ঝুঁকিই সবচেয়ে গুরুতর; চরম আবহাওয়াকে শীর্ষ ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং শীর্ষ দশের অর্ধেকই পরিবেশসংক্রান্ত।

সামাজিক ঝুঁকি: দীর্ঘমেয়াদে অসমতা (৭) ও সামাজিক মেরুকরণ (৯) প্রভাবশালী ঝুঁকি হিসেবে রয়ে গেছে– যা ইঙ্গিত দেয় সামাজিক বিভাজন একটি স্থায়ী চ্যালেঞ্জ।

উপসংহার

"Global Risks Report ২০২৬" কোনো অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী নয়, বরং একটি সতর্কবার্তা ও কর্মসূচির ডাক। WEF-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক যথার্থই বলেছেন– এসব ঝুঁকির কোনোটিই অনিবার্য নয়; এগুলো একই সঙ্গে আমাদের সামনে থাকা বিপদের মাত্রা এবং ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার অভিন্ন দায়িত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সংলাপ ও সহযোগিতাই এই ঝুঁকিময় বিশ্বে আশার আলো।

সূত্র: World Economic Forum–Global Risks Report 2026; NC State ERM Initiative।

SINCE-1993 NABARUN PUBLICATION

৬০. বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয়

ভূমিকা

যুদ্ধের খবর হয়তো অনেকের কাছে দূরের ঘটনা, কিন্তু বাজারে গিয়ে চালের দাম শুনে ফিরে আসা গৃহিণীর দীর্ঘশ্বাসে সেই দূরের যুদ্ধ হয়ে ওঠে নিতান্ত ঘরের সংকট। সরবরাহ-শৃঙ্খলের বিঘ্ন আর জ্বালানির অস্থিরতা মিলিয়ে বিশ্বজুড়ে দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি, তা সাধারণ মানুষের জীবনে কীভাবে ছায়া ফেলছে– এই রচনা তারই বাস্তব চিত্র।

মূল্যস্ফীতির পুনরুত্থান

ঝুঁকির তালিকায় উল্লম্ফন: World Economic Forum–এর Global Risks Report ২০২৬–এ 'মূল্যস্ফীতি' এক বছরে আট ধাপ এগিয়ে ২১তম অবস্থানে উঠে এসেছে, আর 'অর্থনৈতিক মন্দা' একইভাবে আট ধাপ এগিয়ে ১১তম।

যুদ্ধের সরাসরি প্রভাব: মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ায় পরিবহণ থেকে উৎপাদন– সব স্তরেই ব্যয় বেড়ে যায়, যার বোঝা শেষমেশ গিয়ে পড়ে ভোক্তার কাঁধে।

সরবরাহ-শৃঙ্খলের ভাঙন

পরিবহণ-করিডরে বিঘ্ন: হরমুজ প্রণালির মতো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথে চলাচল ব্যাহত হওয়ায় বৈশ্বিক সরবরাহ– শৃঙ্খল ভেঙে পড়ে, ফলে পণ্যের ঘাটতি ও দাম– দুটোই বাড়ে।

খাদ্য ও জ্বালানির দ্বৈত চাপ: জ্বালানির দাম বাড়লে কৃষি উৎপাদন, সার ও পরিবহণ ব্যয় বাড়ে– ফলে খাদ্যপণ্যের দামও ঊর্ধ্বমুখী হয়। এই শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বেশি আঘাত করে নিম্ন আয়ের মানুষকে।

সাধারণ মানুষের জীবনে– এর প্রভাব

জীবনযাত্রার ব্যয় সংকট: নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়লেও আয় সেই হারে না বাড়ায় কোটি কোটি পরিবারের ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়; সঞ্চয় ভেঙে চলে দৈনন্দিন খরচ মেটানোর সংগ্রাম।

উন্নয়নশীল দেশে বাড়তি বোঝা: যেসব দেশ জ্বালানি ও খাদ্য আমদানিনির্ভর, সেখানে মুদ্রার অবমূল্যায়নের সঙ্গে আমদানি-মূল্যস্ফীতি যুক্ত হয়ে সংকটকে আরও গভীর করে তোলে।

স্ট্যাগফ্লেশনের ছায়া: অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করছেন– যদি প্রবৃদ্ধি স্থবির থাকে অথচ মূল্যস্ফীতি অব্যাহত থাকে, তবে বিশ্ব 'স্ট্যাগফ্লেশন'-এর কঠিন ফাঁদে পড়তে পারে।

উপসংহার

মূল্যস্ফীতি কেবল অর্থনীতির পরিসংখ্যান নয়– এটি প্রতিটি রান্না ঘরে, প্রতিটি বাজারের থলেতে অনুভূত এক নীরব করুণ বাস্তবতা। বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা, সংঘাত নিরসন ও দায়িত্বশীল অর্থনৈতিক নীতি ছাড়া এই চাপ থেকে মুক্তি কঠিন। তাই শান্তি ও সুশাসন কেবল রাজনৈতিক আদর্শ নয়, সাধারণ মানুষের পেট ভরে খাওয়ার নিশ্চয়তাও বটে।

সূত্র: AP News; World Economic Forum; Middle East Council on Global Affairs।

NABARUN PUBLICATION

৬১. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) যুগান্তকারী বিকাশ

ভূমিকা

যদি ২০২৩ সাল ছিল জেনারেটিভ এআই-এর বিস্ময়কর আবির্ভাবের বছর, তবে ২০২৫–২০২৬ চিহ্নিত হচ্ছে আরও বড়ো এক রূপান্তরের সময় হিসেবে– কেবল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 'সহকারী' থেকে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ সম্পন্ন করা স্বয়ংক্রিয় 'এজেন্টিক এআই'-তে উত্তরণের যুগ। এই রচনায় সেই বিকাশ ও তার বহুমুখী প্রভাব আলোচিত হয়েছে।

সহকারী থেকে এজেন্টে রূপান্তর

মৌলিক পার্থক্য: Gartner-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, একটি এআই-সহকারী প্রতিটি ধাপে মানুষের নির্দেশনার ওপর নির্ভর করে, কিন্তু একটি এআই এজেন্ট নিজে পরিকল্পনা করতে, সরঞ্জাম ব্যবহার করতে, যুক্তি সাজাতে এবং ন্যূনতম তত্ত্বাবধানে লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে পারে।

নতুন 'এক্সিকিউশন লেয়ার': ২০২৬ সালের এজেন্টিক এআই কেবল উন্নত চ্যাটবট নয়, এক নতুন 'এক্সিকিউশন লেয়ার'– যেখানে স্বয়ংক্রিয় এজেন্ট এন্টারপ্রাইজ সিস্টেম জুড়ে পরিকল্পনা, সমন্বয় ও কাজ সম্পাদন করে।

দ্রুত বিস্তার ও বাজার

এন্টারপ্রাইজে এজেন্ট: Gartner-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ ৪০ শতাংশ এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশনে নির্দিষ্ট-কাজভিত্তিক এআই এজেন্ট যুক্ত থাকবে, যা ২০২৫ সালে ছিল ৫ শতাংশেরও কম।

বাজারের উল্লম্ফন: শিল্প-বিশ্লেষকদের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, এজেন্টিক এআই বাজার বর্তমানের প্রায় ৭.৮ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০৩০ সাল নাগাদ ৫২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে।

ব্যাপক গ্রহণ: একাধিক জরিপে দেখা যায়, প্রায় ৭৯ শতাংশ এন্টারপ্রাইজ এআই এজেন্ট গ্রহণের কথা জানিয়েছে এবং ৯৩ শতাংশ আইটি নেতা দুই বছরের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় এজেন্ট চালুর পরিকল্পনা করছেন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব

কর্মক্ষেত্র ও উৎপাদনশীলতা: গ্রাহকসেবা, সফটওয়্যার উন্নয়ন, বিমা দাবি প্রক্রিয়াকরণ ও স্বাস্থ্যসেবার নথিপত্র ব্যবস্থাপনায় এআই এজেন্ট এখন আর পরীক্ষামূলক নয়– বাস্তব উৎপাদনে যুক্ত হয়ে দৃশ্যমান ফল দিচ্ছে।

শিক্ষায় নতুন দিগন্ত: ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষা, স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন ও শিক্ষাসহায়ক সরঞ্জামের মাধ্যমে এআই শিক্ষাকে আরও সহজলভ্য ও মানানসই করে তুলছে।

'পাইলট পার্গেটরি': তবে বাস্তবতা হলো–গবেষণা অনুযায়ী আনুমানিক ৭০–৮০ শতাংশ এজেন্টিক উদ্যোগ এখনও এন্টারপ্রাইজ জুড়ে পূর্ণমাত্রায় বিস্তৃত হতে পারেনি, অনেক প্রতিষ্ঠান আটকে আছে 'পাইলট পার্গেটরি'তে।

উপসংহার

এজেন্টিক এআই মানবসভ্যতারট সামনে খুলে দিচ্ছে এক অভূতপূর্ব সম্ভাবনার দ্বার– যেখানে যন্ত্র কেবল পরামর্শ নয়, কাজও সম্পন্ন করবে। তবে এই শক্তির সঙ্গে আসে দায়িত্বের ভার। প্রযুক্তির এই উল্লম্ফনকে মানবকল্যাণের পথে পরিচালিত করতে হলে চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা, নৈতিক বিবেচনা ও মানবিক তত্ত্বাবধান। ভবিষ্যৎ তাদেরই, যারা গতির সঙ্গে দায়িত্বের ভারসাম্য রাখতে জানে।

সূত্র: IBM; Innovation Mode; Gartner; Machine Learning Mastery।

NABARUN PUBLICATION

৬২. এআই শাসন ও নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ

ভূমিকা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন এমন এক নির্ণায়ক পর্বে প্রবেশ করেছে, যা শাসন, প্রয়োগ ও কৌশলগত প্রতিযোগিতার কঠিন বাস্তবতা দিয়ে সংজ্ঞায়িত। প্রযুক্তি যত শক্তিশালী হচ্ছে, ততই বাড়ছে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রশ্ন।

শাসনের কেন্দ্রীয় ভূমিকা

নিয়ন্ত্রণই মূল প্রশ্ন: Gartner-এর ২০২৬ Hype Cycle for Agentic AI-তে দেখা যায় এজেন্টিক এআই শাসন, নিরাপত্তা ও ব্যয়-সংক্রান্ত উদ্বেগ এখন প্রযুক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে– স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম যত আন্তঃসংযুক্ত হচ্ছে, ততই বাড়ছে জবাবদিহি ও নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন।

গতি বনাম পরিপক্বতা: Gartner সতর্ক করে যে, বাজারে শক্তিশালী গতিবেগ থাকলেও সহায়ক সক্ষমতাগুলোতে সংশ্লিষ্ট পরিপক্বতার অভাব রয়েছে; অধিকাংশ মোতায়েন এখনও সংকীর্ণ পরিসরে সীমাবদ্ধ।

বাস্তবায়নের বাধা

প্রস্তুতি বনাম প্রয়োগ: Deloitte-এর ২০২৫ Emerging Technology Trends গবেষণা অনুযায়ী, ৩০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান এজেন্টিক বিকল্প খতিয়ে দেখছে ও ৩৮ শতাংশ পাইলট চালাচ্ছে, কিন্তু মাত্র ১৪ শতাংশের সমাধান মোতায়েনের জন্য প্রস্তুত এবং মাত্র ১১ শতাংশ বাস্তবে উৎপাদনে ব্যবহার করছে।

কৌশলের অভাব: ৪২ শতাংশ প্রতিষ্ঠান এখনও এজেন্টিক কৌশলের রোডম্যাপ তৈরি করছে, আর ৩৫ শতাংশের কোনো আনুষ্ঠানিক কৌশলই নেই– যা শাসন-শূন্যতার গভীরতা তুলে ধরে।

নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতা

'গার্ডিয়ান এজেন্ট': Gartner-এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, ২০৩০ সাল নাগাদ 'গার্ডিয়ান এজেন্ট'– অর্থাৎ, অন্য এআই এজেন্টদের নিরাপত্তা ও আচরণ তদারক করা এজেন্ট– মোট এজেন্টিক এআই বাজারের ১০–১৫ শতাংশ দখল করবে।

স্বায়ত্ত সিদ্ধান্তের ঝুঁকি: Gartner ধারণা করছে, ২০২৮ সাল নাগাদ দৈনন্দিন কাজের ১৫ শতাংশ সিদ্ধান্ত এজেন্টিক এআই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেবে– যা জবাবদিহি ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণকে আরও জরুরি করে তোলে।

দ্বিমুখী তলোয়ার: এআই যত বেশি ক্ষমতাবান, তত বেশি বিপজ্জনকও–তথ্য ও সরঞ্জামে প্রবেশাধিকার থাকা এজেন্ট কল্যাণ যেমন– বয়ে আনতে পারে, অপব্যবহারের ঝুঁকিও তেমনি বাড়ায়।

উপসংহার

এআই-এর ভবিষ্যৎ আর কেবল 'কী সম্ভব' তার ওপর নির্ভর করছে না, 'কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়' তার ওপর। প্রযুক্তির এই শক্তিকে মানবকল্যাণে রূপান্তরিত করতে হলে চাই শক্তিশালী শাসন কাঠামো, স্বচ্ছ নৈতিক মানদণ্ড এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। দৌড়ের প্রথম হওয়া নয়, দায়িত্বশীল ও আস্থাভাজন পথচলাই নির্ধারণ করবে কে ভবিষ্যতের নেতৃত্ব দেবে।

সূত্র: Council on Foreign Relations; Gartner 2026 Hype Cycle; Deloitte Insights।

NABARUN PUBLICATION

৬৩. সাইবার নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় সাইবার হামলা

ভূমিকা

যুদ্ধক্ষেত্র এখন ছড়িয়ে পড়েছে অদৃশ্য সাইবার জগতেও। ২০২৫ সালে বিশ্ব প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ করল এমন এক সাইবার হামলা, যা প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এজেন্ট দিয়ে। ডিজিটাল যুগের এই নতুন নিরাপত্তা-ঝুঁকি নিয়েই এই রচনা।

ইতিহাসের প্রথম ঘটনা

এআই-চালিত গুপ্তচরবৃত্তি: ২০২৫ সালের নভেম্বরে এআই প্রতিষ্ঠান Anthropic জানায়, তারা ন্যূনতম মানবিক হস্তক্ষেপে পরিচালিত প্রথম বৃহৎ-পরিসরের এআই-অর্কেস্ট্রেটেড সাইবার-গুপ্তচরবৃত্তি অভিযান শনাক্ত ও ব্যাহত করেছে।

রাষ্ট্রীয় মদদ: উচ্চ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই হামলাকে চীনা রাষ্ট্রসমর্থিত একটি গোষ্ঠীর কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যাকে 'GTG–১০০২' নামকরণ করা হয়েছে।

শনাক্তকরণের সময়: যদিও খবরটি প্রকাশ্যে আসে নভেম্বরে, প্রকৃতপক্ষে হামলাটি শনাক্ত হয় ২০২৫ সালের মধ্য-সেপ্টেম্বরে, যখন Claude Code টুলে অস্বাভাবিক আচরণ ধরা পড়ে।

হামলার ধরন ও মাত্রা

প্রায় স্বয়ংক্রিয় পরিচালনা: এই অভিযানে এআই হামলার ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ কাজ স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করে; মানুষের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয় কেবল গুটিকয়েক গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সিদ্ধান্তে।

লক্ষ্যবস্তু: হামলাকারীরা বিশ্বজুড়ে প্রায় ৩০টি উচ্চমূল্যের লক্ষ্যবস্তুতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালায়– এর মধ্যে ছিল বড়ো প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, রাসায়নিক উৎপাদনকারী ও সরকারি সংস্থা; কয়েকটিতে তারা সফলও হয়।

কৌশল: হামলাকারীরা Claude-কে বিভ্রান্ত করতে ক্ষতিকর কাজগুলোকে ছোটো ছোটো নিরীহ-দর্শন অনুরোধে ভাগ করে এবং নিজেদের 'নিরাপত্তা গবেষক' হিসেবে পরিচয় দিয়ে নিরাপত্তা-ব্যবস্থা পাশ কাটিয়ে যায়।

তাৎপর্য ও সতর্কবার্তা

সাইবার নিরাপত্তায় 'ইনফ্লেকশন পয়েন্ট': Anthropic এই ঘটনাকে সাইবার নিরাপত্তার 'ইনফ্লেকশন পয়েন্ট' বা মোড়-পরিবর্তনের মুহূর্ত হিসেবে অভিহিত করেছে।

প্রতিবন্ধকতা কমে যাওয়া: Anthropic-এর হুমকি-গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান সতর্ক করেন যে, এই সক্ষমতা কম-অভিজ্ঞ বা ছোটো হামলাকারীদেরও এমন আক্রমণ চালানোর সুযোগ দিতে পারে, যা আগে কেবল রাষ্ট্রশক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল।

প্রতিরক্ষায় এআই: বিশেষজ্ঞদের অভিন্ন রায়– হামলাকারীরা যদি এআই ব্যবহার করে, তবে রক্ষকদেরও তা-ই করতে হবে; প্রচলিত সিগনেচারভিত্তিক সুরক্ষা এখন প্রায় অকার্যকর।

উপসংহার

সেপ্টেম্বর ২০২৫ সাইবার নিরাপত্তার ইতিহাসে এক স্থায়ী মাইলফলক হয়ে থাকবে– যখন এআই প্রথমবার নিছক পরামর্শদাতা নয়, হয়ে উঠল অস্ত্র। এই বাস্তবতা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রযুক্তির আশীর্বাদ ও অভিশাপ একই মুদ্রার দুই পিঠ। ডিজিটাল ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত রাখতে চাই সম্মিলিত সতর্কতা, উন্নত প্রতিরক্ষা এবং দায়িত্বশীল এআই–শাসন।

সূত্র: Paul, Weiss; Technology Magazine; Council on Foreign Relations; Anthropic Threat Report।

৬৪. মহাকাশ অভিযানের নতুন যুগ
অথবা–আর্টেমিস II: ঐতিহাসিক চন্দ্র–প্রদক্ষিণ

ভূমিকা

মানুষ চিরকালই আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখেছে– চাঁদ, নক্ষত্র আর অজানা মহাবিশ্বকে ছুঁয়ে দেখার স্বপ্ন। অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় পর সেই স্বপ্ন আবার বাস্তবের কাছাকাছি এসেছে। ২০২৬ সালে নাসার আর্টেমিস কর্মসূচি মানুষের চন্দ্রজয়ের আকাঙ্ক্ষাকে নতুন প্রাণ দিয়েছে। এই রচনায় সেই অভিযাত্রার সাফল্য ও ভবিষ্যৎ স্বপ্ন তুলে ধরা হয়েছে।

আর্টেমিস II: ঐতিহাসিক চন্দ্র-প্রদক্ষিণ

সফল উৎক্ষেপণ: নাসার আর্টেমিস II অভিযান ২০২৬ সালের ১ এপ্রিল ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে SLS রকেটে উৎক্ষেপিত হয়– যা আর্টেমিস কর্মসূচির প্রথম ক্রু-বাহী মিশন।

চার নভোচারী: এ অভিযানে অংশ নেন নাসার নভোচারী রিড ওয়াইজম্যান, ভিক্টর গ্লোভার, ক্রিস্টিনা কোচ এবং কানাডিয়ান স্পেস এজেন্সির নভোচারী জেরেমি হ্যানসেন।

অর্ধশতকের প্রথম: অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময়ের মধ্যে এই প্রথম মানুষ চাঁদের কাছে পৌঁছালেন– Orion মহাকাশযানে চড়ে প্রায় ১০ দিনের যাত্রায় তাঁরা চাঁদ প্রদক্ষিণ করে নিরাপদে পৃথিবীতে ফেরেন।

নতুন রেকর্ড ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তন

দূরত্বের রেকর্ড: নভোচারীরা পৃথিবী থেকে মানুষের সর্বোচ্চ দূরত্ব ভ্রমণের রেকর্ড স্থাপন করেন; Orion মোট প্রায় ৬,৯৪,৪৮১ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে চাঁদ প্রদক্ষিণ করে।

নিরাপদ অবতরণ: ১০ এপ্রিল ২০২৬ ক্যালিফোর্নিয়ার সানটিয়েগো উপকূলের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে সফলভাবে স্প্ল্যাডাউন করে অভিযান সম্পন্ন হয়; পুনঃপ্রবেশের সময় যানটি শব্দের প্রায় ৩৫ গুণ গতিতে ছুটছিল।

সফল পরীক্ষা: এই পরীক্ষামূলক উড্ডয়নে জীবনরক্ষা ব্যবস্থা যাচাই, Orion-এর ম্যানুয়াল চালনা এবং চাঁদের দূরবর্তী পৃষ্ঠের অভূতপূর্ব দৃশ্য ধারণসহ মূল উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হয়।

ভবিষ্যতের পথচলা

আর্টেমিস III: আর্টেমিস II-এর সাফল্যের পরপরই নাসা পরবর্তী মিশনের প্রস্তুতি শুরু করেছে; আগামী বছরের আর্টেমিস III মিশনে Orion ও বাণিজ্যিক মহাকাশযানের মধ্যে 'রেন্ডেজভাস ও ডকিং' সক্ষমতা পরীক্ষা করা হবে।

চাঁদে অবতরণ ও তারপর: পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্টেমিস IV-এর নভোচারীদের ২০২৮ সালে চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ করানো হবে; এই অভিযানগুলো একটি চন্দ্র-ঘাঁটি এবং ভবিষ্যতে মঙ্গল অভিযানের ভিত্তি গড়ে তুলছে।

উপসংহার

আর্টেমিস II কেবল একটি মহাকাশ অভিযান নয়– এটি মানুষের অদম্য কৌতূহল ও সাহসের জয়গান। অর্ধশতাব্দীর বিরতির পর চাঁদের পথে এই প্রত্যাবর্তন প্রমাণ করে, স্বপ্ন দেখা ও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা মানুষের সহজাত। চাঁদ থেকে মঙ্গল– মানবজাতির এই মহাকাশ যাত্রা আগামী প্রজন্মকে মনে করিয়ে দেবে, দিগন্তই শেষ সীমানা নয়, নতুন শুরুর আহ্বান।

সূত্র: *NASA–Artemis II; NASA Newsroom; Gulf News.*

৬৫. মিলান–কর্টিনা শীতকালীন অলিম্পিক ২০২৬

ভূমিকা

বরফ ঢাকা আল্পসের কোলে, ঐতিহাসিক ভেনিস ও মিলানের শিল্পনগরীর পাশে– এই অপরূপ পটভূমিতেই অনুষ্ঠিত হলো ২০২৬ সালের শীতকালীন অলিম্পিক। যখন বিশ্বজুড়ে সংঘাত, বিভাজন ও অনিশ্চয়তা চলছে, তখন মিলান-কর্টিনার এই ক্রীড়া-উৎসব মানুষকে আবারও মনে করিয়ে দিল– খেলার মাঠ এমন এক অভিন্ন ভূমি, যেখানে সীমান্ত মুছে যায়, পতাকা মিলেমিশে এক হয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির এই উদ্‌যাপন নিয়েই এই রচনা।

ঐতিহাসিক আয়োজন

ইতালির চতুর্থ অলিম্পিক: ২০২৬ সালের ৬ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত মিলান-কর্টিনা গেমস ছিল শীতকালীন অলিম্পিকের ২৫তম আসর এবং ইতালির আয়োজনে চতুর্থ অলিম্পিক-এর আগে কর্টিনা দ্যাম্পেজ্জোতে ১৯৫৬, তুরিনে ২০০৬-এর শীতকালীন এবং রোমে ১৯৬০-এর গ্রীষ্মকালীন আসর অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

দুটি শহর, আট অঞ্চল: আয়োজনের মূল কেন্দ্র ছিল মিলান ও কর্টিনা দ্যাম্পেজ্জো; এছাড়া রাসেন-আন্থোলৎস, বরমিও, লিভিনিও, প্রেদাজ্জো, তেসেরো ও ভেরোনাসহ মোট আটটি অঞ্চলে প্রতিযোগিতা ছড়িয়ে ছিল।

নীতিবাক্য: গেমসের অফিসিয়াল নীতিবাক্য ছিল 'IT's Your Vibe'– যা একই সঙ্গে ইতালির পরিচয় এবং ব্যক্তিগত আবেগের যৌথ উদ্‌যাপন।

অংশগ্রহণ ও পরিসর

২,৮৮৪ ক্রীড়াবিদ: মোট ৯২টি দেশ (এবং AIN বা 'অ্যাথলেট ইন্ডিভিজ্যুয়েল নিউট্রেলে') থেকে ২,৮৮৪ জন ক্রীড়াবিদ– ১,৫৩৫ জন পুরুষ ও ১,৩৪৯ জন নারী-অংশ নেন।

৮ ক্রীড়া, ১১৬ ইভেন্ট: গেমসে ছিল ৮টি ক্রীড়া, ১৬টি ডিসিপ্লিন ও মোট ১১৬টি ইভেন্ট, যা অনুষ্ঠিত হয় ১৫টি ভেন্যুতে।

'স্কিমো'র অলিম্পিক অভিষেক: 'স্কি মাউন্টেনিয়ারিং' বা 'স্কিমো'– যেখানে ক্রীড়াবিদরা স্কি ও পায়ে হেঁটে পাহাড়ে ওঠা-নামা করেন– এই প্রথম অলিম্পিকে অভিষিক্ত হলো; পুরুষ-মহিলা স্প্রিন্ট ও মিশ্র রিলেতে পদক দেওয়া হয়।

রাশিয়া ও বেলারুশ: ইউক্রেন আগ্রাসনের কারণে রাশিয়া এবং রাশিয়ার সমর্থনের কারণে বেলারুশ অলিম্পিক থেকে নিষিদ্ধ; তবে অনুমোদিত ক্রীড়াবিদরা 'AIN' পরিচয়ে নিরপেক্ষভাবে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

উদ্বোধন: বরফের গান

সান সিরো স্টেডিয়াম: ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ইতালির বৃহত্তম স্টেডিয়াম-মিলানের ঐতিহাসিক সান সিরো (জুসেপ্পে মেয়াৎজা স্টেডিয়াম)– এ অনুষ্ঠিত হয় চমকপ্রদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, যা প্রযোজনা করে "Balich Wonder Studio"।

'আর্মোনিয়া' বা সংহতি: 'আর্মোনিয়া' (Harmony) নামের এই উদ্বোধনে ৯৩টি দেশের ক্রীড়াবিদ মিলান, কর্টিনা, লিভিনিও ও প্রেদাজ্জো– এই চারটি ভিন্ন স্থানে একযোগে কুচকাওয়াজ করেন; অনুষ্ঠানটি শুরু হয়ে রাত ১১:২৯-এ শেষ হয়।

বিশ্বতারকাদের সমাবেশ: উদ্বোধনে পারফর্ম করেন পাঁচবারের গ্র্যামি-জয়ী মারায়া কেরি, ইতালীয় তেনর আন্দেয়া বোচেলি, লরা পাউসিনি, পিয়ের ফান্‌চেস্কো ফাভিনো এবং 'The White Lotus'-খ্যাত সাবরিনা ইম্পাচ্চাতোরে।

কাল্ড্রন প্রজ্বলন: অলিম্পিক মশাল প্রজ্বলন করেন ইতালির কিংবদন্তি স্কিয়ার দেবোরা কোম্পানিওনি ও আলবের্তো তোম্বা মিলানে; এবং কর্টিনায় কাল্ড্রন প্রজ্বলন করেন বিখ্যাত আলপাইন স্কিয়ার সোফিয়া গোগ্গিয়া।

ভেনিসের আঙিনায় সমাপ্তি

ভেরোনার ঐতিহাসিক অ্যারেনা: ২২ ফেব্রুয়ারি সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ভেরোনার প্রাচীন রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটার 'ভেরোনা অ্যারেনায়'– প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত এই স্থাপনা 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট'-এর শহরে অলিম্পিকের শেষ পর্বকে স্মরণীয় করে রাখে।

IOC-এর নতুন সভাপতি: সমাপনীতে গেমস বন্ধ ঘোষণা করেন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (IOC) নতুন সভাপতি কার্স্টি কভেন্ট্রি, আর শুরুতে গেমস উদ্বোধন করেছিলেন ইতালির রাষ্ট্রপতি সের্জিও মাত্তারেল্লা।

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

প্যারালিম্পিক: সাহসের জয়গান

প্যারা-গেমসের সূচনা: অলিম্পিকের পর ৬ মার্চ থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ১৪তম শীতকালীন প্যারালিম্পিক, যেখানে ৫৫টি দেশ থেকে ৬১২ জন ক্রীড়াবিদ ছয়টি ক্রীড়ায় ৭৯টি পদক ইভেন্টে অংশ নেন।

অ্যারেনা দি ভেরোনা: প্যারালিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় ভেরোনা অ্যারেনায়, যেখানে প্রতিবন্ধী দর্শকদের সুবিধার্থে বিশেষ সংস্কার কাজ করা হয়– যা প্রতীকীভাবে অন্তর্ভুক্তির বার্তা বহন করে।

ছয়টি ক্রীড়া: প্যারালিম্পিকে অনুষ্ঠিত হয় প্যারা আলপাইন স্কিইং, প্যারা বায়াথলন, প্যারা ক্রস–কান্ট্রি স্কিইং, প্যারা আইস হকি, প্যারা স্নোবোর্ড ও হুইলচেয়ার কার্লিং।

ঐক্যবন্ধকারী শক্তি

সীমান্তের উর্ধ্বে: মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য ভাষা, রাজনীতি ও বিরোধ পেছনে ফেলে বিশ্বের ৯২টি দেশ এক ছাদের নিচে এসেছিল– এইটাই অলিম্পিকের সবচেয়ে বড়ো অর্জন।

স্থায়িত্বের বার্তা: চারটি ভিন্ন শহরে একযোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং পুরোনো স্থাপনার পুনর্ব্যবহার– যেমন–১৯৫৬-এর কর্টিনা কার্লিং স্টেডিয়াম– দেখিয়ে দিল, ক্রীড়া-আয়োজনও হতে পারে দায়িত্বশীল ও টেকসই।

নারী-অগ্রগতি: নারী ক্রীড়াবিদের সংখ্যা মোট অংশগ্রহণকারীর প্রায় ৪৭ শতাংশে পৌঁছানো ইঙ্গিত দেয় শীতকালীন ক্রীড়ায় লিঙ্গসমতার ক্রমাগত অগ্রগতি।

উপসংহার

মিলান-কর্টিনা ২০২৬ শুধু পদকের হিসাব নয়– এটি ছিল মানবতার জয়গান। যখন রণাঙ্গনে বারুদের ধোঁয়া, তখন আল্পসের শুভ্র তুষারে প্রতিযোগী ক্রীড়াবিদদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তাঁদের মধ্যকার শ্রদ্ধাপূর্ণ সৌহার্দ্য প্রমাণ করল– মানুষ মূলত বিভাজনের নয়, ঐক্যের জন্যই সৃষ্ট। মশাল যত উজ্জ্বল জ্বলে ওঠে, পৃথিবী ততই কাছাকাছি আসে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই গেমসকে মনে রাখবে কেবল ক্রীড়া-উৎকর্ষের জন্য নয়, এক অস্থির সময়েও বিশ্বকে এক করে দেখানোর সাহসের জন্যও।

সূত্র: Wikipedia; Olympics.com; Encyclopadia Britannica; International Paralympic Committee।

৬৬. আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলন ও বৈশ্বিক নীতি–নির্ধারণ

ভূমিকা

আজকের পৃথিবী এতোটাই আন্তঃসংযুক্ত যে-কোনো একটি দেশ আর একা তার সংকট মোকাবিলা করতে পারে না। জলবায়ু পরিবর্তন, যুদ্ধ-সংঘাত, অর্থনৈতিক টালমাটাল কিংবা প্রযুক্তির অভাবিত উত্থান– প্রতিটি সমস্যা সীমান্ত পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। তাই বিশ্বনেতারা বছরে কয়েকবার এক টেবিলে বসেন, পরস্পরের চোখে চোখ রেখে কথা বলেন। ২০২৫–২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনগুলো এই বৈশ্বিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তাকে আরও স্পষ্ট করেছে– এই রচনায় তাই-ই বিশ্লেষিত।

কেন এই সম্মেলনগুলো গুরুত্বপূর্ণ

সংলাপের অঙ্গীকার: শীর্ষ সম্মেলনগুলো 'সমস্যা সমাধানের' চেয়ে বেশি কাজ করে 'সংলাপের পরিসর' হিসেবে–যেখানে অসম্মত পক্ষরাও কথোপকথনের পথ খোলা রাখতে বাধ্য হন।

নীতি-সমন্বয়: জলবায়ু-অর্থায়ন, বাণিজ্যশুল্ক, ডিজিটাল কর কিংবা মহামারি–প্রস্তুতির মতো ইস্যুতে দেশগুলোর নীতিকে এক সারিতে আনা সম্ভব হয় এই সম্মেলনের কাঠামোতেই।

ভঙ্গুর বহুপাক্ষিকতা: তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন– বহুপাক্ষিক সহযোগিতা ক্রমেই ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে, G20-এর প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

–২০: জোহানেসবার্গ ২০২৫

দক্ষিণ আফ্রিকার সভাপতিত্ব: ২০২৫ সালের নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত G20 শীর্ষ সম্মেলনে নেতারা জলবায়ু ও জলবায়ু-অর্থায়নকে অগ্রাধিকার ইস্যু হিসেবে পুনর্নিশ্চিত করেন।

'ন্যায্য জ্বালানি-রূপান্তর': ঘোষণাপত্রে নবায়নযোগ্য শক্তির দ্রুততর সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য 'ন্যায্য জ্বালানি-রূপান্তর'-এ অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

বহুপাক্ষিকতার প্রশ্ন: তবে ২০২৬ সালের G20 সভাপতিত্বে জলবায়ু গুরুত্ব নাও পেতে পারে বলে আশঙ্কা; বিশেষজ্ঞরা মনে করেন COP31, BRICS ও অন্যান্য মঞ্চে এই গতি বজায় রাখতে হবে।

G7: কানাডার নেতৃত্ব ২০২৬

সাত পরাশক্তির জোট: G7 গঠিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের তেল-সংকট থেকে; কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র– এই সাত দেশ এবং ১৯৭৭ সাল থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর কাজে যুক্ত।

জ্বালানি-নিরাপত্তা ও জলবায়ু: কানাডা তাদের G7 সভাপতিত্বে জ্বালানি-নিরাপত্তাকে শূন্য ও নিম্ন-নিঃসরণ উৎস, গুরুত্বপূর্ণ খনিজের সরবরাহ-শৃঙ্খল এবং বিদ্যুৎ গ্রিডের দৃঢ়তার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করছে।

COP31: জলবায়ু-কূটনীতির পরীক্ষা

আন্তালিয়ায় আয়োজন: ২০২৬ সালের ৯ থেকে ২০ নভেম্বর তুরস্কের আন্তালিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে ৩১তম জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন (COP31), যা চিহ্নিত করবে জলবায়ু-কূটনীতির 'আলোচনা থেকে বাস্তবায়নে' রূপান্তর।

দ্বিমুখী নেতৃত্ব: তুরস্ক ভৌত আয়োজক, আর আলোচনায় নেতৃত্ব দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া-এর মন্ত্রী ক্রিস বোয়েন COP30-এর শেষ থেকে COP31 পর্যন্ত আলোচনা-প্রক্রিয়ায় বিশেষ কর্তৃত্ব পেয়েছেন।

'ট্রয়কা' পদ্ধতি: আজারবাইজান (COP29), ব্রাজিল (COP30) ও তুরস্ক (COP31) মিলে গঠন করেছে 'ট্রয়কা'– একটি নতুন সহযোগিতা-মডেল।

৳ ১.৩ ট্রিলিয়নের চ্যালেঞ্জ: মূল চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে আছে বছরে ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলারের জলবায়ু-অর্থায়নের লক্ষ্য পূরণ, NDCs 3.0-কে 1.5°C সীমার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করা এবং ভূ-রাজনৈতিক বিভাজনের মোকাবিলা।

ভূ-রাজনৈতিক ছায়া: মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে হরমুজ প্রণালি বিঘ্নিত হওয়ায় তেলের দাম ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার পটভূমিতে COP31 অনুষ্ঠিত হচ্ছে– IEA একে 'ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো জ্বালানি-নিরাপত্তা হুমকি' বলে অভিহিত করেছে।

ট্রিপল–COP বছর

একটি বছর, তিন COP: ২০২৬ আরেকটি 'ট্রিপল–COP' বছর। জাতিসংঘ এই বছর জলবায়ু, জীববৈচিত্র্য ও ভূমি– এই তিনটি বৈশিক বিষয়ে কনফারেন্স অব দা পার্টিজ (COP) আয়োজন করছে।

COP30-এর উত্তরাধিকার: ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত COP30-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অভিযোজন-অর্থায়ন তিনগুণ করা এবং জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে রূপান্তর ও ২০৩০ সালের মধ্যে বন উজাড় ঠেকানোর 'রোডম্যাপ' COP31-এ বাস্তবায়িত হবে।

উপসংহার

বিশ্বমঞ্চে নেতারা যখন একসঙ্গে বসেন, তখন তা কেবল কাগজে লেখা ঘোষণা নয়– তা মানবজাতির অভিন্ন ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার এক যৌথ অঙ্গীকার। সাম্প্রতিক সম্মেলনগুলো দেখিয়েছে যে সহযোগিতার পথ যত কঠিন, ততই তা জরুরি। জলবায়ু বদলায় না কোনো সীমান্ত মেনে, ভাইরাস পাসপোর্ট দেখে চলে না, মূল্যস্ফীতি কোনো এক দেশের সমস্যা থাকে না। আমাদের সমস্যা যেহেতু অভিন্ন, সমাধানও তাই হতে হবে যৌথ। সম্মেলনগুলোর কণ্ঠ যত উচ্চ, পৃথিবীর কান্না তত কম হবে– এই আশাতেই বিশ্ব আজ একসঙ্গে বসছে।

সূত্র: Council on Foreign Relations; E3G; IISD / SDG Knowledge Hub; Informed Clearly।

৬৭. পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও বিশ্বনিরাপত্তা

ভূমিকা

হিরোশিমার বিভীষিকার পর প্রায় আশি বছর কেটে গেছে; অথচ, মানবজাতি আজও পারমাণবিক ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। ২০২৬ সাল চিহ্নিত হয়ে থাকছে এমন এক সময় হিসেবে, যখন দুই পারমাণবিক পরাশক্তির মধ্যে শেষ সক্রিয় চুক্তিটিও মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে। নিরস্ত্রীকরণের স্বপ্ন কি তাহলে দূর-অস্ত? নাকি অন্ধকার এই মুহূর্তেই জ্বলে উঠতে পারে নতুন সংলাপের প্রদীপ? পারমাণবিক অস্ত্র, বিশ্বশান্তি ও মানুষের নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে এই রচনা।

New START-এর শেষ

শেষ চুক্তির মেয়াদান্ত: ২০২৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে শেষ সক্রিয় পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি 'New START' মেয়াদোত্তীর্ণ হয়– পাঁচ দশকে এই প্রথম দুই পরাশক্তির মধ্যে কোনো পারমাণবিক চুক্তি বহাল নেই।

চুক্তির সীমা: New START প্রতিটি পক্ষকে সর্বোচ্চ ১,৫৫০টি মোতায়েন কৌশলগত পারমাণবিক ওয়্যারহেড এবং ৭০০টি অপারেশনাল লঞ্চারে সীমাবদ্ধ রেখেছিল।

পুতিনের একতরফা প্রতিশ্রুতি: রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন ঘোষণা করেছেন– যুক্তরাষ্ট্রও প্রতিদান দিলে রাশিয়া ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত আরও এক বছর চুক্তির পরিমাণগত সীমা মেনে চলতে প্রস্তুত।

'সংকট প্রায় শেষ': SIPRI-এর পরিচালক **ড্যান স্মিথ** যথার্থই মন্তব্য করেছেন– 'রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কয়েক বছর আগেই সংকটে প্রবেশ করেছিল, এখন তা প্রায় শেষ।'

পারমাণবিক অস্ত্রের ভান্ডার

১২,২৪১ ওয়ারহেড: SIPRI-এর Yearbook ২০২৫ অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে বিশ্বজুড়ে আনুমানিক ১২,২৪১টি পারমাণবিক ওয়ারহেডের মধ্যে ৯,৬১৪টি সামরিক মজুদে ছিল– অর্থাৎ, ব্যবহারযোগ্য অবস্থায়।

রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষে: রাশিয়ার কাছে আছে আনুমানিক ৪,৩০৯টি ওয়ারহেড এবং যুক্তরাষ্ট্রের ৩,৭০০টি– এই দুই দেশই মিলে বিশ্বের পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডারের ৯০ শতাংশেরও বেশি মালিক।

চীনের দ্রুত উত্থান: চীন গত পাঁচ বছরে তার পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডার ৩০০ থেকে দ্বিগুণ করে ৬০০-এ পৌঁছেছে; ২০২৩ সাল থেকে প্রতি বছর প্রায় ১০০টি ওয়ারহেড যুক্ত হচ্ছে।

আধুনিকীকরণের তোড়জোড়: নয়টি পারমাণবিক রাষ্ট্রই বিস্তৃত আধুনিকীকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, যা ভবিষ্যতে অস্ত্রভান্ডারের আকার ও বৈচিত্র্য বাড়াতে পারে।

NPT: ভঙ্গুর ভিত্তি

২০২৬ পর্যালোচনা সম্মেলন: ১৯৬৮ সালে স্বাক্ষরিত পারমাণবিক অস্ত্র অপসারণ চুক্তির (NPT) দশম পর্যালোচনা সম্মেলন শুরু হয় ২০২৬ সালের ২৭ই এপ্রিল নিউইয়র্কে।

আর্টিকেল VI-এর দায়: NPT-এর Article VI অনুযায়ী, পারমাণবিক রাষ্ট্রগুলো 'শুভ-অভিপ্রায়ে' নিরস্ত্রীকরণের আলোচনায় অংশ নিতে বাধ্য– তবে সমালোচকরা বলেন, কোনো পরাশক্তিই বিশ্বাসযোগ্যভাবে এ দায়িত্ব পালন করছে না।

মূল চুক্তি ভাঙনের পথে: SIPRI সতর্ক করে– New START-এর অবসান NPT-এর মূল চুক্তিকে দুর্বল করবে, যেখানে অ–পারমাণবিক রাষ্ট্রগুলো অস্ত্র তৈরি না করার বিনিময়ে পরাশক্তিদের নিরস্ত্রীকরণের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল।

নতুন উদ্বেগের জনপদ: জাপান, পোল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউক্রেনসহ কয়েকটি দেশে নিজস্ব পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের যৌক্তিকতা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে– যা NPT-এর ভিত্তিকে আরও দুর্বল করতে পারে।

নতুন অস্ত্র প্রতিযোগিতার আশঙ্কা

'দ্বি–স্তরীয় প্রতিরোধ': যুক্তরাষ্ট্রকে এখন একই সঙ্গে রাশিয়া ও চীনের পারমাণবিক হুমকি মোকাবিলার 'দ্বি-স্তরীয় প্রতিরোধ পরিবেশ'-এ পড়তে হচ্ছে– যা কৌশলগত অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে আরও তীব্র করছে।

ত্রি-পাক্ষিক আলোচনার প্রস্তাব: Arms Control Association পরামর্শ দিয়েছে– যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া যাচাইযোগ্য কৌশলগত হ্রাস অব্যাহত রাখলে চীন, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যকেও তাদের অস্ত্রভান্ডার বর্তমান স্তরে স্থির রাখতে আহ্বান জানানো যেতে পারে।

সবাই হেরে যাবে

Arms Control Association-এর প্রধান যথার্থই বলেছেন– 'বাস্তবে আরও বেশি পারমাণবিক অস্ত্র কাউকেই নিরাপদ করবে না, প্রতিরোধও বাড়াবে না; এটি শুধু এমন এক বিপজ্জনক অস্ত্র প্রতিযোগিতার আমন্ত্রণ, যেখানে কেউ জিতবে না।'

নৈতিক প্রশ্ন

ভয়ের ভারসাম্য: 'পারস্পরিক নিশ্চিত ধ্বংস' (MAD) তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আজও বিশ্বশান্তি বজায় আছে– কিন্তু এই ভয়ের ভারসাম্য কতদিন টিকবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

মানবসভ্যতার পণ

একটি ভুল গণনা, একটি প্রযুক্তিগত ত্রুটি কিংবা এক মুহূর্তের রাজনৈতিক উন্মত্ততা– তাতেই কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ মুছে যেতে পারে; এই বাস্তবতা মানবজাতির সবচেয়ে বড়ো নৈতিক বোঝা।

নাগরিক সমাজের ভূমিকা

বিশ্বজুড়ে কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো NPT-পক্ষীয় দেশগুলোর প্রতি ১৯৯৫ সালের প্রতিশ্রুতি– 'পারমাণবিক অস্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ'– পূরণের আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছে।

উপসংহার

পারমাণবিক অস্ত্র কোনো জাতীয় শক্তির প্রতীক নয়– এটি মানবজাতির যৌথ ব্যর্থতার এক বিভীষিকাময় স্মারক। প্রতিটি অতিরিক্ত ওয়ারহেড আমাদের সবাইকে এক ইঞ্চি বেশি অতল গহ্বরের দিকে ঠেলে দেয়। New START-এর মেয়াদ শেষ হলেও সংলাপের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়নি; এখনই সেই দরজা আবার খোলার সবচেয়ে জরুরি মুহূর্ত। ইতিহাস একদিন বিচার করবে আজকের নেতারা কি অস্ত্রের প্রতিযোগিতাকে বেছে নিয়েছিলেন, না সংযমের সাহস দেখিয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি বাসযোগ্য, নিরাপদ পৃথিবী উপহার দিতে হলে নিরস্ত্রীকরণ আর কোনো বিকল্প নয়– এটি একমাত্র পথ।

সূত্র: Control Risks; SIPRI Yearbook 2025; Arms Control Association; ORF Middle East।

NABARUN PUBLICATION

৬৮. প্রযুক্তির নতুন বিস্ময়: Do –°z ট্যাক্সি ও রোবোটিক্স

ভ ভূমিকা

একসময় যা ছিল কেবল কল্পবিজ্ঞানের পর্দায় দেখা স্বপ্ন– আকাশপথে ছুটে চলা ট্যাক্সি– আজ তা বাস্তবের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। শহরের যানজট পেরিয়ে কয়েক মিনিটে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। বৈদ্যুতিক উল্লম্ব উড্ডয়ন ও অবতরণসক্ষম (eVTOL) এয়ার ট্যাক্সি এবং উন্নত রোবোটিক্স মিলিয়ে মানবসভ্যতা প্রবেশ করছে এক নতুন প্রযুক্তি যুগে। এই রচনায় সেই বিস্ময়কর রূপান্তরের কল্পনাপ্রবণ অথচ তথ্যনির্ভর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

আকাশপথে যাতায়াতের স্বপ্ন

ধারণার বাস্তবায়ন: শহুরে আকাশ-পরিবহণ বা 'আরবান এয়ার মোবিলিটি' এখন আর নিছক ধারণা নয়; বৈদ্যুতিক মোটরচালিত, হেলিকপ্টারের মতো উল্লম্বভাবে ওঠানামা করতে সক্ষম এই বিমানগুলো প্রায় নিঃশব্দে ও শূন্য-নিঃসরণে শহরের ভেতরে যাত্রী পরিবহণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

সময়ের নাটকীয় সাশ্রয়: পরিকল্পনা অনুযায়ী, দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে পাম জুমেইরাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে যেখানে গাড়িতে দীর্ঘ সময় লাগে, সেখানে এয়ার ট্যাক্সিতে লাগবে মাত্র প্রায় ১০ মিনিট; আর আবুধাবি থেকে দুবাই পৌঁছানো যাবে আধা ঘণ্টারও কম সময়ে।

যানজটের বিকল্প: প্রায় ২,০০০ ফুট উচ্চতায় উড়ে চলা এই ট্যাক্সিগুলো ৬০ থেকে ৯০ মিনিটের সড়কপথের যাত্রাকে নামিয়ে আনবে মাত্র ১০ থেকে ২০ মিনিটে, যা ভবিষ্যতের নগর-পরিবহণের চিত্রই বদলে দিতে পারে।

নিয়ন্ত্রক অনুমোদন ও কাঠামো

উদ্দেশ্যনির্মিত নিয়মকাঠামো: দুবাইয়ের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা একটি বিশেষভাবে তৈরি নিয়ন্ত্রক কাঠামো দ্বারা সমর্থিত; আমিরাতের জেনারেল সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (GCAA) নতুন 'ভার্টিপোর্ট রেগুলেশনস' প্রণয়ন করেছে।

পাঁচ-ধাপের সনদ: Joby Aviation নিরাপত্তা, পাইলট প্রশিক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন-প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে আমিরাতের বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষের কাছে পাঁচ-ধাপের 'এয়ার অপারেটর সার্টিফিকেট' আবেদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

একচেটিয়া চুক্তি: Joby ২০২৪ সালের ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্টস সামিটে দুবাইয়ের সড়ক ও পরিবহণ কর্তৃপক্ষের (RTA) সঙ্গে চুক্তি করে, যা বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর পর থেকে ছয় বছরের জন্য সেখানে এয়ার ট্যাক্সি পরিচালনার একচেটিয়া অধিকার দেয়।

ভার্টিপোর্ট নির্মাণ

বিশ্বের প্রথম ভার্টিপোর্ট: দুবাই বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিক ভার্টিপোর্ট নির্মাণ শুরু করেছে; দুবাই বিমানবন্দরের পাশে অবস্থিত এই স্থাপনার আনুষ্ঠানিক কোড দেওয়া হয়েছে 'DXV', যা নতুন আমিরাত ভার্টিপোর্ট বিধির অধীনে নকশা-অনুমোদন পাওয়া প্রথম স্থাপনা।

যাত্রী-সক্ষমতা: ২০২৬ সালের জন্য প্রস্তুত হওয়া DXV ভার্টিপোর্ট বছরে আনুমানিক ১ লাখ ৭০ হাজার যাত্রী সামলাতে সক্ষম হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চারটি প্রাথমিক নোড: Joby ও Skyports মিলে দুবাইয়ে চারটি প্রাথমিক ভার্টিপোর্ট গড়ে তুলছে– দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, দুবাই মল, আটলান্টিস দা রয়্যাল রিসোর্ট এবং আমেরিকান ইউনিভার্সিটি ইন দুবাই-এর সংলগ্ন এলাকায়।

ডিজিটাল-ফার্স্ট স্থাপনা: দুবাইয়ের ভার্টিপোর্টে থাকছে নিরাপত্তা স্ক্রিনিং, অপেক্ষাকক্ষ, নিরাপত্তা-ব্রিফিং অঞ্চল ও ফ্লাইট-টাইম প্রদর্শন বোর্ড; পুরো ব্যবস্থাটি ডিজিটাল-ফার্স্ট, যাত্রীরা একটি অ্যাপের মাধ্যমে বুকিং করবেন।

দুই আমিরাতের প্রতিযোগিতা

আবুধাবিতে আর্চার: দুবাইয়ের Joby-এর প্রতিদ্বন্দ্বী Archer Aviation আবুধাবিকে তাদের প্রথম আন্তর্জাতিক বাজার হিসেবে বেছে নিয়েছে; তাদের 'Midnight' নামের চার-যাত্রীবাহী বিমান আল বাতিন এক্সিকিউটিভ এয়ারপোর্টে পরীক্ষামূলক উড্ডয়নও সম্পন্ন করেছে।

আবুধাবির নেটওয়ার্ক: আবুধাবি ১০টি ভার্টিপোর্টের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে; এমনকি রাস আল খাইমাহও ২০২৭ সালের মধ্যে যাত্রী এয়ার ট্যাক্সি সেবা চালুর প্রত্যাশা করছে।

ভিন্ন ব্যাবসায়িক মডেল: Joby নিজে সেবা পরিচালনা করবে, আর Archer স্থানীয় অংশীদারদের কাছে বিমান বিক্রি করবে– এই দুই কৌশলের প্রতিযোগিতা গোটা শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করছে।

বাস্তবতা ও সতর্কতা

সীমিত সূচনা: যেহেতু প্রতিটি নতুন ও জটিল প্রযুক্তিরই প্রাথমিক সমস্যা থাকে, Joby ২০২৬ সালে বেশ সীমিত পরিসরে কার্যক্রম শুরুর কথা ভাবছে–পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন থেকে ধাপে ধাপে যাত্রী পরিবহনের দিকে এগোবে।

নির্ভরযোগ্যতার পরীক্ষা: নিরাপদ ও নিয়মিত সেবা চালু রাখতে হলে বিমান, চার্জিং অবকাঠামো ও শিডিউলিং সফটওয়্যার– সবকিছুকেই প্রতিদিন নিখুঁতভাবে কাজ করতে হবে, যা একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ।

প্রাথমিক মূল্য: নতুন প্রযুক্তি ও সীমিত পরিসরের কারণে শুরুর দিকে এই সেবা থাকবে ব্যয়বহুল ও 'প্রিমিয়াম' শ্রেণির; ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেতে সময় লাগবে।

উপসংহার

Do–°z ট্যাক্সি মানুষের অদম্য উদ্ভাবনী চেতনার প্রতীক, যা অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার সাহস জোগায়। সংযুক্ত আরব আমিরাত আজ যে পথ দেখাচ্ছে, আগামী দশকে তা ছড়িয়ে পড়তে পারে নিউইয়র্ক থেকে টোকিও পর্যন্ত বিশ্বের নানা শহরে। তবে এই স্বপ্নকে টেকসই বাস্তবে রূপ দিতে হলে নিরাপত্তা, পরিবেশবান্ধবতা ও সর্বজনীন সাশ্রয়িতার ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। আকাশ আর শেষ সীমানা নয়– তা হয়ে উঠছে আমাদের দৈনন্দিন পথচলার নতুন মহাসড়ক।

সূত্র: *Gulf News; Aviation Week; The National; Aerospace Global News।*

SINCE - 1993
NABARUN PUBLICATION

৬৯. জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত বিপর্যয়

ভূমিকা

পৃথিবী আজ জ্বরে কাঁপছে– এ কোনো রূপকথা নয়, বরং বিজ্ঞানের নির্মম পরিসংখ্যানে প্রমাণিত বাস্তবতা। ইউরোপের রাজপথে গ্রীষ্মের অসহনীয় তাপপ্রবাহ, স্পেন ও কানাডার দাবানল, কিংবা সমুদ্রের অস্বাভাবিক উষ্ণতা– সবই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং আর ভবিষ্যতের আশঙ্কা নয়, বর্তমানের সংকট। মানবসভ্যতার মুখোমুখি সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ এই জলবায়ু পরিবর্তন নিয়েই এই রচনা।

উষ্ণতার রেকর্ড

তৃতীয় উষ্ণতম বছর: Copernicus জলবায়ু পরিবর্তন সেবা সংস্থার (C3S) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ ও ২০২৪–এর পর ২০২৫ ছিল বিশ্বের রেকর্ড করা ইতিহাসে তৃতীয় উষ্ণতম বছর।

শিল্পপূর্ব স্তরের তুলনায়: ERA5 তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বৈশ্বিক ভূপৃষ্ঠের বায়ুর তাপমাত্রা শিল্পপূর্ব স্তরের চেয়ে ১.৪৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল, আর ২০২৪ সালে তা ছিল রেকর্ড– সর্বোচ্চ ১.৬০ ডিগ্রি।

টানা ১১ বছরের ধারা: বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) নিশ্চিত করেছে, ২০১৫ থেকে ২০২৫– এই টানা ১১ বছরই রেকর্ড-করা ইতিহাসে সবচেয়ে উষ্ণ, যা উষ্ণায়নের অবিসংবাদিত প্রবণতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

প্যারিস চুক্তির সীমা অতিক্রম

টানা তিন বছরের সতর্কসংকেত: ECMWF জানিয়েছে, ২০২৫ সাল দিয়ে শেষ হলো প্রথম এমন তিন বছরের ধারাবাহিক সময়কাল, যেখানে গড় বৈশ্বিক তাপমাত্রা শিল্পপূর্ব যুগের চেয়ে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল– যা প্যারিস চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ সীমা।

প্রতিটি ভগ্নাংশ গুরুত্বপূর্ণ: ECMWF-এর জলবায়ু কৌশল প্রধান যথার্থই বলেছেন– '১.৫ ডিগ্রি কোনো খাদের কিনারা নয়, তবে আমরা জানি, প্রতিটি ভগ্নাংশ ডিগ্রিই গুরুত্বপূর্ণ', বিশেষত চরম আবহাওয়াকে আরও ভয়াবহ করে তোলার ক্ষেত্রে।

দীর্ঘমেয়াদি উষ্ণায়ন: বিভিন্ন পদ্ধতিতে হিসাব করে দেখা যায়, বর্তমানে দীর্ঘমেয়াদি বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মাত্রা শিল্পপূর্ব স্তরের চেয়ে প্রায় ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি এবং বিশ্ব দ্রুত প্যারিস চুক্তির নির্ধারিত সীমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

চরম আবহাওয়ার তাণ্ডব

ইউরোপের তাপপ্রবাহ: ২০২৫ সাল ছিল ইউরোপের জন্যও তৃতীয় উষ্ণতম বছর; রোম, বার্সেলোনাসহ ইউরোপের নানা শহরে গ্রীষ্মে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়ে যায়।

বিশ্বজুড়ে বিপর্যয়: ২০২৫ সালে রেকর্ড তাপপ্রবাহ, ইউরোপ-এশিয়া-উত্তর আমেরিকায় ভয়াবহ ঝড় এবং স্পেন, কানাডা ও দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানলসহ নানা চরম ঘটনা ঘটেছে।

মহাসাগরের উষ্ণতা: মহাসাগর ক্রমাগত উষ্ণ হচ্ছে ও কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করছে; গত দুই দশক ধরে এটি প্রতি বছর মানুষের বার্ষিক শক্তি-ব্যবহারের প্রায় ১৮ গুণ সমপরিমাণ তাপ শোষণ করছে।

সমুদ্রই তাপভান্ডার: বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রায় ৯০ শতাংশ অতিরিক্ত তাপ মহাসাগরে সঞ্চিত হয়, ফলে সমুদ্রের তাপ-পরিমাণ জলবায়ু পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হয়ে উঠেছে।

ভবিষ্যৎ ও দায়িত্ব

আসন্ন উষ্ণ বছর: ECMWF আশঙ্কা করছে, ২০২৬ সালও বিশ্বের পাঁচটি উষ্ণতম বছরের একটি হতে পারে; অর্থাৎ, উষ্ণায়নের এই ধারা সহজে থামছে না।

জরুরি পদক্ষেপের ডাক: ইউরোপীয় কমিশনের আর্থ-অবজারভেশন বিভাগের প্রধান একে 'এমন এক মাইলফলক, যা কেউ দেখতে চায় না' বলে অভিহিত করে জলবায়ু পদক্ষেপের নজিরবিহীন জরুরিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আমাদের হাতেই সিদ্ধান্ত: বিজ্ঞানীরা মনে করিয়ে দেন, তাপমাত্রার এই 'ওভারশুট' কীভাবে সামলানো হবে, সেই সিদ্ধান্ত এখনও আমাদের হাতেই; নিঃসরণ হ্রাস ও দ্রুত পদক্ষেপই একমাত্র পথ।

উপসংহার

জলবায়ু পরিবর্তন আজ মানবসভ্যতার অস্তিত্বের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি বছর যখন আগের সব রেকর্ড ভেঙে নতুন উষ্ণতার শিখর স্পর্শ করছে, তখন নিষ্ক্রিয়তার কোনো অবকাশ নেই। এই গ্রহ আমাদের একমাত্র আবাস; একে রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদেরই। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যেতে হলে আজই– এই মুহূর্তেই– সম্মিলিত, সাহসী ও আন্তরিক পদক্ষেপ নিতে হবে। সময় ফুরিয়ে আসছে, কিন্তু এখনও শেষ হয়ে যায়নি।

সূত্র: Le Monde; Copernicus Climate Change Service; World Meteorological Organization; Reuters।

৭০. কার্বন অপসারণ ও জলবায়ু–প্রযুক্তি

ভূমিকা

জলবায়ু সংকটের অন্ধকার মেঘের ভেতরেও মানুষ খুঁজে চলেছে আশার আলো। নিঃসরণ কমানোর পাশাপাশি বিজ্ঞানীরা এখন এমন প্রযুক্তি গড়ে তুলছেন, যা সরাসরি বায়ুমন্ডল থেকেই কার্বন ডাইঅক্সাইড টেনে বের করে আনে– 'ডাইরেক্ট এয়ার ক্যাপচার' বা DAC। এই প্রযুক্তি একদিকে যেমন–সম্ভাবনার দুয়ার খুলছে, তেমনি বাস্তব সীমাবদ্ধতার কঠিন প্রশ্নও তুলছে। সমস্যা ও সমাধান–উভয়কে সঙ্গে নিয়েই এই রচনা।

ডাইরেক্ট এয়ার ক্যাপচার কী

মূল ধারণা: ডাইরেক্ট এয়ার ক্যাপচার এমন একটি প্রযুক্তি, যেখানে বিশাল পাখার সাহায্যে বাতাস টেনে এনে বিশেষ রাসায়নিক ফিল্টার বা শোষকের মধ্য দিয়ে চালিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড আলাদা করা হয়, এরপর তা স্থায়ীভাবে ভূগর্ভে সংরক্ষণ করা হয়।

প্রচলিত ক্যাপচার থেকে ভিন্ন: কারখানার চিমনি থেকে নিঃসরণের উৎসে কার্বন আটকানোর প্রচলিত পদ্ধতির বিপরীতে, DAC সরাসরি উন্মুক্ত বায়ুমন্ডল থেকেই কার্বন অপসারণ করে, যা একে আলাদা ও চ্যালেঞ্জিং করে তোলে; কারণ বাতাসে কার্বনের ঘনত্ব খুবই কম (প্রায় ৪২২ পিপিএম)।

ম্যামথ: চালু থাকা বৃহত্তম স্থাপনা

আইসল্যান্ডে যাত্রা: সুইস কোম্পানি Climeworks ২০২৪ সালের ৮ মে আইসল্যান্ডে চালু করে 'ম্যামথ' (Mammoth)– বিশ্বের তৎকালীন বৃহত্তম ডাইরেক্ট এয়ার ক্যাপচার ও স্টোরেজ প্ল্যান্ট।

সক্ষমতা: পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হলে ম্যামথের ৭২টি সংগ্রাহক বছরে সর্বোচ্চ ৩৬,০০০ টন কার্বন ডাইঅক্সাইড অপসারণে সক্ষম, যা এর পূর্বসূরি 'ওরকা' প্ল্যান্টের চেয়ে প্রায় নয় গুণ বেশি।

নবায়নযোগ্য শক্তি: Climeworks তাঁর DAC প্রক্রিয়া চালায় নবায়নযোগ্য শক্তি দিয়ে; অংশীদার Carbfix আটকানো কার্বনকে ব্যাসল্ট শিলার সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ভূগর্ভে স্থায়ীভাবে আটকে দেয়।

স্ট্র্যাটোস: পরবর্তী বিশাল লাফ

টেক্সাসে নির্মাণ: যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম টেক্সাসে Occidental-এর সহযোগী 1PointFive নির্মাণ করছে 'স্ট্র্যাটোস' (Stratos), যা বছরে সবোচ্চ ৫ লাখ টন কাবন ডাইঅক্সাইড অপসারণে সক্ষম হবে, অথাৎ ম্যামথের চেয়ে পায় ১৪ গুণ বড়ো।

পর্যায়ক্রমিক চালু: মডিউলার 'ট্রেন' আকারে নির্মিত স্ট্র্যাটোসের প্রথম দুটি ট্রেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে শেষ হয়; ২০২৫ সালের শেষদিকে কাযক্রম শুর হয়ে ২০২৬ সালের মাঝামাঝি পূণ সক্ষমতায় পৌঁছানোর কথা।

বাণিজ্যিক পরীক্ষা: দিনে প্রায় ১,৩৭০ টন কার্বন অপসারণ করতে সক্ষম এই স্থাপনাই হবে DAC প্রযুক্তি পাইলট পর্যায় ছাড়িয়ে বাণিজ্যিক স্কেলে কাজ করতে পারে কি না, তার প্রথম বড়ো পরীক্ষা।

আরও স্থাপনা: Heirloom লুইজিয়ানায় দুটি স্থাপনা গড়ছে যাদের সম্মিলিত সক্ষমতা বছরে ৩ লাখ ২০ হাজার টন; এগুলো ২০২৬ সালে চালু হলে কার্বন অপসারণের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে বলে আশা।

বাস্তব সীমাবদ্ধতা ও সমালোচনা

সক্ষমতা বনাম বাস্তবতা: সমালোচকরা মনে করিয়ে দেন– ২০২৪ সালে ম্যামথ প্ল্যান্ট বাস্তবে সারা বছরে মাত্র অল্প পরিমাণ কার্বন অপসারণ করতে পেরেছে, যা নকশাকৃত সক্ষমতার তুলনায় অনেক কম; এটি প্রযুক্তির প্রাথমিক অবস্থার সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে।

উচ্চ ব্যয়: Climeworks-এর কার্বন অপসারণ ক্রেডিটের দাম এখনও প্রতি টন প্রায় ৬০০–৮০০ ইউরো, যা একে অনেক ক্ষেত্রে ব্যয়সাপেক্ষ করে তোলে; তবে বড়ো স্থাপনাগুলো চালু হলে দাম কমার আশা করা হচ্ছে।

পরিপূরক, বিকল্প নয়: বিশেষজ্ঞরা জোর দিয়ে বলেন, DAC কখনোই নিঃসরণ হ্রাসের বিকল্প নয়, পরিপূরক; মূল লড়াই এখনও জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোতেই।

উপসংহার

কার্বন অপসারণ প্রযুক্তি মানুষের প্রকৌশল-প্রতিভার এক অসাধারণ নিদর্শন– বাতাস থেকে অদৃশ্য গ্যাস টেনে বের করে আনার এই সক্ষমতা একসময় অকল্পনীয় ছিল। তবে এই প্রযুক্তিকে আশীর্বাদ হিসেবে কাজে লাগাতে হলে তাকে দেখতে হবে এক বৃহত্তর সমাধানের অংশ হিসেবে, একক জাদুকরী সমাধান হিসেবে নয়। সমস্যা যত বড়ো, সমাধানও তত বহুমুখী হতে হবে– নিঃসরণ হ্রাস,

নবায়নযোগ্য শক্তি ও কার্বন অপসারণ মিলেই গড়ে উঠবে এক টেকসই ভবিষ্যৎ। অন্ধকারের ভেতরেও মানুষের উদ্ভাবন জ্বালিয়ে রাখছে আশার প্রদীপ।

সূত্র: Innovation Mode; Climeworks; Interesting Engineering; Regreener।

SINCE-1993
NABARUN PUBLICATION

৭১. বৈশ্বিক স্বাস্থ্য ও জলবায়ু–সম্পর্কিত রোগ

ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তন সরাসরি আঘাত হানছে মানুষের শরীরে ও স্বাস্থ্যে। উষ্ণায়নের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে রোগবাহী মশা–মাছির আবাসস্থল, ছড়িয়ে পড়ছে ম্যালেরিয়া-ডেঙ্গুর মতো রোগ, বাড়ছে তাপজনিত মৃত্যু। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে অভিহিত করেছে মানবজাতির মুখোমুখি সবচেয়ে বড়ো স্বাস্থ্য-হুমকি হিসেবে। স্বাস্থ্য ও পরিবেশের এই গভীর আন্তঃসম্পর্ক নিয়েই এই রচনা।

জলবায়ু: এক স্বাস্থ্য-জরুরি অবস্থা

বহুমুখী প্রভাব: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, জলবায়ু পরিবর্তন নানাভাবে স্বাস্থ্যে আঘাত হানছে– চরম আবহাওয়াজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতা, খাদ্যব্যবস্থার বিপর্যয়, প্রাণিবাহিত ও পানি– পরিবেশবাহিত রোগের বিস্তার এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা।

সবচেয়ে বড়ো হুমকি: আসন্ন জলবায়ু সংকটকে চিহ্নিত করা হয়েছে মানবজাতির মোকাবিলা করতে হওয়া সবচেয়ে বড়ো স্বাস্থ্য-হুমকি হিসেবে; পরিবেশ ও জলবায়ু-উপাদান সরাসরি প্রভাবিত করছে রোগবাহক ও রোগজীবাণু উভয়কেই।

অসম প্রভাব: এই জলবায়ু সংবেদনশীল স্বাস্থ্য-ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি বহন করছে সবচেয়ে দুর্বল ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী– নারী, শিশু, দরিদ্র সম্প্রদায়, অভিবাসী ও বাস্তুচ্যুত মানুষ এবং বয়স্করা।

প্রাণিবাহিত রোগের বিস্তার

৭ লাখ মৃত্যু: প্রাণিবাহিত রোগ (vector-borne disease) বর্তমানে সব সংক্রামক রোগের ১৭ শতাংশেরও বেশি; এতে প্রতি বছর ৭ লাখের বেশি মানুষ মারা যায়, যার মধ্যে কেবল ম্যালেরিয়াতেই মৃত্যু ৬ লাখের বেশি।

নতুন অঞ্চলে বিস্তার: তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ও লাইম রোগের মতো রোগ আগে অপ্রভাবিত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে এবং ইতোমধ্যে আক্রান্ত এলাকায় পরিস্থিতি আরও খারাপ করছে।

উচ্চতায়ও সংক্রমণ: কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু ও বলিভিয়ার মতো দেশে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২,০০০ মিটারেরও বেশি উঁচু আন্দিজ অঞ্চলে, যা একসময় সংক্রমণের অযোগ্য মনে করা হতো; সেখানেও ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে।

চরম আবহাওয়ার ভূমিকা: বন্যা বিশাল অস্থায়ী প্রজননক্ষেত্র তৈরি করে মশার সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়; যেমন– ২০২৫ সালে পাকিস্তানের বর্ষায় বিপর্যয়কর বন্যা পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে আর্বোভাইরাল রোগের বিস্ফোরক প্রাদুভাব ঘটায়।

তাপ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যঝুঁকি

তাপজনিত মৃত্যু: সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী, তাপজনিত মৃত্যুর ৩৭ শতাংশের জন্য দায়ী মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন; গত দুই দশকে ৬৫ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে তাপজনিত মৃত্যু বেড়েছে ৭০ শতাংশ।

খাদ্য-নিরাপত্তাহীনতা: ২০২০ সালে ১৯৮১–২০১০ সময়ের গড়ের তুলনায় ৯ কোটি ৮০ লাখ বেশি মানুষ খাদ্য-নিরাপত্তাহীনতার মুখে পড়েছিল–জলবায়ু পরিবর্তন খাদ্যব্যবস্থায় সরাসরি আঘাত হানছে।

মানসিক স্বাস্থ্য: জলবায়ু পরিবর্তন একই সঙ্গে তাৎক্ষণিক মানসিক সমস্যা (যেমন– উদ্বেগ ও ট্রমা) এবং বাস্তুচ্যুতি ও সামাজিক বন্ধন ভাঙনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি মানসিক ব্যাধিরও জন্ম দিচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পূর্বাভাস: WHO সতর্কভাবে অনুমান করছে, ২০৩০-এর দশক নাগাদ ম্যালেরিয়া ও উপকূলীয় বন্যার মতো জলবায়ু-প্রভাবিত কারণে বছরে অতিরিক্ত ২ লাখ ৫০ হাজার মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

করণীয় ও আশার দিক

প্রতিরোধযোগ্যতা: সঠিক অবকাঠামো, সরকারি সহযোগিতা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পারলে এই রোগগুলোর প্রভাব অনেকটাই কমানো সম্ভব– অর্থাৎ, সংকট অনিবার্য নয়।

টিকার অগ্রগতি: RTS,S/AS01 ও R21/Matrix–M– এই দুটি ম্যালেরিয়া টীকার সাম্প্রতিক অনুমোদন লক্ষ লক্ষ মানুষ, বিশেষত শিশুদের, এই মশাবাহিত রোগ থেকে রক্ষার নতুন আশা জাগিয়েছে।

দ্রুত প্রতিক্রিয়া: বিশ্বজুড়ে স্থানীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে এমনভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে, যাতে চরম আবহাওয়ার পরপরই সম্ভাব্য রোগ-প্রাদুর্ভাবে দ্রুত সাড়া দেওয়া যায়।

উপসংহার

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ– এ দুটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত; একটির ক্ষতি অনিবার্যভাবে ডেকে আনে অন্যটির বিপর্যয়। জলবায়ু পরিবর্তন তাই কেবল পরিবেশবিদদের নয়, চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্য-কর্মীদেরও গভীর উদ্বেগের বিষয়। তবে আশার কথা হলো, এই ঝুঁকির অনেকটাই

প্রতিরোধযোগ্য, যদি আমরা জলবায়ু সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা শক্তিশালীকরণকে একসঙ্গে অগ্রাধিকার দিই। একটি সুস্থ পৃথিবীই কেবল গড়ে তুলতে পারে একটি সুস্থ মানবজাতি।

সূত্র: Earth.Org; World Health Organization; UNDP; CAS; Science Direct।

SINCE-1993
NABARUN PUBLICATION

৭২. ফিফা বিশ্বকাপ–২০২৬

ভূমিকা

ফুটবল খেলা এক সর্বজনীন ভাষা, যা ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও সীমান্তের বিভেদ ভুলিয়ে কোটি কোটি মানুষকে এক করে দেয়। প্রতি চার বছর অন্তর ফিরে আসা ফিফা বিশ্বকাপ সেই ঐক্যের সবচেয়ে বড়ো উৎসব। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ ইতিহাসের পাতায় এক অনন্য অধ্যায় রচনা করতে চলেছে– তিনটি দেশ মিলে আয়োজন, ৪৮টি দলের অংশগ্রহণ আর রেকর্ডসংখ্যক ম্যাচ। খেলাধুলার এই ঐক্যবন্ধকারী শক্তি নিয়েই এই রচনা।

ঐতিহাসিক আয়োজন

তিন দেশের যৌথ আয়োজন: ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ যৌথভাবে আয়োজন করছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো– এই প্রথম তিনটি দেশ মিলে একটি বিশ্বকাপের আয়োজক এবং দ্বিতীয়বারের মতো একাধিক দেশ যৌথভাবে আয়োজন করছে (এর আগে ২০০২ সালে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া)।

১৬ শহর, ১৬ ভেন্যু: টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হবে ১৬টি শহরে– যার মধ্যে ১১টি যুক্তরাষ্ট্রে, ৩টি মেক্সিকোতে এবং ২টি কানাডায়।

২৩তম আসর: এটি ফিফা বিশ্বকাপের ২৩তম আসর, যা আনুষ্ঠানিকভাবে FIFA World Cup 2026 নামে বিপণন করা হচ্ছে।

নতুন বিন্যাস ও রেকর্ড

৪৮ দলের প্রথম আসর: এই প্রথম ৪৮টি দল বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে, যা ২০২২ সালের ৩২ দলের তুলনায় বড়ো সম্প্রসারণ।

১০৪টি ম্যাচ: ৪৮ দলকে ১২টি গ্রুপে (প্রতি গ্রুপে চার দল) ভাগ করা হয়েছে; মোট ১০৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে (গ্রুপ পর্বে ৭২টি ও নকআউট পর্বে ৩২টি), যা ২০২২ সালের ৬৪ ম্যাচ থেকে অনেক বেশি।

৩৯ দিনের উৎসব: অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা বেশি হওয়ায় টুর্নামেন্টটি চলবে ২০২৬ সালের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত– মোট ৩৯ দিন, যা আগের আসরগুলোর প্রায় ৩২ দিনের চেয়ে দীর্ঘ।

নতুন রাউন্ড অব ৩২: প্রতি গ্রুপের শীর্ষ দুই দল এবং সেরা আটটি তৃতীয়-স্থানধারী দল নতুন 'রাউন্ড অব ৩২'-এ উঠবে; এরপর সব ম্যাচই নকআউট পদ্ধতিতে।

সূচি ও আকর্ষণ

উদ্বোধন ও ফাইনাল: উদ্বোধনী ম্যাচ ১১ জুন মেক্সিকো সিটির বিখ্যাত এস্তাদিও আজতেকায় (মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা), আর ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১৯ জুলাই নিউইয়র্কের নিউজার্সি স্টেডিয়ামে।

চূড়ান্ত ড্র: গ্রুপ-বিন্যাস চূড়ান্ত হয় ২০২৫ সালের ৫ ডিসেম্বরের ফাইনাল ড্র এবং ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের শেষ বাছাইপর্বের ম্যাচগুলোর পর; ছয়টি দল প্লে-অফের মাধ্যমে চূড়ান্ত স্থান নিশ্চিত করে।

ব্যাপক সম্প্রচার: বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি দর্শক এই আসর উপভোগ করবেন; কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই সব ১০৪টি ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচারিত হবে এবং রেকর্ড ৪০টিরও বেশি ম্যাচ প্রাইম-টাইমে দেখানো হবে।

ফুটবলের ঐক্যবন্ধকারী শক্তি

বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় আসর: ফুটবল বিশ্বকাপ গ্রহের সবচেয়ে বেশি দর্শকপ্রিয় ক্রীড়া আসর; এই ক'টি সপ্তাহ গোটা বিশ্ব যেন এক বিশাল পরিবারে পরিণত হয়, যেখানে আনন্দ-উচ্ছ্বাস ভাগ করে নেয় ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ।

ছয় মহাদেশের মিলনমেলা: ছয়টি মহাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী ৪৮টি দলের অংশগ্রহণে এই আসর হয়ে উঠছে এক প্রকৃত বৈশ্বিক মিলনমেলা, যা মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বার্তা বহন করে।

শান্তির বার্তা: ফিফা ২০২৫ সালে প্রবর্তিত 'ফিফা পিস প্রাইজ' চালু করেছে, যা প্রতি বছর শান্তির মাধ্যমে বিশ্বের মানুষকে এক করতে সহায়তাকারী ব্যক্তিদের দেওয়া হবে, যা খেলাধুলার ঐক্যবন্ধকারী আদর্শকেই তুলে ধরে।

উপসংহার

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ মানবতার ঐক্য, বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতির এক জীবন্ত উদ্‌যাপন। যখন বিশ নানা সংঘাত ও বিভাজনে ক্লান্ত, তখন একটি ফুটবল বিশ্বকাপ মনে করিয়ে দেয়– খেলার মাঠে আমরা সবাই সমান, সবাই এক। তিন দেশ, ৪৮ দল আর কোটি কোটি হৃদয়ের এই মহামিলন প্রমাণ করবে, খেলাধুলার শক্তি সীমান্ত মুছে দিয়ে মানুষকে কাছে টানতে পারে। বল গড়ানোর সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় আজ গোটা বিশ্ব।

সূত্র: Wikipedia; Encyclopedia Britannica; NBC Sports; Roadtrips।

JANEARUN PUBLICATION

৭৩. মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ ও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে প্রভাব

ভূমিকা

একুশ শতকের তৃতীয় দশকে এসে মানবসভ্যতা আবারও প্রত্যক্ষ করেছে যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ। ২০২৬ সালের শুরুতে ইরানকে কেন্দ্র করে যে সংঘাত দানা বাঁধে, তা কেবল একটি আঞ্চলিক বিরোধ হয়ে থাকেনি–তার কম্পন গিয়ে পৌঁছেছে বিশ্ব অর্থনীতির স্নায়ুকেন্দ্রে। তেলের পাইপলাইন থেকে শুরু করে রুটির দাম পর্যন্ত, যুদ্ধের আঁচ লেগেছে সর্বত্র। এই রচনায় দেখানো হয়েছে কীভাবে একটি যুদ্ধ একই সঙ্গে জীবন ও জীবিকা–উভয়কেই বিপন্ন করে তোলে।

সংঘাতের প্রেক্ষাপট ও বিস্তার

সংঘাতের সূচনা: ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বপরিকল্পিত হামলার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সূচনা হয়, যা ২০২৪ ও ২০২৫ সালের উত্তেজনার ধারাবাহিকতার এক বড়ো উল্লম্ফন।

পাঁচ সপ্তাহের লড়াই: Encyclopædia Britannica–র তথ্য অনুযায়ী, পাঁচ সপ্তাহেরও বেশি লড়াইয়ের পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান ৭–৮ এপ্রিল যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়, যাতে ইসরায়েলও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বহুপাক্ষিক জড়িত হওয়া: পারমাণবিক কর্মসূচি, প্রক্সি মিলিশিয়াদের প্রতি সমর্থন এবং আঞ্চলিক আধিপত্যের দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধে ইসরায়েল, ইরান, যুক্তরাষ্ট্র ও বিভিন্ন প্রক্সি শক্তি জড়িয়ে পড়ে।

মানবিক ক্ষয়ক্ষতি

হাজারো প্রাণহানি: Britannica জানায়, এই সংঘাতে ইরান ও লেবাননে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়, আর ইসরায়েল ও উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলোতে নিহত হয় কয়েক ডজন।

লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত: আল-জাজিরার সরাসরি পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হিসেবে নিবন্ধিত হয়; কেবল ৮ এপ্রিল একদিনেই হামলায় ৩০০-এর বেশি মানুষ নিহত ও অন্তত ১,১৫০ জন আহত হন।

দৈনন্দিন জীবনে আঘাত: যুদ্ধ কেবল রণাঙ্গনে সীমাবদ্ধ থাকেনি– অবকাঠামো ধ্বংস, ইন্টারনেট অন্ধকার ও মৌলিক সেবায় বিঘ্ন সাধারণ নাগরিকদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

জ্বালানি সরবরাহে বিপর্যয়

হরমুজ প্রণালির সংকট: বিশ্বের অন্যতম স্পর্শকাতর তেল-করিডর হরমুজ প্রণালিতে চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়, ফলে এশিয়ার নানা অংশে জ্বালানি সংকট দেখা দেয় এবং তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিশ্ব অর্থনীতিতে।

তেলের দামে উল্লম্ফন: Middle East Council on Global Affairs-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বৈশ্বিক তেল ও গ্যাস সরবরাহ প্রায় ২০ শতাংশ কমে যাওয়ায় ব্যারেল প্রতি দাম ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যায়– যা একটি বৈশ্বিক মন্দা ডেকে আনার মতো যথেষ্ট।

অর্থনৈতিক ধাক্কা

ইরানের পঙ্গু অর্থনীতি: যুদ্ধের সরাসরি ব্যয়, কয়েক দশকের নিষেধাজ্ঞা ও মুদ্রার অবমূল্যায়ন মিলিয়ে ইরানের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়; রিয়ালের মান ২০১৮ সালের পর থেকে ৯০ শতাংশেরও বেশি হারিয়েছে।

ইসরায়েলের আর্থিক বোঝা: ৩০ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত হিসাবে, ইসরায়েলের অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়।

স্ট্যাগফ্লেশনের আশঙ্কা: টেকসই উচ্চ তেলের দাম একই সঙ্গে মন্দা ও মূল্যস্ফীতির দ্বৈত সংকট–স্ট্যাগফ্লেশন–সৃষ্টির ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে বলে অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করেন।

উপসংহার

এই যুদ্ধ আমাদের আরেকবার মনে করিয়ে দিয়েছে–আজকের বিশ্ব একটি অভিন্ন জালে বাঁধা। এক অঞ্চলের বারুদের গন্ধ অন্য মহাদেশের মানুষের ভাতের থালায় গিয়ে পৌঁছায়। তাই যুদ্ধ থামানো কেবল কূটনৈতিক দায় নয়, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার শর্তও বটে। শান্তির পথই একমাত্র টেকসই পথ।

সূত্র: Encyclopædia Britannica; Al Jazeera; AP News; Middle East Council on Global Affairs।

৭৪. স্যাটেলাইট যুগে বাংলাদেশ
অথবা, মহাকাশ যুগে বাংলাদেশ

ভূমিকা

সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়,
জ্বলে পুড়ে–মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়। — সুকান্ত

"তীব্র আগুনের হলকা ছুটিয়ে প্রচন্ড শক্তিতে মহাকাশের দিকে ডানা মেলে ছুটে চলল বাংলাদেশের পতাকাশোভিত প্রথম স্যাটেলাইট " —এটি স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় মুহূর্ত। এর মাধ্যমে বাঙালি জাতির সক্ষমতা, উন্নতি, সাফল্য, গৌরব ও দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ হয়। বাংলাদেশ প্রবেশ করে মহাকাশ যুগে। স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্যাটেলাইটের অভিজাত ক্লাবের ৫৭তম সদস্যের মর্যাদা লাভ করে।

স্যাটেলাইট কী ও কীভাবে কাজ করে : স্যাটেলাইট হলো মহাকাশে উৎক্ষেপিত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত কৃত্রিম উপগ্রহ। স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গার খবর নিমেষেই পেয়ে যাই। স্যাটেলাইটকে রকেট বা স্পেস শাটলের কার্গো বে–এর মাধ্যমে কক্ষপথে পাঠানো হয়। পাঠানোর সময় রকেট নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয় ইনর্শিয়াল গাইডেন্স সিস্টেম (আইজিএস) মেকানিজম। পৃথিবীর অভিকর্ষ পার হতে রকেটটিকে ঘণ্টায় ২৫ হাজার ৩৯ মাইল ত্বরণে ছুটতে হয়। স্যাটেলাইট স্থাপনের সময় কক্ষীয় গতি ও তার জড়তার ওপর পৃথিবীর অভিবর্ষের যে প্রভাব রয়েছে এর জন্য সামঞ্জস্যবিধান করতে না পারলে স্যাটেলাইট এ অভিকর্ষের টানে ফের ভূ–পৃষ্ঠে চলে আসতে পারে। এ জন্য স্যাটেলাইটকে ১৫০ মাইল উচ্চতাবিশিষ্ট কক্ষপথে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১৭ হাজার মাইল গতিতে পরিভ্রমণ করানো হয়। মূলত গতিবেগ কত হবে তা নির্ভর করে স্যাটেলাইটটি পৃথিবী থেকে কত উচ্চতায় রয়েছে, তার ওপর। পৃথিবী থেকে ২২ হাজার ২২৩ মাইল ওপরে স্থাপিত স্যাটেলাইট ঘণ্টায় ৭০০ মাইল বেগে পৃথিবীকে আবর্তন করে। পৃথিবীর সঙ্গে স্যাটেলাইটও ২৪ ঘণ্টা ঘোরে। তবে ভূ–স্থির বা জিওস্টেশনারি উপগ্রহগুলো এক জায়গাতেই থাকে। এগুলো আবহাওয়া ও যোগাযোগ–সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত হয়। স্যাটেলাইট ঠিক এরকমই একটি স্যাটেলাইট। কাজের ধরনের ওপর নির্ভর করে স্যাটেলাইটটি কত উচ্চতায় বসবে। যেমন : গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) স্যাটেলাইট স্থাপন করা হয় ৬ হাজার থেকে ১২ হাজার মাইল উচ্চতায়।

স্যাটেলাইট সম্পর্কিত তথ্য : কৃত্রিম উপগ্রহটি ১১৯.১° পূর্ব দ্রাঘিমার ভূ–স্থির প্লটে স্থাপিত হয়। এটিকে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকরণ করা হয়েছে। ফ্রান্সের থ্যালিস অ্যালেনিয়া স্পেস কর্তৃক নকশা তৈরি করা হয়েছে এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিমালিকানাধীন মহাকাশযান সংস্থা স্পেস এক্স থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। স্যাটেলাইট ১৬০০ মেগাহার্টজ ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৪০টি কেইউ এবং টিসি ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার বহন করবে এবং এটির আয়ুষ্কাল ১৫ বছর। স্যাটেলাইটের বাইরের অংশে বাংলাদেশের লাল–সবুজ পতাকার রঙের নকশার ওপর ইংরেজিতে লেখা রয়েছে বাংলাদেশ ও । বাংলাদেশ সরকারের একটি মনোগ্রামও সেখানে রয়েছে। বিএস–১ উপগ্রহটি ২৬টি কেইউ ব্যান্ড এবং ১৪টি টিসি ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডারে সজ্জিত হয়েছে ১১৯ দশমিক ১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমার কক্ষপথে অবস্থান থেকে। কেইউ ব্যান্ডের আওতায় রয়েছে বাংলাদেশ, বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমাসহ ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া অঞ্চল। টিসি ব্যান্ডেরও আওতায় রয়েছে এই সমুদয় অঞ্চল।

স্যাটেলাইটের সম্ভাবনা : বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড স্যাটেলাইট মহাকাশে কাজ শুরু করার তিন মাসের মধ্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। বিদেশি স্যাটেলাইটের ভাড়া বাবদ বাংলাদেশকে গুনতে হতো ১ কোটি ৪০ লাখ ডলার। নিজস্ব উপগ্রহ উৎক্ষেপণের পর বাংলাদেশ সেই নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠে অর্থ সাশ্রয় করতে পারছে। স্যাটেলাইটে রয়েছে মোট ৪০টি ট্রান্সপন্ডার। এর ২০টি বাংলাদেশের ব্যবহারের জন্য রাখা হয়েছে এবং বাকি ২০টি ট্রান্সপন্ডার ভাড়া দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে নেপাল, মিয়ানমার ও ভুটানের কাছে স্যাটেলাইট সেবা দিয়ে কোটি কোটি টাকা আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। স্যাটেলাইটের অবস্থান ইন্দোনেশিয়ার একদম ওপরে। ইন্দোনেশিয়া থেকে উত্তর দিকে যত দেশ আছে যেমন : মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, সিঙ্গাপুর সবই কিন্তু এই স্যাটেলাইটের আওতায় রয়েছে। এই স্যাটেলাইটের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে অনেক বেকার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। কবির ভাষায়—

তুমি আজ মহাকাশ বিজয়ের পথে
তথ্য প্রযুক্তিতে তুমিই শ্রেষ্ঠ হবে।

স্যাটেলাইট–১ উৎক্ষেপণ
অবস্থান ১১৯.১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা
মহাকাশে আছে মোদের লাল–সবুজ পতাকা

স্যাটেলাইট সেবাখাতে বাংলাদেশ : স্যাটেলাইটের কেইউ ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডারের স্পট বিমের আওতায় বাংলাদেশ ও বঙ্গোপসাগরের জলসীমা। অন্যদিকে এই ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডারের রিজিওনাল বিমের আওতায় রয়েছে ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া। রিজিওনাল টিসি ব্যান্ড বিমের আওতায় থাকা দেশগুলো হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, ভুটান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও কাজাখস্তানের কিছু অংশ। ফলে এসব দেশে টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচার সেবা দিতে পারছে স্যাটেলাইট। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ডিজিটাল বৈষম্য দূর হয়েছে বলে আশা করা যায়। ডাইরেক্ট টু হোস পদ্ধতিতে স্যাটেলাইট থেকে সিগন্যাল গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলেও সরাসরি টেলিভিশন সম্প্রচার করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন দুর্যোগে দেশের বিভিন্ন টেরিস্ট্রিয়াল অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হলেও যোগযোগব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখতে স্যাটেলাইট ব্যবহার করা হয়। সাবমেরিনের কাজ কোনো কারণে ব্যাহত হলে তখন বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট সেবা পাবে। সন্দ্বীপ ও হাতিয়ার সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঢাকার সাথে ল্যান্ড কমিউনিকেশন বন্ধ হয়ে গেলে এর সাহায্যে ঢাকার সাথে যোগাযোগ করা যাবে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। যার ফলে স্যাটেলাইট আবিষ্কার ও উৎক্ষেপণ করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ মহাকাশ যুগে প্রবেশ করেছে। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে এখন দেশের অভ্যন্তরে সার্বিক যোগাযোগব্যবস্থা সচল থাকছে। এ ছাড়া দেশের অর্থনীতিও ত্বরান্বিত হয়েছে। মোটকথা, বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

৭৫. গৃহকার্যে বিজ্ঞান

ভূমিকা : বর্তমান সভ্যতা মানুষের বহু শতাব্দীর স্বপ্ন ও সাধনার ক্রমপরিণাম। মানুষ তার যুগযুগান্তরের স্বপ্ন ও সাধনার অনবদ্য ফসল দিয়ে গড়ে তুলেছে সভ্যতার এ বিশাল ইমারত। আপনার প্রাণশক্তি তিল তিল দান করে, বুকের রক্তবিন্দু ঢেলে দিয়ে সে রচনা করেছে সভ্যতার এই তিলোত্তমা মূর্তি। সে সভ্যতার বেদিমূলে দিয়েছে তার বাহুর শক্তি, মস্তিষ্কের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি এবং হৃদয়ের ভালোবাসা। বিজ্ঞানও মানুষের অতন্দ্রসাধনার ফসল। কালক্রমে মানুষ বিজ্ঞানকে তার সভ্যতার বিজয়রথের বাহন করে শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে এসে উপনীত হয়েছে বর্তমানের পাদপীঠতলে। আজ গৃহকার্যেও বিজ্ঞানের উপস্থিতি ব্যাপক। নানা প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে নানা কাজে। বলা বাহুল্য, মানবসভ্যতার এই চরম উন্নতির মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের অপরিসীম অবদান।

যুগের পর যুগ ধরে, বিজ্ঞান সাধনা করে
গড়েছে অবাক পৃথিবী, আজকের আয়োজনে
কল্পনায়ও আসেনা যা, আকাঙ্ক্ষারও বেশি
বিজ্ঞানীদের পরিশ্রমে তা, মিলেছে আজি সবি।

— সরদার রহমত

বিজ্ঞান চেতনার প্রসার : সে সময় সভ্য মানুষ শুধু প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনে নয়, নিছক জানার বা বোঝার আগ্রহেই নানা বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করতে শুরু করে। তার আগে প্রত্নপ্রস্তর যুগের মানুষ শিকার ও গৃহস্থালির প্রয়োজনে ফ্লিন্ট পাথরের টুকরো ঘষে বানিয়েছিল তির, ছুরি, হাতুড়ি ইত্যাদি নানা জিনিস। সেই আদিম যুগে গোষ্ঠীবদ্ধ যাযাবর মানুষের জীবনে যুগান্তর আনল আগুনের আবিষ্কার আর কৃষিকাজের প্রচলন। সে সময় গড়ে উঠল ছোটো ছোটো গ্রাম। উদ্ভাবিত হলো আদি কৃষিযন্ত্র 'লাঙল'। মানুষ খেতে জলসেচের জন্য তার বৈজ্ঞানিক বৃত্তিকে কাজে লাগাতে শিখল। শস্য সংরক্ষণ, ফসল থেকে আরও নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী বানাতে শিখল, কুমোরের চাকা ঘুরিয়ে মানুষ বানাতে শুরু করল নানা ধরনের মাটির পাত্র। সে সময় বয়নশিল্পেরও উদ্ভব ঘটে। ভারী জিনিস সহজে তোলার জন্য সে সময় মানুষ কপিকল যন্ত্রের সাহায্য নিতে শিখেছিল।

ক্রমে মানুষের বিজ্ঞানচেতনায় আরও অনেক অগ্রগতি এলো। প্যাপিরাস–জাতীয় নলখাগড়া থেকে মিশরের মানুষ প্রথম লেখার উপযোগী কাগজ তৈরি করল। ইরাক অঞ্চলের মানুষেরা প্রথম চাকাযুক্ত গাড়ি বানিয়ে পরিবহণব্যবস্থার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনে। কয়েক হাজার বছর আগে চীনের বিজ্ঞানীরা অতি দ্রুত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যোগ–বিয়োগ করার উপযোগী গণকযন্ত্র তৈরি করে

নেন। সে গণকযন্ত্র এ–কালে ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর যন্ত্রের আদিরূপ। বিজ্ঞানী টেসিবিয়স বানিয়েছিলেন জলঘড়ি। জল তোলার উপযোগী বিশেষ ধরনের পাম্প এবং যন্ত্রচালিত ঘড়ি প্রথম আবিষ্কৃত হয় চীন দেশে। এসবই ঘটেছিল খ্রিষ্টের জন্মের আগে। গ্রিসের মানুষ প্রথম পৃথিবীর ও মহাকাশের মানচিত্র বানায়। প্রাণিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, স্থাপত্যবিদ্যা এবং জ্যামিতির ক্ষেত্রে গ্রিক বিজ্ঞানীদের দান কম ছিল না।

শত সহস্র বছর ধরে মানুষ কাজ করে চলেছে, জ্ঞানচর্চা দ্বারা সে প্রবল শক্তি অর্জন করতে প্রয়াসী হয়েছে। আজকের জীবনে বিজ্ঞানের সফল ব্যবহার মানুষের দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার গৌরবময় ফল। ইউরোপে শিল্পবিপ্লব ঘটে যাওয়ার পর থেকে, উনিশ শতকে মানুষ দৈনন্দিন জীবনে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে পূর্ণাঙ্গরূপে কাজে লাগিয়েছে। তখন থেকেই গৃহকার্যে শুরু হয় বিজ্ঞানের ব্যবহার। ক্রমে নানা প্রযুক্তির ব্যবহার গৃহকার্যে ব্যাপক হয়ে ওঠে।

এখন আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার নয়,
বরং প্রযুক্তির ভিতরে বসবাস করছি। — *গডফ্রে রেগিও*

গৃহকাযে বিজ্ঞান : আধুনিক জীবন একান্তভাবেই বিজ্ঞাননির্ভর। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষের বিবিধ প্রয়োজন মেটাচ্ছে। কেবল তাই নয়, বিজ্ঞান মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন এনেছে। বিজ্ঞানের ইতিহাস অন্ধকুসংস্কার ও যুক্তিহীন ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে যুক্তিনিষ্ঠ মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস। বিজ্ঞান শুধু মানুষের দৈনন্দিন জীবনকেই সমৃদ্ধ করেনি, তার চিন্তার জগৎকেও প্রভাবিত করেছে। আজ জীবনের সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবিসংবাদিত প্রভুত্ব। প্রভাতের শয্যাত্যাগ থেকে শুরু করে নিশীথের শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত বিজ্ঞান মানুষের অত্যন্ত অনুগত অনুচর। বিজ্ঞানের যেসব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন আজ আমাদের গৃহকার্যে প্রভাব বিস্তার করে আছে, এখন আমরা সে সম্পর্কে আলোকপাত করব।

স্টোভ : প্রভাতি চা পান থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্রে গমন ও কর্মক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন সবই আজ বিজ্ঞাননির্ভর। সকালে চা না হলে আমাদের চলে না। একসময় এই চা তৈরি হতো বিজ্ঞানের দান স্টোভে আগুন জ্বালিয়ে। আধুনিক বিজ্ঞানের বদৌলতে প্রযুক্তির উন্নতি ঘটলেও গ্রামাঞ্চলে এখনো স্টোভের ব্যবহার প্রচলিত।

বিদ্যুৎশক্তি : বিদ্যুৎশক্তির ব্যাপক প্রচলন ঘটায় আমাদের ঘরে আধুনিককালে তার সাহায্য ছাড়া এক মিনিটও চলে না। বৈদ্যুতিক উনান থেকে শুরু করে রেডিয়ো, টেলিভিশন, ফ্যান, টেপরেকর্ডার, ফ্রিজ, পানি তোলার মেশিন, ঘর সাফাই মেশিন, মসলাবাটা ও নানা খাদ্য গুঁড়া করার মেশিন, বাসন ও কাপড় ধোয়ার যন্ত্র, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ইত্যাদি সবই চলে বিদ্যুতের সাহায্যে। আর এগুলো সবই আমাদের গৃহকার্যে ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যুতিক বাতির আলোয় আলোকিত হয় আমাদের ঘর। বর্তমানে গ্রামের ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ও ভোল্টা বিদ্যুতের আবিষ্কার ও উন্নয়ন করে আমাদের গৃহকার্যকে যেমন সহজ করে দিয়েছেন, তেমনই করে দিয়েছেন আরামদায়ক জীবনের ব্যবস্থা।

রেডিয়ো : সমগ্র দেশে আজ অনুসন্ধান চালালে প্রায় প্রতিটি ঘরেই একটি করে রেডিয়ো পাওয়া যাবে। নিভৃত পল্লিতে, যেখানে বিদ্যুৎশক্তি পৌঁছেনি, সেখানেও ব্যাটারির সাহায্যে রেডিয়ো চলে। ব্যাটারিও বিজ্ঞানের অবদান। রেডিয়োর প্রভাতি ঘোষণা শুনে আমাদের অনেকের ঘুম ভাঙে। রেডিয়ো বা বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে আমরা স্বদেশ ও বিশ্বের নানা সংবাদ ঘণ্টায় ঘণ্টায় জানতে পারি এবং শুনতে পারি নানা অনুষ্ঠান। তাই মার্কনি আবিষ্কৃত রেডিয়ো আমাদের ঘরে ঘরে জীবনের একটি অংশ হয়ে পড়েছে।

মোবাইল ফোন : ঘরে ঘরে আজ মোবাইল ফোনের ব্যবহার আছে। এর সাহায্যে ঘরে বসে দূরের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের খোঁজখবর নেওয়া যায়। ব্যাবসাবাণিজ্যের তদারকি করা যায়। বর্তমানে মোবাইল ফোনের চেয়ে সহজ যোগাযোগ মাধ্যম আর নেই। তাই বিজ্ঞানের আবিষ্কার মোবাইল ফোন গৃহকার্যে আজ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

টেলিভিশন : বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার টেলিভিশন। শহরের প্রায় প্রতিটি ঘরেই খুঁজলে একটি টেলিভিশনের সন্ধান পাওয়া যাবে। রেডিয়োতে আমরা যে সংবাদ শুনতে পাই, টেলিভিশনে সেই সংবাদ শোনার সাথে সংবাদ পাঠক ও সংবাদের নানা দৃশ্য দেখতে পারি। আধুনিক স্যাটেলাইট–ব্যবস্থায় টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা ঘরে বসে দেখতে পারি বিশ্বকাপ ফুটবল, বিশ্বকাপ ক্রিকেট, অলিম্পিক গেমস, রেসলিং ইত্যাদি খেলা। গ্রামাঞ্চলে যেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে সেখানেও টেলিভিশন আছে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের গৃহজীবন হয়েছে আনন্দময়। এটি চিত্তবিনোদনের উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

ফ্রিজ : বিজ্ঞান আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ করে দিয়েছে। গৃহজীবনকে করেছে আরামপ্রদ। ফ্রিজের বদৌলতে আজ আর আমাদের প্রতিদিন বাজারে যেতে হয় না। একবার বাজারে গিয়ে কয়েক দিনের বাজার এনে ফ্রিজে রেখে দেওয়া যায়। ফ্রিজ থেকে প্রয়োজনমতো পণ্যসামগ্রী নিয়ে গৃহিণী রান্না করতে পারে। মোটামুটি সচ্ছল পরিবারগুলোতে গৃহকার্যে ফ্রিজের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

বৈদ্যুতিক পাখা : বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ দেশ হলেও শীতকাল ছাড়া বাকি সব ঋতুতেই কমবেশি গরম থাকে। আর এই গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাতাস প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানের আবিষ্কার বৈদ্যুতিক পাখা আমাদের বাতাস দেয়। আমাদের জীবনকে আরাম দেয়। বিজ্ঞানের অবদানের মধ্যে আমাদের গৃহকার্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় একটি সামগ্রী বৈদ্যুতিক পাখা।

সংবাদপত্র : প্রতিদিন সকালবেলা সংবাদপত্র না হলে আমাদের চলে না। এর মাধ্যমে আমরা ঘরে বসে প্রতিদিন বিশ্ব পরিস্থিতি, বাজারদর, খেলার খবর, চাকরির খবর ইত্যাদি জানতে পারি। সংবাদপত্রের লেখাগুলো যে কলম দিয়ে লেখা হয়, যে কম্পিউটার দিয়ে অক্ষরবিন্যাস করা হয় এবং যে মুদ্রণযন্ত্র দিয়ে ছাপা হয়, তাও বিজ্ঞানের অবদান। যে কাগজে সংবাদপত্র ছাপা হয় তাও বিজ্ঞানেরই আবিষ্কার। সুতরাং সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমাদের গৃহকার্যে বিজ্ঞানই ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস : আজ শহরের প্রতিটি বাড়িতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্যাস ছাড়া আজ আর শহরের বাড়িতে চুলা জ্বলে না, গ্যাস না হলে খাবার রান্না হয় না— তাই আমাদের জীবনের সাথে মিশে গেছে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার। এই গ্যাসের আবিষ্কার ও গ্যাসকে জ্বালানির উপযোগী করে তোলার সাথে বিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

টিচিং কম্পিউটার : বিদেশে নামমাত্র দামে টিচিং কম্পিউটার পাওয়া যায়। সেসব কম্পিউটারের সাহায্যে ঘরে বসে ছেলেমেয়েরা নিজে নিজেই বিভিন্ন বিষয়ে লেখাপড়া করতে পারে। এছাড়াও রয়েছে বর্ণপরিচয় ও এক–দুই শেখানোর কম্পিউটার শিক্ষক। এই কম্পিউটার বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার।

এছাড়াও বিজ্ঞানের আরও নানা আবিষ্কার আমাদের গৃহকার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে । যেমন : বৈদ্যুতিক বাল্ব, কাপড় ধোয়ার যন্ত্র, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, সেলাই মেশিন, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, টাইপ রাইটার মেশিন, টেবিল ল্যাম্প, ভিডিয়ো, ক্যালকুলেটর, ইলেকট্রনিক খেলনা ইত্যাদি।

উপসংহার : আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সাথে এক হয়ে গেছে বিজ্ঞান। আজ বিজ্ঞানকে বাদ দিলে আমাদের বেঁচে থাকা দুরূহ। মানুষ বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছে তার নিত্য কর্মে। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান মানুষকে শুধু সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যই দিচ্ছে না, মনকেও করছে পরিশীলিত। তাই আমরা আমাদের গৃহকার্যে ও জীবনে বিজ্ঞানকে বরণ করেছি প্রয়োজনের অনুরাগে।

পরিশেষে বলা যায়—

সকল জীবনই একটা পরীক্ষা। বেশি বেশি পরীক্ষার
মাধ্যমে জীবনকে আরও সুন্দর বনানো সম্ভব আর
এর নামই বিজ্ঞান। — এলান পারলিস

NABARUN PUBLICATION

৭৬. বিদ্যুৎ সংকট ও তার প্রতিকার *[চ. বো. '১০]*

অথবা, বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সমস্যা ও এর প্রতিকার

ভূমিকা

বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের মধ্যে বিদ্যুৎ অন্যতম। বিদ্যুৎ সভ্য জগতের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যেখানে বিদ্যুতের অনুপস্থিতি বর্তমান সেখানে সভ্যতা এখনও বহুদূর। এককালের অন্ধকার পৃথিবী এখন বিদ্যুতের কল্যাণেই হয়েছে আলোকিত; কলকারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান হয়েছে গতিশীল। বিদ্যুৎশক্তি আজ গোটা বিশ্বকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। বদলে গিয়েছে মানুষের জীবন, জীবনেও এনেছে গতি।

উন্নত দেশে বিদ্যুৎ সংকট : আজকের বিশ্বে যেসব দেশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উৎপাদনধর্মী কলকারখানায় উন্নতি করেছে সেসব উন্নতির পেছনে বড়ো শক্তি হিসেবে কাজ করেছে বিদ্যুৎশক্তি। আমাদের কাছের দেশ সিঙ্গাপুর। দেশটি আয়তনে খুব ছোটো হলেও অর্থনৈতিকভাবে তারা প্রভূত উন্নতি সাধন করতে পেরেছে বিদ্যুৎশক্তির যথাযথ ব্যবহার করে। উন্নত দেশগুলোতে বিদ্যুৎ ঘাটতি কম বলে তাদের উৎপাদন, অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার মান সবকিছুই উঁচু।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সংকট : স্বাধীনতা–পূর্ব বাংলাদেশ আর পরবর্তী বাংলাদেশ এ দুয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকলেও বিদ্যুতের বিষয়টি থেকে গেছে একইরকম। দেশে তখনও পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ছিল না, এখনও নেই। গভীর বিদ্যুৎ সংকটে পতিত আমাদের দেশ প্রকট বিদ্যুৎ ঘাটতি জনজীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন, অফিস পাড়া, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সর্বত্রই বিদ্যুতের ঘাটতি। ফলে জীবনে দুর্ভোগ, উৎপাদনে স্থবিরতা লেগেই আছে। বিদ্যুৎ ঘাটতি প্রকট বলেই কৃষিজমিতে পর্যাপ্ত সেচব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। ফলে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয় বর্ষা মৌসুমে। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কল্যাণে কিছু উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও ব্যাপক ঘাটতি পুষিয়ে নিতে বড়ো কোনো ভূমিকা পালন করা কেন্দ্রটির পক্ষে সম্ভব হয় না। নিয়মিত লোডশেডিং আমাদের দেশের প্রতিদিনকার চিত্র। দুর্নীতি আর অদক্ষ ব্যবস্থাপনা এসে যখন যুক্ত হয় তখন এ প্রক্রিয়াটি হয়ে পড়ে আরও হতাশাজনক।

বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণসমূহ : বাংলাদেশে যে কয়টি তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে সেগুলো সচল রাখার জন্য যে কাঁচামাল নিত্য সরবরাহ জরুরি তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বিদ্যুৎ ঘাটতি থেকে যাচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই। নতুন উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অদূরদর্শিতা এবং সামর্থ্যহীনতা একটি বড়ো কারণ। উপযুক্ত প্রযুক্তি ও সহায়ক যন্ত্রপাতির অভাবও এক্ষেত্রে একটি অন্তরায়। পাশাপাশি আমাদের দেশের সরকারের চিরায়ত অবস্থাকে কিছুটা দায়ী করা যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবে আমরা লক্ষ করি আমাদের দেশের সরকার সবসময়ই নির্ভরশীল। বিদেশি কোনো কোম্পানি কখন এসে চুক্তি করে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করে দেবে এ প্রতীক্ষা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। সরকারের সাহসী সিদ্ধান্তের অভাবও তাই বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণ। রাজনৈতিক আস্থাশীলতা ও প্রশাসনিক জটিলতাও বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণ বলে বিবেচনা করা যায়। এ অবস্থা আমাদের কাম্য হতে পারে না। আমাদের উচিত এ সংকটের আশু–সংস্কার।

জাতীয় জীবনে বিদ্যুৎ সংকটের প্রভাব : বিদেশি বিনিয়োগ যে দুটি প্রধান কারণে বিঘ্নিত হয় তার মধ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতি একটি। বিদ্যুৎ ঘাটতির ফলেই জাতীয় অর্থনীতি ও উন্নয়ন ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষত শিল্পকারখানার উৎপাদনের স্থবিরতা ও কৃষিখাতের উৎপাদন হ্রাস জাতির জন্য নিঃসন্দেহে দুশ্চিন্তার কারণ। বিদ্যুৎ শক্তির পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা না গেলে দেশের উন্নতি ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে পড়বে।

বিদ্যুৎ সংকটের প্রতিকার : বিদ্যুৎ সংকট থেকে উত্তরণ ঘটাতে চাইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন চাহিদা অনুসারে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। শুধু উৎপাদনের পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়। বরং উৎপাদিত বিদ্যুতের যথাযথ সংরক্ষণ এবং সমাজের উঁচু স্তর থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সমভাবে বিতরণের ব্যবস্থাও নিতে হবে। দেশের প্রায় সকল জায়গাতেই অবৈধভাবে বিদ্যুতের ব্যবহার ও অপচয় হচ্ছে। সরকারের উচিত হবে অবৈধ লাইনগুলো বিচ্ছিন্ন করা এবং অপচয়রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সমগ্র বাংলাদেশকে ছোটো ছোটো জোনে বা জেলাভিত্তিক সীমানা নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট এলাকার চাহিদা সঠিকভাবে নিরূপণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ করলে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হতে পারে। তবে এ কাজটি সহজসাধ্য নয় বলে পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

উপসংহার : বিদ্যুৎ একটি অতি প্রয়োজনীয় শক্তি। বিদ্যুৎ ছাড়া মানবসভ্যতা কল্পনা করা যায় না। দেশের উন্নতি–অবনতি অনেকাংশে এর ওপর নির্ভরশীল। বিদ্যুৎ আমাদের জীবনে যেমন এনেছে গতি, আনন্দ, আলো, কষ্ট লাঘব করার শক্তি তেমনি এর সংকটও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার চরম হুমকিস্বরূপ। তাই এ সংকট থেকে উত্তরণ অত্যন্ত জরুরি। যত তাড়াতাড়ি বিদ্যুৎ ঘাটতি লাঘব করা যাবে, তত তাড়াতাড়ি দেশ ও জাতি উন্নতি লাভ করতে পারবে।

৭৭. নিয়মানুবর্তিতা

ভূমিকা : এই বিশ্ব প্রকৃতি এক নিয়মের রাজ্য। পৃথিবীর সবকিছুই নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে। মানুষ সামাজিক জীব। শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রকৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে। মানুষ নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে। যে সৌরজগতে আমরা বাস করছি তা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই কতকগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম–শৃঙ্খলা অনুযায়ী এই সৌরজগৎ পরিচালিত হচ্ছে। তাই অশ্বিনীকুমার দত্ত বলেন, "গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত— এই ছয়টি ঋতু নির্দিষ্ট চক্রে ঘুরিতেছে।" পুব আকাশে সূর্য ওঠে আর পশ্চিম আকাশে অস্ত যায়। আসে রাত, রাতের পরে দিন— এর ব্যতিক্রম কিছু নয়। এমনিভাবে দিন–রাত, জোয়ারভাটা, ঋতুচক্র সবকিছুই একটা নির্দিষ্ট নিয়মে চলছে।

নিয়মানুবর্তিতা কী : বিশ্বের ধরা–বাঁধা নিয়মের রাজ্যে কোনো কিছু এলোমেলোভাবে না করে নিয়মমাফিক করাকেই নিয়মানুবর্তিতা বলে।

প্রাণিজগতে নিয়ম–শৃঙ্খলা : প্রকৃতির মতো প্রাণিজগতেও রয়েছে নিয়ম। পিপীলিকা কি সুন্দরভাবে দলবেঁধে চলে। বুনো হাতিও তাই। এমনিভাবে বনের পাখি ও মৌমাছির মধ্যে দেখা যায় নিয়ম–শৃঙ্খলা।

ছাত্রজীবনে নিয়মানুবর্তিতা : স্কুল–কলেজে ছাত্রছাত্রীদের সময়নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে শিক্ষাদান করতে হবে। আদর্শপ্রীতি ও চরিত্র গঠন এই সময় একান্তভাবে আবশ্যক। শিক্ষার্থীদের জীবনে নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা একদিন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। সেজন্য তাদের উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন অপরিহার্য। নিয়মকানুন না মানার মধ্যে শৃঙ্খলা নেই। তাই আল কোরআনে এরশাদ রয়েছে, "বিশৃঙ্খলা জঘন্যতম অপরাধ।" ফলে জীবন গঠনের জন্য ছাত্রছাত্রীকে নিয়মকানুন পালন করতে হবে। ছাত্রজীবনই জীবন গঠনের একমাত্র বীজ বপনের সময়। এসময়েই যে অভ্যাস গড়ে ওঠে তা–ই পরবর্তী জীবনে কার্যকর হয়। নিয়ম–শৃঙ্খলা গড়ে তোলার উপযুক্ত স্থান বা ক্ষেত্র হচ্ছে বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে লেখা–পড়া, খেলাধুলা, চলাফেরা, আচার–আচরণ ও অনুষ্ঠানে নিয়মকানুন শিক্ষা দেয়। এগুলো মেনে চললে ভবিষ্যৎ জীবনে সাফল্য লাভ সম্ভব। বিদ্যালয় ছাড়াও ঘরে–বাইরে রয়েছে নিয়মের বিশাল জগৎ। যা থেকে নিয়ম শেখা যেতে পারে।

নিয়মানুবর্তিতা চর্চার উপায় : নিয়মানুবর্তিতার গুরুত্ব সম্পর্কে ভিন্নমতের কোনো অবকাশ নেই। নিয়মের অধীন না থাকলে সর্বত্র উচ্ছৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে জাতীয় জীবনে সংকট নেমে আসে। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের কল্যাণের স্বার্থে নিয়মকানুন মানা ও তার চর্চার ব্যবস্থা করতে হবে। জাতিকে নিয়মের মধ্যে আনতে হলে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সকল শ্রেণির নাগরিকের কর্মকাণ্ডকে নিয়মানুবর্তী করা সম্ভবপর হলেই জাতির জীবন থেকে অভিশাপ দূর করা যাবে। সমাজজীবনও নিয়ম–শৃঙ্খলায় ভরপুর। নিয়ম–শৃঙ্খলা ছাড়া সমাজ চলতে পারে না। এখানে আমরা খেয়ালখুশিমতো কিছু করতে পারি না। নিয়ম ভঙ্গ করলে তাই শাস্তি পেতে হয়। এ কারণেই তো সমাজজীবন হয়ে ওঠে সুন্দর ও সুষ্ঠু। নিয়ম আছে বলে সমাজ এত শান্তিময়। এ জন্যই আমরা এখানে সুখে–স্বাচ্ছন্দ্যে, মিলেমিশে ও নিরাপদে বসবাস করতে পারি। শিশুকাল হতে নিয়ম–শৃঙ্খলা শিক্ষার অভ্যাস করতে হবে। তরুণসমাজ প্রধানত শিক্ষার্থী সমাজ। পিতামাতা এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সুশৃঙ্খল কর্মক্ষেত্র থেকে সর্বোত্তম ফল লাভ করা যায়। বিশেষত রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ যদি নিয়মানুবর্তিতার আদর্শ স্থাপন করতে পারেন, তাহলে জাতি তথা সমাজজীবনে গৌরব বৃদ্ধি পাবে। সংসার সমাজ সর্বত্রই নিয়মানুবর্তিতার চর্চা করা দরকার।

নিয়মকানুন শিক্ষা : এই পরম কল্যাণকর সদ্‌গুণের অনুশীলনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় ছাত্রাবস্থা। গুরুজনের প্রতি ভক্তি, বিনয়, সময়ানুবর্তিতা প্রভৃতি সমাজ শুভকর নিয়মাবলি শিক্ষার এটাই উপযুক্ত সময়। বিদ্যালয়, গৃহে, ক্রীড়াঙ্গনে, বিতর্ক সভায় নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করতে করতে ভবিষ্যতের সামাজিকজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা এ অবস্থাতেই মানুষ লাভ করে থাকে। তাই বলতে হয়, "বায়ু নির্দিষ্ট নিয়মে বইছে।" আরও বলতে হয়, "মেঘ নির্দিষ্ট নিয়মে সঞ্চালিত হচ্ছে ।"

উপসংহার : সুশিক্ষিত ও ছাত্রহিতৈষী শিক্ষকের কর্তব্য তরুণদের উচ্ছ্বল প্রাণধারাকে এ সময় থেকেই নিয়মের নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত করে দেওয়া, উচ্ছৃঙ্খলতার ইন্ধনে সে প্রাণবহ্নিকে ধ্বংসরূপী হতে না দেওয়া। এটিই সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে, নিয়মানুবর্তিতা ভিন্ন কোনো ব্যক্তি তথা কোনো জাতিই কোনো দিন যথার্থ উন্নতি লাভ করতে পারে না। কবির ভাষায়—

এইখানে মিথ্যে কথা কেউ বলে না
এইখানে অসৎ পথে কেউ চলে না
পড়ার সময় লেখা পড়া
কাজের সময় কাজ করা।
খেলার সময় হলে খেলা করি।

৭৮. সৎসঙ্গ
অথবা, উন্নত সংস্পর্শ
অথবা, সৎসঙ্গে যুব জীবন
অথবা, উন্নত জীবনের সঙ্গ

ভূমিকা

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সংসারে সকলের সাথে মিলেমিশে জীবনযাপনের রীতি শুরু হয়েছে বহুদিন আগে থেকেই। যৌথ জীবনের পরিসরে কীভাবে প্রত্যেকটি জীবন সুন্দর ও সার্থকভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে সেজন্য মানুষের সাধনার অন্ত নেই। নিজের জীবনের বিকাশ নিজ নিজ পরিবেশের মধ্যেই সাধিত হয়। আর তাই পরিবেশের প্রভাব মানবজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত।

সৎসঙ্গের সংজ্ঞা : পরিবেশ যদি যথার্থ অনুকূল হয়ে উঠে তবে যেকোনো মানবসন্তানই প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠার সুযোগ পায়। সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য মানুষের জীবনে সঙ্গীর স্থান সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। সঙ্গী হিসেবে যদি ভালো মানুষ পাওয়া যায় তবে তা সৎসঙ্গ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাই সৎসঙ্গ বলতে বোঝায় উত্তম চরিত্রের বন্ধু–বান্ধব, যাদের প্রভাব ও আদর্শে নিজের জীবন গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে।

জীবনের বৈশিষ্ট্য : মানুষের চারপাশে যে জীবন নিয়ত আবর্তিত হয় তাতে আছে ভালোমন্দের সমাহার। বস্তুতপক্ষে, ভালোমন্দ নিয়েই সংসার জীবন। প্রত্যেক মানুষ তার জীবনে একদিকে যেমন ভালোর মুখোমুখি হচ্ছে, তেমনি প্রতিনিয়ত মন্দের ও মুখোমুখি হচ্ছে। কিন্তু জীবনের সার্থক বিকাশের জন্য প্রয়োজন কেবল ভালোর দিক, মন্দ দিকগুলো তাকে সচেতনভাবে পরিহার করে চলতে হবে। সেজন্য মন্দসঙ্গ পরিত্যাগ করে উত্তম সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা : সৎসঙ্গের প্রয়োজন মানবজীবনে অত্যধিক। জন্মের পর থেকে মানুষের যে শিক্ষা গ্রহণের সূত্রপাত হয় জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে তা চলতে থাকে। কিন্তু জীবন গঠনের একটা বিশেষ সময় আছে, সেটা জীবনের প্রাথমিক পর্যায়। তখন নানা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করে মানুষের জীবনকে একটা কাঠামোর মধ্যে ফেলার চেষ্টা করে। যতদিন পর্যন্ত জীবন গঠনের জন্য শিক্ষাকাল চলতে থাকে ততদিন পর্যন্ত সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা আছে। কারও জীবনই পরিপূর্ণতা নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠেনি। তাকে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে হলে জ্ঞান অর্জন করতে হয়, অভিজ্ঞতা তাকে বিকশিত হতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে উত্তম সঙ্গী থাকলে তাদের পভাবে জীবনকে সার্থকতার পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব।

সৎসঙ্গের উপকারিতা : কথায় বলে, 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।' সঙ্গী যদি ভালো চরিত্রের হয় তাহলে তাদের প্রভাবে নিজের জীবনকে ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত করা সহজ। নিজের কোনো ত্রুটি থাকলে তা তখন দূর করা সম্ভব হয়। ভালো চরিত্রের বন্ধু–বান্ধব সাথে থাকলে নিজের মনের মধ্যে কোনো অসদুদ্দেশ্য আসতে পারে না এবং কখনো কিছু অন্যায় থাকলেও তা আর মাথা চাড়া দিতে পারে না। বলা যেতে পারে, সৎসঙ্গীরা পরশপাথরের মতো। পরশপাথরের জাদুস্পর্শে লোহা যেমন সোনা হয়ে যায়, তেমনি সচ্চরিত্রের অধিকারী বন্ধুদের সান্নিধ্যে মানুষ সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। মানজীবনের সামনে উজ্জ্বল আদর্শ থাকলে তা জীবন গঠনে ও নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সহায়ক হয়। আর সৎসঙ্গীই সেই মহান প্রয়োজন সাধন করে থাকে।

অসৎসঙ্গের অপকারিতা : অন্যদিকে অসৎসঙ্গ মানবজীনে সর্বনাশ ডেকে আনে। সংসারে ভালোর পাশাপাশি মন্দ লোকেরও অভাব নেই। মন্দ লোকের সান্নিধ্যে এসে মানুষ কুপথে যায় এবং জীবনের জন্য ডেকে আনে নিদারুন অন্ধকার। এমনি অনেক চরিত্রবান ব্যক্তি খারাপ সঙ্গীর জন্য অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়। জীবনের যেকোনো সময় এ ধরনের সঙ্গদোষ ঘটতে পারে। সেজন্য অসৎসঙ্গী খুবই ভয়াবহ বলে বিবেচনার যোগ্য।

মানুষের কর্তব্য : সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ এ পার্থক্যের কথা বিবেচনা করেই মানুষের জীবনে সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা সবীকৃত হয়েছে এবং অসৎসঙ্গ পরিহারের চেষ্টা করা হয়। মানুষের শিশুকাল থেকে এ সম্পর্কে সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে যদি সঠিক গতিপথ নির্ধারণ করা না যায় তবে ভবিষ্যৎ কখনো উজ্জ্বল হতে পারে না। তাই ছোটোবেলা থেকেই অসৎসঙ্গ পরিহার করতে হবে এবং সৎসঙ্গে যাতে জীবন গড়ে ওঠার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

উপসংহার : মানবজীবন গঠন অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। এক্ষেত্রে সচেতন না হলে জীবনকে সার্থক করে তোলা যায় না। আমাদের দেশের যে পরিবেশ তাতে বেশি সচেতনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। অশিক্ষা ও দারিদ্র্য আমাদের সমাজজীবনকে বিষাক্ত করে রেখেছে এখানে ছড়িয়ে আছে অনাচার ও কুসংস্কার। সেজন্য প্রতিকূল পরিবেশে জীবনযাপন করতে হলে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আমাদের শিশুরা যাতে সুন্দর পরিবেশে মানুষ হয়ে উঠতে পারে সেজন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে প্রত্যেককে সঙ্গী নির্বাচনে সচেতন হতে হবে।

SINCE - 1993
NABARUN PUBLICATION

৭৯. মনুষ্যত্ব

ভূমিকা :

শুনহ হে মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই

মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা— জীবসত্তা আর মানবসত্তা। জীবসত্তার কাজ প্রাণধারণ, আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা। এখানে মানুষ বৈশিষ্ট্যহীন, প্রাণিজগতেরই একজন; অপরাপর প্রাণীদের মতো ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে ছোটাছুটি করা তার কাজ। কী করে বাঁচা যায় ও সন্তানসন্ততিদের বাঁচিয়ে রাখা যায়, সে চিন্তায় সে অস্থির। কিন্তু প্রাণী হলেও মানুষ অপরাপর প্রাণীকে পশ্চাতে ফেলে এসেছে, বরং নিজের মধ্যে অনুভব করেছে এক নতুন সত্তা। এই নব অনুভূতি সত্তার নামই মানবসত্তা, আর এখানেই মানুষ অপরাপর প্রাণী থেকে আলাদা। আত্মরক্ষা বা বংশরক্ষা নয়, মুক্তির আনন্দ উপভোগই এখানে বড়ো হয়ে ওঠে। মুক্তি মানে অস্তিত্বের চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি, শুধু তাই নয়, এক নব সূক্ষ্ম অস্তিত্বের উপলব্ধি।

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নয় নহে কিছু মহীয়ান

মনুষ্যত্ব কী : মনুষ্যত্ব মানুষের সেসব গুণাবলি যা মানুষ ধারণ করে, লালন করে এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সেগুলো প্রয়োজনমতো কার্যকর করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভালো–মন্দের দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে মানুষ ভালোকে বেছে নেবে বিবেকের দ্বারা, প্রথার দ্বারা নয়— এই হচ্ছে মনুষ্যত্ব।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, "মনুষ্যত্ব আমাদের পরম দুঃখের ধন, তা বীর্যের দ্বারা লভ্য।" মনুষ্যত্ব প্রসঙ্গে ডা. লুৎফর রহমানের পর্যবেক্ষণ হলো, "প্রতিদিনের ছোট ছোট কথা, ছোট ছোট ব্যবহার, হাসি–রহস্য, একটুখানি সহায়তা, একটা স্নেহের বাক্যে মনুষ্যত্ব সূচিত হয়।"

অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের মস্তিষ্কে মনুষ্যত্বের উপাদানগুলো সজ্জিত আছে, কঠোর সাধনা ও চর্চার মধ্য দিয়ে তা অর্জন করতে হয়। এ অর্জিত উপাদানগুলোর সমন্বয়ই মনুষ্যত্ব।

মনুষ্যত্বের উপাদান : মানুষের যেসব গুণ জগতের অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষকে পৃথক করেছে, মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছে, সেই গুণগুলোই মনুষ্যত্বের উপাদান। মানুষের চেতনায়, মানুষের প্রতিভায় এসব গুণ সুপ্ত থাকে। মানুষকে তার চলার পথের প্রেরণায়, দুঃখে, সান্ত্বনায়, উদ্যোগে, উদ্যমে, আপ্যায়নে, ভালোবাসায় এসব গুণের চর্চা করতে হয়। প্রতি মুহূর্তে, প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি কার্যক্রমে উপাদানগুলোর অনুশীলন, প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা ধাতস্থ ও আত্মস্থ করতে হয়। এ উপাদানগুলো হলো : স্নেহ– মমতা, প্রীতি–প্রেম, সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, ত্যাগ, সৌজন্য, দয়া, সাধুতা, ক্ষমা, তিতিক্ষা, অনুগ্রহ, উদারতা, আত্মবিশ্বাস, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সমদর্শন, কল্যাণচিন্তা ইত্যাদি। এসব উপাদান মানুষের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তা তৈরি করে, পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ ও সম্পতি গড়ে তোলে, পারস্পরিক সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করতে উদ্‌বুদ্ধ করে, পরস্পরকে ভালোবাসতে অনুপ্রাণিত করে।

মনুষ্যত্ব চর্চা : মনুষ্যত্ব তথা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ দিক হলেও প্রাণিত্বকে অবহেলা করা যায় না; বরং মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়েও চলা যায়; কিন্তু প্রাণিত্বকে বাদ দিয়ে চলা কঠিন। তাই মানুষকে প্রাণিত্বের সাধনাই করতে হচ্ছে বেশি। রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি প্রাণিত্বের সাধনারই নিদর্শন, আর তারই ফলে মানুষের জীবনধারণ আর আদিম জৈব ব্যাপার না থেকে ধীরে ধীরে মানবিক ব্যাপার হয়ে ওঠে। মানবিক হওয়ার অর্থ জৈব ব্যাপারটাই মনুষ্যত্বের পর্যায়ে উন্নীত হওয়া নয়; মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া, মানবোচিত হওয়া।

মনুষ্যত্ব ও পরিবার : মনুষ্যত্বের প্রথম শিক্ষা মানুষ তার পরিবার থেকেই লাভ করে। কেননা মানুষ একসময় পরিবার গঠন করেছে মনুষ্যত্বের বোধ বা চেতনা থেকেই। পরস্পর নির্ভরতা, পরস্পর ভালোবাসা, স্নেহ–মায়া–মমতার চর্চা, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ, সাহায্য–সহযোগিতার মনোভাব, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শন— এ সবকিছু মানুষ পরিবার থেকেই শেখে। পারিবারিক বন্ধন বলতে যা বোঝায় তা মনুষ্যত্বের চর্চা ও অর্জনেরই ফল।

মনুষ্যত্ব ও সমাজ : লালনের ভাষায়—

যেদিন হিন্দু, মুসলমান
যেদিন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান
জাতি–গোত্র নাহি রবে
এমন মানব সমাজ কবে গো, কবে গো সৃজন হবে?

অনেক পরিবার নিয়েই সমাজ, মানুষ পরিবার থেকে যা কিছু শেখে তার যথার্থ প্রয়োগ হয় সমাজে। বিনয়, সৌজন্য, পারস্পরিক মর্যাদাবোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও কর্মযজ্ঞের বন্ধন সমাজকে সুন্দর ও সৌহার্দপূর্ণ করে তোলে। মনুষ্যত্বের বিকাশে সমাজও এভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মনুষ্যত্ববোধের অভাব কারও মধ্যে দেখা গেলে সমাজ তার বিরুদ্ধে

কঠোর অবস্থান নেয়। ফলে তার মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জন্মে। তাকে দেখে অনেকেই সচেতন হয়। আদবকায়দা, শিষ্টাচার, দয়ামায়া, সহানুভূতির প্রকাশ ঘটলে সমাজ তার প্রশংসা করে, সম্মান করে। আর এসবের অবক্ষয় বা অবনতি ঘটলে সমাজের মানুষ চিন্তিত হয়, সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সুতরাং মনুষ্যত্ব চর্চার মাধ্যমে সমাজকে সুন্দর, সুষম, গতিশীল ও কল্যাণকর করে গড়ে তোলা যায়। এজন্যই প্রাচীন পারস্য উপদেশে বলা হয়েছে, "পৃথিবীর কাছে তোমার মনুষ্যত্বের পরিচয় হচ্ছে তোমার সত্যিকারের নাম।"

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব : শিক্ষার সাথে মনুষ্যত্বের সম্পর্ক নিবিড়। কেননা "জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার (মনুষ্যত্ব) ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা।" মানুষকে মনুষ্যত্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই শিক্ষার কাজ। যে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের চর্চা ও প্রকাশ নেই তার আত্মার মৃত্যু অনিবার্য। কেননা শিক্ষা মনুষ্যত্ব অর্জনের পথ দেখায়, মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। মানবিক মূল্যবোধ অর্থাৎ, মনুষ্যত্ব ছাড়া মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ মুক্তচিন্তা করতে শেখে, বুদ্ধির স্বাধীনতা লাভ করে এবং আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা অর্জন করে। এর ফলে মনুষ্যত্বচর্চার পথ সুগম, সুন্দর ও পরিশীলিত হয়।

মনুষ্যত্ব ও সাহিত্য : মনুষ্যত্বের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। কেননা সাহিত্যে মনুষ্যত্বেরই সার্বিক প্রতিফলন ঘটে। মনুষ্যত্বের উপাদানগুলো সাহিত্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যে কারণে মানুষ সাহিত্য পাঠ করে, সাহিত্যের ঘটনা ও চরিত্র থেকে শিক্ষা নেয়। যারা সাহিত্য রচনা করেন তারাও মানবিক দিকগুলো সাহিত্যে তুলে ধরেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "সাহিত্যের মধ্যে মানুষের হাসি–কান্না, ভালোবাসা, বৃহৎ মানুষের সংসর্গ এবং উত্তাপ, বহু জীবনের অভিজ্ঞতা, বহুবর্ষের স্মৃতি, সবশুদ্ধ মানুষের একটা ঘনিষ্ঠতা পাওয়া যায়। সেইটেতে বিশেষ কী উপকার করে পরিষ্কার করে বলা শক্ত; এই পর্যন্ত বলা যায়, আমাদের সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বকে পরিস্ফুট করে তোলে।"

মনুষ্যত্ব ও মহামানব : যুগে যুগে যখনই মনুষ্যত্বের অবমাননা হয়েছে, মনুষ্যত্ব শৃঙ্খলিত হয়েছে, সর্বত্র হতাশা ও অবক্ষয় দেখা দিয়েছে তখনই মহামানবরা আবির্ভূত হয়েছেন। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছেন, পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বের মুক্তি নিশ্চিত করেছেন। হিংস্র, সংঘাত ও অরাজকতা থেকে মুক্ত করে মানুষকে দেখিয়েছেন মানবধর্মের শান্তিময় পথ— মনুষ্যত্বের পথ। কেননা মনুষ্যত্বকে আড়াল করে বা অবলুপ্ত করে প্রকৃত মানুষ হওয়া অসম্ভব। একই সাথে সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। মনুষ্যত্বের চর্চা ও বিকাশের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ বিশ্ব নির্মাণে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন গৌতম বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, যিশুখ্রিষ্ট, হজরত মুহাম্মদ (সা.) প্রমুখ।

মনুষ্যত্বের অবমাননা : মানুষ মনুষ্যত্বের প্রতীক। বিভিন্ন সময়ে মানুষই আবার মনুষ্যত্বের অবমাননা করেছে। মনুষ্যত্বের অবমাননা হয়েছে ভারতবর্ষে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় মানুষকে নানা ভাগে বিভক্ত করে। আরব দেশসমূহে মেয়েশিশু হত্যাসহ নানা অমানবিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মনুষ্যত্ব ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। ইউরোপের দেশসমূহে মধ্যযুগে নেমে এসেছিল অন্ধকার, মনুষ্যত্বকে দূর করে পেশিশক্তির উত্থান ও ধর্মের নামে অধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। মনুষ্যত্বের অবমাননা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি নিধনযজ্ঞ ও পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে অসংখ্য জীবন ধ্বংসের মাধ্যমে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নির্বিচারে হত্যা ও অমানবিক কর্মকাণ্ড মনুষ্যত্বের অবমাননার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আজও ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে নানা অছিলায় মনুষ্যত্বের অবমাননা চলছে। এসব জঘন্য কাজের সাথে যারা জড়িত তারা ভেদবুদ্ধিহীন মানুষ, তারা মানুষ নামের কলঙ্ক। কিছু রাষ্ট্রও নিজেদের হীনস্বার্থে সারা পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের অবমাননার জন্য দায়ী।

জাতিসংঘের ভূমিকা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নারকীয় হত্যাযজ্ঞে মনুষ্যত্বের অবমাননার ভয়ংকর ও বীভৎস রূপ দেখে শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন কিছু রাষ্ট্রনায়ক তথা ব্যক্তির পরামর্শে গঠিত হয় জাতিসংঘ। পরবর্তীকালে ঘোষিত হয় মানবাধিকার সনদ। যে সনদে স্বাক্ষর করেছে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ। মানুষ হিসেবে মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় এ সনদ নিঃসন্দেহে একটি মাইলফলক। মনুষ্যত্বের রক্ষাকবচ হিসেবে এ সনদ সারা পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

মনুষ্যত্ব ও বাংলাদেশ : প্রাচীন থেকেই বাংলাদেশের মানুষ মনুষ্যত্বের চর্চা ও এর বিকাশসাধনে তৎপর। যে কারণে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করছে। সৌহার্দ ও সম্প্রীতির দিক থেকে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে ঈর্ষণীয় অবস্থানে রয়েছে। কোনো কোনো সময় দু–একটি ছোটো এলাকায় মনুষ্যত্বের অবমাননা হলেও তা কখনো ব্যাপক আকার ধারণ করেনি। কেননা বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় ও মানবিকবোধসম্পন্ন মানুষ এ ধরনের জঘন্য কার্যকলাপ পছন্দ করে না। এদেশের মানুষ সমাজজীবনে, কাব্যে, সাহিত্যে, চিত্র, সংগীত ও অভিনয় শিল্পে মনুষ্যত্ব তথা মানবিকবোধের স্বাক্ষর রেখেছে চিরকাল। আজও তা অব্যাহত রয়েছে। মনুষ্যত্বের লালন ও বিকাশে এ দেশের সর্বস্তরের মানুষ অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে, যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

মনুষ্যত্বের উৎকর্ষসাধন : মানবজীবনে এবং মানবকল্যাণে মনুষ্যত্বের বিকাশ ও উৎকর্ষসাধন অপরিহার্য। কেননা আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ মানবতাবোধ তথা মনুষ্যত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ মূল্যবোধের ধারা যেকোনো মূল্যে আমাদের ধরে রাখতে হবে। এগুলোকে ধরে রাখলেই মনুষ্যত্ববোধের চর্চা স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠবে। কিন্তু উগ্র ধর্মান্ধতা এবং সন্ত্রাসীগোষ্ঠী নানাভাবে আমাদের মূল্যবোধের ঐতিহ্য নষ্ট করার চেষ্টা করে। এদের সংখ্যা বেশি নয়। তাই শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন মানুষকে প্রতিবাদী হতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সেই সাথে পরিবার, সমাজ, মন্দির, মসজিদ, শিক্ষালয়ে নৈতিক শিক্ষা ও মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এ সম্পর্কে সঠিক প্রচার হলে এখানকার প্রজন্ম মনুষ্যত্বের লালন ও চর্চায় অধিকতর অনুরাগী হয়ে উঠবে।

উপসংহার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা আর সমস্তই তার অধীন।" মানুষ হিসেবে অন্য মানুষের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং মর্যাদা সম্পর্কে আমরা সবাই সচেতন হলে মনুষ্যত্বের শিক্ষালাভ হয়ে যাবে। আর মনুষ্যত্বের শিক্ষা সম্পন্ন হলে মানবসমাজের যেমন উৎকর্ষ সাধিত হবে, তেমনি প্রকৃতি ও জীবজগতের নিরাপত্তা ও পরিচর্যা নিশ্চিত হবে। আর তখনই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা বলতে পারব, "মনুষ্যত্বের সাধনাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা।"

SINCE - 1993
NABARUN PUBLICATION

৮০. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আমাদের দেশপ্রেম

[ঢা. বো. '১৬; সি. বো. '২৩; ব. বো. '২৩]

অথবা, **মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং আমাদের করণীয়** *[সকল বো. '১৮; ঢা. বো. '২৪]*

ভূমিকা

স্বাধীনতা তথা মুক্তি একটি সভ্য জাতির বেঁচে থাকার সর্বোত্তম অবলম্বন। আবহমানকাল থেকে এই চেতনা আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে, ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং উন্নয়নের দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। পরাধীনতার গ্লানি, বৈষম্যের পীড়ন এবং ভাষা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে মুক্তির আশায় বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ ১৯৭১ সালে বর্বর পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে মরণপণ মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যকে ছিনিয়ে আনে। ত্রিশ লাখ শহিদের আত্মত্যাগ ও দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তার মূলে রয়েছে বাঙালি জাতির ঐক্য, সাম্য ও মুক্তির চেতনা। কবির ভাষায়—

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগাম।'

সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ইতিহাস : এই উপমহাদেশ ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিলাভ করলেও বাঙালি জাতির প্রকৃত মুক্তি আসেনি। বাঙালি জাতি পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের শোষণ ও শৃঙ্খলের জটিল জালে বন্দি হয়। ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি জাতি শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির আশায় ঐক্যবদ্ধ হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি উদার-অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আশায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণ একত্রিত হয় দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে বাঙালি জাতি। এরপর নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির আলোকে গড়ে ওঠে বাঙালির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পেক্ষাপট। বাঙালির রক্তে রঞ্জিত উর্বর ভূমি বাঙালিকে লালন করছে সগৌরবে। মূলত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে আমাদের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠছিল তার মূলে ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। ফলে বাঙালি জাতি গড়ে তুলেছে নতুন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বরূপ : ধর্মীয় কুসংস্কার ভুলে গিয়ে বাঙালি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একই পতাকাতলে সমবেত হয়। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন প্রেরণা দান করে। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে বিশ্বের দরবারে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তাকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। যে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চেতনা লালন করে বাঙালি এগিয়ে চলেছে তার গতি সুস্থিত নয়। মাঝে মাঝে জাতীয় মতানৈক্যের অভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নানা অস্থিরতা দেখা দেয়। অন্যদিকে, কিছু গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক চেতনা ও কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত করছে মূল চেতনা তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে। লাল-সবুজ পতাকাতলে মানুষ কোনো ধর্মীয় চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়নি; বরং সকল ধর্মীয় কুসংস্কার ও বিভেদ ভুলে গিয়ে মানবতাবোধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছিল। সুতরাং আমাদের আবশ্যিক ও নৈতিক দায়িত্ব মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শানিত হয়ে আমাদের দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা :

'কীসে কী হইল, পশ্চিম হইতে নরঘাতকরা আসি
সারা গাঁও ভরি আগুনে জ্বালায়ে হাসিল অট্টহাসি
মার কোল থেকে শিশুরে কাড়িয়া কাটিল সে খান খান
পিতার সামনে মেয়েকে কাটিয়া করিল রক্তস্নান'

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে বাঙালির দেশপ্রেম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমনকি অতীতের সব সংগ্রামেও দেশপ্রেমই ছিল অন্যতম চালিকাশক্তি। স্বদেশ, স্বভাষা ও

স্বজাতির প্রতি ভালোবাসার চূড়ান্ত ফল হলো ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ। এ সময় বাঙালি জাতি নতুন করে জেগে ওঠে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল এই দীর্ঘ ২৩ বছর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতিকে তিলে তিলে নিঃশেষিত করেছে। কেড়ে নিতে চেয়েছে মুখের ভাষা, ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এসব শোষণ–বঞ্চনা থেকেই বাঙালির দেশাত্মবোধ তার অস্থিমজ্জায় শক্তপোক্তভাবে গেড়ে বসেছে। বাঙালির সাহিত্য চর্চায়ও আমরা পাই মুক্তিযুদ্ধ ও দেশপ্রেমের চেতনা। কবিতায়, গল্পে, গানে, উপন্যাসে, নাটকে প্রকাশিত হয়ে আসছে মুক্তিযুদ্ধ ও দেশপ্রেমের চেতনা। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের পর দেশাত্মবোধক গানের একটা নতুন জোয়ার পরিলক্ষিত হয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রেও ব্যাপকভাবে দেশপ্রেম প্রতিফলিত হয়ে আসছে।

দেশপ্রেমের উৎস ও প্রভাব :

"স্বদেশের উপকারে নেই যার মন
কে বলে মানুষ তারে? পশু সেইজন।"

সকল মানুষের অন্তরে সুপ্ত থাকে স্বদেশপ্রেমের চেতনা। স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রেমহীন মানুষ বিবেকবর্জিত। স্বদেশপ্রেম মানুষকে উদার হতে সহযোগিতা করে। আত্মসম্মান, পরিশুদ্ধ ভাবাবেগ ইত্যাদি থেকে স্বদেশপ্রেমের উদ্ভব হয়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ স্বদেশপ্রেমের পরিচয় মেলে। স্বদেশপ্রেমের চেতনায় অনুপ্রাণিত মানুষের মন–মানসিকতায় সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা স্থান পায় না। রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী সবাই তাদের আপন কর্মের মাধ্যমে স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। তাদের প্রদীপ্ত চেতনাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষ দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে প্রেরণা পায়।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাংলাদেশ : সকল শ্রেণির মানুষের মৌলিক চাহিদা ও অধিকার আদায়ের চেতনা হলো মুক্তিসংগ্রাম। শোষণ–বঞ্চনাহীন স্বাধীন–সার্বভৌম পবিত্র ভূমিতে বেঁচে থাকার দৃঢ় প্রত্যয়ে ১৯৭১ সালে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতাসহ সকল শ্রেণি–পেশার মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে। পরিকল্পিত কৃষি ও শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে আত্মনির্ভর বাংলাদেশ গড়াই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। এই মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধারাই আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরদিন তাঁদের অবদানকে স্মরণ করবে।

আধুনিক সমাজ বাস্তবতায় আমাদের করণীয় : মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি স্বাধীন ভূমি। কিন্তু এই চেতনা কতটুকু রক্ষা করতে পেরেছি তা আজ প্রশ্নবিদ্ধ। সমাজজীবনে চরম অবক্ষয় আজ জাতিকে করে তুলেছে দিশেহারা। নানা অনিয়ম–দুর্নীতি আজ মহামারির মতো জাতীয় জীবনের সকল জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের যুবসমাজও এই অবক্ষয়ের করাল গ্রাসে আক্রান্ত। তাছাড়া রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও ঐক্যের অভাব প্রতিনিয়ত আমাদের দ্বন্দ্ব, কলহ, দুর্দশা ও নৈরাজ্যের ভেতর টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মানবতাহীন, নিষ্ঠুর কাজ করতে মানুষের বিবেক আর বাধা দেয় না। এ অবস্থায় আমাদের প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত দুর্নীতিমুক্ত ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা। আমাদের পকৃত গৌরবগাথার ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বেশিমাত্রায় উপস্থাপন করা উচিত। যে আদর্শ, লক্ষ্য ও চেতনা ধারণ করে জীবন আত্মোৎসর্গ করেছে বাংলার লাখো মুক্তিযোদ্ধা, সেই আদর্শ ও চেতনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

উপসংহার : ১৯৭১ সালে আমরা অর্জন করেছি রাজনীতিক ও ভখণ্ডগত স্বাধীনতা। দেশপ্রেমের যেমন বিকল্প নেই তেমনই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাও আজ অপরিহার্য। এই চেতনাকে আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দিয়ে চিরস্থায়ী রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা করতে হবে। তবেই সার্থক হবে আমাদের সকল ত্যাগ, সকল উৎসর্গ।

'হাঁটি হাঁটি শিশুটিকে আমি আর আজ
কোথাও দেখি না
নরম নোলক পড়া বৌটিকে আমি আর আজ
কোথাও দেখি না
কেবল পতাকা দেখি,
স্বাধীনতা দেখি!
তবে কি আমার ভাই আজ ওই স্বাধীন পতাকা?
তবে কি আমার বোন তিমিরের বেদীতে উৎসব?'

৮১. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সমকালীন রাজনীতি

ভূমিকা :

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা
আমরা তোমাদের ভুলবো না।

শহিদ ও মুক্তিযোদ্ধা স্বজনদের অভিযোগ সবাই (বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধীরা) বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ৩০ লাখ শহিদের সঙ্গে, তাদের স্বজনদের সঙ্গে এবং সর্বোপরি সব প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে। শুধু ডিসেম্বর মাসে অথবা কখনো কখনো আপনারা গানের পঙ্‌ক্তিটি আওড়ান 'এক সাগর' রক্ত যারা দিয়েছেন– 'আমরা তোমাদের ভুলব না।' বাস্তবে, খুব কম লোকই তাদের মনে রেখেছেন, তাদের স্বজন ছাড়া। একটি দেশের বাস্তবিকতাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যারা সেদিন নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিল তাদের কেউ শহিদ হয়েছে, যুদ্ধাহত হয়েছে, পঙ্গু হয়েছে, কেউ স্বজন হারিয়েছে, সহায়–সম্পদ হারিয়েছে, কেউ জীবিত আছে এক বুক জ্বালা নিয়ে। এককথায়, দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে তারা অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা বনাম দেশদ্রোহী : দেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা যখন লড়াই করছিল, তখন অনেক মানুষ আবার ঘরে এসির (রূপক অর্থে) আরামে ছিল। দেশের স্বাধীনতার জন্য যে মুক্তিযোদ্ধারা এত বড়ো ভূমিকা রাখল, তারা কী পেলো? তাদের সম্মান চাওয়া কি অন্যায়? দেশ ও দেশের মানুষ থেকে কিছু সুযোগ–সুবিধা পাওয়া তাদের ন্যায্য অধিকার। এজন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে অন্যদের মেলানো ঠিক হবে না। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা চায় একটু সম্মান। কৃতজ্ঞ জাতি হিসেবে একটু সম্মান কি আমরা তাদের দিতে পারি না! অপরপক্ষে, যেসব মানুষ (সমর্থবান মানুষ) দেশের পক্ষে লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার বদলে আরামে ছিলেন, পলায়নপর ছিলেন, তাদের দেশে পদ পাওয়ার অযোগ্য হওয়া উচিত। অনেক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার অভিযোগ, অধিকাংশ প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা (শহিদ ও যুদ্ধাহতসহ) সুযোগের চেয়ে বঞ্চনাই বেশি পেয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান : এ কথা আক্ষরিক অর্থেই কেবল সত্য, বাস্তবে নয়। এ কথা সবাইকে মনে রাখতে হবে, মুক্তি বিনা মূল্যে মেলেনি বিশেষত বাংলাদেশের। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র কারো ইচ্ছায় সৃষ্টি নয়, বল প্রয়োগেও সৃষ্ট নয়। এই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র মানুষের নিতান্ত প্রয়োজনেই ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের ৩০ লাখ মানুষ শহিদ হয়েছেন, অনেক মা–বোন নির্যাতিত–ধর্ষিত হয়েছে, তাদের কোটি–কোটি পোষ্যরা চিরদুর্ভোগে আছে। সবাইকে মনে রাখতে হবে, আজ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই অনেকে অনেক কিছু পেয়েছেন–আশাতীতভাবেই। কিন্তু যারা সব হারিয়ে নিঃস্ব হলো তাদের প্রবোধ কীসে? এমনকি আমিও আমার মতো অনেকেই তার বাবাকে কোনোদিন দেখতেও পাইনি! অর্থাৎ জন্মের আগেই এতিম হয়েছে বলে। চেতনা হলো মানুষের মনের গভীরে লালিত সেই আদর্শ, যা তাকে সব কাজে অনুপ্রেরণা জোগায়। সংগত কারণেই বাংলাদেশিদের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে (জাতীয়ভাবে) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা : এ দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন তো দূরের কথা আমার বাবার মতো ৩০ লাখ শহিদের জীবন দিয়ে পাওয়া এই দেশে অনেকেই আজ আমাদের ওপরে জমিদারি মনোভাব দেখায়, যা সত্যিই বড়ো কষ্টের! আমাদের দেশে অনেক সময় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দেখা গেছে ঘুণপোকা। বাংলাদেশিদের মধ্যে এ মুহূর্তে স্বাধীনতা তথা বাংলাদেশবিরোধী মনোভাব কতটা প্রবল, সে সম্পর্কে ধারণা মোটেই সুখকর নয়। তবে বাংলাদেশ তথা মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ তথা মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের মধ্যে বৈরিতার ইতিহাস অতীতে না হলেও এখন তীব্র, দীর্ঘ এবং গভীর। আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির গোড়াটি নিহিত রয়েছে ১৯৭১–এর ঘটনায়। মূলত সব সমস্যার শুরু ১৯৭১ সালে। হতাশার কথা বাংলাদেশবিরোধী অনুভূতি বাংলাদেশের সমাজের (একটি অংশের) গভীরে প্রোথিত। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশবিরোধীদের সম্পর্কে আধুনিককালের বৈরিতা শুরু হয় ১৯৪৭–এর দেশভাগের পর থেকে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে–বিপক্ষে কত লোক আছে, তার হিসাব করতে গেলে আমরা দেখি, বিপক্ষে এখনো অনেক মানুষ আছে। তার অন্যতম কারণ একাত্তরের জঘন্যতম গণহত্যার কাহিনি হৃদয়ে ধারণ না করা, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিকৃত ইতিহাস প্রচার এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশবিরোধী অব্যাহত ষড়যন্ত্র ইত্যাদি। আর প্রকৃত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করায় জাতির মহাক্ষতি হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে দেশের ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে গোয়েন্দাদের দিয়ে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যাকারীদের চিহ্নিতকরণ, তাদের গণকবর শনাক্তকরণ, শহিদদের স্মৃতি ও নির্যাতনের স্মারকগুলো চিহ্নিত করে তা রক্ষার চেষ্টা করতে হবে। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাসহ (শহিদ ও যুদ্ধাহতসহ) সাধারণ

জনগণের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন না ঘটাতে পারলে জনগণ শুধু রাজনীতিবিদদের স্বপ্নের জিকিরে আর ভুলবে বলে মনে হয় না। কারণ বিগত ৪৬ বছরে দেশে সংগঠিত সেই মহানাটক আজও মঞ্চায়িত হচ্ছে। জনগণের চাই অন্ন–বস্ত্র–বাসস্থান, স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসহ অন্যান্য চাহিদা মেটানোর মতো সক্ষমতা। দেশে মুদ্রাস্ফীতি চলছে (দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে)। মানুষের এত কষ্ট (অনেক দিন যাবৎ) চোখে দেখা যায় না। রাজনৈতিক সন্ত্রাসীরা আজ এ দেশে বড়ো ধরনের দাঙ্গা–হাঙ্গামা বাধানোর ক্ষমতা রাখে বলে অনেকের অভিমত।

আমাদের প্রত্যাশিত রাজনীতি : মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশে সাধারণ জনগণের জন্য নতুন সমাজ গঠনোপযোগী যে সংস্কারের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া দরকার ছিল, তা নেওয়া হয়নি (যদিও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার কিছু কিছু কাজ করেছে)। অন্যদিকে দেশে অনেক আগে থেকে চলে আসছে অব্যাহত সন্ত্রাস, লুটপাট ইত্যাদি। দেশ স্বাধীন হলেই সবাই শান্তিতে থাকবে বলে মনে করেছিল অনেকেই। কারণ সবার প্রাণের দাবি ছিল অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে মুক্তি। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলেও অস্থিতিশীল রাজনীতির কারণে দেশে পরিপূর্ণ শান্তি আসেনি। এ দেশের জনগণের দাবি খুব বেশি নয়। কিন্তু রাজনীতিবিদরা বিভিন্ন ইস্যুতে ভোল বদলে ফেলেছে (সব রাজনীতিবিদ নয়)। সংবিধানে সবার সমান অধিকারের কথা বলা থাকলেও–বাস্তবে তার বাস্তবায়ন পরিপূর্ণভাবে হচ্ছে না। দেশের রাজনীতি ক্রমেই অধঃপতিত হচ্ছে। তবে এত কিছুর পরেও অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে আমাদের দেশে। আমার বিশ্বাস জনগণ পরিবর্তন আনবে। সেজন্য অপেক্ষা করতে হবে।

বাংলাদেশের রাজনীতির আসল সমস্যা নিহিত রাজনৈতিক দলগুলোর সংকীর্ণতা ও ক্ষমতালিপ্সার কারণে, যে আদর্শে বলীয়ান হয়ে আমরা এক ক্ষমতাধর ঔপনিবেশিক শক্তিকে ভেঙে খানখান করে দিয়েছিলাম, সে আদর্শ, ঐক্য তারা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। অনেকেই আজ বলে থাকে, বর্তমানে রাজনীতি এক জঘন্য কৌশল। মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ এখন মোটামুটি উন্নত। বহু ত্যাগ ও রক্ত দিয়ে পাওয়া সুন্দর স্বাধীন বাংলাদেশে আজ কেবলই গন্ডগোল আর রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। দরকার রাজনৈতিক ঐক্য। ইতিবাচক পরিবর্তনগুলো শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং আলোচনার ভিত্তিতে করতে হবে। আগেকার দিনের মতো গণ–অভ্যুত্থান করে ক্ষমতা দখল করা যাবে বলে মনে হয় না। কারণ বাংলাদেশে সবসময় চলে ক্ষমতা দখল প্রতিষ্ঠার লড়াই।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, এসব থেকে পরিত্রাণের, উঠে দাঁড়ানোর এখনই সময়। তাহলেই সুখীসমৃদ্ধ বাংলাদেশ পাব আমরা, নচেৎ নয়। ইতিহাস বলে, ভালো কাজ না করলে কোনো কূটচাল, প্ল্যান–পাঁয়তারাই কাজে লাগে না। এগুলো বাদ দিয়ে জনসেবা করুন সবাই। রাজনীতি করতে হলে এটা লাগবেই। অন্য কোনো কিছুই কাজে দেবে না।

৮২. স্বাধীনতার মূল্য ও স্বদেশপ্রেম

ভূমিকা : যেকোনো জাতির স্বাধীনতা অর্জনের বৃত্তান্ত অত্যন্ত উঁচ–নিচু এবং ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। আর তার চেয়েও আরও কঠিন হলো– অর্জিত স্বাধীনতাকে জাতীয় জীবনে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলা। কথায় আছে, 'স্বাধীনতা অর্জনের চেয়েও স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।' স্বাধীনতার মর্যাদা ধরে রাখা দেশের প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। কেননা আমাদেরকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে হলে স্বাধীনতাকে রক্ষা করতেই হবে। আর একজন দেশপ্রেমিক ব্যক্তিই পারে সেই স্বাধীনতা রক্ষায় উদ্‌বুদ্ধ হতে। তাই যেকোনো স্বাধীন দেশের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে স্বদেশপ্রেমের গুরুত্ব অপরিহার্য।

স্বাধীনতার মূল্য ও স্বদেশপ্রেম বলতে কী বোঝায় : স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে সবার জীবনে অর্থবহ করা ও রক্ষা করার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার শক্তিকে স্বাধীনতার মূল্য বলে। স্বাধীন দেশের ভেতরে ও বাইরে অসংখ্য শত্রু রয়েছে। তারা যেকোনো সময় অর্জিত স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে দিতে সদা তৎপর থাকে। কষ্টার্জিত এই স্বাধীনতাকে যেন কোনো অপশক্তি কিংবা স্বাধীনতা বিরোধীরা ধ্বংস করে দিতে না পারে সেদিকে দেশপ্রেমিক মানুষদের সজাগ থাকতে হবে। অন্যায় অনিয়মমুক্ত সুখী–সমৃদ্ধিশালী দেশ গঠনই স্বাধীনতার মূল্য। বহু ত্যাগ–তিতিক্ষা ও সংগ্রামের সোনালি ফসল স্বাধীনতা অর্জনের ফলে রাষ্ট্রের নানা বিষয়ে মানুষের অবাধ মত প্রকাশের যে সুযোগ অর্জিত হয় তা সামগ্রিকভাবে রক্ষার চ্যালেঞ্জ গ্রহণই স্বাধীনতার মূল্য। তাই স্বাধীনতার মূল্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। অন্যদিকে, নিজের দেশের প্রতি অবিচল ভালোবাসা ও আনুগত্যই হলো স্বদেশপ্রেম। দেশের উন্নতির জন্য সর্বস্ব ত্যাগের সাধনা হলো দেশপ্রেমের পরিচয়। দেশপ্রেমিকরা বিপদে–আপদে, সংকটে–দুর্যোগে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশের সেবা করে, দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে। আর ব্যক্তির মধ্যে স্বদেশপ্রেমের চেতনা জাগ্রত হলেই কেবল কষ্টার্জিত স্বাধীনতার মূল্য ধরে রাখা সম্ভব।

স্বাধীনতার মূল্য ও স্বদেশপ্রেমের পারস্পরিক সম্পর্ক : স্বাধীনতার মূল্য ও স্বদেশপ্রেম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশপ্রেম ছাড়া স্বাধীনতার মূল্য দেওয়া অসম্ভব। কারণ স্বাধীনতাকে রক্ষার মধ্যেই স্বাধীনতার মূল্য নিহিত। জীবন দিয়ে যারা স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছেন, আমাদের বাধাহীন জীবন দান করে গেছেন তারা স্বাধীনতার প্রাথমিক মূল্য দিয়ে গেছেন।

কিন্তু স্বাধীনতার চূড়ান্ত মূল্য দিতে হয় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের মানুষকে। কেননা অর্জিত স্বাধীনতাকে ধ্বংস করার জন্য স্বাধীনতাবিরোধীরা সর্বদা তৎপর থাকে। তাই স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্য, স্বাধীনতার মর্যাদাকে ধরে রাখার জন্য দেশপ্রেমিকদের সচেতন থাকা দরকার। কেননা একজন দেশপ্রেমিকই তার দেশের প্রতি সদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে পারে। কারণ তিনি তার দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। তাই স্বাধীনতার মূল্য দেশপ্রেমিক ছাড়া অন্য কেউ যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। এ কারণেই স্বাধীনতার মূল্য ও স্বদেশপ্রেম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

স্বাধীনতার মূল্য রক্ষায় স্বদেশপ্রেমের অবদান : স্বাধীনতার মূল্য রক্ষায় স্বদেশপ্রেমের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। স্বদেশপ্রেম মানুষকে শেখায় ত্যাগী হতে। দেশপ্রেমিক ব্যক্তিরা দেশের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পিছপা হয় না। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা করে দেশের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ থাকতে কেবল স্বদেশপ্রেমই একজন মানুষকে সহযোগিতা করে। মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হলে তারা দেশের বিপদ মুহূর্তে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। আর দেশপ্রেমিক ব্যক্তিরাই দেশের মধ্যে কোনো অন্যায়–অত্যাচার, বিশৃঙ্খলা, শোষণ দেখা দিলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আবার দেশের স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি দেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে দেশের সকল জনগণ দেশের সাহায্যে এগিয়ে নাও আসতে পারে। তখন খাঁটি দেশপ্রেমিকরা দেশের অস্তিত্ব, স্বাধীনতার অস্তিত্ব রক্ষায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়। এভাবে স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে স্বাধীনতার মূল্য রক্ষা করা যায়।

বাংলাদেশে স্বাধীনতার মূল্য ও স্বদেশপ্রেম : সুজলা–সুফলা, শস্য–শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশে একসময় ছিল সম্পদের প্রাচুর্য। মানুষের মধ্যে সর্বদা শান্তি–শৃঙ্খলা বিরাজ করত। এজন্য বিদেশি অপশক্তি এদেশকে শাসন–শোষণ করেছে বিভিন্নভাবে। আফগান, মোগল, ফিরিঙ্গি, পর্তুগিজ, পাঠান, বর্গি, ব্রিটিশ বেনিয়া কোম্পানি এবং সর্বশেষ পাকিস্তানিদের দ্বারা এদেশ শাসন–শোষণের শিকার হয়। তাই বাঙালিরা অবশেষে দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তাদের প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্ত, দুই লক্ষ মা–বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে এদেশে উদিত হয় স্বাধীনতার সূর্য। ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতির স্বদেশপ্রেমের কারণে আজ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। এই স্বাধীনতার মূল্যকে বুকে লালন করে বাঙালি জাতি এখনও সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে।

জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার মূল্য ও স্বদেশপ্রেম : জাতীয় নেতাদের মধ্যে নির্ভেজাল স্বদেশপ্রেম থাকতে হবে। কারণ জাতীয় নেতারাই পুরো বিশ্বের প্রতিনিধি। তাদের নেতৃত্বেই পুরো বিশ্ব পরিচালিত হয়। সকল জাতি তাদের কাজকর্ম, সিদ্ধান্ত ও আদর্শ অনুসরণ করে। তারাই কেবল দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারেন। তাছাড়া দেশের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা কী হবে তাও তারা সুপরিকল্পিতভাবে আগে থেকেই ঠিক করতে পারেন। একটি দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে শমিক–কর্মচারী পর্যন্ত সকলের মধ্যে দেশপ্রেম থাকতে হবে। নতুবা দেশের স্বাধীনতার মূল্য থাকবে না। তাই জাতিকে উন্নতির আসনে অধিষ্ঠিত করতে চাইলে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করে স্বাধীনতার মূল্য ধরে রাখতে হবে।

বর্তমানে স্বাধীনতার মূল্য ও স্বদেশপ্রেম : মানুষের মধ্যে অতীতেও স্বদেশপ্রেম ছিল, বতমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে পরিবেশ–পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বাধীনতার মূল্য ও দেশপ্রেমের মাত্রাগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান পুঁজিবাদী আর্থনীতিক ব্যবস্থাও বিদেশি পরাশক্তির চাপে, সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যগুলোর আগ্রাসন এবং উন্নত দেশগুলোর কূটনৈতিক প্রভাবে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সর্বদা হুমকির সম্মুখীন। তাছাড়া বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে উৎপাতকারী বিদেশি অপশক্তির কারণে বর্তমানে স্বাধীনতার মূল্য নস্যাৎ হওয়ার উপক্রম প্রায়। এ কারণে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। তাহলেই স্বাধীনতার মূল্য রক্ষা করা সম্ভব হবে।

স্বদেশপ্রেমহীন স্বাধীনতা পরিস্থিতি : স্বদেশপ্রেমের অভাবে একটি দেশের অর্জিত স্বাধীনতা নাশ হয়ে যেতে পারে। এছাড়া স্বদেশপ্রেম না থাকলে জাতি স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারবে না। ফলে দেশে অন্যায়–অত্যাচার, লুটপাট, শোষণ, ধর্ষণ, অরাজকতা, সুদ–ঘুস, কালোবাজারি, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, হত্যা প্রভৃতি অপকর্ম বেড়ে যায়। ফলে সেই জাতির জীবনে নেমে আসে দুর্যোগ এবং স্বাধীনতার মূল্য ক্ষুণ্ন হয়।

উপসংহার : স্বাধীনতার মূল্য ও স্বদেশপ্রেম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি ছাড়া অন্যটি অকল্পনীয়। আমাদের সকলের উচিত স্বদেশপ্রেম চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে স্বাধীনতার মূল্য রক্ষা করে দেশের কল্যাণে এগিয়ে আসা।

৮৩. জনসেবা
অথবা, সমাজসেবা

ভূমিকা

জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। পরস্পরের সাহায্য ব্যতীত তারা জীবনধারণ করতে পারে না। শৈশবে মানবসন্তান পিতামাতার মুখাপেক্ষী হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োজন বৃদ্ধি পায় এবং তাই তাকে অপরের সাহায্যের ওপর আরও নির্ভরশীল হতে হয়। কি গ্রাসাচ্ছাদন সংস্থান, কি বাসগৃহ-নির্মাণ, কি বিলাসোপকরণ সংগ্রহ, কি বিদ্যার্জন, কি ধর্মশিক্ষা লাভ, কি ব্যাধির প্রতিকার— প্রতি কার্যেই মানুষকে পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে সাহায্য বা সেবা করার নামই জনসেবা।

জনসেবাই মহাপুরুষগণের কর্মাদর্শ : হজরত মুহম্মদ (সা.) বলেছেন, "মানুষের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ, যিনি মানুষের উপকার করেন।" মহাপুরুষগণ তাঁদের জীবনের কার্য ও উপদেশাবলি দ্বারা শুধু এ শিক্ষাই জগৎবাসীকে দিয়ে গিয়েছেন যা, মানবসেবা বা জনসেবাই স্রষ্টার সেবা। জনসেবাই সমাজসেবা। তাঁরা জগতের আপামরসাধারণকে আপনার ভাইবোন বলে নানাভাবে তাদের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা ও সেবা করে গিয়েছেন। মানুষের ভালোবাসায় পাগল হয়ে তাকে উদ্‌বুদ্ধ করার চেষ্টাতেই হজরত ইসা (আ.) হাসিমুখে ক্রুশযূপকাষ্ঠে প্রাণ দিয়েছেন এবং সেই মৃত্যুর সময়েও কৃতঘ্ন মানবকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর নিকট কাতর প্রার্থনা জানিয়েছেন। রোগ-শোক, জরা-মৃত্যুক্লিষ্ট মানবের দুঃখের ব্যথা দূর করার উপায় অনুসন্ধানের জন্যই মহাপুরুষ বুদ্ধদেব সাম্রাজ্য, সুখ, ঐশ্বর্য এবং পিতামাতা ও স্ত্রী-পুত্রের বন্ধন ছিন্ন করে পথে বের হয়েছেন। মানবপ্রেমের জন্যই মানবশ্রেষ্ঠ হজরত মুহম্মদ (সা.)-কে পৌত্তলিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তমসাচ্ছন্ন মানুষের নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। মানুষকে প্রেমধর্ম শিখানোর জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ মানবের দুয়ারে দুয়ারে যেচে প্রেমনাম বিলিয়েছেন; পাষণ্ড ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত মানবের হস্তে আঘাত পেয়ে আপনার দেহ রক্তাক্ত হয়েছে, তবু প্রেমামৃত দানের জন্য তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট এ মানবপ্রেম শিক্ষা করেই তাঁর দিগ্‌বিজয়ী শিষ্য বিবেকানন্দ সারাবিশ্বের মানবপ্রেম প্রচার করে গিয়েছেন। মুসলিম দরবেশগণ এভাবেই দুঃখ-পীড়িতদের চিরদিন উপকার সাধন করে গিয়েছেন।

জনসেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম : জনসেবা বা মানব সেবা বলতে অন্ধ, আতুর, দরিদ্র বা ভিখারিকে এক মুষ্টি অন্ন, দুটি পয়সা, একখণ্ড বস্ত্র বা কিছু ওষুধপত্র দিয়ে সাহায্য করা বোঝায় না। নিজের সর্বস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ধনী-দরিদ্র, আতুর, অনাথ, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে আপামরসাধারণকে আপন সহোদর ভেবে সর্বতোভাবে তার মঙ্গল সাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করাই জনসেবা। এরূপ নিষ্কাম জনসেবাই মহামানব ধর্ম—এটাই প্রকৃত সমাজসেবার আদর্শ। জগতে আমরা যা কিছুই দেখি তৎসমুদয় এক বিরাট শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট। সেই বিরাট শক্তিই আল্লাহ। আমরা সকলেই তাঁর বান্দা। তাই সকলেই ভাই ভাই। কাজেই কারও প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করা উচিত নয়। আল্লাহর সৃষ্ট জীবকে ভালোবাসতে পারলে তবেই আমরা তাঁকে ভালোবাসতে সমর্থ হব।

এ সংসারে কোনো লোক ধনাঢ্য, কেউ নির্ধন, কেউ উচ্চকুলজাত, কেউ হীন-বংশসম্ভূত, কিন্তু সকলেই এক বিশ্ব-স্রষ্টার সন্তান, সুখ-দুঃখ-বোধশক্তি সকলেরই সমান। সুতরাং এক বিধাতার রাজ্যে বাস করে পরস্পর ভেদবুদ্ধি পরিহার করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। বস্তুত, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বভাব স্থাপনই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। এ ভ্রাতৃত্বভাব বা সাম্যভাবের মধ্যে জনসেবার বীজ গুপ্তভাবে লুক্কায়িত আছে।

শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা দীন-দুঃখীর ব্যথা মোচনে অগ্রসর হয় না তাদের মতো নরাধম এ জগতে আর দ্বিতীয়টি নেই। বলাবাহুল্য, স্বার্থবুদ্ধি বা বৃথা মর্যাদাবোধ অনেক সময় তাদেরকে সেবাকার্য হতে বিরত রাখে। ইতরপ্রাণীর ন্যায় আত্ম-সুখই এদের প্রধান লক্ষ্য। পরোপকারই জীবন; পরহিত চেষ্টার অভাবই মৃত্যু। যার প্রেম নেই, সে মৃত অথবা প্রেত বই অন্য কিছু নয়।

অতিথি সেবা : প্রাচীনকাল হতে সেবা আমাদের দেশে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে গণ্য। তৎকালে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে অতিথি সৎকার করে গৃহস্থগণ নিজেদের ধন্য মনে করত। স্বহস্তে অতিথি সেবায় মান-সম্ভ্রম ক্ষুণ্ন হয় না। অতিথি তুল্য ধর্ম আর নেই।

মানুষ ধরো মানুষ ভজ শোন বলি রে পাগল মন

কৈশোরে সেবাকার্য শিক্ষা : বিদ্যালয়ে তরুণদের অন্তরে সেবাধর্মের বীজ বপনস্বরূপ সেবাব্রতীদল (Boy Scouts) গঠন করা হয়। যদি তারা সুষ্ঠুভাবে স্বীয় কর্তব্য পালন শিক্ষা করে তবে আশা করা যায়, তার দ্বারা দেশের মহাকল্যাণ সাধিত হবে। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে প্রাথমিক সাহায্য (First Aid) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। এটা যে মানুষের কত দরকারি তা বলে শেষ করা যায় না। এ সেবাধর্মের বীজ কৈশোরেই বালক-বালিকাদের অন্তরে বপন করতে হবে। এ সময়ে তারা পিতামাতার সেবা, পরিবারস্থ আত্মীয়স্বজনের সেবা, দাসদাসী, প্রতিবেশী প্রভৃতির সেবা করে সেবাধর্ম পালন শিক্ষা করতে পারে। সেবার

আনন্দে তাদের মনের আনন্দ বাড়বে, মনুষ্যত্বের গৌরব বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং সেবাকার্য শিক্ষা যত সত্বর আরম্ভ করা যায়, ততই সমাজের জন্য মঙ্গলকর।

পল্লিতে সেবাসংঘের প্রয়োজনীয়তা : পল্লিগ্রামে রোগের প্রাবল্য অত্যধিক, উপযুক্ত শুশ্রূষাকারী ও চিকিৎসকের নিতান্ত অভাব। তাই গ্রামে গ্রামে সেবাসংঘ স্থাপন করে যুবকগণ জনসেবা কার্যে নিযুক্ত থাকলে পল্লির বহু অসহায় লোককে অকালমৃত্যুর কবল হতে রক্ষা করা যেতে পারে।

উপসংহার : আর্তজনের সেবা করলে তাদের বদনমণ্ডল কৃতজ্ঞতায় সুন্দর ও সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সৌন্দর্য অবলোকন করে সেবাপরায়ণ ব্যক্তির অন্তরে যে আনন্দরসের সঞ্চার হয় তা তার সেবাকার্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আর্তের ও ব্যথিতের সেবা করে তাদেরকে ধন্য করা হয় না; বরং দাতা দান করে, সেবক সেবা করে নিজে ধন্য হয়। জনসেবা সেবকের— এ মনোবৃত্তি নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। তবেই সেবা সার্থক হবে।

SINCE - 1993
NABARUN PUBLICATION

৮৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

অথবা, **আমাদের মুক্তিযুদ্ধ**

অথবা, **মুক্তিযুদ্ধ ও আজকের বাংলাদেশ** *[কু. বো. '১৬]*

ভূমিকা

সুদীর্ঘকালের ইতিহাস থেকে জানা যায় বাঙালি জাতি হাজার বছর ধরে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে আসছে। বাঙালির প্রাকৃতিক পরিবেশেই আছে তার প্রতিবাদের ভাষা। পরের বশ্যতা সে কোনোদিনই মেনে নিতে পারেনি। তাই বারবার এখানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। সেই আগুনে তার শৌর্যবীর্য দীপ্ত হয়ে উঠেছে। অবশেষে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি অর্জন করে তার প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যে বোধ বা চেতনাকে কেন্দ্র করে, তারই নাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তাকে চিরসমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রেরণা জোগাবে অনন্তকাল।

'স্বাধীনতা তুমি/বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর/শানিত কথার ঝলসানি–লাগা সতেজ ভাষণ।/স্বাধীনতা তুমি/চা–খানায় আর মাঠে–ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ। ...স্বাধীনতা তুমি/গৃহিণীর ঘন খোলা কালো চুল,/হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।/স্বাধীনতা তুমি/খোকার গায়ে রঙিন কোর্তা,/খুকীর অমন তুলতুলে গালে/রৌদ্রের খেলা।'

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি : ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের জাঁতাকলে প্রায় দুশো বছর ধরে নিষ্পেষিত হয়েছিল ভারতীয় উপমহাদেশ। ১৯৪৭ সালে সে জাঁতাকল থেকে এ উপমহাদেশের মানুষ মুক্তিলাভ করলেও মুক্তি আসেনি বাঙালি জাতির। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানি শাসকদের শৃঙ্খলে আবার বন্দি হলো বাঙালি জাতি। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন থেকে ধাপে ধাপে সংগ্রাম করে মুক্তির পথ খুঁজছিল বাঙালি জাতি।

১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার জয়লাভ, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন হতে ১৯৬৬–র ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯–এর নজিরবিহীন ছাত্র গণ অভ্যুত্থানসহ বিভিন্ন গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন। ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে তদানীন্তন পূর্ব–পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়ার গড়িমসি ও ভুট্টোর ভেটো অব্যাহত থাকে। অবশেষে র নির্দেশে ১৯৭১–এর ১লা মার্চ হতে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত নজিরবিহীন অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে। লাখো জনতার উপস্থিতিতে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে র ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার আহ্বান কোনো অস্পষ্ট বিষয় নয়। সবশেষে ২৫শে মার্চ রাতে নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত বাঙালির ওপর পাক–বাহিনীর বর্বর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃক স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা–বাণী প্রচার এবং 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'–এ স্বতঃস্ফূর্ত স্লোগান দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। গানে তাই ভেসে আসে—

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি

মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ : ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের অন্ধকার রাত্রিতে পাক–হানাদার বাহিনী সশস্ত্র অবস্থায় অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা নির্বিচারে চালায় হত্যাযজ্ঞ। ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে কে গ্রেফতার করা হয়। ২৬শে মার্চ যার যা আছে তাই নিয়ে সর্বত্র শত্রুর মোকাবিলা শুরু হয়। র ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও নেতৃবৃন্দ আত্মগোপন করে যে যেভাবে পারেন সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়ে একত্র হন। গ্রামে–গঞ্জে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, পুলিশ, আনসার সবাই মিলে যার যার অঞ্চলে আঞ্চলিক কমান্ড তৈরি করে বিক্ষিপ্তভাবে শত্রুর ওপর আক্রমণ চালাতে থাকে। কতিপয় বিবেকহীন বিশ্বাসঘাতক আলবদর, রাজাকার, আলশামস ছাড়া গোটা জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৬শে মার্চ চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামের স্থানীয় জননেতা আবদুল হান্নান র পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন। ২–৩ মাস পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত ও অসংগঠিত অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ যুদ্ধ চলতে থাকে।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। এ সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় নেতৃত্ব দেয়।

দেশের সমগ্র সীমান্ত এলাকায় আশ্রয়গ্রহণকারী রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের নেতা–কর্মীদের উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প এবং শরণার্থী ক্যাম্প গড়ে উঠতে থাকে। চার–পাঁচ মাস পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের গতিবিধি ও পরিস্থিতি

পর্যবেক্ষণের পর ভারত সরকার প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী সরকারের কার্যক্রম বৈপ্লবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এ দিকে দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ওপর চলে প্রচণ্ড গেরিলা আক্রমণ।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করে সেক্টর কমান্ডারদের নিয়োগ করা হয়। এতে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয় ও তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিপ্লবী অনুষ্ঠান ও রণসংগীত মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশবাসীকে যথেষ্ট উৎসাহিত করে। প্রবাসী সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আবেদন জানায় এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। এমনিভাবে নয় মাস যুদ্ধের ভেতর দিয়ে ১৯৭১–এর ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে। কবি বলেন—

"তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর
পাড়ি দিব রে
আমরা ক'জন নবীন মাঝি
হাল ধরেছি, শক্ত করে রে"

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে আমাদের যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে তার মূলে কাজ করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। গত চার দশকে নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকশিত হয়েছে আমাদের সমাজজীবনে। ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারীমুক্তি আন্দোলন, নারীশিক্ষা, গণশিক্ষা, সংবাদপত্রের ব্যাপক বিকাশ সর্বোপরি গণতান্ত্রিক অধিকার চেতনা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে সমাজে। এরশাদ সরকারের নয় বছরের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যে প্রবল গণজোয়ারের মধ্য দিয়ে নবতর বিজয় অর্জন ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারও প্রেরণা জুগিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের সাহিত্যে বিশেষ করে কবিতা ও কথাসাহিত্যে এক নবতর ধারার জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশে কবিতাচর্চা তথা সাহিত্যচর্চা আজকে যতটা ব্যাপ্তি পেয়েছে তার পেছনে বড়ো প্রেরণা ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে গান এবং নাটকে। গণসচেতনতামূলক বক্তব্যধর্মী নাটক ব্যাপকভাবে রচিত হয়েছে স্বাধীনতার পর। আমাদের দেশাত্মবোধক গানের ক্ষেত্রে এক নতুন জোয়ার এনেছে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়গাথা। আমাদের চলচ্চিত্রেও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা প্রকাশ পেয়েছে।

'রক্তের কাফনে মোড়া কুকুরে খেয়েছে যারে, শকুনে খেয়েছে যারে,/সে আমার ভাই, সে আমার মা, সে আমার প্রিয়তম পিতা/ স্বাধীনতা সে আমার স্বজন হারিয়ে পাওয়া একমাত্র স্বজন/স্বাধীনতা সে আমার প্রিয় মানুষের রক্তে কেনা অমূল্য ফসল/

বর্তমান প্রেক্ষাপট ও আজকের বাংলাদেশ : যে স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষা সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সেই স্বপ্ন নানা কারণে গত চার দশকেও সাফল্যের লক্ষ্যমাত্রা স্পর্শ করতে পারেনি। স্বাধীনতার পর বারবার সামরিক অভ্যুত্থান, হত্যা আর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী দেশি ও বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের অপতৎপরতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, যুবসমাজের মধ্যে সৃষ্ট হতাশা, বেকারত্ব, জনস্ফীতি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, ঘুস, দুর্নীতি ইত্যাদি স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিপন্ন করে চলেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কার্যকলাপ বারবার সংঘটিত হয়েছে প্রশাসনের ভেতরে এবং বাইরে। প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তির সংঘবদ্ধ প্রয়াস ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আন্তরিক পদক্ষেপ। এজন্য দুর্নীতিমুক্ত কল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা যেমন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত গৌরবগাথা আর আত্মত্যাগের ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা। কবির ভাষা আজ ভুলে গেলে চলবে না। কবি বলেন—

তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা
তোমাকে পাওয়ার জন্য
আর কত ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কত দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?

উপসংহার : মুক্তির চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ১৯৭১ সালে আমরা যে কঠিন আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তা হচ্ছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তখনই সাফল্যে উদ্ভাসিত হবে যখন এ রাজনৈতিক স্বাধীনতা আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতায় রূপান্তরিত হবে। সে লক্ষ্যে আজ সমাজের সর্বস্তরে মুক্তিযুদ্ধের মহান চেতনাকে ছড়িয়ে দেওয়া ও লালন করা প্রয়োজন। দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের মহৎ লক্ষ্যসমূহ জাগ্রত করা গেলে তবেই আমাদের স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এক গৌরবময় স্তরে উত্তীর্ণ হবে। কবি বলেন—

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনিপ্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্‌বিদিক
এই বাংলায়
তোমাকেই আসতে হবে, হে স্বাধীনতা।

৮৫. চরিত্র

ভূমিকা : চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। চরিত্রের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে অলংকৃত করতে পারে। চরিত্র এমন এক সম্পদ যার মাধ্যমে মানুষ সব গুণের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে। সমাজে যে ব্যক্তির চরিত্র ভালো সে সবচেয়ে উত্তম মানুষ বলে বিবেচিত। ব্যক্তির আচরণ ও আদর্শকে বোঝাতে চরিত্র শব্দটি ব্যবহৃত হয়। চরিত্র মানুষকে ন্যায়পথে পরিচালিত করে। অন্যায় কাজকর্ম থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে। চরিত্রই মনুষ্যত্বের আসল পরিচয়। চরিত্রবান ব্যক্তি সমাজ তথা জাতির কাছে সব সময় শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকেন। অসৎ চরিত্রের মানুষ সমাজে ঘৃণার চোখে পরিলক্ষিত হয়। তাই চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়, "The crown in glory of life is character."

চরিত্রের উপাদান : সততা, সত্যনিষ্ঠা, প্রেম, মানবতা, দেশপ্রেম, অধ্যবসায়, পরোপকারিতা হলো চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান। এগুলো মানুষকে সহজে নিজের মধ্যে বিকশিত করতে হবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার প্রতিটি কথা ও কাজের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তুলতে হবে। ব্যক্তির চারিত্রিক গুণাবলির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে সেগুলো হলো—

১. মানুষের মধ্যে ধৈর্য, সাহস, আনুগত্য, সততা ইত্যাদি বৃদ্ধি।
২. শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, আচার–আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা।
৩. দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, মানবপ্রেম ইত্যাদিতে উদ্‌বুদ্ধ হওয়া।
৪. হিংসা–বিদ্বেষ পরিহার করা।
৫. ন্যায়বিচার, মানবকল্যাণ ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলিকে জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ।

সচ্চরিত্রের লক্ষণ : নৈতিকতা বলতে চরিত্রকে বোঝায় না। চরিত্রের মধ্যে মানুষের যাবতীয় গুণাবলি থাকতে হবে। চরিত্রবান ব্যক্তি জগতের মায়া–মোহ, লোভ–লালসার বন্ধনকে ছিন্ন করে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় অবিচল থাকেন। যিনি চরিত্রবান তিনি কখনো সত্য থেকে বিচ্যুত হন না, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না, আনন্দে আত্মহারা হন না। তিনি সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ হয়ে মানুষকে ভালোবাসেন। প্রতিটি মানুষের উচিত সমাজের সকলকে ভালোবাসা, একে অপরের প্রতি সাহায্য–সহযোগিতা করা। তাহলে সচ্চরিত্রের লক্ষণ দেখা যাবে। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত চরিত্র গঠনে সাধনা করা।

সচ্চরিত্রের ফল : ভালো চরিত্রের মাধ্যমে জীবনের গৌরব পরিলক্ষিত হয়। চরিত্র দিয়ে জীবনের যে গৌরবময় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তা আর কিছুতেই সম্ভব নয় বলে সবার ওপরে চরিত্রকে সুমহান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। যার পরশে জীবনে পরিবর্তন ঘটে। সৎ চরিত্রের অধিকারী সমাজের শ্রেষ্ঠ অলংকার ও প্রজ্বলিত দীপশিখা। তার মধ্যে যাবতীয় মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটে বলে চরিত্রবান মানুষ জাতির সম্পদ। বিভিন্ন মনীষীদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় প্রতিটি মহান ব্যক্তি সচ্চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

চরিত্র গঠনে পরিবারের ভূমিকা : চরিত্র গঠনের কাজ শিশুকাল থেকে মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত চলতে থাকে। শৈশবকাল হচ্ছে চরিত্র গঠনের উৎকৃষ্ট সময়। তাই পরিবারকে চরিত্র গঠনের উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রত্যেক শিশুই কোনো না কোনো পরিবারে নিষ্পাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। শিশুরা সব সময় অনুকরণপ্রিয়। শিশুকে তার পরিবার যদি সৎ ও আদর্শবান হওয়ার শিক্ষা দেয় তাহলে সেই শিশু অবশ্যই সৎ চরিত্রের গুণে গুণান্বিত হবে।

চরিত্র গঠনে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব ও সঙ্গ নির্বাচন : মানব চরিত্র গঠনে পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। একজন মানুষ যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করে, তার চরিত্র সেভাবেই গঠিত হয়। সেজন্য সে যাতে পরিবারের বাইরে খারাপ লোকের কাছ থেকে দূরে থাকে সেজন্য পরিবারকে খেয়াল রাখতে হবে। সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বন্ধু নির্বাচন করতে হয়। কথায় বলে, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ; একজন ভালো বন্ধু যেমন জীবনের গতি পালটে দিতে পারে ঠিক তেমনি একজন অসৎ বন্ধু জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। পরশমণির ছোঁয়ায় লোহা যেমন সোনা হয়ে ওঠে তেমনি সৎ চরিত্রের প্রভাবে মানুষের পশুবৃত্তি ঘুচে যায়। আবার সঙ্গাদোষে মানুষ তার চরিত্রকে হারিয়ে পশুর চেয়েও অধম হয়ে যায়, এ জগতে যত লোকের পতন হয়েছে তা লক্ষ করলে দেখা যায় সঙ্গাদোষই তার জন্য দায়ী।

চরিত্র গঠনে স্বীয় সাধনা : চরিত্রলাভের প্রধান উপায় স্বীয় সাধনা। চরিত্র সাধনার ধন। বহুদিনের সাধনার বলে তা অর্জন ও রক্ষা করতে হয়। যেকোনো প্রাপ্তি অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন। সংসার মায়ার জালে আবদ্ধ পাশের হাজারো প্রলোভন মানুষকে বিপথে চালিত করে মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। নিজের আত্মশক্তির বলে সেই সব প্রলোভনকে দমন করে নিজেকে দৃঢ় রাখতে হবে। যে দুর্বল সে চরিত্রলাভের উপযোগী নয়, সমস্ত অন্যায়কে দূরে ঠেলে দিয়ে নির্লোভ মনোবলকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই উত্তম চরিত্রবলের অধিকারী হতে পারবে।

চরিত্র গঠনে মহামানবদের উদাহরণ : পৃথিবীতে আজ যাঁরা নিজ কর্মবলে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন বা সমাজের মহাকল্যাণসাধন করে গিয়েছেন তাদের জীবন কাহিনি পড়লে দেখতে পাওয়া যায়, তাঁরা সকলেই ছিলেন চরিত্রবান এবং

আদর্শের প্রতীক। হজরত মোহাম্মদ (সা.) তাঁর চরিত্রবলে জগতে অসাধ্যসাধন করে গিয়েছেন। চরিত্রের মতো অন্য কোনো মহৎগুণ পৃথিবীতে নেই। যিনি চরিত্রবান তিনি মানবশ্রেষ্ঠ। তাইতো কবি বলেছেন—

"এমন জীবন তুমি করিবে গঠন
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।"

চরিত্রহীন ব্যক্তি ঘৃণার পাত্র : মানুষের একমাত্র সম্পদ চরিত্র। চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অধম। স্বাস্থ্য ও অর্থবিদ্যাকে আমরা যেমন মানবজীবনের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করি তেমনি চরিত্রকেও জীবনের অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জীবনের চলার পথে এগুলোর যতই অবদান থাক না কেন এককভাবে এগুলোর কোনোটিই মানুষকে সর্বোত্তম মানুষে পরিণত করতে পারবে না, যদি না সে সচ্চরিত্রবান হয়। জীবনের জন্য চরিত্র প্রধান নিরাময় হিসেবে কাজ করে। মানুষ তার মৌখিক ও দৈহিক সৌন্দর্য আরও আকর্ষণীয় ও মধুময় করতে সুন্দর পোশাক ব্যবহার করে এবং অনুপম সৌন্দর্যের বিকাশসাধন করে কিন্তু সে যদি চরিত্রবান না হয় তা হলে এ সবই বৃথা।

চরিত্রের গুরুত্ব : চরিত্র গঠনের গুরুত্ব এতই ব্যাপক যে জীবনের যাবতীয় সফলতার পূর্বশর্ত হিসেবে একে বিবেচনা করা হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে সুখী, সফল এবং জয়ী হওয়ার জন্য উত্তম চরিত্রের কোনো বিকল্প নেই। যিনি সৎ চরিত্রের অধিকারী তিনি সমাজের শ্রেষ্ঠ অলংকার ও প্রজ্বলিত দীপশিখা। এজন্যই চরিত্রকে জীবনের মুকুট বলা হয়। চরিত্রের শক্তিতে ও প্রভাবে মানুষ হতে পারে বিশ্ববরেণ্য ও চিরস্মরণীয়। তাই চরিত্রের বিকাশসাধনই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

উপসংহার : চরিত্রের কাছে পার্থিব সম্পদ ও বিত্ত অতি নগণ্য। অর্থের বিনিময়ে চরিত্রকে কেনা যায় না। ধনসম্পত্তির অভাবে মানুষ অতৃপ্ত থাকতে পারে, কিন্তু যার চরিত্র প্রকৃত অর্থে সচ্চরিত্রের গুণ লাভ করেছে সে চিরপূর্ণ ও চিরতৃপ্ত মানুষ। ব্লাকি বলেছেন, "অর্থের প্রয়োজন নেই। পদমর্যাদার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন আছে শুধু চরিত্রের, যা মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।" চরিত্রবান ব্যক্তি সমাজের শ্রেষ্ঠ অলংকার। মানবজীবনে চরিত্রের মতো বড়ো অলংকার আর নেই।

SINCE-1993 NABARUN PUBLICATION

৮৬. সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ

ভূমিকা

পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি যতগুলো জাতি জ্ঞান–বিজ্ঞানে, অর্থ–বাণিজ্যে সাফল্যের চরম শীর্ষে অধিষ্ঠিত হয়েছে তাদের সাফল্যের মূল কারণ ছিল নিজের সম্ভাবনা ও সামর্থ্যকে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। আমরা বাংলাদেশি, সংগ্রামেই আমাদের জন্ম, সংগ্রামেই আমাদের টিকে থাকা। আমাদের কাছে আছে হাজারো সম্ভাবনা, আছে হাজারো বাধা। তবুও আমরা এগিয়ে চলছি। কখনো দুর্বার গতিতে, কখনো মন্থর গতিতে। আজ সময় এসেছে, আমাদের সম্ভাবনাগুলোকে অনুধাবন করার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের নাম দিয়েছে এশিয়ার 'এমারজিন টাইগার'। এতো বড়ো উপাধি পেয়ে খুশিতে আত্মহারা না হয়ে আমাদের সত্যি প্রমাণ করতে হবে, হ্যা, অবশ্যই আমরা এমারজিন টাইগার। আর তা না হলে যেকোনো সময় আমরা হয়ে যেতে পারি 'থলেবিহীন ঝুড়ি (Bottomless Basket)'। এখন আমরা এমারজিন টাইগার হবো নাকি থলেবিহীন ঝুড়ি হবো এর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কিন্তু এখনই।

বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় বিভিন্ন খাতসমূহ : পুরো বাংলাদেশটাই একটি সম্ভাবনাময় দেশ। এর প্রতিটি পরতে পরতে অপার সম্ভাবনা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো আমাদের দেশ 'ল্যান্ড লকড' নয়। আমাদের মানচিত্রের বিশাল একটি জায়গাজুড়ে আছে বঙ্গোপসাগর। যার ফলে পণ্য আমদানি–রপ্তানির প্রয়োজন নেই। এছাড়া আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান মোনসুন এশিয়ায় (Moonsoon Asia)। এর ফলে বছরে চার মাস আমরা পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত পাচ্ছি। এমনকি আমাদের পাশের দেশ ভারতকে তার সেভেন সিস্টার রাজ্যগুলোতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আমাদের ভূমি ব্যবহার দরকার পড়েছে। এর অর্থ আমাদের ভৌগোলিক অবস্থা ও জলবায়ু শিল্পায়নের জন্য যথার্থ ও উপযুক্ত। এখন কেবল সঠিক নেতৃত্ব ও উদ্যোগ প্রয়োজন।

তথ্যপ্রযুক্তি খাত : আইটি সেক্টরে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। Software Developing & Apps তৈরির মতো কাজ করার জন্য যেসব জিনিস প্রয়োজন– Analytical Strill, fac, Mathematical Skill এবং Auto visualization power. প্রথম দুইটি বিষয়ে নিঃসংশয়ে বলা যায়, আমরা ভারতের বা অন্য দেশের আইটি এক্সপার্টদের তুলনায় কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। আমাদের Analytical Skill যে কত ভালো তা আমরা প্রমাণ করেছি Outsourcing খাতে। গত দু–তিন ববছর যাবৎ আন্তর্জাতিক বড় বড় কোম্পানির Logo Design, Analytical Database Consulting, Graphics Design, Web Developing ইত্যাদি কাজ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে করেছি। আমাদের আউট–সোর্সরা বিড করে কাজগুলো এনেছেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অত্যন্ত সুদক্ষভাবে তাদের কাজগুলো সম্পন্ন করে তা Submit করেছেন। এখানে বলে রাখা ভালো, আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো কখনই কোয়ালিটির সাথে আপস করে না। সুতরাং আমাদের প্রদর্শন করতে হয়েছে। এতে একই সাথে আমাদের ফ্রিল্যান্সিং আউট–সোর্সারদের Analytical Skill অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার আসুন Mathematical Skill–এর প্রসঙ্গে। সাধারণত আইটি খাতের বেশিরভাগ কাজের জন্য Logarithm–এর গাণিতিক সমস্যাগুলোর ওপর ভালো দক্ষতার প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশের তরুণরা অনেক আগেই Logarithm foc Field Theory and polynomials, convex Geometry and Discrete Geometry & Numerical Analysis-T গণিতের জটিল ও কঠিন জায়গাগুলোতে কাজ করে সফল হয়েছে। ম্যাথ অলিম্পিয়াড এর প্রমাণ। সেখানে আমরা একবার রৌপ্য ও দুবার ব্রোঞ্জ পদক বয়ে এনেছি। এবার আসুন প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে। মূলত এই মুহূর্তে প্রধান সমস্যা হলো আমাদের মানসিকতা, অথচ আইটি খাতে উন্নতির বড়ো একটি নিয়ামক হলো সুদূরপ্রসারী চিন্তা। আজ স্টিভ জবস Apple-এর স্বপ্ন না দেখলে আমাদের আইফোন ব্যবহার করা হতো না বা বিল গেটস Microsoft–এর চিন্তা না করলে কম্পিউটার আমাদের কাছে এত সহজলভ্য হতো না।

কৃষিখাত : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। প্রাকৃতিক কারণে আমাদের দেশের কৃষিখাত অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। আর এর সাথে যুক্ত হয়েছে উর্বর মাটি। এছাড়া আরও যে সম্ভাবনাগুলো আছে তার মধ্যে রয়েছে প্রচুর নদী–নালা ও এর উর্বর পলিমাটি এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা। তবে এই খাতে উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে অবশ্যই কৃষকের উন্নতি সাধন করতে হবে। মধ্যস্বত্বভোগী ও মহাজনি প্রক্রিয়ার বেড়াজাল ছিন্ন করে কৃষককে ফসলের প্রকৃত দাম দিতে হবে। আর দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্ববাজারকে লক্ষ্যে আনতে হবে। এছাড়া কৃষি গবেষণাকে অধিক পরিমাণে উৎসাহ প্রদান করতে হবে এবং কৃষির উন্নত প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে হবে। ফসলের মজুদ বাড়ানোর জন্য অধিক পরিমাণে কোল্ডস্টোরেজ ও বিভিন্ন কৃষিনির্ভর ও উর্বর এলাকায় ইপিজেড–এর আদলে 'Agro Industrial Zone' তৈরি করতে হবে। তবেই এই কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের কৃষিখাত সোনালি খাতে রূপান্তরিত হবে।

তৈরি পোশাক খাত : বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত অন্যতম শীর্ষ একটি অর্থ উপার্জনকারী খাত। কারণ এই তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে অনেকদূর নিয়ে এসেছে। নিম্ন শ্রমিক খরচ ও পণ্যের গুণগত মান এর বড়ো কারণ। এরপরও এই সেক্টরে আরও এগিয়ে যাওয়ার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এজন্য অবশ্যই নিরাপদ শ্রম পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

জনশক্তি খাত : জনশক্তি খাত বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান খাত। তবে এ খাতে এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমাদের পিছিয়ে থাকার কারণ অদক্ষ জনশক্তি। আমরা যদি আমাদের দেশের জনশক্তিকে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিভিন্ন দেশে পাঠাই তবে নিঃসন্দেহে এই খাত হতে পারে আগামীদিনের সবচেয়ে সাফল্যময় একটি খাত।

পর্যটন খাত : অপার সৌন্দর্যের দেশ বাংলাদেশ। এ দেশে পাহাড় আছে, আছে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন, রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার। এছাড়াও রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সংবলিত স্থান। এই সকল স্থানে পযাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ করে উপযুক্ত পর্যায়ে ব্র্যান্ডিং করলে মালদ্বীপ কিংবা শ্রীলঙ্কার ন্যায় বাংলাদেশের পর্যটন খাতও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে বিশাল বড়ো নিয়ামক হবে।

সিরামিক খাত : এ খাতে বাংলাদেশ বেশ সাফল্য দেখিয়েছে। তবে সুযোগ আছে আরও অনেকদূর যাওয়ার। বিশেষত বাংলাদেশের টেবিলওয়ার সিরামিক উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে বেশ সুনাম কুড়িয়েছে। এছাড়া স্যানেটারিওয়ার, ইনসুল্যাটার ও অন্যান্য সিরামিকেও আছে অপার সম্ভাবনা। তবে এ খাতে আরও অধিক সাফল্যের জন্য আরও বেশি টেকনিক্যাল এক্সপার্ট ও স্কিল্ড ম্যানপাওয়ার আবশ্যক।

ইলেকট্রনিক খাত : বাংলাদেশ Semi-conductors প্রস্তুতকরণে একক অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম মোবাইল নেটওয়ার্ক আমাদের দেশে। তাই সময় এসেছে গৃহে ব্যবহার্য জিনিস তথা টেলিভিশন, ডিভিডি ও সিডি প্লেয়ার্স, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার, ওভেন ইত্যাদি নিজেরা প্রস্তুত করার। বাংলাদেশের 'Walton' নামের একটি কোম্পানি ইতোমধ্যে এই খাতে কাজ শুরু করেছে। তবে এ খাতে আরও উন্নতির জন্য স্কিল্ড সহজ প্রশিক্ষণবন্ধ মানবসম্পদ নিশ্চিতকরণ আবশ্যক।

ফ্রোজেনফুড : সারা বিশ্বজুড়ে ফ্রোজেনফুড ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলাদেশেও এ খাতে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত ফ্রোজেনফিস ও শ্রিম্প/প্রোণের ব্যাপক চাহিদা বিশজুড়ে রয়েছে।

ফার্মাসিউটিক্যাল খাত : বাংলাদেশে তৈরি মেডিসিন ভ্যাক্সিন বা জাতীয় ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য সারাবিশ্বে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। তবে সম্ভাবনাময় এ সেক্টরে আরও অধিক উন্নতি সাধনের জন্য পণ্যের অধিক গুণগত মান নিশ্চিতকরণ আবশ্যক। এছাড়া এ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণাকে অধিক পরিমাণে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

বিদ্যুৎ খাত : বাংলাদেশের Power Sector সবে মাত্র উন্নতি করতে শুরু করেছে। এক সময় বাংলাদেশে বিদ্যুতের জন্য আমরা পুরোপুরি সরকারের ওপর নির্ভরশীল ছিলাম। লোডশেডিং আর সিস্টেম–লসে ভরপুর ছিল এ খাত। এখন বেসরকারি উদ্যোগে এই খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে। তবে তা অব্যাহত রাখতে হবে।

অটোমোবাইল খাত : এই খাতটির সাথে তৈরি পোশাকের মিল রয়েছে। সত্তরের দশকে তৈরি পোশাক খাতকে বেশ উচ্চাভিলাষী খাত বলা হতো। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসে এই তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশকে নতুন এক পরিচয় দিয়েছে। ঠিক তেমনি আজ অটোমোবাইল খাতকে অনেকের কাছে উচ্চাভিলাষী মনে হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে নিজস্ব ব্র্যান্ডের গাড়ি প্রস্তুত অবশ্যই সম্ভব।

এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি খাত : এই খাতটি নিঃসন্দেহে উচ্চাভিলাষী খাত। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে স্টিল ইন্ডাস্ট্রির প্রসার ঘটেছে। সুতরাং প্রথমে Unpowerd aircraft Glider plane' এবং পরবর্তীতে Powerd aircraft propeler jet, Rectoreraft' I এক্ষেত্রে কেবল দরকার সাহসী উদ্যোগ।

কনস্ট্রাকশন খাত : দেশের অভ্যন্তরে এই খাতের ব্যাপক প্রসার হয়েছে। এখন সময় এসেছে দেশের বাইরে আমাদের স্থপতি এবং প্রকৌশলীদের মেধাকে কাজে লাগানোর। এতে আমাদের রিয়েল এস্টেট খাত যেমন আন্তর্জাতিক পরিসরে যোগ হবে তেমনি বাংলাদেশের কনস্ট্রাকশন খাত। দেশের ন্যায় বিদেশেও ব্যাপক সুনাম অর্জন করতে পারবে।

উপসংহার : বাংলাদেশের এই অপার সম্ভাবনাময় খাতগুলোর সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ ও বেসরকারি বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনাগুলো হতে পারে একে অন্যের পরিপূরক। কেবল সরকারি উদ্যোগের দিকে তাকিয়ে থাকলেই দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতগুলোকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত করলে অচিরেই আমাদের মাতৃভূমি প্রিয় বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে গৌরবের আসন লাভ করবে।

৮৭. শৃঙ্খলাবোধ

[ব. বো. '০৪]

ভূমিকা : সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি এক অদৃশ্য নিয়মশৃঙ্খলার অধীন। সৌরজগতের গ্রহ–উপগ্রহ থেকে পৃথিবীর গাছপালা, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট ও কঠোর নিয়মশৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত। কোথাও এর সামান্যতম ব্যতিক্রম বা বিপর্যয় নেই। সম্রাট নেপোলিয়নের ভাষায় বলা যায়, "Discipline is the key stone to success which is compulsory to follow to balance the systems." অর্থাৎ, "নিয়মানুবর্তিতা সফলতার মূল চাবিকাঠি যা ব্যবস্থাপনার ভারসাম্য বজায় রাখতে অনুসরণ করা আবশ্যক।" মানবজীবনেও প্রয়োজন সেই কঠোর নিয়মের শাসন। মানুষের জীবনকে সুন্দর করে তুলতে হলে তার জীবনেও শৃঙ্খলাবোধ বা নিয়মানুবর্তিতার দরকার। কারণ শৃঙ্খলাই সৌন্দর্য ও জাতীয় উন্নতির উপায়।

জীবনে শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা : জীবনে শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রথমেই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন থাকা দরকার যে, মানবসমাজ অন্যান্য জীবজন্তু ও প্রাণিকুল সবই বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গ এবং নিয়মশৃঙ্খলার অধীন। প্রকৃতির রাজ্যে যে শৃঙ্খলা বিরাজিত তারই শাসনে মানুষের দেহ–মনে আসে অনিবার্য ক্রমবিবর্তন। কোনো মানুষই সে নিয়মকে অস্বীকার করতে পারে না। শৈশবের শুভলগ্নেই নিয়মানুশীলনের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। মানবজমিনে সোনা ফলাতে হলে চাই নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের বিশ্বস্ত অনুশীলন। কঠিন নিয়মের বাঁধনে বাঁধতে না পারলে পরিবারে ভাঙন ধরে, সমাজ টেকে না, রাষ্ট্র বিপর্যস্ত হয়, প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়ে।

শৃঙ্খলার শ্রেণিবিভাগ : জীবনে শৃঙ্খলাবোধকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়— ১. দেহ গঠনে শৃঙ্খলাবোধ ও ২. মনোগঠনে শৃঙ্খলাবোধ। সুস্থ জীবনে দুটিই সকলের কাম্য। এ সুস্থতার জন্য আমাদের আহার, নিদ্রা, দৈহিক শ্রম ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। আমাদের দেহ অভ্যন্তরীণ আন্ত্রিক প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত। তাই আমাদের দেহকে সুস্থ রাখার জন্য কাজকর্ম, আহার ও নিদ্রার মধ্যে শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতা একান্ত প্রয়োজন।

সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা : প্রতিটি কর্মানুশীলনের আছে একটি বিশেষ ধারাক্রম, যার নাম ছন্দ। সেই ছন্দই শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতা, সেই ছন্দই সাফল্যের পুরোহিত। শৈশব থেকে মানুষকে সমাজে বিচরণ করতে হয়, গ্রহণ করতে হয় নানা সামাজিক দায়িত্ব। কিন্তু সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি খেয়ালখুশি মতো যথেচ্ছাচার শুরু করে, তাহলে সমগ্র সমাজটাই উচ্ছৃঙ্খলতার উন্মাদাগারে পরিণত হবে। অবিশ্রান্ত সংঘর্ষে মানবজীবনের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।

পারিবারিক জীবনে শৃঙ্খলা : পরিবার সমাজের এক–একটি ক্ষুদ্র পঙ্‌ক্তি। পারিবারিক শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে সামাজিক শৃঙ্খলা আসে। তাই পরিবারের সদস্য হিসেবে প্রতিটি মানুষের উচিত পারিবারিক নীতিকে গুরুত্ব দেওয়া, যা মানুষের জীবনে সামগ্রিকভাবে শৃঙ্খলা এনে দেয়।

ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা : ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ছাত্রজীবনই নীতিচেতনা–নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ অনুশীলনের প্রকৃষ্ট সময়। অল্প বয়সে ছাত্রদের মানসিক বৃত্তিসমূহ কোমল থাকে, বলা যায় এক থলে কাদার মতো। কাদামাটি থেকে যেমন দক্ষ শিল্পী সুন্দর মূর্তি নির্মাণ করতে পারেন তেমনই উপযুক্ত নীতিনিয়মে শৃঙ্খলা রক্ষায় ছাত্রও উপযুক্ত হয়ে ওঠে— হয়ে ওঠে প্রকৃত মানুষ। প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্খলাবোধ জীবন বিকাশের উজ্জীবনী মন্ত্র এবং ছাত্রকাল থেকেই জীবন উপযুক্তরূপে গঠিত হতে থাকে। তাই অধ্যয়নকক্ষে পাঠ ও গঠনক্ষেত্রে প্রাত্যহিক জীবনচর্চায় ছাত্রদেরও নিয়ম–শৃঙ্খলা কঠোরভাবে অনুশীলন করতে হবে। সব ছাত্র হয়তো মেধাবী নয়, অর্থসামর্থ্যও সকলের বেশি থাকে না— কিন্তু ছাত্র যদি নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাপন করে, শিক্ষাক্ষেত্রে যদি উপযুক্ত শৃঙ্খলা মেনে চলে, জীবনযাপনেও যদি তার প্রয়োগ ঘটায়; তবে ছাত্র ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ নাগরিক, শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকরূপে গড়ে উঠতে পারে।

শৃঙ্খলা ও মানবসমাজের উন্নতি : মানবসভ্যতার বর্তমান চরম বিকাশের মূলেও আছে মানুষের সুশৃঙ্খল ও সুসংহত কর্মোদ্যোগ। যেখানে শৃঙ্খলা নেই, সেখানে শ্রী নেই, কল্যাণ নেই, আনন্দ নেই, শান্তি নেই। সুশৃঙ্খল জাতির ভাগ্যে জোটে সাফল্যের জয়টিকা এবং উচ্ছৃঙ্খল জাতির ভাগ্যে জোটে পরাজয়ের দুঃসহ গ্লানি। আমাদের অর্থনৈতিক জীবনকেও সুষ্ঠুভাবে চালনার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক শৃঙ্খলাবোধ। পরিমিত ব্যয় এবং আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা না থাকলে শৃঙ্খলাবোধহীন বেহিসাবি মানুষ জীবনে নানা দুঃখ–দুর্দশার সম্মুখীন হয়।

শৃঙ্খলার গুরুত্ব : ব্যক্তিগত, দৈহিক, নৈতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সর্বক্ষেত্রে উন্নতির জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন আবশ্যক। স্বাস্থ্যরক্ষায় নিয়ম ভঙ্গ করলে দেহ রোগাক্রান্ত হতে বাধ্য। আত্মসংযমে অসমর্থ হলে মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়বেই। এর ফলে নৈতিক চরিত্রের অবনতি অনিবার্য। বিক্ষিপ্ত মনকে যদি শৃঙ্খলার শাসনে বাঁধতে পারা না যায়, তবে বিদ্যাচর্চা করা কীভাবে সম্ভব? কাজেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতার চর্চা করতে হবে। প্রয়োজনীয় বিধিবিধান না মানলে সুন্দর জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কল্যাণমুখী সুন্দর জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতার গুরুত্ব অপরিসীম।

উপসংহার : মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যথাযথ শৃঙ্খলাবোধ থাকা প্রয়োজন। শৃঙ্খলাহীন জীবন হালছাড়া নৌকার মতো। যাকে বলে নীতিহীন জীবন। শৃঙ্খলাবোধের মাধ্যমে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেই শুধু নয়, জাতীয় জীবনে তথা সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রে লাভবান হতে পারব, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

৮৮. আমার জীবনের লক্ষ্য
অথবা, জীবনের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
অথবা, আমার যা হতে ও করতে ইচ্ছে করে *[সি. বো. '১৭]*

ভূমিকা : কোনো না কোনো একটি লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই মানবজীবন আবর্তিত হচ্ছে। আমি যখন ভাবতে বসি, 'আমার জীবনের লক্ষ্য কী, তখন আমার কিশোর মনে নিত্যনতুন আশা দেখা দেয়। যখন নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের সংগীতগুলো আমার মন–প্রাণকে পুলকে আচ্ছন্ন করে। তখন মনে হয়, একজন কবির জীবনই ধন্য, তাই কাব্যসাধনাই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য; আবার যখন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর বাহাদুরির কথা চিন্তা করি, তখন একজন বিজ্ঞানী হয়ে রহস্য সন্ধানের জন্য মন–প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আবার একজন দেশপ্রেমিকের অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ, দেশমাতৃকার সেবায় অকাতরে জীবনোৎসর্গের বিষয় যখন চিন্তা করি তখন স্বদেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার জন্য মনপ্রাণ আকুলি–বিকুলি করে। আত্মীয়স্বজনের আর্থিক দুঃখ–দৈন্য দেখলে মন চায় যেকোনো উপায়েই হোক অর্থোপার্জন করে তাদের এই নিদারুণ দুঃখ দূর করি। আবার কখনোবা কোনো কৃতকর্মা উকিল, ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তারের অতুল ঐশ্বর্যের প্রতি চেয়ে এদের যেকোনো একটি বিষয় অবলম্বন করে আমার জীবনও সার্থক করতে ব্যাকুল হয়ে পড়ি। এরূপ শতসহস্র বাসনা আমার তরুণ চিত্তকে সর্বদা উদ্‌ভ্রান্ত করে রাখে। কী যে আমার প্রকৃত বাসনা, তা উদ্ভাবন করতে পারলাম না।

এত কিছু ভাবনা–চিন্তা করেও পণ্ডিতমূর্খ হয়ে রইলাম। মনে পড়ল যে সমাজে, যে পল্লিতে আমার জন্ম সেখানকার মানুষের অবস্থা। বন্যার প্লাবনে তাদের শস্য সম্পদ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। রোগ–শোক, ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে তারা জর্জরিত। গ্রামের দু–চারজন বিত্তশালী ব্যক্তি পদে পদে অর্থের জোরে তাদের ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নেয়; অথচ কারও বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সামর্থ্য তাদের নেই।

শিক্ষার অভাবে আমার প্রতিবেশীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, রাজশক্তি কর্তৃক ঘৃণিত, শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক অবহেলিত, জগতের সুসভ্য মানব সমাজে নগণ্য। কেবল শিক্ষার অভাবেই তাদের সঙ্গে বাহ্য জীবনের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি; শিক্ষার অভাবেই তারা উন্নত ও সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পারেনি; শিক্ষার অভাবে তারা মানুষ হিসেবে তাদের মর্যাদা বুঝতে পারেনি।

আমার পরিকল্পনা : তাদের এ চরম দুর্দশার কথা চিন্তা করে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, আমার জীবনের মূলমন্ত্র হবে এ অশিক্ষিত তমসাচ্ছন্ন গ্রাম্য লোকদের মধ্যে শিক্ষার আলোক–শিখা প্রজ্বলিত করে দেওয়া। আমার একক–জীবনের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা দ্বারা হয়তো আমি এ বিষয়ে বিরাট রকম সাফল্য দেখাতে পারব না; কিন্তু আমার প্রতিটি শিষ্যকে আমারই ব্রতে অনুপ্রাণিত ও দীক্ষিত করে যেতে পারলে আশা আছে, একদিন আমি সমাজের বরণীয় ও স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারব। আমার শিক্ষা ও অনুপ্রেরণায় এ অজ্ঞ ও মূর্খ সমাজ হতে বহু উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিদ জন্মলাভ করে সমাজের মুখোজ্জ্বল করতে পারবে এবং অনুন্নত ও অবহেলিত সমাজকে আরও উন্নত ও গৌরবান্বিত করে তুলতে সমর্থ হবে।

এই সিদ্ধান্তে দৃঢ়সংকল্প হয়ে আমার নিজ গ্রামের জনসাধারণকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও মর্যাদা সম্বন্ধে বোঝাতে লাগলাম। ধীরে ধীরে আমার চেষ্টা সাফল্যের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আমরা সকলে মিলে গ্রামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলাম। এ বিদ্যালয়ে আমি অবৈতনিক প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে লাগলাম।

আমার এরূপ পরিকল্পনায় আমার পিতা–মাতা, আত্মীয়স্বজনসহ আরও অনেকে অসন্তুষ্ট হলেন। বন্ধুদের কেউ কেউ আমাকে পাগল বলে অভিহিত করল। পিতা–মাতা মনে করতেন, আমি একজন জাঁদরেল প্রকৌশলী হয়ে বেশি পরিমাণ টাকাপয়সা রোজগার করব। আত্মীয়স্বজনেরা আশা করতেন, আমার বদৌলতে কনট্রাক্টরি করে দু–পয়সা করতে পরবেন। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করত জজ হব, কেউ কেউ মনে করত রাজনৈতিক নেতা হব। কিন্তু তাদের সকল আশায় গুড়েবালি হলো।

পরীক্ষায় সাফল্য : ইতোমধ্যে আমার বিএ অনার্স পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলো, আমি প্রথম শ্রেণি পেয়ে কৃতকার্য হয়েছি। অধ্যাপকদের শুভাশিস পেলাম। তাঁরা আমার জন্য রিসার্চ স্কলারশিপের ব্যবস্থা করবেন বলে লিখেছেন। কিন্তু আমার নিজ গ্রামের লোকদের অজ্ঞতা দূরীকরণের রিসার্চ গ্রহণ করলাম।

উপসংহার : আমার বিগত ১২ বছরের অক্লান্ত সাধনায় সে ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টি এখন একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। সহস্রাধিক ছাত্র তা দ্বারা অজ্ঞতা দোষমুক্ত হয়েছে। প্রত্যেক বিদায়ী ছাত্রই আমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে যে, ভবিষ্যতে তারা দেশের অজ্ঞতা দূরীকরণে সচেষ্ট হবে। আমার বিশ্বাস, তাদের প্রচেষ্টায় দেশ হতে অজ্ঞতা দূরীভূত হবে। আমার স্বপ্ন সার্থক হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশ সংরক্ষণ

৮৯. সুনামি
অথবা, ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় : সুনামি

ভূমিকা

এমন অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্তন আমরা লক্ষ করি যা মানবজীবনে নিয়ে আসে ধ্বংসলীলা আর দুর্বিষহ মৃত্যু। এসব প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— ভূমিকম্প, বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, দাবানল, অগ্যুৎপাত ইত্যাদি। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। এসব দুর্যোগের কবলে পড়ে বহু লোক তাদের মূল্যবান জীবন দিয়েছেন, দিচ্ছেন এবং দেবেন—এটাই সত্য। কিন্তু গত ২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের মানুষগুলো নতুন এক অভিজ্ঞতা লাভ করে; যার নাম সুনামি। এর ধ্বংসযজ্ঞ এতটাই ভয়নাক ছিল যে, এখনো এ অঞ্চলের মানুষের কাছে এক ভয়ংকর আতঙ্কের নাম সুনামি।

সুনামি কী : 'সুনামি' জাপানি শব্দ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো— Tsunami। থাইল্যান্ডে স্থানীয়ভাবেই ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসকে সুনামি বলা হয়। সুনামি হচ্ছে সমুদ্র তলদেশে তৈরি ভূকম্পন থেকে সৃষ্ট ঢেউ। এই ঢেউয়ের গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ৮০০ কি.মি. পর্যন্ত হতে পারে। পানির নিচে ঢেউ সৃষ্টির বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অভিমত হচ্ছে— ভূমিকম্প সৃষ্টি হওয়ার সময় ভূ–অভ্যন্তর থেকে প্রচণ্ড জ্বালানি বা শক্তি উদ্‌গিরণ হয় এবং নির্গত শক্তি ভূকম্পনকেন্দ্র থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যদি পানির নিচে ভূকম্পন হয় তাহলে এই শক্তি পানিকে আলোড়িত করে। এই আলোড়নের ফলে বিশাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হয় সবচেয়ে বেশি। গত ডিসেম্বর ২০০৪ সালের সুনামি ছিল অত্যন্ত বিভীষিকাময়।

সুনামির ধ্বংসযজ্ঞ : ২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে শতাব্দীর ভয়াবহ ভূমিকম্পের প্রভাবে যে সুনামির সৃষ্টি হয় তা বিশ্ববাসীকে মহাপ্রলয়ের বিভীষিকা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর প্রভাবে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের ১৩টি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯০০ সালের পর বিশ্বের পঞ্চম ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে এই সুনামির সৃষ্টি হয়। এর ফলে প্রায় ৩৩ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসের কবলে পড়ে লাখো মানুষ। প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে এর ফলে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পর্যটকও ছিল। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইন্দোনেশিয়ার বান্দা আচেহ প্রদেশ, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ভারত, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ ও মিয়ানমার উপকূলীয় এলাকা। থাইল্যান্ডের সমুদ্রসৈকত 'ফুকেটে' সুনামির তোড়ে সাগরবক্ষে ভেসে যায় অধিকাংশ পর্যটক। ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কোনো কোনো এলাকা জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডবে বিরানভূমিতে পরিণত হয়। প্রচণ্ড ও ব্যাপক এ ভূমিকম্প এশিয়া ছাপিয়ে আফ্রিকাকেও নাড়িয়েছে। কেঁপে উঠেছে আফ্রিকার সোমালিয়া, সিসিলি, কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়া প্রভৃতি দেশও। সুনামির থাবায় বিধ্বস্ত নগর–জনপদগুলো পরিণত হয়েছে বিরান প্রান্তরে। আর্তমানবতার পাশে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে পাশে দাঁড়িয়েছে বিশ্বসমাজ।

সুনামি সম্মেলন : সুনামিতে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের পর সুনামিসংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায়। জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান সুনামি বিধ্বস্ত ইন্দোনেশিয়ার বান্দা আচেহ প্রদেশ পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "মাইলের পর মাইল এমন ধ্বংসযজ্ঞ আমি জীবনে দেখিনি।"

সুনামিতে করণীয় : সুনামি এমন ধরনের এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। বরং তা থেকে আত্মরক্ষার কৌশলগুলোই আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে আমাদের উপকূলীয় লোকদের সচেতন করতে হবে। সুনামির পূর্বাভাস ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সর্বোপরি পরিবেশ দূষণের মাত্রা হ্রাস করতে হবে। তাহলেই কিছুটা হলেও এর ভয়ংকর আক্রমণ থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। তাছাড়া আন্তর্জাতিকভাবেও এর সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালানো জরুরি।

পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ : বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল পুরোটাই সাগরের কাছে অবস্থিত। তাই সুনামির সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়ার অবকাশ নেই। গত ২৬শে ডিসেম্বর ২০০৪ সালের সুনামির প্রভাব বাংলাদেশে তুলনামূলক না পড়ার কারণ ছিল ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। কেননা, এখানে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণেই ঢেউ বাংলাদেশে আছড়ে পড়েনি। তাই এ ব্যাপারকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। আমাদেরকে এখনি সুনামির সংবাদ প্রচারের জন্য কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার মতো সুনামি মোকাবিলার জন্যও তাদেরকে সচেতন করতে হবে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগকে অবহেলা করার সুযোগ নেই। তাই এখনই আমাদের উচিত এর প্রতিরোধকল্পে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ ব্যাপারে সরকারের একটি নীতিমালা দাঁড় করানো উচিত।

৯০. বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা ও প্রতিকার
অথবা, শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যা
অথবা, বাংলাদেশের বন্যা

ভূমিকা

বাংলাদেশ নদীবহুল দেশ। কাজেই বর্ষা ঋতুতে এই নদীগুলো যখন জলোচ্ছ্বাসে গ্রাম ও নগর ভাসিয়ে ফসল নষ্ট করে অগ্রসর হয়, তখন আতঙ্কে দিন গণনা করতে হয়। এটা বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে এক অভিশাপবিশেষ।

বন্যার স্বরূপ : বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা দেখা দেয়। বন্যার রূপও বড়ো ভয়ংকর। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। গাছপালা ঘরবাড়ির চিহ্ন দেখা যায় না। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে জলস্ফীতি দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে নদ–নদীতেও প্লাবন আসে। বর্ষা আর প্লাবনের এই অস্বাভাবিক অবস্থাই বন্যা। পানিতে ভেসে যায় ঘরের চালা, পশুর মৃতদেহ আর মানুষের গলিত শবদেহ। বাংলাদেশে প্রতিবছর বন্যার ফলে কোনো না কোনো অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে দেশে অর্থনৈতিক অবস্থার চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়।

বন্যার কারণ : বন্যার কারণ নানাবিধ। **প্রথমত**, অতিবর্ষণের ফলে পানি নদ–নদী, খাল–বিল, ডোবা–নালা, মাঠ–প্রান্তর ছাপিয়ে গ্রামান্তরে প্রবেশ করে। **দ্বিতীয়ত**, হিমালয় পর্বতের তুষার রাশি গলিত হয়ে নিম্নভূমির দিকে ধাবিত হয় এবং এটা নদীতে মিশে বন্যার আকার ধারণ করে। কেউ কেউ অনুমান করেন, আসামের প্রবল ভূমিকম্প বাংলাদেশের বন্যার একমাত্র কারণ। ভূতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেছেন, আসামের বিগত ভূমিকম্পের ফলে বাংলাদেশের নদীগুলোর তলদেশ অনেকখানি উচ্চতাপ্রাপ্ত হয়েছে। বিগত কয়েক বছর নদীগর্ভে কোনো সংস্কার সাধিত হয়নি। তার ফলে নদীগর্ভ ভরাট হয়ে চলেছে। বন্যা হলে পানি নদীনালা ছাপিয়ে লোকালয়ে প্রবেশ করে। পূর্বে নদীগর্ভগুলোর সংস্কার সাধিত হতো; তখন বন্যা এমন মারাত্মক আকার ধারণ করত না।

১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৫৮, ১৯৬৪, ১৯৭০ ও ১৯৭৪ সালের বন্যা মানুষের মনে এখনো বিভীষিকারূপে বিরাজ করছে। ১৯৮৭ সালের বন্যার ধাক্কা সামলিয়ে না উঠতেই আবার ১৯৮৮ সালে ব্যাপক আকারে সারাদেশব্যাপী বন্যা প্রলয়ংকরী রূপ নেয়। প্রকৃতপক্ষে বন্যা যেন আমাদের দেশে একটি নিয়মিত দুর্যোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবছর হাজার হাজার বাড়িঘর নষ্ট হচ্ছে, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, বিপুল প্রাণহানি ঘটছে; এদিক দিয়ে দেশের আর্থিক ক্ষতিও ব্যাপক। ১৯৮৮ সালের বন্যা সর্বগ্রাসী হয়েছিল। পানি রাজধানী ঢাকা শহরে প্রবেশ করেছিল। হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে আরম্ভ করে শহরের নানা অভিজাত এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা, শিল্প এলাকা প্লাবিত হয়েছিল।

দেশি ও বিদেশি বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, বাংলাদেশের বন্যা বহুমুখী ও ভয়াবহ। এর কারণও অনেক। ১৯৮৮ সালের বন্যা ছিল স্মরণাতীতকালের মধ্যে ভয়াবহ। এই বন্যার ভয়ালমূর্তি ও ভয়াবহতার মোকাবিলায় ঢাকা ও এর নিকটবর্তী অঞ্চলের মানুষজন এবং দেশের অন্য প্রান্তরের জনগণ সাহস ও আত্মপ্রত্যয় দেখিয়ে ঐক্যের পরিচয় দিয়েছিল। ১৯৮৮ সালের সর্বনাশা বন্যায় পাঁচ কোটি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

বন্যায় দুর্ভোগ : আষাঢ়–শ্রাবণ এ দুই মাস বর্ষাকাল। আষাঢ়ের শুরু হতেই সমস্ত আকাশ মেঘাবৃত থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বারিপাত আরম্ভ হয়। বর্ষার প্রারম্ভেই আসাম ও পরে উত্তর বাংলা বন্যায় প্লাবিত হয়। তন্মধ্যে পাবনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, সিলেট, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বন্যা ভীষণ আকার ধারণ করে। বর্ষার পানি ক্রমশ স্ফীত হয়ে নদ–নদী, ডোবা–নালা, রাস্তা–ঘাট, বন–জঙ্গল, খেত–খামার পানিতে ভাসিয়ে দেয়; পরে বাসগৃহও জলমগ্ন হয়ে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। কারও ঘর ভেঙে পড়ে, বেড়া ভেসে যায়; ভেড়া, গোরু, মহিষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। বন্যার ফলে কত যে পাকা ধানের খেত, পাটের খেত সমাধিপ্রাপ্ত হয় তার ইয়ত্তা নেই। গরিব কিষান–কিষানি খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না। তারা খাদ্যাভাবে অস্থিচর্মসার হয়ে পড়ে। বন্যার ফলে গৃহস্থের দুর্দশা হয় অবর্ণনীয়।

বন্যার কবলে পড়ে সাপে–মানুষে একসঙ্গে বাস করে। জন্তু–জানোয়ারগুলো উঁচু ডাঙ্গায় আশ্রয় নেয়। বন্যায় বহু প্রাণী পানিতে ডুবে মরে। কোনো কোনো স্থানে শিশু মায়ের কোল হতে গড়িয়ে পড়ে মারা যায়; কেউবা মৎস্যের ঝাপটানি ভেবে নিজের পুত্রের বুকে বর্শা বিদ্ধ করে।

সরকারি ও বেসরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা : বন্যার কবলে পড়ে বহু লোক প্রাণ হারায়। যারা বেঁচে থাকে, তারা অর্ধাহারে, অনাহারে কঙ্কালসার হয়ে পড়ে; কতজন অখাদ্য আহার করে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করে। তার পরিণাম হয় নিদারুণ। দেশে মহামারির হিড়িক পড়ে। ওই সকল এলাকায় সাহায্যের জন্য নানা দেশের মেডিক্যাল মিশন, রেডক্রস মিশন আসে। তারা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। সংক্রামক ব্যাধি যাতে মহামারিরূপে দেখা দিতে না পারে সেজন্য সরকারি ও বেসরকারি

প্রতিষ্ঠানগুলো হতে ওষুধ ও ইনজেকশন বিতরণ করা হয়। তারা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে বিভিন্ন উপায়ে অর্থ সংগহ করে ও বন্যাপীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা : বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নদীর ওপর বাঁধনির্মাণ করে স্থানে স্থানে বিশাল জলাধারের সাহায্যে বন্যাকে প্রতিরোধ করা হয়েছে। প্রবল বারিপাতের ফলে নদীর পানি স্ফীত হয়ে গড়িয়ে পড়ে। সে জলধারাকে যদি বিশাল জলাধারে সঞ্চিত করে রাখা হয়, তবে বন্যাকে প্রতিরোধ করা যায়। পক্ষান্তরে গ্রীষ্মকালে সে সঞ্চিত পানি কৃত্রিম খালের সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রে দেওয়ার জন্য সুবন্দোবস্ত করা হয়। এটাও সত্য যে বহুকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের নদীগুলোর কোনো সংস্কার সাধন করা হয়নি; সেজন্য বর্ষার প্রারম্ভেই তা ভরাট হয়ে প্লাবনের সৃষ্টি হয়। আধুনিক 'ড্রেজার মেশিন' দ্বারা এর সংস্কার সাধন করা যেতে পারে। বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধন করতে হলে সার্ক অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজন। জাতিসংঘ ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের বন্যা সমস্যার সমাধানে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। জাতিসংঘ দুর্যোগ ত্রাণ সংস্থার প্রধান মি. ইসাফী বন্যার সময় বন্যার ভয়াবহতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য এদেশে আসেন। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্ব ব্যাংক ও আই.এম.এফ বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, জাপান, ইতালি, ইরাক, সৌদি আরব এবং অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলো বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা সমাধানে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের কর্মপ্রয়াস যতই ব্যাপকতর হোক না কেন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ সূত্রটি কিন্তু আমাদের আয়ত্তে নেই। নিয়ন্ত্রণের উৎসমূল রয়েছে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে— ভারত, নেপাল, ভুটান ও চীনে। সরকারি পর্যায়ে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে ২৬ দফা কর্মসূচি তৈরি করা হয়েছে ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এর বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উপসংহার : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে মানুষের বুদ্ধি ও শক্তি নিতান্তই সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাই বলে এই বৈজ্ঞানিক যুগে দৈবের ওপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। তার প্রতিরোধের উপযুক্ত চেষ্টা করতে হবে। তবেই আমাদের দেশ বন্যা ও প্লাবনের হাত হতে রক্ষা পাবে। লাখো নর–নারীর বেদনাঘন মন আনন্দে ভরে উঠবে। সুখ–শান্তিতে তারা বাস করতে পারবে। দেশ ধনধান্যে পুনরায় ভরে উঠবে।

৯১. ভূমিকম্প
অথবা, ভূমিকম্প ও বাংলাদেশ
অথবা, ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে বাংলাদেশ

ভূমিকা

ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূপৃষ্ঠে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। পৃথিবীতে এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে ভূমিকম্প হয় না। প্রতিনিয়ত পৃথিবীর সর্বত্রই ভূমিকম্পের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ভতত্ত্ববিদগণের মতে প্রতি আড়াই ঘণ্টায় একবার ভূমিকম্প হয়। তবে সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প হয় জাপানে। ভূপৃষ্ঠে দ্রুত ও আকস্মিক পরিবর্তন সাধনকারী প্রক্রিয়ার মধ্যে ভূমিকম্প অন্যতম। সাধারণ ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫ থেকে ৭০০ কি.মি. গভীরে এ রকম কম্পনের সৃষ্টি হয়। এগুলোর মধ্যে প্রায় প্রতি ৫০০টিতে একটি মারাত্মক আকার ধারণ করে। ভূকম্পনের মাত্রা নিরূপণের জন্য সাধারণত রিখ্টার স্কেল ব্যবহৃত হয়। ৮ মাত্রার কোনো ভূমিকম্প সবকিছু ধুলায় মিশিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ভূমিকম্প কী : কোনো প্রাকৃতিক কারণবশত কখনো কখনো ভূত্বক আকস্মিকভাবে কেঁপে ওঠে। ভূত্বকের এ কেঁপে ওঠাকে ভূমিকম্প বলা হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোনো এক স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। ভূ–অভ্যন্তরে যে স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়, তাকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র বলে। আর কেন্দ্রের ঠিক ওপরে ভূপৃষ্ঠের বিন্দুকে উপকেন্দ্র বলে। ভূমিকম্পের কেন্দ্র সাধারণত ভূপৃষ্ঠ থেকে অভ্যন্তরে ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। উল্লেখ্য, কম্পন বা আন্দোলন কেন্দ্র থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কম্পনবেগ কেন্দ্র থেকে উপকেন্দ্রে বেশি অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে W.G. Moore বলেছেন, "ভূমিকম্প হলো ভূত্বকের আন্দোলন বা কম্পন, যা সাধারণত ভূপৃষ্ঠের নিচে উৎপত্তি লাভ করে।"

ভূমিকম্পের কারণ : আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্যুৎপাতের কারণে ভূমিকম্প হয়। অগ্যুৎপাতের কারণে সৃষ্ট ভূমিকম্প অগ্যুৎপাতের প্রকৃতির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। জীবন্ত বিস্ফোরক আগ্নেয়গিরি থেকে বিস্ফোরণ ঘটলে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বিরামহীন

ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এছাড়া ভূ–আন্দোলন, ভূপৃষ্ঠের চাপবৃদ্ধি, তাপ বিকিরণ, ভূগর্ভে পানির পবেশ, বিস্ফোরণ, শিলাচ্যুতি ইত্যাদি কারণেও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের ভূমিকম্পের অশনিসংকেত : বাংলাদেশে ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর এবং আমেরিকান ভূতাত্ত্বিক জরিপ ও ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক জরিপের বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, বাংলাদেশ বর্তমানে ভয়াবহ ভূমিকম্পের মুখোমুখি। বৃহত্তর চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলে কিছুদিন যাবৎ ঘন ঘন মৃদু কম্পনের যেসব ভূমিকম্প হচ্ছে, সেগুলোকে বড়ো ধরনের ভূমিকম্পের ইঙ্গিতবহ বলে মনে করেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। চট্টগ্রামে যে ভূমিকম্পগুলো রেকর্ড হচ্ছে, সেগুলোর দুশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে, মধ্যে কিছুদিন আগে রংপুর অঞ্চলে সংঘটিত ৫.২ মাত্রায় ভূমিকম্পটি। কারণ এর উৎপত্তিস্থল তিস্তাচ্যুতি। এই চ্যুতিটি এ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বিপর্যয়কর ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল।

বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত ভূমিকম্প : গত এক দশকে বাংলাদেশে ২০১টি ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। বাংলাদেশে সংঘটিত বিভিন্ন সময় ভূমিকম্পের যে মাত্রা নির্ণয় করা হয়, তা নিম্নরূপ—

ভূমিকম্প অঞ্চল	সাল	মাত্রা (রিখ্টার স্কেলে)
চট্টগ্রাম	১৯৯৭	৬.৬
মহেশখালী	১৯৯৯	৫.২
ঢাকা	২০০১	৪.৮
ঢাকা	২০০২	৫.৫
সমগ্র বাংলাদেশ	২০১৫	৬.৪
সিলেট	২০১৭	৪.৯
ঢাকা	২০১৮	৩.৪
সিলেট	২০১৯	৪.৫
ঢাকা	২০১৯	৪.০০

বাংলাদেশের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা : বাংলাদেশ হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। তাই যেকোনো সময় বড়ো ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে। গবেষকরা বলেছেন, এ ভূকম্পনের ফলে মুহূর্তের মধ্যে বিপন্ন হতে পারে কয়েক লাখ মানুষের জীবন। ভূকম্পনের মাত্রানুযায়ী বাংলাদেশকে তিনটি এলাকা বা জোনে ভাগ করা হয়েছে। যথা : (ক) মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা; (খ) মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ও (গ) কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা।

(ক) **মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা :** রিখ্টার স্কেলে মাত্রা ৭। এই এলাকা দেশের উত্তর ও উত্তর–পূর্বাঞ্চল নিয়ে গঠিত। বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুরের পূর্বাঞ্চল, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই এলাকার আওতাভুক্ত।

(খ) **মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা :** রিখ্টার স্কেলে মাত্রা ৬। পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী, রংপুরের উত্তর–পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ, জয়পুরহাট, নওগাঁ, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলা এই এলাকার আওতাভুক্ত।

(গ) **কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা :** রিখ্টার স্কেলে মাত্রা ৫। এই এলাকা দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পশ্চিম অঞ্চল নিয়ে গঠিত। মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, যশোর, বরিশাল, ঝালকাঠি, ভোলা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চল এই এলাকার আওতাভুক্ত।

ভূমিকম্পের সময় করণীয় : মাত্র এক মিনিটের মধ্যে সংঘটিত হতে পারে ভূমিকম্প, ঘটে যেতে পারে হাজারো মানুষের মৃত্যু। তবে একটু সতর্ক হলে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি থেকে অনেকটা নিরাপদে থাকা যায়। এ সময় কোন অবস্থানে থাকলে কী করতে হবে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো—

(ক) **বাড়িতে থাকলে :** ভূমিকম্পের সময় বাড়িতে থাকলে দ্রুত বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাই শ্রেয়। এ সময় গ্যাসের চুলা, হিটার ইত্যাদি বন্ধ রাখা এবং ঘরের দরজা বন্ধ থাকলে দ্রুত খুলে দেওয়া উচিত। কেননা ঘরের ওপরের অংশ ভেঙে পড়লে বের হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

(খ) **বাড়ির বাইরে থাকলে :** ভূমিকম্প অবস্থায় বাইরে থাকলে বড়ো বড়ো বৃক্ষ বা দালানকোঠার নিচে দাঁড়ানো উচিত নয়। কেননা বৃক্ষ বা দালানকোঠা ভেঙে ওপরে পড়তে পারে অথবা বৃক্ষের শাখা বা জানালার কাচ ভেঙে শরীরের বিভিন্ন অংশ

ক্ষত-বিক্ষত হতে পারে। এমতাবস্থায় খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকলে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

(গ) **লিফটের ভেতরে থাকলে :** ভূমিকম্পের সময় লিফটের ভেতর থাকলে এবং তা ঊর্ধ্বমুখী হলে প্রথম যে তলায় বিরতি নেবে, সেখানেই নেমে যাওয়া উচিত। আবার নিম্নগামী হলে দ্রুত নিচে নামার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু লিফটের ভেতরে আটকে পড়লে লিফট রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তাকে না পাওয়া গেলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। তবে ভূমিকম্প বা অগ্নিকাণ্ডের সময় লিফট ব্যবহার না করাই উত্তম।

(ঘ) **ট্রেন বা গাড়ির ভেতরে থাকলে :** ট্রেনে বা গাড়িতে থাকাবস্থায় ভূমিকম্প শুরু হলে সিট বা অন্য কিছু ধরে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত, যাতে ট্রেন বা গাড়ি হঠাৎ থেমে গেলে বা পড়ে গেলে আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে।

(ঙ) **পাহাড় বা সৈকতে থাকলে :** ভূমিকম্পের সময় পাহাড় বা সৈকতে থাকলে দ্রুত সে এলাকা ত্যাগ করা উচিত। কারণ এ সময় পাহাড় ধসে পড়তে পারে। আর উপকূলীয় এলাকায়ও প্রাণনাশের ভয় থাকে।

(চ) **মার্কেট, সিনেমা হলে কিংবা আন্ডারগ্রাউন্ড শপিং মলে থাকলে :** ভূমিকম্পের সময় মার্কেট, সিনেমা হলে কিংবা আন্ডারগ্রাউন্ড শপিং মলে থাকলে ভবন কর্তৃপক্ষ, কর্মচারী কিংবা নিরাপত্তাকারীদের সাহায্য নেওয়া উচিত।

উপসংহার : প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটি ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের ফলে মুহূর্তের মধ্যে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ভূমিকম্প এমনই এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা মানুষ মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে। ভূমিকম্পের মাত্রা নিরূপণ, পরীক্ষা এবং এ সম্পর্কে গবেষণার জন্য চট্টগ্রামের আমবাগানে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সরকার ঢাকা, সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী, খুলনা প্রভৃতি অফিসে চট্টগ্রামের মতো উন্নত প্রযুক্তি নির্মাণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কম হবে বলে আশা করা যায়।

৯২. সিডর
অথবা, প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডর

ভূমিকা

সবুজ-শ্যামল, সুন্দর এই পৃথিবীর মানচিত্রে ছোট্ট একটি দেশ বাংলাদেশ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে লাল-সবুজের এই দেশটি সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের লীলাভূমি হিসেবে আখ্যায়িত। প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেশি আক্রান্ত হয়। ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান এমন এক জায়গায় যে, নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন এ দেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশটি নদীবাহিত পলিমাটিতে তৈরি একটি বদ্বীপ-বিশেষ। শত শত নদ-নদী বয়ে গেছে এ দেশের ওপর দিয়ে। তার ওপর এ দেশের দক্ষিণাংশ জুড়ে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। ফলে সাগরে ঝড় উঠলেই প্রবল দক্ষিণা হাওয়ার তোড়ে সমুদ্রের লোনা পানি উঁচু হয়ে পড়ে নিচু উপকূলে। এতে সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বন্যা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, টর্নেডো, সাইক্লোন—তার সঙ্গে নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাস ও জমিতে লবণাক্ততার আক্রমণ— এসব প্রায় প্রতিবছর লেগেই আছে। এমনি নানা দুর্যোগ এ দেশের মানুষের জীবনকে, তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নকে তছনছ করে দেয়। তেমনই একটি ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'। যা স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়।

সিডরের তাণ্ডবলীলা : ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাতেই প্রলয়ংকরী সিডরের আঘাতে লন্ডভন্ড হয়ে যায় দেশের বিস্তীর্ণ উপকূলবর্তী অঞ্চল। দেশের অভয়ারণ্য বলে খ্যাত খুলনার সুন্দরবন এলাকা থেকে শুরু হয়ে বরিশাল, পটুয়াখালী, কক্সবাজারসহ উপকূলবর্তী প্রায় ১৫টি জেলা এই তাণ্ডবের শিকার হয়। রাত ৯টার দিকে ঘূর্ণিঝড়টি ২৪০ থেকে ২৮০ কিলোমিটার রূপ নিয়ে দুবলারচর, হিরণপয়েন্ট, বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ভোলা, লক্ষ্মীপুর, সাতক্ষীরা, ঝালকাঠি, যশোরসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলবর্তী এলাকাগুলোতে আঘাত হেনেছিল। ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত, জোয়ারের তাণ্ডব আর সেসঙ্গে প্রবল বর্ষণে পুরো এলাকায় নেমে আসে মহাবিপর্যয়। বাতাসের প্রচণ্ড ঝোড়োগতিতে হাজার হাজার কাঁচা ও আধাপাকা টিনের বাড়ি, স্কুলঘরের চালা কাগজের মতো উড়তে থাকে। শত শত মাছ ধরার ট্রলার জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে হারিয়ে যায়। চারদিকে শুরু হয় অসহায় মানুষের আর্তচিৎকার। বাড়িতে বাড়িতে আজানের ধ্বনি আর হাহাকার নেমে আসে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দেশের সবকটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র বন্ধ হয়ে স্মরণকালের বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটে। দেশ নিমজ্জিত হয় অন্ধকারে। মাত্র ৫-৭ ঘণ্টার ব্যবধানে সিডরের প্রলয় তাণ্ডবে হাজারো মানুষের মৃত্যু ঘটে। ফলে পার্শ্ববর্তী নদীনালা, খাল ও সাগরে ভেসে ওঠে শত শত মানুষের লাশ। ফসলের মাঠে, গাছের ডালে ও দুমড়ে-মুচড়ে পড়া গাছের নিচে পাওয়া যায় অনেক লাশ। প্রলয়ংকরী সিডর লন্ডভন্ড করে ফেলে অগণিত গ্রাম-জনপদ। এক রাতেই মুছে ফেলে আগের দিনের সকল চিহ্ন। তাৎক্ষণিক জরিপে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকার ওপরে।

পদক্ষেপ : দানব সিডর শুধু প্রাণহরণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, ভাসিয়ে নিয়েছে খেতের ফসল, পুকুরের মাছ, ঘেরের চিংড়ি, জেলের জাল, নৌকা, ট্রলার, হাঁস–মুরগি, গোরু–ছাগল, বাড়িঘর সবই। এসব অঞ্চল সিডরের আঘাতে ধ্বংসস্তূপ আর বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। ভাগ্যক্রমে যারা বেঁচে গেছে— বেঁচেছে তার জীবন কিন্তু শেষ হয়ে গেছে তার জীবিকা। ৫৮% কৃষিনির্ভর দক্ষিণাঞ্চলের রোপা আমন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। এ সকল সর্বহারা কৃষক নিঃস্ব জেলেদের এখন শুধু বেঁচে থাকার ফরিয়াদ, আর্তনাদ আর হাহাকার। এ সকল সর্বহারা মানুষদের হারানো পেশা ফিরিয়ে দেওয়ার সকল বন্দোবস্ত করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। এজন্য পূর্বের ঋণের বোঝা তাদের কাঁধ থেকে নামাতে হবে। সরকারি, বেসরকারি ও এনজিওদের সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। হালের বলদ, চাষের লাঙল, মাছ ধরার জাল, নৌকা, ট্রলার, বীজ, সার, তেল, কীটনাশক সবকিছু যাতে তারা অনায়াসে পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। এভাবে একদিন তারা মাথা তুলে দাঁড়াবে নিজের পায়ে, ভুলে যাবে জলোচ্ছ্বাসের দুঃস্বপ্নময় স্মৃতি, ফসলের খেতে জাগবে কৃষকের হাসি, মাঝিদের কণ্ঠে উঠবে ভাটিয়ালির সুর। গহিন গাঙে থাকবে মাছ ধরার ট্রলার। অন্তত ততদিন, যতদিন না আসে অন্য সিডর।

সাইক্লোনের আগমন ঠেকানো না গেলেও এর আঘাত যাতে জোরালো না হয়, ক্ষতির পরিমাণ যাতে সহনীয় পর্যায়ে থাকে— সে ব্যবস্থাতো আছেই মানুষের হাতে। ঘূর্ণিঝড় কিংবা জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ কমাতে হলে আমাদের স্থায়ী ও টেকসই কিছু পদক্ষেপ হাতে নিতে হবে।

প্রথমত, ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার জন্য ঘূর্ণিপ্রবণ উপকূলীয় এলাকায় পর্যাপ্ত স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। ইতোমধ্যে নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট অপ্রতুল। সারাদেশে কমপক্ষে পাঁচ হাজার আশ্রয়কেন্দ্র বানাতে হবে।

দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস বা আগাম সতর্কতার যথার্থতা নিশ্চিত করতে হবে এবং মানুষের আস্থা বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে কন্দরকেন্দ্রিক সেকেলে সিগন্যাল পদ্ধতি বাতিল করে সাধারণ মানুষের জন্য সহজ কোনো পদ্ধতি চালু করতে হবে। মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোরও এ ব্যাপারে অনেক করণীয় আছে। সহজ কোনো ডিভাইসের মাধ্যমে দুর্যোগের পূর্বাভাস তারা তাদের গ্রাহকদের সরবরাহ করতে পারে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান পদ্ধতি আধুনিকায়ন করে এবং জনগণের মধ্যে এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর প্রস্তুতি নিশ্চিত করা যায়।

তৃতীয়ত, উপকূলীয় দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে আরও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে সংকটকালে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা যায়।

চতুর্থত, উপকূল রক্ষা বাধটির সংস্কার বনায়ন করতে হবে। এই বুড়ো ভাঙা বাঁধটি বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে কোটি মানুষের জীবন। এর সংস্কার করতে হবে এবং প্রয়োজনে আরও উঁচু করতে হবে।

পঞ্চমত, উপকূলবর্তী এলাকায় ব্যাপক বনায়ন করতে হবে। দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোকে নিবিড় বনায়নের আওতায় এনে ঘূর্ণিঝড়ের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রাকৃতিক দেওয়াল গড়ে তুলতে হবে। এতে ঘূর্ণির গতিবেগ কম হবে।

ষষ্ঠত, সিডর আক্রান্ত বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের সংস্কার করতে হবে।

সপ্তমত, গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমাতে, বিশ্ব জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ করতে এবং পরিবেশের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে বিশ্ব ফোরাম কর্তৃক গৃহীত সকল পদক্ষেপের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করে যাওয়া প্রয়োজন।

অষ্টমত, ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলো পুনরায় নির্মাণ করতে হবে এবং দুর্যোগকালীন সময়ে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে হবে।

নবমত, উপকূলীয় এলাকার ঘরবাড়িগুলো ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধে সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। জাপানে ভূমিকম্পের হাত থেকে বাঁচার জন্য যেমন বিশেষভাবে গৃহনির্মাণ করা হয়, দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য তেমনি বিশেষ ধরনের ঘরবাড়ি বানানো যায় কি–না তা নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করতে হবে।

দশমত, ভবিষ্যৎ ঘূর্ণি মোকাবিলার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখতে হবে। সরকারের হাতে থাকবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার যথাযথ পলিসি। আমাদের রয়েছে ১৯৭০ আর ১৯৯১ সালের ভয়াবহ দুটি ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার অভিজ্ঞতা। সেখানকার সাফল্যগুলোর কৌশল আর ব্যর্থতাগুলো সর্তকতার সাথে কাজে লাগাতে হবে সাম্প্রতিক সিডর মোকাবিলায়, কাজে লাগাতে হবে অনাগত সাইক্লোন মোকাবিলায়। তবে তাৎক্ষণিক কিংবা স্থায়ী সিডর মোকাবিলার উভয়স্তরেই প্রধান দায়দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকেই।

বাঙালি বীরের জাতি। জাতীয় প্রতিপক্ষ মোকাবিলার ঐতিহ্য বাঙালির আছে। আছে প্রাকৃতিক প্রতিপক্ষ মোকাবিলার অভিজ্ঞতা। দানব সিডরের আঘাতে অগ্রসর জাতীয় জীবনের ছন্দপতন হয়তো হবে, কিন্তু তা কাটিয়ে উঠে অগ্রযাত্রায় তাল মেলানো অসম্ভব বলে মনে হয় না। সিডরের আঘাতে যারা প্রাণ হারিয়েছে, তাদের জন্য হয়তো কিছু করার নেই কিন্তু যারা এখনো বেঁচে আছে, যারা জীবন্মৃত কিংবা যাদের জীবন এখন অসংখ্য শর্তাধীন, তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া অপরিহার্য। সবাই একত্রে পারে দুর্গতদের বাঁচিয়ে তুলতে। সেই শ্রেয়বোধ সবার ভেতরে সঞ্চারিত হোক।

উপসংহার : এককালে মানুষের ধারণা ছিল প্রকৃতির ওপর যেকোনো উপায়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই সবচাইতে জরুরি। আজ সে ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। কেননা দেখা যাচ্ছে, এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে বন ধ্বংস করে, নদীর প্রবাহ বন্ধ করে, পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে মানুষ নিজের জন্য সমূহ বিপদ ডেকে এনেছে। মানুষ চেষ্টা করছে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রেখে প্রকৃতির সহায়তায় নিজের জীবনধারাকে আগামী দিনের সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তাই আজ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য নয়, মানুষ গড়ে তুলতে চাইছে প্রকৃতির সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধ।

ঋতু, প্রকৃতি ও স্বদেশ

৯৩. প্রিয় এ দেশ আমার

ভূমিকা :

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না তো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি

এক বিশাল জনসংখ্যাবিশিষ্ট বিশ্বের দারিদ্র্যপীড়িত একটি দেশ হলো বাংলাদেশ। বিগত শতকে এ দেশটিকেই ঘিরে রয়েছে কত ঐতিহাসিক ঘটনা। পাওয়া না পাওয়ার বেদনা। একুশ শতকের সূচনালগ্নে তাই বাংলাদেশের চাওয়া–পাওয়া অনেক। এক সময়ের সুজলা–সুফলা, শস্য–শ্যামলা নদীমাতৃক এ বাংলাদেশ পথ–পরিক্রমায় বর্তমানে তার নিজ গতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে এনেছে ব্যাপক পরিবর্তন। তারই প্রেক্ষাপটে একুশ শতকের বাংলাদেশের প্রত্যাশা।

অতীতের বাংলাদেশ : আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি তথা বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির অতীত ইতিহাস সংগ্রামমুখর, স্বাধীনতাকামী তথা বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ডে জর্জরিত। সুদীর্ঘ দুশো বছর ব্রিটিশ শাসনের জাঁতাকালে নিষ্পেষিত হয়েছে বাঙালি। আমাদের কৃষ্টি–কালচার হয়েছে ভূলুণ্ঠিত। পদে পদে লাঞ্ছনা–বঞ্চনা, শোষণ আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালি বারবার প্রতিবাদমুখর হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে বিশ শতকের মাঝামাঝি পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু তাতে বাংলাদেশের প্রভু বদল ছাড়া বাস্তব কিছু ঘটেনি। ব্রিটিশ শাসনের অবসানে পাকিস্তানিরা চেপে বসে বাঙালিদের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো। আঘাত আসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর। কিন্তু বাঙালির ঐতিহ্য তথা সংগ্রামপ্রিয়তা থেমে থাকেনি। ভাষার জন্য উৎসর্গিত হলো বুকের তাজা রক্ত। সেই রক্তমাখা পিচ্ছিল পথেই আসে একাত্তরের মহান মুক্তিসংগ্রাম। ত্রিশ লাখ মানুষের জীবন, দুই লক্ষ মা–বোনের ইজ্জত আর কোটি কোটি টাকার ধনসম্পদের বিনিময়ে অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হলো বাঙালি জাতির বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এ গর্ব নিয়েই স্বাগত জানাই নতুন শতককে, নতুন সহস্রাব্দকে, আমার স্বপ্নের বাংলাদেশকে, প্রিয় দেশ গড়ার মানসে জীবন উৎসর্গ করা বাঙালি ভাইবোনদের।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট : স্বাধীনতার সুদীর্ঘ ৫০ বছর পার হলেও বাংলাদেশ এখনো স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি। আজও বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার সুফল নিতে পারেনি। বহুবিধ সমস্যা আর প্রতিকূলতা ক্রমেই ঘিরে ফেলেছে এ দেশকে। এসব সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ হলো দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাতে জর্জরিত বাংলাদেশ। এ থেকে উত্তরণের সমস্ত পথই যেন রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। ভয়াবহ জনসংখ্যা বিস্ফোরণের মারাত্মক প্রতিক্রিয়ায় দিন দিন বাড়ছে বেকারের সংখ্যা, সেই সাথে সৃষ্টি হচ্ছে নানাবিধ সমস্যা। বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষালাভের সুযোগ খুবই সীমিত। জাতীয় প্রবৃদ্ধি নেই বললেই চলে। আন্তর্জাতিক দেনার দায়ে জর্জরিত এ দেশ। দিন দিন আমদানি–রপ্তানির ভারসাম্য প্রতিকূলই থেকে যাচ্ছে।

গ্রাম ও শহরের বৈষম্য : ছায়া সুশীতল শান্তির নীড় পল্লিবাংলা আজ তার নিজস্ব প্রকৃতি হারিয়েছে। দিন দিন যেন পল্লিবাংলা নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। একসময় বাস্তবেই ছিল "মাছে ভাতে বাঙালি" কিংবা "পুকুরভরা মাছ আর গোয়ালভরা গোরু"। এখন এসব শুধু প্রবাদেই শোনা যায়। বাস্তব চিত্র ভিন্ন। আজ মানুষ ক্রমেই শহরমুখী। উপার্জনের আশায়, একটু সচ্ছল জীবনের প্রত্যাশায় শহরে মানুষ উপচে পড়ছে। গ্রামের গাছপালা নিধন হয়ে যাচ্ছে অবিবেচকের মতো, নদী শুকিয়ে গেছে, বহু সোনালি ধানের জমিতে মানুষ মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিচ্ছে। সর্বত্রই শুধু সমস্যা আর সমস্যা। উপরন্তু সন্ত্রাস এখন বাংলাদেশের এক অতি পরিচিত শব্দ। চাঁদাবাজি, রাহাজানি, অপহরণ, ধর্ষণ যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে মানুষ চরম উৎকণ্ঠায় ভুগছে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা সমস্যার জটকে আরও বেশি জটিল করে তুলেছে। নতুন শতকের শুভলগ্নে এসব সমস্যা কাটিয়ে বাংলাদেশ সুন্দর সুখময়তা অর্জন করবে এটিই আমার স্বপ্ন ও সাধনা।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ : উপর্যুক্ত সহস্র সমস্যার মাঝেও বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে। বিশ্বভ্রাতৃত্বের চেতনাধারী বাংলাদেশ বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সবসময়। আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে এবং হচ্ছে। বহুজাতিক বাহিনীতে বাঙালির অংশগ্রহণ, সাইপ্রাস–নামিবিয়া, সিয়েরা লিওনে সৈন্য

প্রেরণ, ফিলিস্তিন সমস্যায় জোরালো বক্তব্য প্রদান বাংলাদেশের মর্যাদা বাড়িয়েছে বহুগুণে। বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ এবং বাঙালির গর্ব, বাঙালির অহংকার ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান একটি অনন্যসাধারণ ঘটনা। বিশ্বময় বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে পারা আমাদের এক গৌরবের ব্যাপার। ক্রীড়াঙ্গনে বিগত শতকে বাংলাদেশ আরেকটি মাইলস্টোন স্থাপন করেছে। সারা বিশ্ব চমৎকৃত হয়েছে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সোনার ছেলেদের হুংকারে। আইসিসি চ্যাম্পিয়ান হওয়া, বিশ্বকাপে পাকিস্তান ও ভারতকে পরাজিত করতে পারা— সবই এক–একটি ইতিহাস। এ সোনালি ইতিহাসের মণিকোঠায় পা রেখেই একবিংশ শতকে বাংলাদেশের পদচারণা আরও তাৎপর্যময় হবে, আরও সুগভীর নিবিড়তায় বাঙালি জাতি সদর্পে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে— এটিই সকলের কাম্য।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ : আমার প্রিয় দেশ আত্মপ্রত্যয় ও আত্মপ্রচেষ্টার দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে এটিই হবে স্বনির্ভরতার মূলমন্ত্র। জনসমস্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নসাধন করে দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য কাজ করতে হবে। পরমুখাপেক্ষিতা কমাতে হবে। তবেই দেশ স্বনির্ভর হবে।

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী–সাহিত্যিক : বিগত শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অমর্ত্য সেনের নোবেল পুরস্কার লাভ বাঙালি জাতির শিরকে সমুন্নত করেছে। সে সাথে গত শতকে শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, জসীমউদ্‌দীনের মতো কালজয়ী লেখক; জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, এস. এম. সুলতান প্রমুখ প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী; সংগীতের ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন খাঁ, গোলাম আলী খাঁ, রবিশংকর, বেলায়েত খাঁ প্রমুখ বিশ্বসভায় নিজ নামে পরিচিত। রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষ বোস, মওলানা ভাসানী, এ. কে. ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান নিজ মহিমায় সমুজ্জ্বল। এঁদের স্মৃতিচারণ করে এ আদর্শকে সামনে রেখে বাংলাদেশ একবিংশ শতাব্দীতে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, গড়ে তুলতে পারবে স্বপ্নের স্বনির্ভর দেশ— এ প্রত্যাশা সকলের।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, স্বপ্নের বাংলাদেশ হবে শোষণ, বঞ্চনা, অন্যায় ও অর্থনৈতিক বৈষম্যমুক্ত। এদেশের আর কোনো নারী নির্যাতিত হবে না, অসহায়ত্বের শিকার হবে না। এদেশের প্রতিটি শিশুই প্রকৃত মানবসন্তানের মতো বেড়ে উঠবে। একজন মানুষও অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে না। প্রত্যাশা করি নতুন শতকে এদেশ হবে দুর্নীতিমুক্ত। শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হবে। পথপাশে পড়ে থাকবে না একজনও ভিখারি। রাজনীতির অসহিষ্ণুতা বিদূরিত হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা থাকবেন তারা হবেন আকাশের মতো উদার। লোভ–লালসা, হানাহানি কিছুই স্পর্শ করতে পারবে না তাদের। তবেই বাংলাদেশ সোনার বাংলা হয়ে বিশ্বসভায় নিজ আসন মজবুত করতে পারবে।

আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতে মরি

৯৪. বাংলাদেশের বর্ষা
অথবা, বর্ষায় বাংলাদেশ
অথবা, পল্লি ও নাগরিক জীবনে বর্ষা
অথবা, বাংলার বর্ষা
অথবা, আমাদের জীবনে বর্ষা
অথবা, আমার প্রিয় ঋতু বর্ষা
অথবা, বর্ষায় পল্লিজীবন ও নাগরিক জীবন

ভূমিকা

বাংলাদেশ ঋতুবৈচিত্র্যের দেশ। বিভিন্ন ঋতুর আগমনে এখানে অতুলনীয় প্রাকৃতিক লীলাবৈচিত্র্য ঘটে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত—এ ছয়টি ঋতু একে একে আবির্ভূত হয়। প্রত্যেকটি ঋতুর রূপবৈচিত্র্য এখানকার প্রকৃতিতে স্পষ্টরূপে ধরা দেয়। বর্ষা ঋতুর স্নিগ্ধসজল রূপ এর শ্যামল শ্রী নিয়ে যত স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হয় তেমন আর কোনো ঋতুতে হয় না।

বর্ষার আগমন : বর্ষার নবসমারোহে বাংলাদেশের অবারিত প্রাঙ্গণে যে অতুলনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি হয়, তা বর্ণনাতীত। বর্ষার সমাগমে খালবিল, নদীনালা পানিতে থইথই করে। কোনো কোনো গ্রামকে দ্বীপের মতো মনে হয়। বিলের পানিতে কই,

শিং, মাগুর প্রভৃতি মাছ ইতস্তত বিচরণ করে। আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টি নামে। বনে বনে জুঁই, কেয়া, কদমফুলের স্নিগ্ধ সৌরভ ভেসে বেড়ায়। কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘনগৌরবে নব যৌবনা বরষা,
শ্যামগম্ভীর–সরসা,
গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে।
নিখিল চিত্ত হরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা"

বর্ষায় পল্লির অবস্থা : বর্ষাকালে গ্রামের মাঠঘাট, পুকুর প্রভৃতি জলপূর্ণ হয়ে যায়। চলাচলের প্রায় সমস্ত রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে; কৃষকগণ বাঁশের মাথাল মাথায় দিয়ে মাঠে কাজ করতে থাকে। গ্রাম্য রমণীরা বৃষ্টিতে ভিজে ঘাটে পানি আনতে যায়। ছোটো ছেলেমেয়েরা পানিতে ভিজে ভেলা, কেয়াপাতার নৌকা ইত্যাদি ভাসিয়ে আনন্দ লাভ করে। সারাদিন কৃষকদের মাঠে কাজ করতে হয়; কারণ বর্ষাকাল পাট কাটা ও ধান চাষের উপযুক্ত সময়। গ্রামেই বর্ষার দৃশ্য সবচেয়ে ভালোভাবে উপভোগ করা যায়। বর্ষার আগমনে বাংলাদেশের আতপ্ত পল্লিদেহে নবজীবনের সঞ্চার হয়। মাঠঘাট, খালবিল যে দিকেই দৃষ্টি যায় কেবল পানি আর পানি। বর্ষাকালে গ্রামবাসীদের হাটবাজার করা বড়োই কষ্টকর। কারণ, কর্দমাক্ত ও ভগ্ন পথ–ঘাট দিয়ে চলাফেরা করা তাদের পক্ষে অতীব দুষ্কর হয়ে ওঠে। অনেক সময় নৌকা, ডিঙ্গি, ভেলা প্রভৃতি চলাফেরা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। বর্ষার পল্লিতে সন্ধ্যার পূর্বে ঘন অন্ধকার নেমে আসে। দূর বনানীর পা ঘেঁষে অন্ধকার জমাট বেঁধে আসে। ক্ষণে ক্ষণে এ অন্ধকার ভেদ করে বিদ্যুতের ঝলক দেখা দেয়। শৃগাল দলে দলে ঘুরে বেড়ায় আর হুক্কাহুয়া রবে দিক প্রান্তর মুখর করে তোলে।

বর্ষার রূপ : বর্ষায় বাংলাদেশের প্রকৃতি অন্য রকম রূপধারণ করে। আকাশে ঘনকালো মেঘের আনাগোনা চলতে থাকে। দুই–তিন দিন হয়তো সূর্যের দেখাই মেলে না। কখনো কখনো শোনা যায় মেঘের গর্জন। বাইরে গেলে দুর্ভোগের সীমা থাকে না। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আষাঢ়' কবিতায় বলেছেন—

'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাসনে,
ঘরের বাহিরে!'

বর্ষায় আকাশের অবস্থা : বর্ষাকালে আকাশ সর্বদাই মেঘাবৃত থাকে। আকাশ যেন নীল শাড়ি ত্যাগ করে কালো শাড়ি পরে শরীর আবৃত রাখে। আর কখনো কখনো ঘোমটার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারার চেষ্টা করে। সময় সময় আকাশ যেন বিরহিণী নারীর মতো অভিমানে গাল ফুলিয়ে থাকে। আবার কখনো অকস্মাৎ অশ্রুধারা বর্ষণ করে অভিমানের মাত্রা হালকা করার চেষ্টা করে।

বর্ষায় মনের অবস্থা : বর্ষাকালে মেঘে মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যায় আর তার বনভূমি মেদুর হয়ে ওঠে। বিদ্যুৎ চমকায় আর মেঘের গুরুগুরু ধ্বনিতে হৃদয়ও দুরুদুরু কেঁপে ওঠে। বাতাস হয়, বৃষ্টি ঝরে, মানুষের মন উদাস হয়ে যায়। কার অভাব যেন মনের মধ্যে অনুভূত হয়। কী যেন নেই, যেন অজানা কেউ আছে, থাকলে ভালো হতো। পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন এমনি দিনে বলেছেন—

"আজিকে বাহিরে শুধু ক্রন্দন ছল ছল জলধারে
বেণুবনে বায়ু নাড়ে এলোকেশ, মন যেন চায় কারে।"

বাংলা সাহিত্যে বর্ষা : সাহিত্যের প্রেরণাস্থল হিসেবে বর্ষার ভূমিকা বহু পূর্ব থেকেই স্বীকৃতি পেয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলিতে বর্ষার প্রেক্ষাপটে মানুষ চিরদিনের বিরহ–বেদনা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে।

"এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর"— কবির এই উক্তি শুধু রাধার একার বিরহের চিত্র নয়, নিখিল মানবচিত্তের বিরহ–বেদনার রূপ ধরা পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে ও সংগীতে বর্ষার যে রূপ তুলে ধরেছেন, তা অতুলনীয়। কাজী নজরুলের কাব্যে বর্ষা এসেছে বেদনাদীর্ণ হৃদয়ের প্রতীক হিসেবে। এছাড়াও বর্ষা নিয়ে কবিতা লিখেছেন জসীমউদ্‌দীন, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা প্রমুখ কবিরা।

বর্ষার অপকারিতা : বর্ষার যেমন উপকারিতা আছে তেমনি অপকারিতাও কম নয়। বৃষ্টির পানিতে পল্লির রাস্তাঘাট কাদায় ভরে ওঠে এবং কোনো কোনো জায়গা পানিতে ডুবে যায়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম অনেক বৃদ্ধি পায়। জনজীবনে নেমে আসে চরম দুর্ভোগ।

উপসংহার : ঘনঘোর বর্ষার শ্যাম সমারোহে বাংলাদেশের পল্লিদৃশ্য আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে বাংলাদেশের বর্ষা বিশেষ ছায়াপাত করেছিল। তিনি বর্ষা ঋতুর মনোরম রূপবৈচিত্র্য দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর কবিমনের সে অনুভূতি কবিতা ও কাব্যের বাণীরূপ পেয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, অক্ষয় কুমার বড়াল প্রমুখ কবি পল্লি ও বর্ষা বিষয়ে কবিতা লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন। বাংলার বর্ষা শুধু কবিকেই নয়, ভাবুকমাত্রকে দোলা দিয়ে যায়। বস্তুত বাংলার বর্ষার অপরূপ সৌন্দর্য তার নিজস্ব সম্পদ; এ সম্পদ দুনিয়ার অন্য কোথাও আছে কি না জানি না।

৯৫. একটি ঝড়ের রাত

না, আমি কোনো দিন বুঝতে পারব না
আসলে কাকে বলে ঝড়ের ভয়–
যদিও দুর্যোগ এসেছে বহুবার,
তবুও এই ঝড় আমার নয়

আমার জীবনে অনেক ঝড়ের রাত এসেছে। কালবৈশাখির তাণ্ডব নৃত্যও দেখেছি; আবার আশ্বিনের অকাল প্রচণ্ড ঝড়ও দেখেছি। বইপত্রে অনেক ঝড়ের বর্ণনা পড়েছি। আবার মুরুব্বিদের কাছে অনেক ঝড়ের বীভৎস কাহিনি শুনেছি। কিন্তু গত বছর ৩ জ্যৈষ্ঠে ঝড়ের যে তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করেছি তার কাছে আমার দেখা এবং শোনা সমস্ত ঝড়ের রাতের স্মৃতিই ম্লান হয়ে গেছে।

সে দিনটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর। মেঘমুক্ত নীল আকাশ। প্রখর রোদের সাথে ঝিরঝির বাতাসে বেশ মনোরম মনে হচ্ছিল দিনটি। অথচ সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমস্ত মানুষকে অবাক করে উত্তর–পশ্চিম কোণে দেখা দিল এক বিশাল ঘন–কালো মেঘের পাহাড়। ধীরে ধীরে সূর্য ডুবেছে, সন্ধ্যা নেমেছে আর মেঘের পাহাড় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। সমস্ত আকাশ, গাছপালা, লতাপাতা, বাতাস নিস্তব্ধ। গাছের একটি পাতাও সামান্য নড়ে না, এমনকি সন্ধ্যায় নীড়ে ফেরা পাখিরাও যেন কী এক অজানা আশঙ্কায় নীরব নিস্তব্ধ। সমস্ত আকাশ ধীরে ধীরে অন্ধকারে ছেয়ে গেল। এমনি সময়ে রেডিয়োতে হঠাৎ শোনা গেল আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের বিপৎসংকেত। কিন্তু এমন সর্বনাশা ঝড় হতে পারে তা কেউ ভাবতেও পারেনি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা শুনতে পেলাম বাতাসের সাঁইসাঁই শব্দ। সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মতো শব্দ করে বাতাস আসছে, ঝড় আসছে। ধুলাবালিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল চতুর্দিক। দরজা–জানালা বন্ধ করে দিলাম। কবির কথা মনে উদয় হলো :

ঝড়ের রাতে লোকে হাঁটছে শুনি নাকি?
যেন–বা পরিযায়ী পাখির দল?
আজি সে–অভিসারে বর্ষা হানা দেবে।
বন্ধু হে আমার, জলকে চল...

কিছুক্ষণ পর বাতাসের সাথে শুরু হলো প্রচণ্ড বৃষ্টি। বাতাসের বেগ ক্রমে বাড়তে লাগলো। চারদিকে কেবল শোঁ শোঁ শব্দ, একের পর এক বজ্রপাতের বিকট আওয়াজ, আর ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকানিতে মনে হলো যেন মহাপ্রলয় আসন্ন। মানুষের গগনভেদী চিৎকার আর আজান–ধ্বনি শুনে আমার শরীরে কাঁপন ধরেছে। আমাদের ঘরের পাশের বড়ো আম গাছটি একটা বিকট মটমট শব্দ করে ভেঙে গেল। আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। আমার মা'র কান্নাকাটি ও বারবার নির্দেশে আমিও কয়েকবার আজান দিলাম। একবার জানালা একটু ফাঁক করে দেখলাম আমাদের বৈঠক ঘর এবং রান্নাঘরের চালা ওড়ে গেছে, বেড়াগুলো পালাসহ হুমড়ি খেয়ে উঠানে পড়ে আছে। এমন সময় কোথা থেকে এক টিনের চালা এসে আমাদের ঘরের চালের সাথে প্রবল বেগে ধাক্কা খেয়েছে এবং আমরা এর বিকট শব্দে ভয়ে শঙ্কিত হয়ে গেলাম। কিন্তু আমাদের ঘরটি খুব শক্ত অর্থাৎ মজবুত হওয়াতে ভেঙে পড়েনি, তবু ভয়ের অন্ত ছিল না। সারাক্ষণ আমরা ছিলাম ভয়ে আতঙ্কিত। কবিগুরুর ভাষায়—

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে,
ঝড় এল রে আজ––

মেঘের ডাকে ডাক মিলিয়ে
বাজ্ রে মৃদঙ বাজ্।
আজকে তোরা কী গাবি গান
কোন্ রাগিণীর সুরে।
কালো আকাশ নীল ছায়াতে
দিল যে বুক পূরে।

আমার সমস্ত চেতনা, শিরা–উপশিরা যেন হিম হয়ে এলো। এই অন্ধকার ভয়াল রাত, সমস্ত পৃথিবী যেন অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। ঝড়ের শুরুতেই ইলেকট্রিসিটি নিভে গেছে। আমাদের ঘরে একটি হারিকেন জ্বলছে। তাও আবার ডেকচির ভেতর বন্দি। কেননা বাতাসে এটিও নিভে যেতে পারে। এদিকে ঝড়ের বেগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রকৃতি যেন আজ পাগলপারা হয়ে ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছে। রুদ্ররূপে প্রকৃতির এই ভীষণতম মূর্তি, এই ভয়াল রূপ স্বচক্ষে না দেখলে কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে না– ঝড় যেন ধ্বংসের প্রতীক, এক ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা। তখন আবারো কবিগুরু নাড়া দেয়—

আমাকে আজ কে খুঁজেছে
পথের থেকে চেয়ে।
জলের বিন্দু পড়ছে রে তার
অলক বেয়ে বেয়ে।
মল্লারেতে মীড় মিলায়ে
বাজে আমার প্রাণ,
দুয়ার হাতে কে ফিরেছে
না গেয়ে তার গান।

প্রায় মধ্যরাতের দিকে ঝড় থামলো। কিন্তু বাতাস একেবারে থামেনি, মাঝেমধ্যে দমকার আকারেও আসে। চতুর্দিক থেকে ভেসে আসতে লাগলো মানুষের কান্নার শব্দ, কিন্তু এই অন্ধকারে বেরোতে সাহস হলো না। বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঘুম আসছে না। মানুষের কান্না এবং আহাজারির অস্পষ্ট শব্দগুলো শুনে মনে হলো গ্রামের বাড়িঘর বুঝি আর কিছুই বাকি নেই। সবই বুঝি শেষ করে দিয়ে গেছে এই সর্বনাশা ঝড়। তাই ঘুম আর হলো না। সমস্ত রাতটা উদ্‌বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে কাটলো।

ভোর হতে না হতেই বেরিয়ে পড়লাম। মেঘমুক্ত সীমাহীন নীল আকাশ, প্রকৃতি সব নীরব নিস্তব্ধ। চারদিকে ধ্বংসস্তূপ। ভয়ে বেদনায় বুক থরথর করে কাঁপতে লাগলো। ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম পাড়া–প্রতিবেশীদের বাড়ির দিকে। বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি, গাছপালা, বাড়ি–ঘর সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। সব স্তূপাকারে পড়ে আছে উঠানে, রাস্তা–ঘাটে, খেতে–খামারে। ফসলের মাঠের দিকে তাকানো যায় না। সমস্ত ফসল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে শিলাবৃষ্টি আর ঝড়ে। বাড়ি–ঘরের ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে আছে অসংখ্য মানুষের ছিন্ন–বিচ্ছিন্ন দেহ। এসব দেখে চোখ যেন ঝলসে যেতে চায়। অসংখ্য অসহায় নারী–পুরুষের বুকফাটা আর্তনাদে আকাশ–বাতাস–প্রকৃতি যেন গুমরে গুমরে কাঁদছে। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য যে না দেখেছে তাকে বোঝানো বড়ো কঠিন। আমার চোখ দিয়েও ঝরঝর করে পানি পড়তে লাগলো। ইচ্ছে করছিল চিৎকার করে কাঁদি কিন্তু পারিনি। যতই বেলা বাড়তে লাগলো ততই চতুর্দিক থেকে ধ্বংসের খবর, মৃত্যুর খবর আসতে লাগলো। ঝড় যেন কেবল গরিব মানুষেরই গজব, মৃত্যুর অমানিশা, স্বজনহারা মানুষের গগনবিদারী আর্তচিৎকার। এই ভয়াবহ ধ্বংসলীলা আর বীভৎস মৃত্যুর দৃশ্য এ জীবনে কখনো ভুলবো না এবং ভোলার নয়। এই স্মৃতি আমার হৃদয়ে, মনে, অস্থিমজ্জায় চিরদিন জেগে থাকবে ভয়ের কালরাত হিসেবে।

কাজল মেঘে ঘনিয়ে ওঠে
সজল ব্যাকুলতা,
এলোমেলো হাওয়ায় ওড়ে
এলোমেলো কথা।
দুলছে দূরে বনের শাখা,
বৃষ্টি পড়ে বেগে,
মেঘের ডাক কোন্ অশান্ত
উঠিস জেগে জেগে।

৯৬. আমার প্রিয় ঋতু
অথবা, বাংলাদেশের শরৎকাল
অথবা, শরৎ ঋতুতে বাংলাদেশ

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি বৈচিত্র্যময় দেশ। ছয়টি ঋতু সারা বছরে তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলাদেশের বুকে আবির্ভূত হয়। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত—এই ছয়টি ঋতু প্রতিবছর দেশের মানুষের কাছে প্রকৃতির মহিমা বিস্তার করে। কিন্তু আমার প্রিয় ঋতু সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে আমি নিঃসন্দেহে বলব যে, শরৎ (ভাদ্র ও আশ্বিন মাস) আমরা কাছে অন্য ঋতুগুলো অপেক্ষা সেরা। শরৎ আসে বর্ষাকালের অবসানে; তখন সে বাংলার বুকে তার রজতশুভ্র জ্যোৎস্না ও পুষ্প-সুষমা নিয়ে আবির্ভূত হয়। বর্ষার বারিধারায় পীড়িত ধরণী আবার হাস্যমুখর হয়ে ওঠে। এজন্য শরৎ আমার প্রিয় ঋতু।

শরৎ ঋতুর পক্ষে যুক্তি : বর্ষাকালের বাংলার পল্লি অঞ্চলের মানুষের মনে উৎসাহ সঞ্চারিত হলেও অতিরিক্ত বর্ষণে বন্যার প্লাবন সমগ্র দেশের জন্য অমঙ্গল বয়ে আনে। কিন্তু শরতের মন ভোলানো রূপসৌন্দর্য বাংলার প্রকৃতিকে আবার গরীয়সী করে তোলে। এ সময়ে বর্ষার ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশির আনাগোনা দেখা যায় না, সেখানে সাদা সাদা মেঘ ইতস্তত আসমানে ভেসে বেড়ায়। শরৎ প্রভাতের মাধুর্য মনকে যেমন দোলা দিয়ে যায় তেমন অন্য কোনো ঋতু দেয় না, দিতে পারে না। তাই তো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আজি কী তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাত ঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমর শোভাতে।

শরতের রূপ : বাংলাদেশের শরৎকালই সবচেয়ে স্পষ্ট। তাই শরৎকে চিনতে আমাদের অসুবিধা হয় না। হালকা সাদা তুলোর মতো মেঘের দল শুভ্র বলাকার ন্যায় ভেসে বেড়ায় নীল আকাশজুড়ে। দিগন্ত বিস্তৃত নীলাকাশের নিচে মাঠে মাঠে দুলতে থাকে সাদা কাশফুলের থোকা। ফুলের শোভা আর শস্যের শ্যামলতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে শরৎ। প্রকৃতির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কবি তখন গেয়ে ওঠেন—

"আজ ধানের খেতে রৌদ্র ছায়ায়
লুকোচুরি খেলা
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা ॥"

শরতের সৌন্দর্য বাংলার প্রকৃতিকে করে তোলে রূপময়। আকাশের উজ্জ্বল নীলিমার প্রান্ত ছুঁয়ে মালার মতো উড়ে যায় পাখির ঝাঁক। শিউলিতলায় হালকা শিশিরে ভেজা দূর্বাঘাসের ওপর চাদরের মতো বিছিয়ে থাকে সাদা আর জাফরান রং মেশানো রাশি রাশি শিউলিফুল। শরতের ভোরের এই সুরভিত বাতাস মনে জাগায় আনন্দের বন্যা।

সূর্য ওঠে সোনার বরণ রূপ নিয়ে। নির্মল আলোয় ভরে যায় চারদিক। ফসলের মাঠে একপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর রুপালি ধারায় সূর্যের আলো ঝলমল করে। নদীর তীরে কাশবনের সাদা কাশফুল কখনো হাতছানি দিয়ে ডাকে। মনে পড়ে কবির লেখা চরণ—

"পুচ্ছ তোলা পাখির মতো
কাশবনে এক কন্যে
তুলছে কাশের ময়ূর-চূড়া
কালো খোঁপার জন্যে।"

কাশফুলের মনোরম দৃশ্য থেকে সত্যিই চোখ ফেরানো যায় না। ভরা নদীর বুকে পাল তুলে মালবোঝাই নৌকা চলে যায়। ডিঙি নাও বাইতে বাইতে কোনো মাঝি হয়তোবা গেয়ে ওঠে ভাটিয়ালি গান। বিলের জলে নক্ষত্রের মতো ফুটে থাকে সাদা ও লাল শাপলা। সকালের হালকা কুয়াশায় সেই শাপলা এক স্বপ্নিল দৃশ্যের অবতারণা করে।

শরৎকালের সৌন্দর্য : শরৎকালে মাতৃভূমি বাংলাদেশের যে রূপ ফুটে ওঠে তা অন্য ঋতুতে বিরল। আমিও শরতের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়ি। রাত্রিকালে শারদ–শশীর উজ্জ্বল কিরণে পথঘাট প্লাবিত হয়ে অপরূপ সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে ওঠে, শশীর উজ্জ্বল কিরণস্পর্শে বাংলার কাশবন, বৃক্ষশীর্ষ, গৃহচূড়া ও নদীর নির্জন বুক সমস্তই হাস্যময়ী রূপ ধারণ করে। শরতে নানা জাতের ফুল ফোটে। ফোটে শেফালি, মালতী, জুঁই, টগর, কামিনী ও শারদীয় ফুল। ফুলের সমারোহে আনন্দে বুক ভরে ওঠে। তাদের সৌন্দর্যে আমার মন হারিয়ে যেতে চায়। তাদের মিষ্টি সুবাস ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। শারদীয় মৃদুমন্দ হাওয়া, ফোটা ফুলের স্নিগ্ধ সৌরভ, নীলিমার দিগন্ত বিস্তৃত পরিবেশ মানব মনকে উদাস করে তোলে। রাতের শিউলি ঝরে পড়ে প্রভাতের পদধ্বনিতে, ক্ষেতের ফসল জানান দিয়ে যায় শরতের বার্তা। শরতের আগমনে বাংলার বন–উপবন দোয়েল, কোয়েল, ময়নার কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে। বাঙালি হিন্দু নরনারী শরৎ প্রকৃতির সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে ওঠেন, তাঁরা মেতে ওঠেন নানা উৎসব ও পালাপার্বণে।

এদেশের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিজীবী। তারা খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ। শরৎকাল প্রধানত তাদেরই জন্য আনন্দ বয়ে নিয়ে আসে। তারা পরিশ্রম করে ফসল ফলায়। সে ফসল ঘরে আসবে তারই আগমনী বার্তা কৃষককুলকে আনন্দ–চঞ্চল করে। ঝিরঝির বাতাস যেমন ঢেউ খেলে যায় মাঠের ফসলে তেমনি দোলা দেয় চাষির মনে। শরৎকালের জ্যোৎস্নাচ্ছন্ন রাত্রিতে গ্রামের নরনারী গানের মধ্যে ডুবে থাকে। তারা যাত্রা, কবিগান এসব নিয়ে একপাড়া থেকে অন্য পড়ায় আসর জমায়।

উপসংহার : আজ দিন পালটেছে, অর্থনৈতিক বিপর্যয় সাম্প্রতিক মানুষের আনন্দ ও উপলব্ধিকে কাবু করেছে। বাংলার শারদ স্নিগ্ধ মহিমা তার মনে আগের মতো ঝঙ্কার তোলে না। তা না তুললেও কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—

"আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি
মনে হয় এ যেন আমার প্রথম দেখা।
আমি দেখলাম নবীনকে,
প্রতিদিনের ক্লান্ত চোখ
যার দর্শন হারিয়েছে।" —**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

৯৭. শরতের সকাল

ভূমিকা : ছয় ঋতুর দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। প্রতিটি ঋতু আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। শরৎকালে প্রকৃতি অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়। শরৎ সকালের প্রকৃতির প্রসন্ন হাসি আর সুবর্ণ মোহন কান্তি দর্শনে মানুষ মাত্রই মুগ্ধ হয়। শরতের প্রকৃতির স্নিগ্ধ শান্তরূপ সকলকে আকৃষ্ট করে।

শরতের আবির্ভাব : ভাদ্র–আশ্বিন– এ দুই মাস শরৎকাল। বর্ষা শেষ হতে হতেই করে তখন বাংলাদেশের প্রকৃতির নাট্যমঞ্চে নেপথ্যে শরৎ সুন্দরীর আবির্ভাবের অদৃশ্য আয়োজন চলতে থাকে। নিঃশব্দ চরণে সে যে কখন এসে হাজির হয় তা কেউ টেরই পায় না। অনেক সময় বর্ষা চলে গেলেও শরৎ আসতে কিছুটা বিলম্ব হয়। হঠাৎ একদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে যখন দেখতে পাই, শিশিরসিক্ত দূর্বাঘাসের ওপর সূর্যকিরণ পড়ে হাজারও মুক্তোদানার রূপ ধারণ করেছে, তখন আমাদের আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে, শরৎ সুন্দরী বাংলাদেশের বুকে এসে হাজির হয়েছে। বাংলাদেশে শরৎকাল সামান্য কিছুদিন স্থায়ী হয়। এ সামান্য সময়েই প্রকৃতিতে নিয়ে আসে নতুন ছন্দ, নতুন সৌন্দর্য।

শরৎ সকালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য : শরৎ ঋতুর প্রধান উপহার– সকালে হালকা কুয়াশা আর বিন্দু বিন্দু জমে ওঠা শিশির। এ সময় পূর্ণ যৌবনা নদী প্রাণচাঞ্চল্যে, খরতর বেগে ছুটে চলে নিজ গন্তব্যে। রক্তিম সূর্য পুব আকাশে উদিত হয়। আকাশে সারসের দল সাঁইসাঁই করে ওড়ে চলে কোনো মানস সরোবরের দিকে। সুনীল আকাশে ভেসে বেড়ায় খন্ড খন্ড অসংখ্য সাদা মেঘের ভেলা। স্নীল আকাশের ছায়া পড়ে শান্ত নদীর বুকে। নদীর কোল ঘেঁষে ফোটে অসংখ্য কাশফুল। সেই সাদা কাশবনে মৃদু বাতাস ঢেউ খেলে যায়। আকাশের স্নিগ্ধ সূর্যকিরণে মাঠ–ঘাট ঝলমল করে। হাঁটুজলে সাদা বক নিবিষ্ট মনে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকালয়ে খ্যাঁকশিয়াল আর বনবিড়ালের আনাগোনা বৃদ্ধি পায়। দোয়েল–কোয়েল আর বিভিন্ন পাখির কলকাকলিতে মুখরিত থাকে চারদিক। শরতের শারদীয় সকালে ফোটে নানা রঙের ফুল। জুঁই, টগর আর মালতি ফুলের শুভ্র সৌন্দর্যে চারদিক মোহিত থাকে। শরতের প্রভাতে শিশির ভেজা শেফালি ফুল অনুপম সৌন্দর্য নিয়ে ঘাসের বুকে হাসে।

আকাশে, বাতাসে আর দূর্বাঘাসে শরৎ তার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য বিলিয়ে দেয়। এর অপূর্ব সৌন্দর্যে বাংলার প্রকৃতি ও পরিবেশ মোহনীয় হয়ে ওঠে। তাই তো কবি গেয়ে ওঠেন—

আজিকে তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে
হে মাতঃ বঙ্গা! শ্যামল অঙ্গা
ঝলিছে অমল শোভাতে।

শরতের সকালের বৈশিষ্ট্য : শরতের শিশির ভেজা প্রকৃতির আস্তরণ ভেদ করে সূর্য আলো ছড়ায়। সকালের মিষ্টি রোদ সত্যিই অনেক চমৎকার। শরতের সকালের স্নিগ্ধ বাতাস শরীরে জাগায় শিহরন। মাঠভরা ফসলের খেতে প্রথম যখন সূর্যের আলো পড়ে তখন সবকিছু যেন চিকচিক করে। এককথায়, শরতের সকালের অপরূপ সৌন্দর্য এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশের সৃষ্টি করে।

মানবমনে শরতের সকালের প্রভাব : শরতের সকালের মনোরম পরিবেশ মানবমনকে প্রফুল্ল করে। সারা আকাশজুড়ে বৃষ্টিহীন সাদা মেঘের বিচরণ মানুষের মনে এনে দেয় প্রশান্তি। সকাল বেলার মিষ্টি রোদ মানুষের মনকে ভাবুক করে তোলে। সকালে ঘাসের ওপর বিন্দু বিন্দু শিশির কণা, বিভিন্ন গাছে গাছে ফুটে থাকা ফুলের সমারোহ, বিভিন্ন ফুলের সুবাস প্রভৃতি থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা অতুলনীয়।

শরতের সকালের অন্যতম আকর্ষণ : শরতের সকালে নানান পিঠা বানানো বাঙালি সংস্কৃতির একটি অংশ এবং শরতের সকালের অন্যতম আকর্ষণ। প্রতিদিন সকালে গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে সকালবেলা পিঠা দিয়ে নাশতা করা হয়। তাছাড়া আত্মীয়–স্বজন ও বন্ধু–বান্ধবদের পিঠা খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ জানানো হয়। এভাবে সুপ্রাচীনকাল থেকে গ্রামে বাঙালি সংস্কৃতিকে ধরে রাখা হয়েছে ।

শরতের সকালে কৃষকের উচ্ছ্বাস : বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের বেশিরভাগ লোক জীবিকানির্বাহ করে কৃষিকাজ করে। শরৎকালে কৃষকরা খুব খুশি হয়। কেননা এ ঋতুতে ফসলের সম্ভাবনা জেগে ওঠে। বর্ষার দীর্ঘ সময় মাঠ–ঘাটে শুধু পানি আর পানি থাকে। কৃষক ঠিকভাবে ফসলের পরিচর্যা করতে পারে না। তাই শরৎঋতুর আগমনে কৃষকরা আবার নতুন ফসলের অপেক্ষায় থাকে। ঝিরঝির বাতাস ধানের খেতে ঢেউ দিয়ে যায় আর কৃষকের মনে দোলা দেয়। প্রকৃতিতে বহমান ঝিরঝির বাতাস কৃষকের সব অবসাদ দূর করে। তারা মনের আনন্দে জমিতে ফসলের পরিচর্যা করে আর মনে মনে সুখের স্বপ্ন বোনে।

শরতের সকালে জনজীবন : শরতের সকাল জনজীবনে নতুন আমেজ এনে দেয়। তখন পল্লির পথঘাট থাকে শুকনো। কোথাও কোনো কাদা থাকে না। সকাল হতেই মানুষের মধ্যে শুরু হয় কর্মব্যস্ততা। সবাই ছুটে চলে যার যার কর্মস্থলে। গ্রামাঞ্চলের খেয়াঘাটে জমে মানুষের ভিড়।

কাব্য সৃষ্টির আবেদন : শরতের আবেদন কবি ও সাহিত্যিক হৃদয়ে অতল গভীর। শরতের সকাল কবি–সাহিত্যিকদের মনে বিশেষভাবে ধরা দেয়। আর তাই তাঁরা তাঁদের সাহিত্যকর্মে শরতের সৌন্দর্যকে উপজীব্য করে তুলেছেন। শরতের সকালের সৌন্দর্য কবিদের হৃদয়াবেগকে বাজিয়ে দেয়, লেখনীশক্তিকে আরও তীক্ষ্ণ করে তোলে।

উপসংহার : শরতের নির্মল সৌন্দর্য মানুষকে করে মোহিত। এ সময় বাংলাদেশ এক অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়। বিশেষ করে শরতের সকাল বিচিত্র সৌন্দর্য বিলিয়ে দিয়ে সবার মন কেড়ে নেয়।

৯৮. নদীর তীরে সূর্যাস্ত *[দি. বো. '১৩]*
অথবা, সূর্যাস্তে একদিন
অথবা, যখন সন্ধ্যা নামে

ভূমিকা

"সন্ধ্যা হয়ে আসে,
সোনা–মিশেল ধূসর আলো ঘিরল চারিপাশে।
নৌকাখানা বাঁধা আমার মধ্যিখানের গাঙে,
অস্তরবির কাছে নয়ন কী যেন রং মাঙে।"

বিশ্বের হাজারো সৌন্দর্যের মধ্যে অন্যতম সৌন্দর্যপূর্ণ মুহূর্ত হলো নদীর তীরে সূর্যাস্তের দৃশ্য। কর্মব্যস্ত দিনের আলো মুছে গিয়ে পৃথিবীর বুকে একসময় সন্ধ্যা নেমে আসে। একটি আঁধার ধীরে ধীরে পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলে। দিন ও রাতের মধ্যবর্তীক্ষণে সূর্যদেব যে অপরূপ সৌন্দর্যদান করে, তা সত্যিই অভাবনীয়। সূর্যাস্তের এ সময়টি নিঃসন্দেহে একটি উপভোগ্য সময়। এ সৌন্দর্য আমাদের চিত্তে শিহরন জাগায়। কবিগুরু দিনশেষের কথা ভেবেই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব দিয়ে লিখেছেন—

"জানি গো দিন যাবে
এ দিন যাবে।
একদা কোন বেলাশেষে
মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার
মুখের পানে চাবে।

নদী ও বাংলার রূপ : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। অসংখ্য নদীনালা জালের মতো দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। বিভিন্ন ঋতুতে নদীর রূপ, নদীর জলরাশি, নদীতে চলমান নৌকা, নদীতীরের গাছপালা, দূরের আকাশের পাখি ইত্যাদি সব মিলিয়ে নদী যেন অপরূপ সৌন্দর্যে সজ্জিত থাকে সবসময়। দিনের শেষের গোধূলিলগ্ন নদীর এ সৌন্দর্যকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। সূর্যাস্তের সময় সূর্যের রক্তিম আভা এক বিচিত্র সৌন্দর্যে নদীকে রাঙিয়ে তোলে। নদীর এক অনন্য সুন্দর রূপ পরিলক্ষিত হয় তখন। কবির ভাষায়—

"আলোর সঙ্গে আকাশ যেথায় এক হয়ে যায় মিলে
শুভ্রে এবং নীলে
তীর্থ আমার জেনেছি সেইখানে।
অতল নীরবতার মাঝে অবগাহনস্নানে।"

সূর্যাস্ত দেখি যেখানে বসে : নদীতীরে বসে সূর্যাস্ত দেখার সুযোগ হলো সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। সামনের আকাশ মেঘমুক্ত। নীল আকাশে শরতের গা জুড়ানো হাওয়ার মাতামাতি। ঝাঁক বেঁধে সুদূরে ভেসে যাওয়া পাখির দল রবীন্দ্রনাথের বলাকার মতো পাখা ঝাপটিয়ে চলে যাচ্ছে কোনো আনন্দের বার্তা নিয়ে। আর আমি বসে ঝিলমের সেই স্তব্ধ মুহূর্তের মতো দেখছি সেই নয়নাভিরাম দৃশ্য। আমারও যেন মনে হচ্ছে—

"মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।"

সূর্যাস্ত মুহূর্তে দেখা নদীর উভয় তীরের বর্ণনা : মংলা বন্দরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পশুর নদী। নদীর এপারে বিস্তীর্ণ মাঠ বিভিন্ন গাছগাছালিতে পূর্ণ। মাঝে মাঝে ছোটো আঁকাবাঁকা রাস্তা আর জাহাজ ভেড়ানোর জেটি। ওপারে বিস্তীর্ণ সুন্দরবনের মনোরম শোভা। অনেক দূরে সুন্দরবনের গাছগুলো ছোটো আকারে দেখা যাচ্ছে। নদীতে ছোটো–বড়ো জাহাজ আসা–যাওয়া করছে। এছাড়া সাম্পান ও ছোটো ছোটো জেলে নৌকা নদীবক্ষে বয়ে চলেছে। এপারের বিল্ডিং এবং ছোটো ছোটো ঘরগুলো দূর থেকে দ্বীপের মতো মনে হয়। কিন্তু নদীর ওপারে শুধুই বন ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

নদীতীরে সূর্যাস্তের শোভা : দিনের রৌদ্রোজ্জ্বল আলো আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে আসে। সূর্যের তাপ কমতে থাকে। তারপর একসময় সূর্য আস্তে আস্তে পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ে। সূর্যের অস্ত রশ্মিপাতে সারা পৃথিবী আগুনবরণ ধারণ করে। নদীর জলে সূর্যরশ্মি ছড়িয়ে সোনালি আর রক্তিম রং মেলে চিকচিক করে। এক রঙিন খেলায় মেতে ওঠে নদীর জল এবং সূর্যের রশ্মি। সূর্যটা যখন নদীতীরে অস্ত যায় তখন মনে হয় যেন সে নদীর জলে ডুব দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে রোমান্টিক কবি William Wordsworth-এর কবিতা মনে পড়ে যায়—

"The world sleeps romantically
on the end of eventual time,
there is hymn
For the world

when it is embelleshed
with natural beauties."

সন্ধ্যার শোভা : ধীরে ধীরে সূর্য নদীর জলে ডুবে যায়। পৃথিবীর বুকে নেমে আসে শান্ত সন্ধ্যা। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়িতে আলো জ্বলে ওঠে। চারদিকে জোনাকিরা মিটিমিটি আলো ছড়ায়। নদীর তীরে হিমশীতল হাওয়া বইতে থাকে। ঝিঁঝি পোকা চারদিক থেকে ডাকতে শুরু করে। তখন পশ্চিমাকাশের রক্তিম আভা শেষ হতে না হতেই আকাশে চাঁদমামা উঁকি দেয়। শেষ হয়ে যায় সন্ধ্যা। কবির ভাষায়—

"পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণি চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি ... ...
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি।"

মানবমনে সূর্যাস্তের প্রভাব : সূর্যাস্ত দেখে মানবমন প্রফুল্ল হয়। হৃদয়ে জাগায় আনন্দের শিহরন। ভাবুক মানুষ ছবি আঁকতে বসে যায়। অস্তগামী সূর্যের রূপ-মাধুরী তুলির আঁচড়ে ধরে রাখতে মানুষের কতই না প্রচেষ্টা। সূর্যাস্ত দেখার প্রয়াসে কতজন ছুটে আসে নদীতীরে। কত স্মৃতি, কত কথা গাঁথা হয়ে যায় মনের ভেতর। কবির ভাষায়—

"দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ঐ ছায়া
ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ"

মনের আয়নায় সূর্যাস্ত : সূর্যাস্ত মানুষের মনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। সে তার ক্ষুদ্রত্ব বুঝতে পারে। উদার হয় তার হৃদয়। ঘুচে যায় সকল সংকীর্ণতা। কবির মনে জাগে—

"হেথায় এসে চেয়ে দেখি— নাই যে কেহ নাই।
কতকালে কত লোকে কত দিনের শেষে
ধুয়েছিল পথের ধুলা এইখানেতে এসে।"

স্মৃতির ভারে মানুষ কাতর হয়। সূর্যাস্তের আভা তার মনে দিন শেষের বাণী নিয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—

"দিন শেষ হয়ে এল, আঁধারিল ধরণী
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।"
হাঁগো, এ কাদের দেশে বিদেশি নামিনু এসে
তাহারে শুধানু হেসে যেমনি—
অমনি কথা না বলি ভরা ঘট ছলছলি
নতমুখে গেল চলি তরুণী
এ ঘাটে বাধিব মোর তরণী ॥"

দিনের শেষ মুহূর্তগুলো, সূর্যাস্তের ক্ষণগুলো মানুষের মনের আয়নায় গাঁথা হয়ে যায়। নানাভাবে, নানারূপে স্মৃতিময় হয়ে থাকে নদীতীরের সূর্যাস্ত।

সূর্যাস্তের পরে : ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হতে থাকে। আকাশ থেকে মিলিয়ে যেতে থাকে সোনালি আভা। তারপর একসময় সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়। মনে হয় নদীর ঢেউগুলো যেন সেই অস্তগামী সূর্যকে ধরে রাখার জন্য ব্যগ্র বাহু মেলে এগিয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে উদ্দাম জলরাশির অতলতলে ডুবে যায় সেই রক্তিম গোলক। দূরে আম্রবীথিকার অন্তরালে পল্লিকুটিরে জ্বলে ওঠে সন্ধ্যাদীপের শিখা। কর্মক্লান্ত মানুষেরা তাদের গৃহাঙ্গনে ফিরে আসে। দিগন্ত অস্তমিত সূর্যের আভা জেগে থাকে আরও কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে নেমে আসে স্তব্ধতার রাত। তখন—

"সন্ধ্যা তারা ধীরে
সর্ব্বপণে করে পদার্পণ নদীতীরে
অরণ্য শিয়রে।"

উপসংহার : নদীতীরে সূর্যাস্তের শোভা একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। এ শোভা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়। এ সৌন্দর্য সকল সৌন্দর্যপিপাসু মানুষের অন্তরে শিহরন জাগায়। পৃথিবীর এ অপরূপ সৌন্দর্য যে প্রত্যক্ষ করেনি তার জীবন যেন বৃথা। পৃথিবীর এ অনির্বচনীয় সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে প্রত্যেকেরই একবার হলেও নদীতীরের সূর্যাস্তের দৃশ্য অবলোকন করা উচিত।

৯৯. বাংলাদেশের নদনদী *[কু. বো. '০৯]*

অথবা, নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ

ভূমিকা

এই পদ্মা, এই মেঘনা,
এই যমুনা সুরমা নদী তটে
আমার রাখাল মন, গান গেয়ে যায়
আমার রাখাল মন, গান গেয়ে যায়
এই আমার দেশ, এই আমার প্রেম
আনন্দ বেদনায়, মিলন বিরহ সংকটে।
কতো আনন্দ বেদনায়, মিলন বিরহ সংকটে।

নদীমাতৃক আমাদের বাংলাদেশে প্রাকৃতিক কারণে বেশি পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। আবার এ দেশের অবস্থান হিমালয়ের মূল ভূখণ্ডে। আর এ সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলাদেশে অসংখ্য নদনদীর উৎপত্তি লক্ষ করা যায়। সমগ্র বাংলাদেশটি যেন নদনদী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে। আর এ কারণে বাংলাদেশকে নদীমাতৃক দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

বাংলাদেশের নদনদী : বাংলাদেশের নদনদীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এর গতিময়তা। অর্থাৎ পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে এ নদী তার অবিরাম গতিধারায় প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রের মাঝে মিলেমিশে একাকার হয়। এভাবে সমুদ্রবক্ষে চলতে গিয়ে নদী তার অসংখ্য শাখানদী, উপনদী ইত্যাদি সৃষ্টি করে থাকে। বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর মধ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ নদীগুলো বাংলাদেশের ভূখণ্ডকে যেন চতুর্দিক থেকে মায়া–মমতার বন্ধনে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। কবির ভাষায়—

এই মধুমতি ধানসিঁড়ি নদীর তীরে
নিজেকে হারিয়ে যেন পাই ফিরে ফিরে
এক নীল ঢেউ কবিতার প্রচ্ছদ পটে
আনন্দ বেদনায়, মিলন বিরহ সংকটে।

পদ্মা নদী : পদ্মা নদী বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গা নাম ধারণ করে এ নদী ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার দক্ষিণ সীমানায় প্রবেশ করেছে। আর এদেশে প্রবেশের পর এর নাম হয়েছে পদ্মা। পদ্মা নদী প্রথমে গোয়ালন্দের নিকটে যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। পরবর্তীতে তা মেঘনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়। উল্লেখ্য যে, একসময়ের পদ্মা নদীর বিচিত্ররূপ বর্তমানকালের প্রেক্ষাপটে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতের 'ফারাক্কা বাঁধ' এ গতিকে স্তিমিত করে দেওয়ার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। ফলে আমরা ন্যায্য অধিকার হারাতে বসেছি। আর এ কারণে পানির অভাবে রাজশাহী অঞ্চলে কৃষিকাজ স্থবির হয়ে পড়েছে। পদ্মা নদীর প্রধান শাখানদী হিসেবে মধুমতি, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ–র নাম উল্লেখ করা যায়। আবার মহানন্দা, কপোতাক্ষ, পশুর ইত্যাদি পদ্মা নদীর উপনদী হিসেবে গণ্য হয়।

মেঘনা নদী : ভারতের আসাম অঞ্চলের কাছাড় জেলার বরাক নদী সুরমা ও কুশিয়ারা— এ দুই নামে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে প্রবাহিত হয়েছে। এভাবে এ নদীর গতিপ্রবাহ সিলেটের পশ্চিমে আজমিরিগঞ্জে অবস্থান করে কালনি নাম ধারণ করেছে এবং তা ভৈরব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। অতঃপর ভৈরব থেকে মেঘনা নামে এ নদী চাঁদপুর গিয়ে পদ্মা নদীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। উল্লেখ্য যে, 'তিতাস ও ডাকাতিয়া' মেঘনা নদীর প্রধান দুটি শাখানদী হিসেবে গণ্য।

যমুনা নদী : ভারতের তিব্বত অঞ্চলের সাংপো নদ ব্রহ্মপুত্র নামে ভারতের আসাম অঞ্চল হয়ে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ তথা রংপুর সীমানায় প্রবেশ করেছে। এর পরে এ নদের গতি জামালপুরে যমুনা নামে স্বীয় পরিচয় লাভ করে। এ যমুনা নদী বাহাদুরাবাদ ও জগন্নাথগঞ্জ হয়ে গোয়ালন্দে তার গতিকে প্রবাহিত করে পদ্মা নদীর সঙ্গে মিলিত রূপ মেঘনার স্পর্শসহযোগে একই সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তিতাস, আত্রাই ও করতোয়া যমুনা নদীর প্রধান উপনদী। আর যমুনার শাখানদীর নাম ধলেশ্বরী। এ ধলেশ্বরী থেকে আরেকটি শাখানদী উৎপন্ন হয়ে ধলেশ্বরীতেই মিলেছে। একে বুড়িগঙ্গা নদী বলা হয়। আর এ বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা তার স্বীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র নদ : প্রায় দুশো বছর পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে তার গতিকে ভৈরবের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত করে। তবে প্রাকৃতিক কারণে এর গতিময়তায় পরিবর্তন ঘটে। ফলে বর্তমানকালে এ নদী জামালপুর অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গোয়ালন্দের দিকে ধাবিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখানদী নারায়ণগঞ্জের কাছে শীতলক্ষ্যা নামে তার গতিকে প্রবাহিত করে চলেছে।

কর্ণফুলী নদী : কর্ণফুলী নদীটিকে ঘিরে নানা ঐতিহাসিক কাহিনি বিদ্যমান। এ নদীটি ভারতের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এ নদীটি খরস্রোতা। এর মোহনা খুবই গভীর বলে প্রতীয়মান হয়। আর এ কারণে এ নদীর তীরেই বড়ো বড়ো জাহাজ অনায়াসে নোঙর করে। এভাবেই এখানে সর্ববৃহৎ বন্দর গড়ে উঠেছে। কর্ণফুলী নদীর প্রধান উপনদীর নাম হালদা, সিফেক ও কাসালং।

উপসংহার : প্রাকৃতিক পানির বৃহত্তম আধার হলো বাংলাদেশের নদনদী। তাই এ নদনদীগুলো আমাদের জাতীয় সম্পদ। এ নদনদী থেকে বিদ্যুৎ, মৎস্য সম্পদ, সেচব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, উর্বর পলিমাটি আমরা গ্রহণ করি। আর এভাবে নানাবিধ সম্পদে এ বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করতে নদনদীগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। আর তাই এর রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

আমি জন্মেছি বাংলায়
আমি বাংলায় কথা বলি।
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে, হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরশত নদী শুধায় আমাকে, কোথা থেকে তুমি এলে?

স্বাস্থ্য ও ব্যাধি

১০০. বার্ড ফ্লু

ভূমিকা : সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী এক আতঙ্কের নাম বার্ড ফ্লু। এ আতঙ্ক একযোগে ছড়িয়ে পড়েছে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ জুড়ে। এ আতঙ্ক থেকে পরিত্রাণের জন্য চলছে প্রতিরোধের ব্যাপক উদ্যোগ ও গবেষণা। এ রোগ বিভিন্ন এলাকায় মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে। বার্ড ফ্লু রোগের প্রধান বাহন হচ্ছে পাখি। এ থেকে পরবর্তীতে আক্রান্ত হয় মানুষ। তাই এ রোগের প্রতিরোধকল্পে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

বার্ড ফ্লু–র পরিচয় : বার্ড ফ্লু এক ধরনের ভাইরাস আক্রান্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা। এ ভাইরাসের নাম হলো 'টাইট অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জ' বা H_5N_1'। এটি পাখিবাহিত ভাইরাস–জাতীয় রোগ। এ ভাইরাস পাখির দেহ থেকে অপসারিত হয়ে মানুষের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সাথে মিশ্রিত হয়ে নতুন এক রোগের জন্ম দেয়। এটি অতি দ্রুত এক প্রাণীর দেহ থেকে অন্য প্রাণীর দেহে ছড়িয়ে পড়ে। তবে সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হচ্ছে 'টাইট অ্যাভিয়ান ইনফ্লয়েঞ্জা' ভাইরাসটি বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। এটি সার্স ভাইরাসের চেয়ে বিপজ্জনক। এ রোগের প্রকোপে বিশ্ব আজও আতঙ্কগ্রস্ত। এ বিষয়ে উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)।

বার্ড ফ্লু যেভাবে ছড়ায় : বার্ড ফ্লু রোগের প্রধান বাহক হলো জলচর পাখি, বন্যপাখি ও হাঁস–মুরগি; তবে মূলত এই রোগের রিজার্ভার হলো জলচর পাখি। এসব পাখির অন্ত্রে H_5N_1ভাইরাস বাস করে। এ ভাইরাস এসব পাখির বিষ্ঠা ও মলের সাহায্যে বেরিয়ে আসে এবং বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে মানুষসহ অন্যান্য পশুপাখিতে সংক্রামিত হয়। আক্রান্ত পশুপাখির হাঁচি–কাশির মাধ্যমে শ্লেষ্মা ও কফ আকারে বেরিয়ে আসে বার্ড ফ্লু জীবাণু এবং সুস্থ পশুপাখির শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে এদের দেহে ছড়িয়ে পড়ে।

দেশে দেশে বার্ড ফ্লু : প্রথম ১৯৯৭ সালে হংকং–এ মানবদেহে বার্ড ফ্লু ধরা পড়ে। হংকং–এ আক্রান্ত হয় ১৮ জন, তার মধ্যে মারা যায় ৬ জন। ১৯৯৮ সালে চীন দেশে এ রোগ শনাক্ত করা হয়। ২০০৩ সালে বার্ড ফ্লু ছড়িয়ে পড়ে নেদারল্যান্ডে। আক্রান্ত হয় ৮০ জন, মারা যায় ১ জন। ২০০৪ সালে মহামারি আকারে বার্ড ফ্লু দেখা দেয় ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডে। ভিয়েতনামের ৬৪ প্রদেশের মধ্যে ৫৬টি প্রদেশেই এ রোগ মহামারি রূপ ধারণ করে। ভিয়েতনামে বার্ড ফ্লু আক্রান্ত প্রায় ২০ কোটি মুরগি নিধন করা হয়েছে। মৃত্যু হয়েছিল ১৩ জনের। থাইল্যান্ডের ৭৬টি প্রদেশের মধ্যে ৩৫টি প্রদেশেই ছড়িয়ে পড়ে এ রোগ। নিধন করা হয় ১১ মিলিয়ন মুরগি। দক্ষিণ কোরিয়ার ১৬টি এলাকায় বার্ড ফ্লু–র প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এখানে

নিধন করা হয়েছিল ৩০ লক্ষাধিক মুরগি। ইন্দোনেশিয়ায় এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং নিধন করা হয় ৫ মিলিয়ন মুরগি। পাকিস্তানেও ধরা পড়ে H_5N_1 ভাইরাস। ২০০৬ সালে ভারতেও সন্ধান পাওয়া গেছে বার্ড ফ রোগের। তাই ভারত ও থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে মুরগি আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়।

বার্ড ফ্লু আতঙ্কে বাংলাদেশ : বাংলাদেশে ২০০৭ সালে প্রথমবারের মতো বার্ড ফ্লু আক্রান্ত মুরগি ধরা পড়ে। গাজীপুর, সাভার ও মানিকগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বার্ড ফ্লু আক্রান্ত হাজার হাজার মুরগি নিধন করা হয়। সম্প্রতি ভারত ও থাইল্যান্ডে H_5N_1 ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। বার্ড ফ্লু আতঙ্কের কারণে বাংলাদেশ পোলট্রি শিল্প ও অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এ রোগের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে সাধারণ জনগণ ব্রয়লার মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকে। ফলে রাতারাতি ব্রয়লার মুরগির পাইকারি ও খুচরা বাজারে চাহিদা ৬০ শতাংশ কমে যায়। তবে বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচার করা হয় ভালোভাবে সিদ্ধ করলে বার্ড ফ্লু–র জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে সম্প্রতি আবার পোলট্রি শিল্প চাঙা হয়ে উঠেছে।

বার্ড ফ্লু–র লক্ষণ : বার্ড ফ্লু রোগের উপসর্গ হিসেবে দেখা দেয় সর্দি, হাঁচি, জ্বর, গলা ব্যথা— এমনকি সারা গায়েও ব্যথা দেখা দেয়। এ রোগের সংক্রমণে চোখেও ইনফেকশন দেখা দেয়। দেখা দিতে পারে মারাত্মক নিউমোনিয়া। ধীরে ধীরে রোগী দুর্বল ও অচল হয়ে পড়ে। তীব্র শ্বাসকষ্টের এক পর্যায়ে আক্রান্ত ব্যক্তি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

বার্ড ফ্লু–র প্রতিকার : বার্ড ফ্লু রোগের ভাইরাসটি খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়। ফলে ভাইরাস–বিরোধী প্রতিষেধক প্রায়ই অকার্যকর হয়ে পড়ে। তবে ইনফ্লুয়েঞ্জা–নামক ভাইরাস–বিরোধী ঔষধ অনেকটা কার্যকর। ইতোমধ্যে এমালটাডিন এবং রাইমানটাডিন ঔষধ বার্ড ফ্লু ভাইরাসের জন্য কার্যকর প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করেছে। অন্যদিকে সেলটা–নির্ভর ও জ্যানাভাভির ওষুধও বেশ কার্যক্ষম।

বার্ড ফ্লু প্রতিরোধ : বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন ভ্যাকসিনের মাধ্যমে এ রোগের প্রতিরোধ সম্ভব। বার্ড ফ্লু আক্রান্ত দেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বিদেশ থেকে মুরগি আমদানির ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। আমাদের উচিত মুরগির খামার, মুরগির মার্কেট ও মুরগির মলমূত্র ডাম্পিং করা স্থান এড়িয়ে চলা।

উপসংহার : বার্ড ফ্লু সাম্প্রতিক বিশ্বের এক অন্যতম আতঙ্ক। দিন দিন এর সংক্রমণ ও দেশীয় পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্য দিকে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করছে নানা ভ্যাকসিন ও H_5N_1 ভাইরাস–বিরোধী ওষুধ। পাশাপাশি পোলট্রি ও পোলট্রি–সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা অতীব জরুরি। তবেই এ ঘাতক ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবে বিশ্ব ও বিশ্বজনতা।

১০১. ডেঙ্গুজ্বর ও এর প্রতিকার
অথবা, ডেঙ্গুজ্বরের প্রাদুর্ভাব ও প্রতিবার

ভূমিকা : মানুষ জন্মের পর থেকেই বিভিন্ন রোগশোকের মোকাবিলা করে টিকে আছে। রোগশোক মানুষের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে ভয়ংকর আতঙ্ক ডেঙ্গুজ্বর। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র ডেঙ্গুজ্বর এক মহামারি রূপ ধারণ করেছিল। মৃত্যু হয়েছে অনেকের। এর ভয়ে ঢাকা শহরের স্কুলকলেজ কয়েক দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে গোটা বিশ্বে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল প্রায় দুই কোটি মানুষ।

ডেঙ্গুজ্বর : ডেঙ্গু এডিস মশাবাহিত ভাইরাসজনিত এক ধরনের তীব্র জ্বর। এর সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। নেই প্যাটেন্টকৃত কোনো ওষুধ। উপসর্গের ওপর নির্ভরশীল হয়ে এর চিকিৎসা করতে হয়। ১৯৮৬ সালে আমেরিকার দক্ষিণ টেক্সাসে ডেঙ্গু রোগটি মহামারি আকারে দেখা দেয়। সাম্প্রতিক মহামারি ঘটে রেইনোসার মেক্সিকো সীমান্তে।

ডেঙ্গুজ্বরের প্রকারভেদ : ডেঙ্গুজ্বর সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা : ১. ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গুজ্বর ও ২. হেমোরেজিক ডেঙ্গুজ্বর। এ ভাইরাসের আবার চারটি সেরোটাইপ আছে। এগুলো হচ্ছে : DEN-1, DEN-2, DEN-3 এবং DEN-4— এ চারটি সেরোটাইপ থেকেই ডেঙ্গুজ্বর হতে পারে। তবে DEN-2 এবং DEN-3 বেশি মারাত্মক।

ডেঙ্গুজ্বরের উৎস : ডেঙ্গুজ্বর একটি মশকবাহী রোগ। এ রোগের উৎস এডিস মশা। বছরের একটি বিশেষ সময়ে প্রধানত বর্ষার শুরু কিংবা শেষের দিকে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এডিস ইজিপটাই এবং এডিস এলবোপিকটাস–নামক দুই প্রজাতির স্ত্রী মশা ডেঙ্গুজ্বরের বাহক। এসব মশার ডিম্ব স্ফুটনের জন্য মানুষের রক্ত খাদ্য হিসেবে উত্তম। তাই সফল প্রজননের জন্য এরা মানুষের রক্ত খাদ্য হিসেবে শোষণ করে। রক্তের সাথে ডেঙ্গু ভাইরাস চলে যায় মশার দেহে। এতে ওই মশাটি হয়ে ওঠে বিষাক্ত ও বিপজ্জনক ডেঙ্গু ভাইরাসবাহী। এ মশাটি যে সুস্থ মানুষকে কামড়ায় সেও আক্রান্ত হয় মারাত্মক ডেঙ্গুজ্বরে।

এডিস মশা চেনার উপায় : কোনো বিশেষ আকৃতি বা লক্ষণ দেখে এডিস মশা চেনা কষ্টসাধ্য। তবে এ মশার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্যান্য মশার নেই। এ মশার সারা শরীরে সাদা সাদা দাগ থাকে। বুকের দুই পাশে থাকে কান্তের

মতো দুটি দাগ। কালোর ওপর সাদা সাদা দাগ অন্যান্য মশারও থাকতে পারে। কিন্তু কাস্তের মতো দাগগুলো সাধারণত অন্যান্য মশার বুকে দেখা যায় না। এরা আকারে অনেক বড়ো হলেও অন্যান্য মশাও এদের সমান আকার হতে পারে। খালি চোখে নয় বরং ম্যাগনিফাইং গ্লাস দ্বারা এগুলোকে শনাক্ত করতে হয়।

এডিস মশার বংশবিস্তার : এডিস মশার বংশবিস্তার অন্যান্য মশার চেয়ে ব্যতিক্রম। এ মশা পরিষ্কার, বদ্ধ কিন্তু স্বচ্ছ পানিতে ডিম পাড়ে। ড্রেন বা নর্দমার পচা ময়লা পানিতে এরা ডিম পাড়ে না। সাধারণত বাড়ির আশেপাশের ফুলের টবে, ডাবের খোসায়, ভাঙা পাত্রে, পরিত্যক্ত টায়ারে, দুধ বা আইসক্রিমের কৌটায়, এসি বা ফ্রিজের নিচে জমে থাকা পানিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। শুকনো মৌসুমে এ মশার বংশবিস্তার খুব একটা হয় না। আবার অতিরিক্ত বৃষ্টির মধ্যেও এরা বংশবিস্তার করতে পারে না। বরং কিছুদিন পরপর বৃষ্টি হলে বিভিন্ন পাত্রের জমা পানিতে বংশবিস্তার করা এদের জন্য সহজ হয়।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ : এডিস মশা ডেঙ্গুজ্বরের বাহক; তাই বাহক মশা দমন করাই ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধের প্রধান উপায়। বাসগৃহে ফুলের টব, ড্রাম, নারকেলের মালা, ডাবের খোসা, গাড়ির টায়ার ইত্যাদিতে জমে থাকা পানিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। তাই এডিস মশা দমনে এসব পানি জমার স্থান ধ্বংস করতে হবে। বাড়িঘর ও তার আশপাশ পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। মশারি ব্যবহার করে এডিস মশার কামড় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এডিস মশা যেহেতু দিনে কামড়ায় সেহেতু দিনের বেলা ও ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করতে হবে।

উপসংহার : ডেঙ্গুজ্বরের ইতিহাস অনেক পুরোনো। এ মহামারি প্রথম ঘটে ১৭৭৯ সালে মিশর ও জাভাতে। ১৮৯৭ সালে অস্ট্রেলিয়া, ১৯২৮ সালে গ্রিস, ১৯৪৫ সালে লুসিয়ানা ও ১৯৮৬ সালে টেক্সাসে ডেঙ্গুজ্বর মহামারি হিসেবে দেখা দেয়। এর কোনো বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা না থাকায় এডিস মশা থেকে সাবধান থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

১০২. এইডস *[রা. বো. '০৯; সি. বো. '০৬; ব. বো. '০৮]*

অথবা, মরণব্যাধি এইডস

অথবা, এইডস : কারণ ও প্রতিরোধ

ভূমিকা

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ। এযুগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাফল্যও মানুষের কল্পনাতীত। কিন্তু একটি শব্দের কাছে চিকিৎসাবিজ্ঞান এখনো অসহায়। শব্দটি হলো 'এইডস'। মঙ্গল গ্রহে অভিযান চলছে। বজ্রপাতের মতো এ শব্দটা পারমাণবিক বোমার চেয়ে ভয়ংকররূপে বলল, পৃথিবীর মানুষ তোমরা বড়ো অসহায়, তোমরা এখনো প্রকৃতির হাতের পুতুল, তোমরা এখনো সবকিছু অর্জন করতে পারোনি—সেই শব্দটাই এইডস। ১৯৮১ সালে আমেরিকায় এ রোগ আবিষ্কার হয়—যে সময় মানুষের আয়ু বেড়েছে। তারপরও বজ্রপাতের মতো এ শব্দে মানুষ আতঙ্কে শিউরে ওঠে। কারণ, এখন পর্যন্ত আমরা এর কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারিনি। দুনিয়া কাঁপানো ভয়াবহ আতঙ্ক ছড়ানো ও অপ্রতিরোধ্য এইডস রোগটি এখনো উন্নত বিশ্বের মাথাব্যথার কারণ।

এইডস–এর বিস্তার : পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যেকোনো বিষয়ের সূচনা হয় একটি দেশে এবং ক্রমান্বয়ে তা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। আবিষ্কার বা সৃষ্টি যদি হয় ধ্বংসাত্মক তবে তা দ্রুত বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। এইডস তেমনি একটি জীবন বিনষ্টকারী ঘাতকব্যাধি। সুদূর আফ্রিকা থেকে মাত্র এক দশকের ব্যবধানে এ রোগ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি ধর্মের অনুশাসনে বাঁধা মুসলিম দেশগুলোও এ রোগের আগ্রাসি থাবা থেকে মুক্ত নয়। আঘাত হেনেছে বাংলাদেশেও। অবাধ যৌনমিলন এইডস রোগের বিস্তারের অন্যতম কারণ। বর্তমানে এইডস রোগ পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। তবে বিশেষ করে আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় এর প্রকোপ বেশি।

রোগের নামকরণ ও রোগের আবিষ্কার : এইডস কী এবং কেন এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য কেউ দিতে পারেনি। বর্তমানে এ মরণব্যাধি এইডস চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিকে যেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে । তবে সবাই স্বীকার করেন, এইডস ভাইরাসজনিত রোগ। এ ভাইরাসের নাম HIV। এর পুরোনাম 'হিউম্যান ইমিউন ভাইরাস'। AIDS–এর পুরোনাম 'অ্যাকোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম' (Acquird Immune Defecency Syndrome)। তাই বলা হয়, এইডস হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ করার অভাবজনিত লক্ষণ। ১৯৮১ সালের জুন মাসে আমেরিকার জর্জিয়া রাজ্যের আটলান্টার 'সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল' সর্বপ্রথম এইডস আবিষ্কার করে। এইডসের ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার ফলে রক্তে রোগ প্রতিরোধকারী T_4 কোষকে আক্রমণ করে। ফলে রোগীর মৃত্যু হয়। এ রোগের ওষুধ নেই বিধায় রোগীর মৃত্যু অনিবার্য।

এ রোগের লক্ষণ : এ রোগের অনেকগুলো লক্ষণ রয়েছে। যেমন–

১. রোগীর ওজন হ্রাস পায়।
২. অনেকদিন ধরে শুকনো কাশি হয়।
৩. এক মাসের বেশি একটানা জ্বর থাকে।
৪. এক মাস বা তার বেশি সময় ধরে পাতলা পায়খানা হয়।
৫. ঘাড় বা বগলে খুব বেশি ব্যথা হয় বা মুখমন্ডল রুগ্ণ হয়।
৬. শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছত্রাকজনিত রোগ দেখা যায়।
৭. শরীরের কোনো অংশ হঠাৎ করে ফুলে যায়।

এইডসের কারণ :

১. এইডস রোগীর সাথে যৌনমিলন করা।
২. কন্ডোম ব্যবহার না করা।
৩. এইডস রোগীর রক্ত গ্রহণ করা।
৪. HIV আক্রান্ত রোগীর ব্যবহৃত ইনজেকশনের সুচ বা সিরিঞ্জ ও দন্ত চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা।
৫. এইডস আক্রান্ত বাবা–মা থেকে শিশুর এইডস হতে পারে।

এইডস প্রতিরোধের উপায় : যেহেতু এইডসের কোনো সুনিশ্চিত চিকিৎসা নেই। এই রোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায় প্রতিরোধ করা। নিচে এই ভয়ংকর ঘাতকব্যাধির প্রতিরোধ করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

১. নারী–পুরুষের অবাধ মেলামেশা রোধ করা।
২. HIV আক্রান্ত রোগীর দেহ থেকে কোনো রক্ত গ্রহণ করা যাবে না।
৩. অন্যের ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, সুচ এবং দন্ত চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাবে না।
৪. ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।
৫. এইডস থেকে সাবধান থাকার জন্য জনগণকে সচেতন করতে হবে।

ভয়াবহ পরিণাম : রোগ ধরা পড়ার পর একাকিত্বতার কাছে রোগী হয়ে ওঠে অসহায়। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে সে পাগল হয়ে ওঠে। মানসিক ও দৈহিক যন্ত্রণায় যেভাবে কষ্ট পায় তা অত্যন্ত মর্মান্তিক।

আরোগ্যকারী ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা : এইডস রোগীর জন্য হতাশার বাণী হলো এই যে, প্রায় চার দশকের এইডসের কোনো ওষুধ আবিষ্কার করা যায়নি, যা দিয়ে এই ভয়াবহ প্রাণঘাতী শত্রুর কবল থেকে রোগী মুক্তি পেতে পারে। আতঙ্কিত বিশ্ববাসীকে এইডস অন্য সব রোগের মতো রোগ নয় বলেই চিকিৎসকরা মত দিয়েছেন।

উপসংহার : এইডস নিরাময়ে বিশ্বের বহু কল্যাণকামী মানুষ এগিয়ে এসেছেন। এটা অবশ্য ভালো দিক। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই মরণব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আমরা পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারব।

১০৩. আর্সেনিক দূষণ ও তার প্রতিকার

ভূমিকা : সুখ–দুঃখ, আনন্দ–বেদনা ও রোগশোকের মাঝেই মানুষের জীবন। রোগ–ব্যাধি সৃষ্টি হয় মানুষের অস্বাভাবিক জীবনযাপন ও নিত্যনতুন কলাকৌশল আবিষ্কারের প্রেক্ষিতে ও প্রকৃতির খেয়ালে। মানুষ এসব রোগশোক থেকে মুক্ত থাকতে চায়। কিন্তু যে রোগটি বাংলাদেশের প্রায় সকল মানুষের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটি হলো আর্সেনিক। মানুষ পানি পান ছাড়া কোনোক্রমে বাঁচতে পারে না; তাই পানির অপর নাম জীবন। আর সেই পানিতেই দেখা দিয়েছে আর্সেনিক দূষণ। এজন্য বাংলাদেশের শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত সকল মানুষ উদ্‌বিগ্ন আর্সেনিকের ভয়াবহতা সম্পর্কে।

আর্সেনিক কী : আর্সেনিক এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ, যা পানিতে দ্রবণীয়। এটি একটি দানাদার পদার্থবিশেষ, যা বায়ুর সংস্পর্শে আসলে কালো রং ধারণ করে। প্রাকৃতিকভাবে আর্সেনিক মাটি, পানি ও বায়ুতে অবস্থান করে। আর্সেনিক মূলত পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় মানবদেহে প্রবেশ করে আর্সেনিক দূষণ সৃষ্টি করে। মাটির উপরিভাগের তুলনায় নিচের ভাগে আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি। তাই আর্সেনিক মিশ্রিত পানি সাধারণত নলকূপের মাধ্যমে মাটির উপরিভাগে আসে।

বাংলাদেশে আর্সেনিকের প্রভাব : বাংলাদেশে আর্সেনিক সমস্যা একটি মারাত্মক সমস্যা। এটি মানুষের জীবনকে সংকটময় করে তুলছে। বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে 'জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর' চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বারোঘরিয়া ইউনিয়নে প্রথম নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের সন্ধান পায়। রাজশাহীতে ১ নভেম্বর ১৯৯৬ সালে কয়েক দফায় প্রায় ২৮টি নলকূপের মধ্যে

১৪টিতে এবং ৫০টির মধ্যে ৩২টিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। দুটি সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৯টি জেলার নলকূপের পানিতে আর্সেনিক পাওয়া যায়। সম্প্রতি এক জরিপে ৬০ জেলার ৯ হাজার ৮৯টি টিউবওয়েলের পানি পরীক্ষা করা হয়। এতে শতকরা ৮৫ ভাগ টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। সম্প্রতি ইউনিসেফের আর্থিক সহযোগিতায় 'জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর'–এর এক জরিপে দেখা যায়, দেশের মধ্যাঞ্চল অর্থাৎ, পশ্চিমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে পূর্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত এলাকা আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত। বৃহত্তর সিলেটেও আর্সেনিকের লক্ষণ বর্তমান। মোটামুটিভাবে বিশেষজ্ঞরা একমত যে, গাঙ্গেয় বদ্বীপ বা গঙ্গা অববাহিকার পাললিক ভূগঠন প্রক্রিয়ায় 'আর্সোনেপাইহেট' শিলাস্তর জমা হয়েছিল লাখো বছর আগে এবং সেচ কাজে অত্যধিক ভূগর্ভের পানি ব্যবহার করার ফলে শিলাস্তর ক্ষয় হয়ে পানিতে আর্সেনিক মিশেছে।

আর্সেনিকের লক্ষণ : আর্সেনিক বিষক্রিয়া ধীরে ধীরে শরীরের ক্ষতি করে। আর্সেনিক বিষক্রিয়ার পর রোগের পূর্ব লক্ষণ প্রকাশ পেতে প্রায় ৭–৮ বছর সময় লেগে যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে আক্রান্ত ব্যক্তির গায়ে কালো কালো দাগ দেখা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে রোগীর হাত ও পায়ের তালুর চামড়া খসখসে হয়ে যায়। তৃতীয় পর্যায়ে হাত–পায়ে গুটিগুটি দেখা দেয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে। আর্সেনিক আক্রান্ত ব্যক্তির সর্বশেষ পর্যায়ে যেসব লক্ষণ দেখা দেয় সেগুলো হলো :

১. হাত ও পায়ে গ্যাংগ্রিন অর্থাৎ, প্রান্তদেশীয় অঙ্গো পচন ধরে।
২. ত্বক, ফুসফুস ও মূত্রথলির ক্যানসার হয়।
৩. লিভারের ক্ষমতা লোপ পায়।
৪. কিডনির কার্যক্ষমতা লোপ পায়।
৫. চোখের মণি সাদা হয়ে যায় ও চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়ে।

আর্সেনিক সমস্যার সমাধান : আর্সেনিক সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো দূষণমুক্ত পানি সরবরাহ। আর্সেনিক দূষণ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এজন্য দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করে এর প্রতিকার ও প্রতিরোধ করতে হবে। আর্সেনিক দূষিত পানি বিশুদ্ধ করার জন্য এক ধরনের ট্যাবলেট আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি বেশ ফলপ্রসূ। ২০ লিটার পানিতে ৫০০ গ্রাম ফিটকিরি দিয়েও পানি বিশুদ্ধ করা যায়। সম্প্রতি আর্সেনিকের ভয়াবহতা প্রকাশিত হওয়ার পর সরকার বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আর্সেনিক মোটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো করা যেতে পারে :

১. আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করতে হবে।
২. ভূগর্ভস্থ পানি ও মাটি পরীক্ষা করে নিরাপদ স্থানে নলকূপ বসাতে হবে।
৩. আর্সেনিকযুক্ত পানি চিহ্নিত করতে হবে এবং সে পানি সরবরাহ করা বন্ধ করতে হবে।
৪. জেলা পর্যায়ে পানি শোধনাগার স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৫. পুকুর বা পরিষ্কার জলাশয়ের পানি ফুটিয়ে পান করতে হবে।
৬. জনস্বাস্থ্য বিভাগসমূহসহ সবাইকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৭. ব্যক্তিগত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আর্সেনিক প্রতিরোধে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে এ রোগ ধরা পড়লে আর্সেনিকযুক্ত পানি খাওয়া বন্ধ করলে রোগ আপনা–আপনিই সেরে যায়। প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি ও ফলমূল খেয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়াও সবুজ শৈবাল দিয়ে তৈরি স্পুরুলিনা–নামক ওষুধ কার্যকর বলে বাংলাদেশের অনেক চিকিৎসক অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যদিও আর্সেনিকের মূলত কোনো কার্যকর চিকিৎসা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

উপসংহার : অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যার মতো আর্সেনিক দূষণও জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। সরকার যদি এখনই কার্যকর ভূমিকা নিতে না পারে, তাহলে ভবিষ্যতে জাতিকে হয়তো চরম সংকটময় মুহূর্ত পোহাতে হবে। তাই সরকারকে অবশ্যই এখন থেকে দীর্ঘমেয়াদি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া আর্সেনিক দূষণ সম্পর্কে জনগণের জ্ঞান বাড়ানোর জন্য ব্যাপকভাবে এ দূষণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রচার করতে হবে।

জীবনী, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

১০৪. হজরত মোহাম্মদ (সা.)

ভূমিকা :

"তিনি দাতা দয়ালু, স্বর্গীয় মধুর চরিত্রবান,
সৃষ্ট জগতের নবি, উম্মতের শাফায়াতকারী,
রাসুলগণের ইমাম, পথের অগ্রণী, খোদার
বিশ্বাসী আমীন, জিব্রিলের অবতরণ স্থান;
আপনার কি উপযুক্ত প্রশংসা করতে পারি?
আপনার'পর সালাম, হে সৃষ্ট জগতের নবি।" —শেখ সা'দি

পথভ্রষ্ট মানুষদের সৎপথে পরিচালনার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে পৃথিবীতে মহাপুরুষ প্রেরণ করেছেন। মরুর দুলাল হজরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বগুণে গুণান্বিত একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। তিনি মানবজাতিকে সত্য পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য ইসলামের আদর্শ ও সত্যবাণী প্রচার করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। হজরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল। তিনি ধর্মবীর, কর্মবীর এবং সংস্কারক। তিনি শুধু স্বপ্নদ্রষ্টা মহামানবই নন, পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি অতুলনীয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

জন্ম ও বংশপরিচয় : ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার সুবেহ সাদেকের সময় আরবের মক্কা নগরীতে বিখ্যাত কুরাইশ বংশে মহানবি হজরত মুহাম্মদ (সা.) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ হজরত ইব্রাহিম (আ.)। তাঁর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব, পিতার নাম আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম বিবি আমেনা।

বাল্যজীবন : হজরত মুহাম্মদ (সা.)–এর বাল্যকাল কাটে অত্যন্ত দুঃখের মধ্য দিয়ে। তাঁর জন্মের ছয় মাস পূর্বে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। জন্মের কিছুকাল পর স্নেহময়ী জননীও হযরতকে ছেড়ে জান্নাতবাসী হন। হালিমা নামে এক ধাত্রী তাঁকে পুত্রস্নেহে লালনপালন করেন। পিতামাতার ইন্তেকালের পর তিনি প্রথমে পিতামহ আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিবের কাছে থেকে বড়ো হতে থাকেন। বাল্যকাল থেকেই মুহাম্মদ (সা.) খুব পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি চাচা আবু তালিবের মেষ চরাতেন। সততা ও নিষ্ঠার জন্য এসময় থেকেই তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাঁর সত্যবাদিতার জন্য আরবের লোকেরা তাঁকে 'আল–আমিন' বা 'বিশ্বাসী' উপাধি দিয়েছিল।

বিবাহ : হজরত মুহাম্মদ (সা.)–এর বয়স যখন ২৫ বছর, তখন তিনি বিবি খাদিজা নামে মক্কার এক ধনবতী মহিলার প্রতিনিধি হিসেবে সিরিয়াতে বাণিজ্যে যান। এই বিধবা মহিলা হযরতের গুণ ও সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি রাজি হন এবং বিবি খাদিজাকে বিয়ে করেন। বিয়ের সময় বিবি খাদিজার বয়স ছিল ৪০ বছর। এসময় থেকেই হজরত মুহাম্মদ (সা.) পরোপকার ও সমাজসংস্কারে মনোযোগ দেন।

নবুয়ত প্রাপ্তি : বাল্যকাল থেকেই হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন খুবই চিন্তাশীল। বিয়ের পর তিনি ধর্মচিন্তায় অধিকতর মনোযোগী হন। সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেন। চারদিকের পাপাচার ও নাস্তিকতা দূর করাই তাঁর চিন্তাভাবনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। মক্কার অদূরবর্তী হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় তিনি দীর্ঘ পনেরো বছর আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। ৬১১ খ্রিষ্টাব্দে চল্লিশ বছর বয়সে তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের মাধ্যমে চরম সত্যের সন্ধান পান এবং নবুয়ত লাভ করেন। এমনিভাবে ঐশীবাণীর মাধ্যমে তাঁর ওপর পবিত্র কুরআন শরীফ নাযিল হয়।

ধর্ম প্রচার : নূরনবি হজরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বাণী প্রচারের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি প্রচারের কাজ শুরু করেন। তিনি প্রচার করতে থাকেন—লা শরিক আল্লাহ। আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই। আল্লাহ–ই একমাত্র মাবুদ, তিনিই একমাত্র প্রভু, তিনি ছাড়া আর অন্য কোনো উপাস্য নেই। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম হলো ইসলাম ধর্ম বা শান্তির ধর্ম। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ—এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ তাঁর প্রেরিত রাসুল। এই মহাসত্য তিনি প্রচার করতে থাকেন। এ সত্য প্রচারের জন্য তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু মহানবি ছিলেন নির্ভীক। তিনি বললেন "কুরাইশগণ যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র আনিয়া দেয় তবুও আমি সত্য প্রচারে বিরত হইব না। হয় সত্যের প্রতিষ্ঠা করিব, না হয় প্রাণ দিব।" সত্য ধর্ম প্রচারে এই ছিল মহানবি (সা.)–এর দৃঢ় সংকল্প।

হিজরত : হজরত মুহাম্মদ (সা.)–এর ইসলাম ধর্ম প্রচারের ফলে এবং মূর্তিপূজার বিরোধিতা করার কারণে মক্কার কুরাইশগণ তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা হযরতকে হত্যার সুযোগ খুঁজতে লাগল, তখন তিনি মক্কায় অবস্থান করা নিরাপদ মনে করলেন না। তাই আল্লাহর নির্দেশে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে হজরত আবু বকর (রা)–কে সাথে নিয়ে মদিনায় প্রস্থান করলেন। মহানবি (সা.)–এর এই মক্কা ছেড়ে মদিনায় যাওয়ারই হিজরত নামে পরিচিত। মদিনার লোকেরা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে গ্রহণ করল। তখনকার ইহুদিগণ ছাড়া মদিনার প্রায় সকল লোকই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো। বিশ্বাসী ও ভক্ত মুসলমানদের মধ্যে অবস্থান নিয়ে তিনি ধর্ম প্রচার শুরু করলেন। মুসলমানদের প্রার্থনার জন্য মদিনায় কাঁচা ইটের গাঁথুনি ও

খেজুর পাতার ছাউনি দিয়ে নির্মিত হলো মসজিদ। এই মসজিদে বসে হজরত মুহাম্মদ (সা.) প্রথম মুসলিম রাজ্যের শাসন কাজ শুরু করলেন।

মক্কা বিজয় : ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে হজরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কায় হজ করতে গেলে কুরাইশদের সাথে 'হোদায়বিয়া' নামক স্থানে সন্ধি হয়। কিন্তু তারা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করলে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (সা.) দশ হাজার মুজাহিদসহ মক্কা জয়ের জন্য অগ্রসর হলেন। মক্কার বীরযোদ্ধাগণ একে একে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় কুরাইশরা হীনবল হয়ে পড়েছিল। হযরতকে বাধা দেওয়ার মতো কোনো শক্তিই তাদের ছিল না। মহানবি (সা.) তাঁর অর্পূব ধৈর্য, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও বিশ্বাসের বলে রক্তপাত ছাড়াই মক্কা জয় করেন। মক্কার লোকেরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করল। ফলে সমগ্র আরব ইসলামের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলো।

মহানবি (সা.) এর চরিত্র–মাধুর্য : পবিত্র কুরআন শরিফের বাণীর মধ্যেই মহানবি হজরত মুহাম্মদ (সা.)–এর চরিত্র–মাধুর্যের মর্মকথা নিহিত আছে। বিশ্বসভ্যতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্যশীলতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলি তাঁর চরিত্রকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাই তাঁর জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তুলেছে। তিনি ছিলেন স্নেহময় পিতা, প্রেমময় স্বামী, অসীম দয়ার সাগর, সদাময় প্রভু এবং নির্ভীক যোদ্ধা। প্রাণঘাতী শত্রুকেও তিনি হাতে পেয়ে ক্ষমা করেছেন। তাঁর মহত্ত্ব, চরিত্রবল ও উদার ব্যবহার শত্রুদেরকেও মুগ্ধ করত। মহানবি (সা.)–এর অভূতপূর্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে লোকেরা তাঁকে ফেরেশতা বলে ধারণা করলে তিনি বলেছিলেন, "আমি তোমাদের মতোই মানুষ, আমি আল্লাহ তা'আলার দূত এবং দাস— আমি কোনো দেবতা বা অবতার নই।" হযরতের এই বাণীর মধ্যেই তাঁর চারিত্রিক মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে এবং ঘোষিত হয়েছে মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ জয়। হজরত মুহাম্মদ (সা.) –এর মতো এমন মহান চরিত্রের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর নেই।

ইন্তেকাল : ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল হজরত মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র জগৎকে শোকসাগরে ভাসিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৬৩ বছর।

উপসংহার : হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন আল্লাহর প্রিয় রাসুল ও নবি এবং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহামানব। তিনি মানবতার ইতিহাসে এক অভিনব যুগান্তর এনেছিলেন। তাই আমাদের সকলের উচিত, মহানবি (সা.) এর আদর্শ ও বাণীকে আমাদের জীবনের পাথেয় করে নিয়ে তাঁর অনুপ্রেরণায় ধাবিত হওয়া।

১০৫. সাহিত্য ও সমাজ *[য. বো. '১২]*

অথবা, বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অথবা, সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক

অথবা, সাহিত্য সমাজের দর্পণ

ভূমিকা

মানুষ তার মনের ভাব অপরের কাছে প্রকাশ করার জন্য সাহিত্যের আশ্রয় নেয়। 'অপর' বলতে এখানে মূলত বোঝানো হয়েছে সমাজের মানুষদের, যারা আমাদের আশেপাশে বসবাস করছে। আবার সাহিত্যিক যেহেতু সমাজেরই একজন, তাই সাহিত্যে তিনি তার ব্যক্তিমনের নিভৃতে সঞ্চিত আশা–আকাঙ্ক্ষা, কল্পনাকে পরিস্ফুট করার পাশাপাশি প্রকাশ করেন দেশ–কাল–সমাজের একটি বিশেষ রূপ। সমাজ ছাড়া সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ তাঁর রচনার উপকরণ তিনি সমাজ থেকেই সংগ্রহ করেন। তাই সমাজ ছাড়া সাহিত্যিকের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। আবার সাহিত্যিক ছাড়াও আধুনিক সমাজের কথা ভাবা যায় না। এককথায় সাহিত্য ও সমাজ পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক : সাহিত্য সমাজের দর্পণস্বরূপ। সমাজজীবনের নানা বিষয় সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়। সমাজকে কেন্দ্র করেই সভ্যতা বিকশিত হয়। লেখক যেহেতু সামাজিক জীব, তাই তার রচনায় সমাজের প্রতিফলন ঘটে। সাহিত্য সৃষ্টিতে সাহিত্যিক কল্পনার আশ্রয় নেন। তবে এই কল্পনার সাথে বস্তুগত বিষয়ও থাকে। আর এ বস্তুস্পর্শ লাভ করা যায় জীবন তথা সমাজ থেকে। কাজেই এ কথা নিশ্চিত যে, সাহিত্যের সাথে সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং সাহিত্য রচিত হয় সমাজবদ্ধ মানুষের জন্যই। মানবজীবনের একটি অংশ হলো আনন্দ। আর সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে মানুষ আনন্দ লাভ করে। তাই আনন্দকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সার্থক হয় না। কাজেই জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগ যেমন বস্তুসত্তার দিক দিয়ে তেমনি আনন্দের দিক থেকেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, সাহিত্য দুই ধরনের; একটি ভাবপ্রধান,

অন্যটি বস্তুপ্রধান। দুই ধরনের সাহিত্যেই রয়েছে জীবনের বিশ্লেষণ। অর্থাৎ সমাজজীবনের চিত্র। যে লেখক যত সূক্ষ্মভাবে জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন তাঁর সাহিত্যে সমাজ তত জীবন্ত হয়ে ওঠে। সাহিত্য হলো সমাজনির্ভর শিল্প। তাই সাহিত্যে সমাজের কথা, সমাজবদ্ধ মানুষের কথা থাকে। সাহিত্য রচিত হয় মানুষের জন্য, সাহিত্যের জন্য মানুষ সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু তাই বলে সাহিত্যের মুখ্য প্রসঙ্গ সমাজ নয়। সমাজ এবং সামাজিক সমস্যা সাহিত্যের আংশিক প্রসঙ্গ হিসেবে আসতে পারে, যদি তা সার্বিক অর্থে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় তবে তা শ্রেষ্ঠ বা সার্থক সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত হবে না। তা হবে সামাজিক সমস্যার। তাই বলে সাহিত্যের সাথে সমাজনীতির বিরোধ আছে এমন কথা বলা যাবে না। সামাজিক সমস্যা অনেক কাল ধরেই সাহিত্যে ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে।

বিশ্বসাহিত্যে সমাজ : আনুমানিক দু'হাজার বছর আগে মিশরে লিখিত বিভিন্ন কাহিনিতে সে সময়ের সমাজ–বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাহিত্যেও সমাজচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনায় সমাজের ছবি বারবার ধরা দিয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে সমাজ সম্পর্কে তাদের মনোভঙ্গি। দস্তয়ভস্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট', 'ম্যাক্সিম গোর্কির মা' প্রভৃতি সাহিত্যে রাশিয়ার সমাজবাবস্তবতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডিগুলোতে সমকালীন ইংল্যান্ডের জনমানুষের ছবি ফুটে উঠেছে। সংস্কৃত ভাষার কবি কালিদাসের রচনাবলিতে আমরা গুপ্তযুগের ভারতবর্ষের একটি আনুপূর্বিক জীবনচিত্রের সন্ধান পাই। চার্লস ডিকেন্স, তলস্তয়, ফ্লবেয়ারের কথাসাহিত্যে সমাজের বাস্তবচিত্র যথাযথভাবে রূপায়িত হয়েছে।

বাংলার সাহিত্য ও সমাজ : পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্যের মতোই বাংলা সাহিত্যেও সমাজজীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের সূচনাপর্ব থেকেই কবি–সাহিত্যিকদের সমাজচেতনা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিচে বাংলা সাহিত্যে সমাজচিত্র কীভাবে রূপায়িত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রাচীন সাহিত্য ও সমাজ : বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হলো চর্যাপদ। এগুলো বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধন সংগীত। তারা নিগূঢ় তত্ত্বকথা বলতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত রূপক, প্রতীক ও অলংকারের। তাই ধর্মকে ছাপিয়ে মানুষ ও সমাজবাস্তবতাই এখানে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। সেই হাজার বছর আগে বাঙালি সমাজে শ্বশুর–শাশুড়ি পরিবৃত যৌথ সমাজ ছিল। সেকালের মানুষরা নৌকা তৈরি করত, শিকার করতে যেত বনাঞ্চলে এবং নারীরা ছিল আজকের মতোই প্রসাধনপ্রিয়। দারিদ্র্যপীড়িত সমাজজীবনের চিত্র রয়েছে চর্যাপদে। একটি চর্যায় স্পষ্টই বলা হয়েছে–

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।

অর্থাৎ টিলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই অথচ নিত্য অতিথি আসে। বর্ণাশ্রমপীড়িত শ্রেণিভিত্তিক সমাজের চিত্রও চর্যাপদে খুঁজে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের সাহিত্য ও সমাজ : বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের রচনা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কৃষ্ণ ও রাধার হৃদয়–বেদনার কথামালা হয়েও তা যেন সমাজেরই আলেখ্য। এ কাব্যে কৃষ্ণ একজন অশিক্ষিত যুবক, দেবতা নন। অন্যদিকে রাধাও দেবী নন। তিনি মানবিক বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ রক্তমাংসের মানুষ। তার সমাজের লাজলজ্জার ভয় আছে। এখানে আমরা অসম বিবাহ ও তার বেদনাময় পরিণতি, হাঁচি টিকটিকি প্রভৃতি কুসংস্কার, নারীদের বিচিত্র সাজসজ্জা, নারী–পুরুষের প্রেম প্রভৃতির চিত্র পাই। মধ্যযুগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হলো মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যে যেসব দেব–দেবী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তারা সমাজের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর শ্রেণির পূজা পেয়েছেন প্রথমে, পরে সমাজের তথাকথিত উচ্চবিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন সমাজজীবনের দুঃখ, দারিদ্র্য, আনন্দ–বেদনা প্রভৃতির চিত্র রূপায়িত হয়েছে।

উনিশ শতকের সাহিত্য ও সমাজ : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা ঘটে উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই। তখনকার মানুষের সামাজিক জীবনচর্চার পরিচয় পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ও মীর মশাররফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ'–এর মতো নাটকে। উনিশ শতকের বিশিষ্ট সৃষ্টি হলো গীতিকবিতা। ব্যক্তি–হৃদয়ের উপলব্ধি এ ধরনের সাহিত্য সৃষ্টির মূল প্রেরণা। কিন্তু সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি–উপলব্ধির প্রকাশ ঘটানো সম্ভব ছিল না। আধুনিকতার সূচনার সঙ্গে সাহিত্যেও অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সমাজজীবন আশ্রিত ব্যক্তিঅভিজ্ঞতারই এক নান্দনিক প্রকাশ হলো গীতিকবিতা। আঠারো শতকের শেষার্ধ এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যে কবিগান ও শায়েরের সৃষ্টি হয়েছিল তা তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা অব্যবস্থারই ফল।

বাংলা কথাসাহিত্য ও সমাজ : বাংলা কথাসাহিত্যে বাবু'র সঙ্গে বাবু'র ধারক ক্ষয়িষ্ণু সমাজের চিত্র পাওয়া যায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। তার 'নব বাবু বিলাস' (১৮২৫) এ ধরনের সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। ক্যাথেরিন মুলেন্সের লেখা ফুলমণি ও করুণার বিবরণে (১৮৫২) খ্রিষ্ট ধর্মান্তরিত বাঙালি পরিবারে ধর্মজীবনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে এক পূর্ণতর সমাজচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এরই কিছু সময় পর লেখা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'য় (১৮৭৪) বাঙ্গার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের চিত্র রূপায়িত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসে সমাজজীবন ও সমাজব্যবস্থার রূপ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসে বৃহত্তর সমাজকাঠামোর পরিচয় আমরা পাই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মূলত সমাজের নির্মমতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এবং এ সমাজের প্রতি ঔপন্যাসিকের সহানুভূতি লক্ষ করা যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে রাঢ় বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় পাই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের দুঃখ–দারিদ্র্য ও জীবনচেতনার এক অনুপম কথামালা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটোগল্পে সমাজের মধ্যবিত্ত, কেরানি শ্রেণি ও নিম্নবিত্ত মানুষের পরিচয় পাই।

বাংলা নাটকে সমাজ : সমাজজীবন সাহিত্যকে কীভাবে প্রভাবিত করে তার প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে বাংলা নাটকে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০) প্রহসনে তৎকালীন বাবু সমাজের তথা ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবকদের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে তিনি তুলে ধরেছেন ধনী, চরিত্রহীন জমিদারের চরিত্র। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬)–তে অধঃপতিত ইয়ং বেঙ্গল সমাজের প্রকৃত চিত্র অঙ্কন করেছেন। 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকে তিনি নীলকরদের অত্যাচার এবং প্রজাদের দুঃখ–দুর্দশার কথা তুলে ধরেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯) নাটকে সামাজিক সমস্যার সংবেদনশীল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

বাংলা কবিতা ও সমাজ : বাংলা কাব্যসাহিত্যেও সমাজজীবনের নানা দিক ফুটে উঠেছে। জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় গ্রামবাংলার ঐতিহ্য ও সমাজজীবন প্রাধান্য লাভ করেছে। অত্যন্ত সফলভাবে তিনি গ্রাম্যজীবন ও গ্রামবাংলার পরিবেশকে কাব্য রচনার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর 'নকশী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাঁট' প্রভৃতি কাব্যে বাংলার মানুষ ও প্রকৃতি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর কবিতায় প্রথম ঘোষণা করেন– "আমি কবি যত কামারের আর কুমারের, মুটে মজুরের।" শ্রমজীবী সমাজকে তিনি তাঁর বিভিন্ন কবিতায় তুলে ধরেছেন। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার প্রধান লক্ষণ হলো যুগচেতনা ও সমাজ–মনস্কতা। তার 'পদাতিক', 'ছাড়পত্র' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এরই স্বাক্ষর বহন করে। কাজী নজরুল ইসলাম কাব্যের মাধ্যমে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা–উত্তর বাংলাদেশের সাহিত্যেও সমাজচেতনার বিষয়টি লক্ষণীয়।

উপসংহার : সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সংযোগ একালে আরও বেশি ঘনিষ্ঠ। সমাজের নানা সংঘাত যত বাড়বে, সাহিত্যও তত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে। কেননা সাহিত্যের বিষয় মানুষের জীবন ও মন। সেই জীবন ও মনের ওপর ভিত্তি করেই সাহিত্যসৌধ নির্মিত হয়। সমাজজীবনে নানা সংকট বিদ্যমান। সাহিত্য সমাজের এ সংকট থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়। তাই একজন সাহিত্যিককে সমাজের কল্যাণের দিকে লক্ষ রাখা উচিত এবং সাহিত্যে তার প্রকাশ ঘটানো সাহিত্যিকের কর্তব্য। কেননা সমাজমনস্ক একজন সাহিত্যিক সমাজের বিবেকরূপে গণ্য হতে পারেন।

১০৬. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অথবা, তোমার প্রিয় কবি ও সাহিত্যিক

ভূমিকা

জীবনে যা চিরদিন
রয়ে গেছে আভাসে
প্রভাতের আলোকে যা
ফোটে নাই প্রকাশে,

যেসব কবি–সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম। কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের এক বিরাট বিস্ময়। কেবল কবিশ্রেষ্ঠ হিসেবে নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ রূপেও তিনি সারা বিশ্বে সম্মানিত । মানবজীবনে এমন কোনো চিন্তা নেই এমন কোনো ভাব নেই যেখানে তিনি বিচরণ করেননি। তিনি মানুষের চিরন্তন সুখ–দুঃখ ও আনন্দ–বেদনার পালাগান রচনা করে গিয়েছেন। তাঁর কাব্যে ব্যথাহত পাবে ব্যথা জয়ের প্রেরণা, দার্শনিক পাবেন প্রকৃত সত্যের সন্ধান, রাজনীতিক পাবেন নির্ভুল পথের নির্দেশ, মৃত্যুপথযাত্রী পাবেন মৃত্যুঞ্জয়ী

সান্ত্বনা। এককথায়, এ দুঃখ–দ্বন্দ্বময় নৈরাশ্যপীড়িত যুগে রবীন্দ্রনাথই আমাদের একমাত্র কল্প তরু; আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাবরঙ্গে অবগাহন করি, তাঁর চিন্তা ধারায় চিন্তা করি, তাঁর সুরে গান গাই, তাঁর ভাষায় কথা বলি।

জন্ম ও বংশপরিচয় : কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ১২৬৮ সালের ২৫ শে বৈশাখ (৭ই মে ১৮৬১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতার নাম সারদাসুন্দরী দেবী। পিতার নয় পুত্র ও ছয় কন্যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চতুর্দশ। সেকালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ধনে–জনে–মানে যেমন ছিল তেমনি শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চায়ও ছিল আদর্শস্থানীয়।

বাল্যকাল ও শিক্ষা : জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথ ভোগবিলাসের মধ্যে বড়ো হয়নি। শৈশবে বিদ্যালয় নয়, নিজবাড়িতে গৃহশিক্ষকের নিকট চার বছর বয়সে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। বাড়িতে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অঙ্কন, সংগীত ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা তার শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। আট বছর বয়সে তাঁকে কলকাতার নর্মাল স্কুলে ভর্তি করা হয়। বাল্যকাল হতে তিনি বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃতি ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। সতেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাত গমণ করেন এবং ব্রাইটন পাবলিক ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন।

কবি কিশোরের কাব্যচর্চা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটোবেলা থেকেই কবিতা রচনায় মগ্ন ছিলেন। তাঁর প্রথম কবিতার লাইন "জল পড়ে পাতা নড়ে"। পনেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'বনফুল' (১৮৭৬) প্রকাশিত হয়। লন্ডন থেকে ফিরে এসে তিনি সম্পূর্ণরূপে সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর সাহিত্যজীবন ছিল দীর্ঘ। দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে তিনি অসংখ্য কবিতা, গান, উপন্যাস, ছোটোগল্প ও প্রবন্ধ রচনা করেন।

সাহিত্য সাধনা : বাংলা কাব্যের প্রথম রূপশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর রচিত—মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, বলাকা, ক্ষণিকা, চৈতালি, গীতাঞ্জলি, মহুয়া, পুনশ্চ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ; ডাকঘর, বিসর্জন, রক্তকরবী, মুক্তধারা, অচলায়তন প্রভৃতি নাটক; গোরা, নৌকাডুবি, চতুরঙ্গ, চোখের বালি প্রভৃতি উপন্যাস এবং বহুসংখ্যক ছোটোগল্প, প্রবন্ধ তাঁর অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় বহন করে। এছাড়াও তিনি দুই হাজারেরও বেশি গান রচনা করেছেন।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'গীতাঞ্জলি' ইংরেজিতে অনুবাদের পর তিনি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন এবং ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে এরূপ সম্মানের অধিকারী হন।

রবীন্দ্রসংগীত : আশৈশব সংগীতে ছিল রবীন্দ্রনাথের অসামান্য পারদর্শিতা। আশৈশব সুকণ্ঠী কবি নিজের সংগীতে নিজেই সুর সংযোজন করে রবীন্দ্রসংগীতের একটি অনবদ্য ঐতিহ্যধারা সৃষ্টি করে যান। কথা ও সুরের এমন অন্বয় সম্মিলন সত্যিই বিরল দৃষ্টান্ত। যতদিন পৃথিবীতে প্রেম, প্রকৃতি, ঈশ্বর চেতনা, স্বদেশ চেতনা থাকবে; ততদিন রবীন্দ্রসংগীতের আবেদন শেষ হবে না। রবীন্দ্রসংগীত নিখিল মানবজগতের তৃষিত চিত্তের তৃপ্তি সরোবর। তাঁর সংগীতের সংখ্যা যেমন বিপুল তেমনি বৈচিত্র্যময়। ভারতের এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি।

চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ : ছবি আঁকা ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বিষয়। তিনি অত্যন্ত উঁচু মাপের চিত্রকর ছিলেন। তাঁর আকা ছবির সংখ্যা দুই হাজারের বেশি।

নাটক ও অভিনয় : আবৃত্তি এবং অভিনয়েও তাঁর প্রতিভা আশ্চর্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। স্বরচিত নাটকে স্বয়ং বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মঞ্চজগতে অভিনয়ের যে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন, তা পরবর্তীকালে আমাদের নাটক এবং রঙ্গামঞ্চের ইতিহাসে ব্যর্থ হয়নি। শুধু তাই নয়, পরিণত বয়সে চিত্রশিল্পেও তিনি বিশ্বকে বিস্মিত করে দেন।

দেশভ্রমণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি ইংল্যান্ড, চীন, জাপান, রাশিয়া, আমেরিকা, ইরান, তুরস্ক, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। তাঁর বিদেশভ্রমণের পরিচয় রাশিয়ার চিঠি, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, পারস্যে, জাপান যাত্রীর ডায়েরি ইত্যাদি গ্রন্থে আছে। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ ও ১৯২৬ সালে মোট দুই বার বাংলাদেশে আসেন।

স্বদেশ ও সমাজ : স্বাধীনতা আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করলেও কবিতা, প্রবন্ধ ও সংগীতের মধ্য দিয়ে তিনি জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে এবং তার পরবর্তী সকল আন্দোলনে তিনি তাঁর কাব্যসাধনার অপূর্ব আলোকে প্রোজ্জ্বল করে গিয়েছেন জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে। জালিয়ানওলাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তাঁর সোচ্চার প্রতিবাদ এবং স্যার উপাধি ত্যাগ তো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন : রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কবিশ্রেষ্ঠ রূপেই শ্রদ্ধেয়। গঠনমূলক কাজেও রবীন্দ্রপ্রতিভা বিস্ময়কর কৃতিত্বের অধিকারী তা অনেকের অজ্ঞাত। বীরভূম জেলার বোলপুরে ভারতীয় আদর্শে তিনি 'শান্তিনিকেতন' নামে একটি

শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে সেখানে স্বয়ং শিক্ষাদানে ব্রতী হন এবং কালক্রমে সেখানে বিশ্বভারতী নামে একটি বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া শান্তিনিকতনের অদূরে দেশীয় কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য তিনি 'শ্রীনিকেতন' নামে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে রেখে যান যা কি না ছিল ভবিষ্যৎ ভারত গঠনের ইঙ্গিত।

বিবাহ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর বাইশ বছর বয়সে মৃণালিনী দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু ১৯০২ সালে মৃণালিনী দেবী অকালে মৃত্যুবরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে স্মরণ করে 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

মহাপ্রয়াণ : অবশেষে অম্লান মানবপ্রীতি, গভীর স্বদেশানুরাগ এবং রসপ্রগাঢ় উন্নত সাহিত্যসম্ভার পেছনে রেখে ২৫ বৈশাখের গৌরব সূর্য মহাকাশ পরিক্রমণ শেষে ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮) কলকাতার রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটে। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি তাঁকে আবহমানকাল ধরে অমর করে রাখবে।

উপসংহার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষার কবি হলেও সারা পৃথিবীর মানুষের কথা বলেছেন, মানবতার গান গেয়েছেন। তাই তিনি বিশ্বকবি, বিশ্বমানবতার কবি। বাংলা ভাষা–সাহিত্য এবং বিশ্বসাহিত্যের দরবারে তিনি চির অমর ও চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন।

১০৭. প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশ *[চ. বো. '১২; সি. বো. '১১; য. বো. '১৩]*

ভূমিকা : কবিতা কার না ভালো লাগে? ছোটোবেলায় মা ঠাকুমার মুখে ছড়া শুনে কোন শিশু না অভিভূত হয়। শৈশবে মায়ের মুখে ছড়া শুনে ছোটো থেকেই আমার কবিতার প্রতি ভালোবাসা। আমি একপ্রকার কবিতার পরিবেশেই বড়ো হয়ে উঠেছি। যখন আমি এক্কেবারে ছোটো তখন মায়ের মিষ্টি সুরে শুনতাম সুকুমার রায় ও যোগীন সরকারের ছড়া। একটু বড়ো হয়ে শুনেছি বাবার উদাত্ত আবৃত্তি। পরিচিত হয়েছি কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ, প্রমুখ কবিদের সাথে। সকল কবিতার মানে বুঝতে পারতাম না। কিন্তু শব্দে ধ্বনি আমার মনে গভীর ভাবের সঞ্চার করে দিত। অনেক কবির কবিতা শুনেছি কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে কবি জীবনানন্দ দাশ আমার প্রিয় কবি হয়ে উঠেছেন তা ঠিক বলতে পারবো না। জীবনানন্দের কবিতা আমার চেতনায় এক অন্য রকম স্বাদ এনে দিয়েছে। যতবার জীবনানন্দের লেখা কবিতা পড়ি ততই কবি হিসেবে তিনি আমার প্রিয় হয়ে ওঠেন।

কবির জীবন : প্রিয় কবির কবিতার কথা বলতে গেলে তাঁর জীবনকথাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। ১৮৯৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল শহরে জীবনানন্দ দাশ জন্মগ্রহণ করেন। মাতা কুসুমকমারী দেবী খুব ভালো কবিতা লিখতেন। পূর্ব বাংলার নদীনালা, মাঠ–ঘাট, গাছপালা, পশুপাখি, কবির চেতনায় এক চিরস্থায়ী স্থান অর্জন করে নিয়েছিল। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই পিতা সত্যানন্দ দাশগুপ্ত–এর কণ্ঠে উপনিষদ আবৃত্তি ও মায়ের গলায় গান শুনতেন। জন্ম থেকেই এক সাহিত্যচর্চার পরিবেশে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন কবি জীবনানন্দ। বিদ্যালয়ে পড়াশোনা চলাকালীনই জীবনানন্দ বাংলা ও ইংরেজি ভাষাতে লেখা শুরু করেন। সেসময় তাঁর ছবি আঁকার ওপরও ঝোঁক ছিল। তিনি ছিলেন আত্মমগ্ন, নিঃসঙ্গ ও বেশ লাজুক স্বভাবের মানুষ। স্পর্শকাতরতা ও বিষণ্ণকার সঙ্গে মিশে ছিল প্রকৃতিপ্রেম ও গভীর প্রজ্ঞা। তাঁর কবিতায় বারবার উঠে এসেছে মানুষের বেদনার কথাও। জীবনানন্দ দাশ ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। জন্মসূত্রে তাঁর পদবি 'দাশগুপ্ত' হলেও তিরিশের দশকের শুরুতে তিনি 'গুপ্ত' ত্যাগ করে শুধু দাশ লেখা শুরু করেন। ১৮৫৪ সালে ১৪ই অক্টোবর অন্যমনস্ক কবি ট্রাম দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। ২২ই অক্টোবর তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

কবিতার বৈশিষ্ট্য : ছোটোবেলা থেকেই সম্ভবত মা কুসুমকুমারী দেবীর প্রভাবেই পদ্য লিখতে শুরু করেন কবি জীবনানন্দ দাশ। ১৯১৯ সালে তিনি 'বর্ষার আহবান' নামে একটি কবিতা লেখেন যা তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত কবিতা। যৌবনের প্রারম্ভেই জীবনানন্দের কবিপ্রতিভা বিকশিত হতে শুরু করে। ১৯২৫ সালে জুন মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর স্মরণে 'দেশবন্ধুর প্রয়াণে' নামক এক কবিতা লেখেন জীবনানন্দ দাশ। যা সেই সময় বঙ্গবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এই কবিতাটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' (১৯২৭) এ স্থান অর্জন করে নেয়। এরপর ধূসর পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে।

সৃষ্টি সম্ভার : ১৯৫২ সালে 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণ বের হয়। 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটিই জীবনানন্দ দাশকে বাংলা কবিতার জগতে চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরপর প্রকাশিত হয় 'মহা পৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির'। ১৯৫৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ছোটোবেলায় মায়ের মুখেই শুনেছিলাম 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলো।

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ

খুঁজিতে যাই না আর; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েলপাখি— চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম— বট— কাঁঠালের— হিজলের— অশথের করে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল— বট— তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ।

আর কোনো কবি এভাবে বাংলার অপরূপ রূপকে বর্ণনা করেছেন বলে মনে হয় না। মায়ের মুখে কবিতাটি শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। এখনও যতবার এই কবিতাটি পড়ি আমাদের বাংলার অপরূপ রূপকে আমি নতুনভাবে খুঁজে পাই। কবি জীবনানন্দ দাশের চিত্রকল্প আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করে। অসম্পূর্ণ বাক্যবন্ধের মধ্যে তিনি তুলে নিয়ে আসেন চেতনার গভীর অনুভূতিশীল তালে। এরই সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এক গভীর বিষণ্ণতার বোধ।

"সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি
এই নদী নক্ষত্রের তালে
সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন—
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!
আমি চ'লে যাব ব'লে
চালতা ফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে?
লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে?
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!"

প্রিয় কবি হওয়ার কারণ : জীবনানন্দ দাশের কবিতায় শব্দ এবং শব্দচিত্র আমার অনুভূতির জগৎকে এক নতুন রসে আপ্লুত করেছে। দেশপ্রেমের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের হৃদয়ের আবেগ ও করুণ রসকে সমন্বিত করে তিনি তাকে সর্বজনীন করে তুলেছেন। তাঁর লেখা 'বনলতা সেন' সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের এক কবিতা। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এক ধূসর জগতের সঙ্গে মিশে যায়। একইসাথে বিষণ্ণতার সঙ্গে বিশে যায় মানবপ্রেমও। নায়িকা হয়ে ওঠে সর্বকালের। "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।" এভাবে আর কোনো কবি বলতে পারেন "সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল।" শেষ পর্যন্ত "থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেনের।"

উপসংহার : সাধু ভাষাকে কবি অনায়াসে মিশিয়ে দিতে পারেন চলিত ভাষার সঙ্গে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর লেখায় কবিতায় এমন এক পরিবেশ রচনা করে দেন যার অভিনবত্ব আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করে দেয়। তাঁর লেখা কবিতাগুলোতে আমি নিজেকে বারেবারে নতুন করে খুঁজে পাই। সবশেষে আমার প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশকে আমি শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

১০৮. অপসংস্কৃতি ও যুবসমাজ
অথবা, সমাজজীবনে অপসংস্কৃতির প্রভাব

ভূমিকা

মানুষের জীবনের চেতনাবোধ যদি সুন্দরে অগ্রসর হয়, কল্যাণের পথে এগিয়ে চলে তবে তাকে সংস্কৃতি বলা যায়। মানবসভ্যতা সত্য, সুন্দর এবং আনন্দের বাহন হলে তবে তাই সংস্কৃতি বলে বিবেচিত হবে।

সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থ : সংস্কৃতি হলো মানুষের জীবন চেতনা। এ জীবন চেতনার ফলে জাতি নিজেকে সবার সামনে প্রকাশ করতে পারে। আসলে যে শিক্ষা সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে অনুপ্রাণিত করে সেটাই সংস্কৃতি। জাতীয় জীবনে সে সৌন্দর্যবোধ যে সৌন্দর্য তাকে আনন্দের সলিলে অবগাহন করায়; অর্থাৎ দেশীয় রীতিনীতি অনুসরণ করে চলতে শেখায় তাকে সংস্কৃতি বলে গণ্য করা যায়। সুন্দরভাবে বেঁচে থাকাটাই সংস্কৃতির মূলকথা।

অপসংস্কৃতির সংজ্ঞার্থ : অপসংস্কৃতি হলো সংস্কৃতির বিপরীত অর্থাৎ বিকৃত অবস্থা। আনন্দময় প্রীতি–সৌহার্দের যে জীবন তার বিপরীত দিক হলো অপসংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানুষের জীবনে আনন্দ আনে তাকে প্রেমময় করে, অপসংস্কৃতি হলো তারই

কলুষিত রূপ। অপসংস্কৃতি সাময়িকভাবে মানুষকে মুগ্ধ করে, চিত্তকে প্রলুব্ধ করে রাখে কিন্তু স্থায়ী কোনো ফল প্রদান করে না। আমাদের যুবসমাজ বিদেশি আচার–আচরণ গ্রহণ করছে, বিকৃত পোশাক–পরিচ্ছদ গ্রহণ করছে—এটা সমীচীন নয়।

অপসংস্কৃতির কুফল : জীবনকে বিকশিত করে তাকে বেঁচে থাকার প্রেরণা দেয় যে সংস্কৃতি তারই বিকৃতি ও ধ্বংসই অপসংস্কৃতির কুফল। আসলে অপসংস্কৃতি স্থায়ী কোনো ফল দেয় না, তা স্বল্পকালীন সময়ের জন্য চমক সৃষ্টি করে বটে। সুদীর্ঘকালের কর্ম ও সাধনার যে ফল তারই বিকৃতি ঘটায় অপসংস্কৃতি। সংস্কৃতির বিকৃতি ও কলুষিত রূপই অপসংস্কৃতির প্রধান কুফল।

অপসংস্কৃতির উৎসস্থল : অনেক সময় দেখা যায় যে, লোকজন বিদেশি সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। বিদেশি সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য নয়। বিচার করে দেখতে হবে যে ওই সংস্কৃতি আমাদের চিন্তাভাবনায় উদার জ্ঞানচর্চার দরজা উন্মোচন করে কিনা, যদি করে তা হলে সেটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য, আর না করলে সেটাই অপসংস্কৃতি। বিভিন্ন দিক রয়েছে অপসংস্কৃতির। হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাসী মনোভাবাপন্ন হওয়া— এসবই অপসংস্কৃতির পথনির্দেশক। যদি এসব না করে উদারভাবাপন্ন হয়, তবে তা অবশ্যই সংস্কৃতিসহায়ক হবে।

যুবসমাজ ও অপসংস্কৃতি : দেশের তরুণ ও যুবসমাজ আমাদের সংস্কৃতিকে কলুষিত করে চলেছে। যদিও তারা দেশের আশা, আকাঙ্ক্ষা তথা জাতীয় ভবিষ্যৎ পথনির্দেশক কিন্তু সে পথ যদি বিপথগামিতার নামান্তর হয়, তবে যুবসমাজ অপসংস্কৃতিকেই উৎসাহিত করছে। আমাদের তরুণদের সিনেমা ও টিভির অবাস্তব ও উদ্ভট নাচ–গান ও সিনেমার অনুকরণ করাই হলো অপসংস্কৃতির রূপ। যেখানে দুর্নীতি আছে সেখানেই আছে অপসংস্কৃতি। শ্লীলতাকে পরিত্যাগ করে যুবকেরা অশ্লীল ছবি ও সিনেমা দেখতে উৎসাহিত হচ্ছে, তারা উগ্র জীবনযাপনে অভ্যস্ত হচ্ছে। এই যে উগ্রতা, এ উগ্রতার ছবি ও কুরুচিপূর্ণ আচার–আচরণ, পোশাক–পরিচ্ছদ গ্রহণে তারা উৎসাহিত হচ্ছে। আবার সেগুলো প্রকৃতপক্ষে দেশের যে সংস্কৃতি ও বাঙালিকালচার তারা তার বিপক্ষতায় মেতেছে। তারা সাম্প্রতিককালে দেশের সংস্কৃতিকে গ্রহণ না করে অপসংস্কৃতির প্রতি উৎসাহিত হচ্ছে, অপসংস্কৃতিকেই তারা বেশি পছন্দ করছে।

বাংলাদেশের যুবসমাজ হিন্দি ও ইংরেজি গান পছন্দ করে। কিন্তু এটা যে আসলে আমাদের দেশের সংস্কৃতির পরিপন্থি— এ বোধ তাদের কে দেবে? প্রকৃতপক্ষে আমাদের যুবসমাজকে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিতে ও অপসংস্কৃতিকেই যে তারা সহায়তা করে চলেছে— এ জ্ঞানদানের জন্য দেশের সুধীজনের প্রয়াস চালানো দরকার; তাহলেই একদিন জাতি অপসংস্কৃতির হাত থেকে রেহাই পেতেও পারে।

উপসংহার : জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য যে শিক্ষা সে শিক্ষাই হলো সংস্কৃতি। তার বিকৃতি হলেই তাকে বলতে হবে অপসংস্কৃতি। অপসংস্কৃতির মূলে আছে আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ। যে সমাজে দুর্নীতি প্রবলভাবে অধিকার বিস্তার করেছে সে সমাজে সুস্থ জীবনযাপন করা বাতুলতামাত্র। সুতরাং অপসংস্কৃতি রোধে সবার আগে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। তরুণ–তরুণীদের বুঝতে হবে যে, কোন সংস্কৃতি গ্রহণযোগ্য ও কোনটি বর্জনীয় এবং যেটি গ্রহণযোগ্য সেটি গ্রহণ করতে হবে, তা না হলে আমাদের দেশের প্রকৃত কল্যাণ হবে না। দেশবাসী তথা রাজনৈতিক নেতাদের এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে তারা যদি অপসংস্কৃতি রোধে সৎসাহসের পরিচয় দিতে পারেন তবেই সুস্থ সমাজ তথা সংস্কৃতিমান সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর, নচেৎ গড্ডলিকা প্রবাহে জাতি যে গা ভাসিয়ে দিয়েছে তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

১০৯. আমার আদর্শ শিক্ষক
অথবা, আমার প্রিয় মানুষ বা ব্যক্তিত

ভূমিকা

জীবনে চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু তাকে সহজ, সাবলীল করে তোলার জন্য যারা আমাকে পাঠদান করে, জ্ঞান বিতরণ করে, চলার পথকে নিষ্কণ্টক করতে অবদান রেখেছেন তাঁরা আমার শিক্ষক, অধ্যাপক এবং পথপ্রদর্শক। জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশে তাঁরা আমাকে নির্ভুল পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। আমার স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে। কাজেই নানা বাধাপ্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা অনন্য, বিচিত্র ও অনুকরণীয়। তাঁরা আমার জীবনে পরশপাথরের মতো। তাঁদের ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায় আমার ভেতরের 'আমিত্ব' জেগে উঠেছিল। শিক্ষকের মর্যাদা সম্পর্কে "শিক্ষা গুরুর মর্যাদা" কবিতায় দেখা যায়–

উচ্ছ্বাস ভরে শিক্ষকে আজি দাঁড়ায়ে সগৌরবে
কুর্ণিশ করি বাদশাহে তবে কহেন উচ্চরবে–
"আজ হতে চির–উন্নত হল শিক্ষাগুরুর শির,
সত্যই তুমি মহান উদার বাদশাহ্ আলমগীর।"

অনন্য একটি দিন : স্কুলের পরিচিত গণ্ডির মধ্যে যা ছিল আমার কাছে একেবারে মুখস্থ সেসব পশ্চাতে ফেলে রেখে আমি আজ প্রথম দিন কলেজে ক্লাস করছি। এটি আমার এক নতুন পরিমণ্ডল। স্কুল আর কলেজে কত প্রভেদ! যিনি আমার কলেজজীবনে প্রথম ক্লাসে এসেছেন তিনি বাংলার স্বনামধন্য অধ্যাপক, যাঁর বিনম্র কণ্ঠস্বর আমাকে আকৃষ্ট করে, তিনি বিশিষ্ট সাহিত্যিক 'নাজমুল হক'। অধ্যাপক নাজমুল হক ধীমান সাহিত্যিক ও একজন গ্রন্থকার। আগেই জানা ছিল যে, স্কুলের শাসন নেই এখানে। এখানে ছাত্রদের পড়াশোনায়, কর্মকাণ্ডে পূর্ণ স্বাধীনতা। এ কথা ভাবতেই শরীর ও মনে রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। একদিন টেলিভিশনে যার ছবি দেখেছি, কণ্ঠস্বর শুনেছি তিনি আমার কলেজজীবনের প্রথম শিক্ষক, তিনি ক্লাস নিতে এসেছেন। তিনি ক্লাসে ঢুকেই উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের দিকে একবার চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, মার্জিত চেহারা ও দোহার গড়নের এক মহান ব্যক্তিত্ব আমার এ স্যার। তিনি তাঁর বক্তৃতার শুরুতে বললেন— আমার তরুণ বন্ধুগণ, তোমাদের কলেজ জীবনের শুরুতে স্বাগত জানাই। এবার আমার চমৎকৃত হওয়ার পালা। কী চমৎকার তাঁর শব্দাবলির নির্ভুল উচ্চারণ। সাথে করে এনেছিলেন রোলকলের রেজিস্ট্রি খাতা। কিন্তু রোলকল করলেন না। কারণ সবার রোলনম্বর খাতায় তোলা হয়নি তখন অবধি।

পরিচয় পর্ব : তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় সারির ছাত্রদের পরিচয় নিলেন একে একে। জেলার ডেপুটি কমিশনারের এক ভাই আমার সহপাঠী। আমারই বয়সি। স্যার প্রথম দিন আমাদের পড়ালেন না। তিনি তাঁর বক্তৃতার সূত্রপাত করলেন ছাত্রছাত্রীদের কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে আলোচনা করে। বলা দরকার কলেজটিতে কো–এডুকেশন চালু ছিল। তাঁর বলার ভঙ্গিটা উপদেশের। ইদানীং ছাত্ররা পড়াশোনা করে না, তারা রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে কাজ করে, পরীক্ষার সময় নকল করে, যা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জ্ঞানচর্চা অবহেলিত, ছেলেমেয়েরা লাইব্রেরিতে পড়ে না। সত্যিকার অর্থে যদি জ্ঞানচর্চা থেকে তারা বিতাড়িত হয় তবে উচ্চশিক্ষা লাভ করা আকাশকুসুমে পরিণত হবে। দেশ আজ স্বাধীন। বিশ্বের মানচিত্রে তার এ যে অবস্থান, কেবল এর ঘোষণা নয়, যথার্থ স্বাধীন নাগরিকরূপে ভূমিকা পালন করতে হবে। এভাবে স্যার তাঁর শব্দাবলির উচ্চারণ করে গেলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে গেলাম, ভুলে গেলাম স্থান–কাল–পাত্র। যেইমাত্র ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজলো অমনি আমি চেতনার রাজ্যে ফিরে এলাম। কলেজজীবনের সেই হলো শুরু। তারপর একে একে দুটি বছর পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে কলেজ অধ্যাপকরা আমাদের পড়িয়েছেন, তাঁদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেছি। তাঁদের কাছে জানতে পেরেছি জ্ঞানচর্চার কোনো বিকল্প নেই।

জ্ঞানরাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন : নাজমুল হক স্যার কলেজে প্রথম দিন সেই যে জ্ঞানরাজ্যের ঘুমন্ত রাজপুরীতে প্রবেশের দ্বার উন্মোচন করলেন সেই থেকে শুরু হয়েছে আমাদের বিচরণ। তিনি বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক, কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের রাজদরবারেও তাঁর বিচরণ অবাধ। বাংলা সাহিত্যের গোড়ার কথা তিনি বললেন একদিন। মধ্যযুগের সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁর বক্তব্য আমাদের উৎসাহিত করে। স্যার একদিন কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলির কথা শোনালেন। মুসলমান কবি আলাওল ও দৌলত কাজীর কথা বললেন। আবার ইংরেজি সাহিত্যের প্রাচীন কবি জিওফ্রে চসারের গল্প করলেন। এসব আপাতদৃষ্টিতে আমাদের জন্য নিরর্থক মনে হতে পারে। কিন্তু না, স্যার আমাদের জন্য বিশেষ করে আমার জন্য জ্ঞানের প্রবাহ সৃষ্টি করেন। দেশবিদেশের সাহিত্যের প্রতি তিনি আমার জ্ঞানের পিপাসাকে আরও বাড়িয়ে দেন। সেদিন থেকে কেবল পাঠ্যপুস্তকের পাতায় আমার পাঠ্যস্পৃহা বন্দি হয়ে রইল না। সৌভাগ্যবশত আমার বাসভবনের লাগোয়া ছিল একটি পাবলিক লাইব্রেরি, যেখানে প্রতিদিন বিকেল বেলা ভিজিট করা ও পড়াশোনা করা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। লাইব্রেরিতে কত বিভিন্ন বিষয়ের বইপুস্তক থাকে। কলেজজীবনে পাঠ্যবইগুলো ভালো করে পড়তে হবে। বাইরের বইও পড়তে হবে। নচেৎ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান লাভ করা বাতুলতা, তা আমার শিক্ষকের কাছেই জানতে পেরেছি। পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়াই শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হতে পারে না, যোগ্য নাগরিক হওয়ার লক্ষ্যে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। স্যারের দেওয়া উপদেশ–নির্দেশের ফলে আমরা ছাত্ররা জ্ঞানচর্চায় উৎসাহী হয়ে উঠলাম; নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা রক্ষায়ও দিকনির্দেশনা পেলাম। সাম্প্রতিক যুবক ও তরুণদের মধ্যে নৈতিকতার যে অবক্ষয় ঘটেছে তার প্রতি তিনি আমাদের বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। সত্যিকার অর্থে আদর্শ নাগরিক হয়ে ওঠার জন্য ভালো ছাত্র হতে হবে এবং এ ভালো ছাত্র হওয়ার জন্য যেসব মৌলিক ও আকর্ষণীয় শর্তসমূহ আছে তার অধিকারী হওয়ার জন্য তিনি গুরুত্বারোপ করলেন। কলেজে যে একটি 'বক্তৃতার মঞ্চ' গঠন করা হয় তার পেছনে উপদেশ ও নির্দেশ স্যারই দিয়েছিলেন। এ মঞ্চ থেকে ছাত্রদের ভবিষ্যতে ভালো বক্তা হওয়ার জন্য যে প্ল্যাটফর্ম দরকার তার ট্রেনিং এখান থেকেই অর্জিত হয়।

বিশিষ্ট এক ব্যক্তিত্ব : নাজমুল স্যার ছিলেন আসলেই এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। নিজে কোনো ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান ছিলেন না। স্যার একবার Leader Exchange programme–এ বিলেত গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি মাসখানেক থেকে সে দেশের লেখাপড়া ও জ্ঞানচর্চার ধারাক্রম প্রত্যক্ষ করেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে কলেজের শিক্ষার্থীদের আলোকিত করার প্রয়াস পান। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করতেন; তারাও তাঁর মধুর ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায় বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেতো। কেউই তাঁর পর ছিল না। আচার–আচরণের যে মধুর বাতাবরণ তৈরি হতো তা কলেজের ছাত্র–শিক্ষকমহলে তাঁকে জনপ্রিয় শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। জনপ্রিয়তা যদি একজন সফল অধ্যাপক হওয়ার মাপকাঠি হয় তাহলে আমাদের স্যার নিঃসন্দেহে ভালো শিক্ষক, সফল অধ্যাপক। আমার আদর্শ শিক্ষক, প্রিয় শিক্ষক বললে আমি তাঁকেই নির্বাচন করব। উত্তরকালে আমি আরও অনেক শিক্ষক–অধ্যাপকের কাছে লেখাপড়া করার সুযোগ লাভ করেছি, কিন্তু নাজমুল স্যারের প্রীতি ও ভালোবাসা, তাঁর স্নেহমমতার স্বাদ আর কোথাও পাইনি। একবার এক ভালো ছাত্র পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল না করতে পারায় তিনি প্রগাঢ় বেদনাবোধ করেন। ছাত্রটিকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে সান্ত্বনা দেন। পরবর্তীতে সে ছাত্র পরীক্ষায় ও বাস্তব জীবনে সূর্যের আলোর মতো দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

উপসংহার : সবদিক থেকেই এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব আমার স্যার জনাব নাজমুল হক। তিনি আমার কছে একজন সেরা মানুষ; শিক্ষকদের মধ্যেও তিনি একজন মহান শিক্ষক। তিনি মার্জিত রুচির মানুষ। সৌজন্য ও আচরণে দেখেছি তাঁর অকৃত্রিমতা এবং মনুষ্যত্বমহিমায় উদ্ভাসিত যিনি তিনিই আমার সম্মানিত শিক্ষক। আমার অভিভাবক জ্ঞান বিতরণে, কলেজে কর্তব্যবোধ ও নিয়মানুবর্তিতায় যিনি নিবেদিত তিনি শিক্ষক ছাত্রছাত্রী সবার কাছে আনন্দোজ্জ্বল দীপ্তিতে সমভাবে প্রতিফলিত হতেন। ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশের নাম স্মরণ রাখার মতো স্মরণশক্তি ছিল তাঁর, যাকে একবার দেখতেন, জানতেন তাকে চিনতে ভুল করতেন না কোনোদিন। ছাত্র–শিষ্যকে জ্ঞানচর্চায় সংক্রামিত করতেন, স্নেহমমতার অকৃপণ দাক্ষিণ্য দিয়ে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করতেন, তিনিই আমার প্রিয় শিক্ষক। পরীক্ষার হলে ছাত্রদের অছাত্রসুলভ আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করতেন না। বৃহত্তর জীবনের ডাকে উল্লাপাড়া আকবর আলি কলেজ ছেড়ে গিয়েছি, ক্রমাগত সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, কিন্তু কলেজের নাজমুল স্যারে কথা আমার চেতনা থেকে কখনো মুছে যাবে না। উনি আমার প্রিয় শিক্ষক, আদর্শ অধ্যাপক।

১১০. আমার প্রিয় কবি

[ঢা. বো. '১৭; য. বো. '১১; রা. বো. '১২, '০৪; কু. বো. '০৩; চ. বো. '০২]

অথবা, **তোমার প্রিয় কবি**

ভূমিকা

"ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল।" —অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রিয় কবি, কে আমার প্রিয় কবি? এক লহমায় এই প্রশ্নের উত্তরে যে নামটি জ্বলজ্বল করে ওঠে তিনি হলেন কবি নজরুল। হ্যাঁ, সেই নজরুল আমার প্রিয় কবি, যাঁর লেখনীস্পর্শে বাংলা সাহিত্য অর্থাৎ কাব্য, উপন্যাস, ছোটোগল্প ও প্রবন্ধ জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করেছে। তিনি বাংলার একান দরদি কবি। বাঙালির বেদন–বিদ্রোহের বিশ্বস্ত রূপকার। তাঁর লেখনীতেই বাংলার ব্যথিত মানুষের বাণীহারা বেদনা পেয়েছিল প্রকৃত প্রকাশের ভাষা। বাংলা কাব্যের শান্ত, স্থির, স্ফটিকস্বচ্ছ সরোবরে কে প্রথম নিয়ে এলেন উত্তাল সমুদ্র তরঙ্গ গর্জন? কে শোনালেন বাধাবন্ধনহারা, দুর্বার চির–যৌবনের বন্দনাগান? কে এমন বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, 'যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস, যেন লেখা হয় আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ।' কে এমন সোচ্চার কণ্ঠে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, সামাজিক ব্যভিচার–অন্যায়–ভণ্ডামি–সাম্প্রদায়িক–ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে? কার অগ্নিক্ষরা চোখে ছিল বিপ্লবের অশনি–সংকেত? তিনি আর কেউ নন, তিনি বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর কবিতা ছিল নিপীড়িত মানুষেরই নব–উত্থান মন্ত্র, সংগীত ছিল মহাবেদনার মহাবিলাপ। তিনি ছিলেন গণজাগরণের ঋত্বিক।

কেন প্রিয় : নজরুল রক্তঝরা লেখনীর মাধ্যমে একটি পশ্চাৎপদ, জরাগ্রস্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিকে যুগিয়েছেন অদম্য প্রেরণা, পরাধীনতার শেকলে আবদ্ধজাতিকে শুনিয়েছেন শেকল ভাঙার গান। আধমরা জাতির বুকে সঞ্চারিত করেছেন বিদ্রোহের তপ্ত শোণিত ধারা। এই বিদ্রোহবোধ ও প্রাণপ্রাচুর্যের জন্যই তিনি সৌন্দর্য বোধের কবি রবীন্দ্রনাথের যুগে জন্মগ্রহণ করেও বাংলা কাব্যে স্বতন্ত্র মর্যাদায় আসীন। চির দুর্দম–দুর্বিনীত দুঃসাহসী কালপুরুষ ও কালজয়ী তারুণ্যের কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলার মাটি ও মানুষকে তিনি দেখেছেন সম্পূর্ণ নুতন দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাই সাধারণ মানুষ

অসাধারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনিই সার্থকভাবে দেখিয়েছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে কী অপার মনুষ্যত্বের মহিমা, অনুভব করেছেন বাঙালির সীমিত জীবনের অন্তরালেও চলছে কত বিচিত্র রূপের লীলাভিসার। এ অনুভবই তাঁর রচনায় পরিস্ফুট। তাই আমার প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

জন্ম ও বংশপরিচয় : কাজী নজরুল ইসলাম ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সালে (২৫শে মে ১৮৯৯) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহাকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ভারতের বিহার প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। আসানসোলে আগমনের পর তাঁর পূর্বপুরুষেরা কাজীর (বিচারক) দায়িত্ব পালন করতেন। এজন্য তাঁদের বংশের পদবি হয় কাজী।

বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন : বাল্যকালেই নজরুল পিতৃহীন হন। ফলে তাঁকে আর্থিক কষ্টে পড়তে হয়। অনাথ বালক হিসেবে তিনি 'দুখু মিঞা' নামে বেড়ে উঠতে থাকেন। নজরুলের জীবনে তাঁর চাচা বজলে করিমের প্রভাব অপরিসীম। তিনি গ্রামের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর তিনি রানীগঞ্জের নিকটবর্তী শিয়ারশোল রাজ স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু স্বাধীনচেতা নজরুলের স্কুলের নিয়মকানুন পছন্দ হলো না। তিনি সেখান থেকে আসানসোলে পালিয়ে যান এবং এক রুটির দোকানে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে কাজ করতে থাকেন। এ সময় এক পুলিশ অফিসার জনাব রফিজউল্লাহ তাকে নিজ গ্রামের ময়মনসিংহের ত্রিশালের দরিরাম হাইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। উড়ন্ত পাখি বিদ্রোহী সত্তার নজরুল তাই সেখানে থাকলেন মাত্র তিন বছর। আবার পালিয়ে চলে গেলেন আসানসোল। সেই পুরাতন ঠিকানায়, ভর্তি হলেন নবম শ্রেণিতে, সিয়ারসোল হাই স্কুলে।

সৈনিক জীবন : ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৯১৭ সালে কবি দশম শ্রেণির ছাত্র। তার বয়স তখন ১৯ বছর। তখন তিনি সৈনিক জীবন বরণ করেন এবং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি গমন করেন। এগারো বছর বয়সেই কবি শক্তির স্ফুরণ ঘটে। যুদ্ধে যোগদান করলেও কাব্যচর্চায় তাঁর কমতি ছিল না। সে সময় ফারসি সাহিত্যের সাথে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হন।

বন্দিজীবন : নজরুলই আমাদের ভাষায় প্রথম কবি, যিনি কবিতার জন্য কারাদণ্ড পান। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মি. সুইন হোর আদালতে বিচারে নজরুল ইসলামের এক বছর সশ্রম কারাবাসের রায় দেওয়া হয়। কবি নজরুলকে বন্দি করে প্রথমে পাঠানো হলো আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। ১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি থেকে ১৫ই এপ্রিল চারমাস কবি ছিলেন আলিপুর জেলে। নজরুলের কারাদণ্ডের খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হলেন। তাঁর নামে উৎসর্গ করলেন নতুন গীতিনাট্য 'বসন্ত'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্নেহভাজন কবির জন্য আকুল হয়ে টেলিগ্রাম পাঠালেন "অনশন প্রত্যাহার করো। আমাদের সাহিত্য তোমাকে দাবি করে।"

কবিপ্রতিভার স্ফুরণ : নজরুল জাতকবি, জন্মগতভাবে কবি। ছোটোবেলায় লেটো দলে যোগদান করে গান বাঁধা ও গাওয়ায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন, তবে তাঁর কবিপ্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ ঘটে সৈনিক জীবনে। করাচিতে সেনানিবাসে অবস্থানকালে অবসরে তিনি কবিতা লিখে হাত পাকান। ১৯২০ সালে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হলে তিনি করাচি থেকে কোলকাতায় ফিরে আসেন এবং পূর্ণোদ্যমে কাব্যচর্চা শুরু করেন। ১৯২২ সালে 'অগ্নিবীণা' কাব্য প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা কাব্য ও বাঙালির জীবনকে তূর্যনিনাদে কাঁপিয়ে নজরুল তাঁর আগমনবার্তা ঘোষণা করেন।

কবির রচনাবলি : কবি মাত্র ৪৩ বছর বয়সে চিরতরে বাক্‌শক্তি হারাবার আগে ২৩ বছরের কবিজীবনে বিপুলসংখ্যক কাব্য, গান, উপন্যাস ও শিশুতোষ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— কাব্যগ্রন্থ : অগ্নিবীণা, দোলনচাঁপা, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা, সিন্ধু হিন্দোল, মরুভাস্কর, সর্বহারা, পুবের হাওয়া, চক্রবাক, জিঞ্জির। গানের বই : বুলবুল, চোখের চাতক, চন্দ্রবিন্দু, জুলফিকার, বনগীতি, গানের মালা, গীতি শতদল। শিশুতোষ গ্রন্থ : ঝিঙে ফুল, সাত ভাই চম্পা, নতুন চাঁদ। উপন্যাস : বাঁধনহারা, কুহেলিকা, মৃত্যুক্ষুধা। গল্পগ্রন্থ : রিক্তের বেদন, শিউলিমালা। নাটক : ঝিলিমিলি, আলেয়া, মধুমালা। প্রবন্ধগ্রন্থ : যুগবাণী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, দুর্দিনের যাত্রী।

বিদ্রোহী নজরুল : ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে দেশ ও জাতির মুক্তির পক্ষে কলম ধরলেন কবি। নজরুলের শ্রেষ্ঠতম কবিতা 'বিদ্রোহী' এবং তিনি 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে পেলেন স্বীকৃতি। কবি তাই সাম্রাজ্যবাদ, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করলেন—

"প্রার্থনা কর যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মানুষের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।"

বাংলার নরম মাটিকে কাঁপিয়ে ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দুলিয়ে, কাব্যলোকে আকস্মিক বিস্ফোরণের তাণ্ডব ছড়িয়ে নজরুলের কবিসত্তা প্রবল হুংকারে বিদ্রোহ করে উঠল। কবি দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করলেন—

"মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হ'ব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না।"

শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে কবির সাহসী উচ্চারণ—

"বল বীর
বল চির উন্নত মম শির,
শির নেহারি আমারি নত শির
ওই শিখর হিমাদ্রির।"

মানবতার কবি : নজরুল মানুষকে ভালোবেসেছিলেন মনে-প্রাণে। জীবনের সকল অস্তিত্ব দিয়ে মানবতার মুক্তিসাধনে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। যেখানে মানবতা ভূলুণ্ঠিত সেখানেই তার বিদ্রোহ। বিপন্ন মানবতার প্রতি তাঁর অন্তরঙ্গ ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। তাইতো কবি তার 'বন্দনা গানে' লিখেছেন—

"শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তির তরবারি
আমরা তাদের ত্রিশ কোটি ভাই,
গাহি বন্দনা-গীতি তারি।"

সাম্যের কবি : নজরুল শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির সপক্ষে অবিরাম ব্যবহার করেছিলেন লেখনী ও প্রতিভাকে। তিনি নিপীড়িত মানবতার কবি। কুলি, মজুর, শ্রমিক থেকে শুরু করে শ্রমজীবী মানুষের অবদানকে তিনি তাঁর কবিতার অনুষঙ্গ করেছেন। তাইতো কবির কণ্ঠে গীত হয়েছে—

"গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই,
নহে কিছু মহিয়ান।

বিপ্লবের কবি : ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছেন নজরুল। সেজন্য তাঁর কবিতা গান এবং প্রবন্ধে ছিল বিপ্লবের মূলমন্ত্র। তাঁর বিপ্লবী চেতনা পরাধীন ভারতকে স্বাধিকার চেতনায় উজ্জীবিত করল। তাইতো কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হলো—

"আমি মরুকবি— গাহি সেই বেগে বেদুঈনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব-অভিযান।"

অসাম্প্রদায়িক কবি : বাংলা সাহিত্যে অন্যতম অসাম্প্রদায়িক কবি নজরুল। তিনি তাঁর সাহিত্যে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন, দেশাত্মবোধক, স্বাধীনতা-সংগ্রাম চিন্তা, ভারতীয়ত্ব এবং বাঙালিয়ানাকে এমন এক সূত্রে বেঁধে তুলেছেন যার কোনো তুলনা আমাদের দেশে নেই। তিনি যেন এক আলৌকিক দেবদূত যিনি হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান, জৈন-বৌদ্ধ-শিখ ও পারসিক সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তাদের অন্তর্জীবনের ব্যথা বেদনাকে অনুভব করে তা দূরীভূত করার চেষ্টা করেছেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগী ভাবশিষ্য নজরুলও বলতে চেয়েছেন যে,

"জগৎ জুড়িয়া একজাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি।"

নজরুল বাঙালি আত্মার বাণীমূর্তি। তাঁর কথা—

"মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান
মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।"

ধর্মীয় সংকীর্ণতা নয়, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প নয়, আগামী দিনে চলার পথে মানবহৃদয় বন্ধন, দেশের জনজীবনে ঐক্য, এটাই যেন তাঁর কাব্যের মূল সুর। তাই হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বে তাঁকে বলতে শুনি—

"হিন্দু না মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বলে ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।"

প্রেমের কবি : নজরুল শুধু বিদ্রোহি আর ভাঙনের কথাই বলেননি। প্রেমের কথাও বলেছেন। একই সাথে নজরুলের কাব্যে প্রেম ও বিদ্রোহ প্রকাশিত হয়েছে। তাইতো তাঁকে বলতে শুনি— "মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি আর হাতে রণতূর্য।" তাঁর 'বিদ্রোহ' কবিতার মধ্যেও এই প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে। তাইতো কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

"আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন
আমি চপল মেয়ের ভালবাসা, তার কাঁকন চুড়ির কনকন।"

নজরুলের কাব্যে দেশাত্মবোধ ও মানবপ্রেম : নজরুলের চিন্তাধারা ছিল সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে দেশ থেকে আর কেউ এত কঠোর ভাষায় এমন করে তিরস্কৃত এবং বহিস্কৃত করতে চাননি। দেশই তাঁর আরাধ্য, মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো বিশ্বাকাশে তাঁর অবাধ বিহার। তাইতো দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত হয়ে কবি বলেন—

"মোরা এক সে দেশের খাইগো হাওয়া, এক সে দেশের জল,
এক সে মায়ের বক্ষে ফলে একই ফুল ও ফল।"

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি সর্বভেদ চিহ্নহীন মনুষ্যত্ব ও সর্ববাধা বিমুক্ত উদার বিশ্ব মানবসমাজের ঐক্যবদ্ধ মহত্তম রূপেরই জয়গান গেয়েছেন।

"গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান
গাহি সাম্যের গান।"

ছোটোদের কবি নজরুল : আমাদের অনেকেরই ধারণা নজরুল শুধুই প্রেম ও বিদ্রোহের কবি। কিন্তু ছোটোদের জন্যও তিনি খুব কম লেখেননি। নানা ধরনের লেখা, কবিতা, ছড়ার পাশাপাশি নাটকও আছে। ছোটোদের কথা ভেবে লিখেছেন কিছু গানও। ছোটোদের জন্য তিনি নিম্নরূপ কবিতা লিখেছেন—

কাঠবিড়ালী, কাঠবিড়ালী, পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও; বাতাবী লেবু লাউ।"

কবির শিশুমন শিশুদের মনের সাথে একাত্ম হয়েই বলেন—

"আমি যদি বাবা হতাম, বাবা হত খোকা
না হলে তার নামতা পড়া মারতাম মাথায় টোকা।"

এভাবেই তিনি ছোটোদের মাঝে আজও বেঁচে আছেন।

নজরুল-সাহিত্যের মূল্যায়ন : নজরুল-সাহিত্য সর্বত্রগামী। কবিতা, গান, গল্প, নাটক, উপন্যাস সকল বিষয়ে তিনি পারদর্শিতা দেখালেও কবি ও সংগীতকার হিসেবেই নজরুলের স্বীকৃতি ব্যাপক। তাঁর কবিতার মূল সুর বিদ্রোহ, মানবতাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা এবং মানুষের প্রতি অকৃত্তিম ভালোবাসা ও জীবনের জাগরণ। বাংলা কাব্যে তিনিই সর্বপ্রথম আরবি-ফারসি শব্দের সফল ও শিল্পিত ব্যবহার করেছেন। পরাধীন ভারতে নজরুল-সাহিত্য মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির সুর হয়ে বেজেছিল। যতদিন সামাজিক অত্যাচার ও অন্যায় থাকবে নজরুলের প্রতিবাদী সুর ততদিনই অগ্নিসুর হয়ে সবকিছুকে পোড়াবে।

স্বদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ : নজরুল ইসলাম শুধু বিদ্রোহ, সাম্য বা প্রেমের কবিই নন তাঁর কাব্যে প্রকৃতিপ্রেমও প্রকাশিত হয়েছে। স্বদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে রূপমুগ্ধ কবির লেখনীতে ফুটে উঠেছে—

"একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লি-জননী
ফুলে ও ফসলে কাদা মাটি জলে ঝলমল করে লাবনী।"

নারী-পুরুষের সাম্য : নারী ও পুরুষ তাঁর চোখে ছিল সমান, যা আজকের আধুনিক যুগেও অনেকে মেনে নিতে চান না। নারী-পুরুষের সাম্য নিয়ে তিনি লিখেছেন—

"সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-নারী কোন ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

নজরুল জীবনের যবনিকা : ১৯৪১ সালে 'পিক্স ডিজিজ'-এ আক্রান্ত হলে তাঁর মস্তিষ্ক বিকল হয়ে যায়। ১৯৪৩ সালে টগবগে নজরুল হঠাৎ করে বাক্ ও স্মৃতি শক্তি হারান। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি এভাবে বাঁচেন। ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট ৭৭ বছর বয়সে ঢাকায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর তিনি অসহায় শিশুর মতো বেঁচে ছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তাঁকে এদেশে এনে বাংলাদেশের জাতীয়

কবির মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। মৃত্যুর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। কবির মৃত্যু যেন স্মরণ করে দেয়—

"ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি
করুণ চোখে চেয়ে আছে সাঁঝের ঝরা ফুলগুলি।"

উপসংহার : একটি কবিসত্তায় এত বিচিত্রতার সমাবেশ আমায় মুগ্ধ করেছে। আমার মনে হয়, বাংলা সাহিত্যে নজরুলের অবদানের কথা লিখে শেষ করা যায় না। এই আর্তপীড়িত মানবতার কবি শেষ জীবনে প্রচণ্ড কষ্ট ভোগ করেছেন। তাঁর আর্থিক দৈন্য, স্ত্রী ও পুত্র বিয়োগ তাঁকে বেদনায় মূহ্যমান করে তোলে। তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন একজনই এবং অনতিক্রম্য প্রতিভার অধিকারী, তেমনি নজরুলও নিজ ক্ষেত্রে অনতিক্রম্য এক প্রতিভা। নজরুল পূর্ণতার স্বপ্ন দেখা মানুষ। সত্য, কল্যাণ, সুন্দরের স্বপ্ন দেখা মানুষ। তাই তিনিই আমার প্রিয় কবি। নজরুলও যেন রবীন্দ্রনাথের মতো বলতে চেয়েছেন—

"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক।"

১১১. পুস্তক পাঠের আনন্দ

ভূমিকা

যে–বই জুড়ে সূর্য ওঠে
পাতায় পাতায় গোলাপ ফোটে
সে–বই তুমি পড়বে।

বইপাঠে আমাদের হৃদয়ে প্রচুর আনন্দ জন্মে। এটা কর্মক্লান্ত দিনের ব্যস্ততা ও হানাহানির মধ্যে ক্লিষ্ট–পীড়িত চিত্তের ক্লান্তি দূর করে, সাথে সাথে নানা বিষয়ে বিচিত্র জ্ঞানদান করে। আনন্দের সঙ্গে জ্ঞান বৃদ্ধি করে বইপাঠ আমাদের পূর্ণ মানুষ করে তোলে।

গ্রন্থ পাঠে মন আনন্দ, বিস্ময় ও সহানুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে ওঠে। মানবহৃদয়ের বৈচিত্র্য সুন্দরভাবে উপলব্ধি করা যায় বইপাঠের মাধ্যমে। ত্যাগের কাহিনি, বীরত্বের মহিমা, সত্যের জন্য জীবনদান, স্বার্থসিদ্ধির জন্য হীন পন্থাবলম্বন, নানা দেশের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, সামাজিক রীতিনীতি, বিজ্ঞানের কল্পতরুর ন্যায় মানুষের হৃদয় তুষ্ট করে।

শান্তির প্রেরণা : দুঃখ–বেদনার মুহূর্তে মানসিক অশান্তিতে ও দুর্বলতার সময়ে বইপাঠ মানুষের মনে শান্তির প্রেরণা যোগায়। সংসারে মানুষের কাজ অফুরন্ত, আর কাজের পথে আসে নানা প্রকার বাধা, হতাশা, আলস্য ও অবসাদ। গ্রন্থ পাঠ দ্বারা মানুষ নব প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করে, হৃদয়ে শান্তি পায়। একজন মনীষী বলেছিলেন, "সাহিত্য অমৃত সমান, শান্তির উৎস, শান্তি–কল্পফলের রস, তাই চির আধিব্যাধি বিজড়িত কর্মতাপতপ্ত, নিরাশা তুহিনাচ্ছন্ন সংসারে জাতি এটা পান করে মরণ তন্দ্রার মধ্যে বেঁচে ওঠে, অবসাদের মধ্যে শক্তি পায়।"

কবি ওমর খৈয়াম তাঁর বেহেশতের আসবাবপত্রের ফিরিস্তি তৈরি করতে গিয়ে কাব্যের কথা বিস্মৃত হননি। রুটি ও মদ হয়তো নিঃশেষ হয়ে যাবে, সাকি ক্লান্ত হয়ে পড়বে, কিন্তু অমরকাব্য অনন্তযৌবনা সঙ্গিনীরূপে তার সঙ্গে থাকবে। তাই কবি পরলোকেও গ্রন্থ পাঠে দিন কাটাতে চেয়েছেন।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হলে একমাত্র বইপাঠ দ্বারাই তা সম্ভবপর হয়। শুধু ভ্রমণ করে বসুন্ধরার বিচিত্র জাতি, দেশ ও সমাজের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভবপর নয়। সেজন্য বইয়ের সাহায্য ছাড়া গত্যন্তর নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতুটুকু জানি।
দেশে দেশে কত–না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী–গিরি–সিন্ধু–মরু,
কত–না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ,
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—"

বইপাঠের ফলে মানুষের মনে জ্ঞানপিপাসা বর্ধিত হয়। বই পাঠ ছাড়া জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের উদ্ভাবিত জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় না। মনীষীগণের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার মধ্যে কত আনন্দ, কত পরিতৃপ্তি তা পাঠকমাত্রই

জানেন। পুঞ্জীভূত জ্ঞান ও আনন্দের পুস্তকাগার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মহাসাগরের শত বছরের কল্লোল কেহ যদি এমন করে বেঁধে রাখতে পারত যে, ঘুমন্ত শিশুটির মতো চুপ করে থাকত, সে নীরব মহাশব্দের সঙ্গে এ পুস্তকাগারের তুলনা হতো। এখানে ভাষা চুপ করে আছে, প্রবাহ স্থির হয়ে আছে, মানবাত্মার অমরলোক কালের অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়ে আছে। হিমালয়ের মাথার ওপরে তুষারের মতো যেমন কত শত বন্যা বাঁধা পড়েছে, তেমনি এ পুস্তকাগারের মধ্যে মানব–হৃদয়ের বন্যাকে বেঁধে রেখেছে।"

সভ্য জগতের সর্বত্রই মানুষ বই পড়ার নেশায় মগ্ন। বইপাঠে মানুষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করে জ্ঞানবিজ্ঞান ও উন্নত সভ্যতার সঙ্গে মানসিক সংযোগবিধান করছে। আমরা জাতি হিসেবে এখনো পশ্চাৎপদ। তাই আমাদের দেশের লোকের পড়ার প্রবৃত্তি কম। এ কারণেই আমরা কতকটা মানসিক সংকীর্ণতার মধ্যে কূপমণ্ডূকের মতো বাস করি।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি : আজকাল সাধারণ ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক, দুঃসাহসিকতাপূর্ণ পুস্তকই অধিকাংশ তরুণ পাঠকের মনে বেশি আনন্দ যোগায়। তাছাড়া সরস উপন্যাসও পাঠক–পাঠিকার কল্পনাকে উদ্দীপিত করে, গ্রন্থ পাঠের আনন্দ মিটায়। বাংলা ভাষার 'দৃষ্টিপাত' (যাযাবর); দেশে–বিদেশে (সৈয়দ মুজতবা আলী); 'পথের পাঁচালী' (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়), 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়); 'পথে–প্রবাসে' (অন্নদাশঙ্কর রায়); 'চরিত্রহীন, বিরাজ বৌ, শ্রীকান্ত, গৃহদাহ, দেনাপাওনা' (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়); 'কথা ও কাহিনী, চিত্রা, চৈতালী' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর); 'ব্যথার দান, অগ্নিবীণা' (কাজী নজরুল ইসলাম); 'বিশ্বনবী (গোলাম মোস্তফা); 'নক্সী কাঁথার মাঠ' (জসীম উদ্‌দীন); 'আমার দেখা তুরস্ক' (বেগম শামসুন নাহার); 'অনেক সূর্যের আশা' (সরদার জয়েনউদ্দীন); 'আবদুল্লাহ' (কাজী ইমদাদুল হক); 'বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন' (মুহম্মদ আবদুল হাই); 'দুই তীর' (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্); 'বন্দর থেকে বন্দরে' (সানাউল হক); 'সারেং বৌ, কবে পোহাবি বিভাবরী' (শহীদুল্লা কায়সার); 'সূর্য দীঘল বাড়ি' (আবু ইসহাক) প্রভৃতি পুস্তক পাঠককে এরূপ আনন্দদান করতে সমর্থ। তাই কাবির ভাষায়—

যে–বই জ্বালে ভিন্ন আলো
তোমায় শেখায় বাসতে ভালো
সে–বই তুমি পড়বে।

উপসংহার : জগৎ ও জীবনের বিচিত্র মাধুর্য এবং সৌন্দর্য পুস্তক পাঠের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। পুস্তক আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। দুঃখে সান্ত্বনা, শোকে সহানুভূতি ও আনন্দে সঙ্গদান করে। তাই পুস্তক পাঠের নেশা আমাদের এক মহৎ হৃদয়বৃত্তি।

যে–বই তোমায় অন্ধ করে
যে–বই তোমায় বন্দী করে
সে–বই তুমি ছুঁবেই না।

১১২. বাংলা সাহিত্যের পরিচয়

ভূমিকা : বাংলা সাহিত্য বিশ্বের একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, রাশান, স্পেনিশ এই সকল সাহিত্যের সাথে বাংলা সাহিত্যকে স্থান দেওয়া যায়। শুধু সমৃদ্ধ নয়, লোকসংখ্যার দিক দিয়েও ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, স্পেনিশ, রাশান, আরবির পরেই বাংলার স্থান। চব্বিশ কোটির লোকের অধিক বাংলা ভাষাভাষী। ভারতীয় উপমহাদেশের লোকসংখ্যার দিক দিয়ে হিন্দির পরেই বাংলার অবস্থান।

প্রাচীনকালের বাংলা সাহিত্য : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রাচীন। এই সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। সপ্তম–অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতকের মধ্যে চর্যাগীতিকাগুলো লেখা। বৌদ্ধ সাধকগণ তাঁদের ধর্মীয়, বিশ্বাসকে চর্যাগীতির মাধ্যমে রূপ দিয়েছেন। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের মূলসুর যে গীতিসুর, তা চর্যাগীতিতে লক্ষ করা যায়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালকে নির্ণয় করা যায় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সূচনা ত্রয়োদশ শতকে এবং অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই সাহিত্যের স্থিতিকাল। মুসলমান কর্তৃক বাংলাদেশ বিজয়ের ফলে (১২০৪ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা সাহিত্যে নতুন সম্ভাবনা দেখা দেয়। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য মূলত তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে– বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য এবং মুসলমানী পুথি সাহিত্য। বৈষ্ণব পদাবলি এবং শ্রীচৈতন্যের জীবনী বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত। রাধা–কৃষ্ণের প্রেম নিয়ে বৈষ্ণব পদগুলো রচিত হয়েছে। অগণিত কবি পাঁচশ বছর ধরে বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন এবং এর মধ্যে শতাধিক মুসলমান কবিও আছেন। শ্রীচৈতন্যের মহিমা কীর্তন করে জীবনী লেখা হয়েছে। তবে এসব জীবনীতে বাস্তবের চাইতে কল্পনার প্রাধান্য বেশি। বৈষ্ণব পদকর্তাদের

মধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস বিশেষভাবে উল্লেখ্য। দেব–দেবীদের মহিমা কীর্তন করে মধ্যযুগে অসংখ্য কাব্য রচিত হয়েছে। যেমন– মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর, দক্ষিণা রায় ইত্যাদি। এগুলোকে মঙ্গলকাব্য বলা হয়। মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গালের কবি মুকুন্দরাম উল্লেখযোগ্য। মুসলমানী পুথি সাহিত্যের মধ্যে নানারূপ কল্পনাশ্রিত বা রোমান্টিক কাহিনিকাব্য রচিত হয়েছে। যেমন : ইউসুফ–জোলেখা, হানিফা ও কয়রাপরী, সয়ফুলমুলুক, লাইলী–মজনু, মনোহর–মধুমালতী, জঙ্গনামা, বিদ্যাসুন্দরী, গুল–ই–বকাওলী, জেবুলমুলক সামারুখ, গদা–মল্লিকা ইত্যাদি। 'পদ্মাবতী' রচয়িতা আলাওল নিঃসন্দেহে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য : এদেশে ইংরেজের আগমনের ফলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটে। বস্তুত ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। এখানে বাংলা গদ্যের যে চর্চা শুরু হয় এর ফলেই বাংলা সাহিত্যে বিচিত্র সম্ভাবনা দেখা দেয়। প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, ছোটোগল্প, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা ইত্যাদি রচিত হতে থাকে। প্রবন্ধ রচয়িতারূপে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত উল্লেখ্য। নাট্যকাররূপে মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, গিরীশ ঘোষ উল্লেখযোগ্য। উপন্যাস লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশ দত্ত প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন ছাড়াও রচনা করেন অনবদ্য ছোটোগল্প। শুধু গদ্য নয়, কাব্যের মধ্যেও কত বৈচিত্র্য–আকারে ও প্রকারে দেখা গেল। মধুসূদন রচনা করেন মহাকাব্য– 'মেঘনাদবধ কাব্য'। এরপর হেমচন্দ্র ও নবীন সেন মহাকাব্য রচনা করেন। কিন্তু মহাকাব্যের যুগ শিগগির স্তিমিত হয়ে এলো। শুরু হলো গীতিকবিতার পালা। আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার জনক বিহারীলাল চক্রবর্তী এবং বিহারীলালের প্রভাব কিশোর রবীন্দ্রনাথের ওপর বার্তায়। বাংলা গীতিকবিতার চরম উৎকর্ষ ঘটে রবীন্দ্রনাথের হাতে। রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' রচনা করে বাংলা সাহিত্যের জন্য দুর্লভ সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে এলেন। সাহিত্যের জন্য তিনি বাংলায় এবং সমগ্র এশিয়ায় নোবেল পুরস্কারে সর্বপ্রথম ভূষিত হলেন (১৯১৩)। বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্য আসন পেল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কাব্য গগনে আবির্ভূত হলেন নজরুল। তিনি বাংলা বাজিয়েছেন। জসীমউদ্দীনের কবিতায় বাংলার পল্লিজীবন রূপ পেয়েছে। গীতিকবিতায় বিদ্রোহের রণনিনাদ ত্রিশের দশকে রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করে কয়েকজন শক্তিশালী কবি আবির্ভূত হন– সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু। জীবনানন্দের কবিতায় বাংলার প্রকৃতি মায়াবী রূপ পেয়েছে। কথাসাহিত্যে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের পর শরৎচন্দ্র চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের মতো এমন দরদি কথাশিল্পী আর দেখা যায় না। তারপর তারাশঙ্করের উপন্যাসে রাঢ় অঞ্চলের জীবন, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাসে দক্ষিণ বাংলার শান্ত প্রকৃতি ও মানুষ রূপ পেয়েছে।

পূর্ব বাংলার সাহিত্য : ১৯৪৭–এ ভারত বিভাগ হলো। দেশ বিভাগের পর এখানকার সাহিত্যে মুসলমানের জীবন ও রূপায়ণের একটা প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এ জীবনবোধের রূপকারদের মধ্যে ফররুখ আহমদ, শাহাদাৎ হোসেন, আবুল ফজল, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, আবু ইসহাক প্রমুখ উল্লেখ্য।

বাংলাদেশের সাহিত্য : এরপর আসে একাত্তরের মুক্তিসংগ্রাম। ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হলো স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। এদেশের সাহিত্যে এখানকার মানুষের আশা–আকাঙ্ক্ষা, বাসনা–বেদনা, সুখ–দুঃখ প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, রশিদ করিম প্রমুখ উল্লেখ্য।

উপসংহার : বাংলা সাহিত্য বিশ্বের দরবারে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদায় সমাসীন। আমাদের জাতীয় জীবনে আমাদের সাহিত্যই সব চাইতে গৌরবের। বাংলা সাহিত্য আমাদের পরম প্রিয় সম্পদ।

১১৩. বাংলাদেশের লোকসাহিত্য

ভূমিকা : বাংলা লোকসাহিত্য এক অমূল্য সম্পদ। পল্লিবাংলার সহজ–সরল মানুষের সুখ–দুঃখ, হাসি–কান্না, প্রেম–বিরহ, আনন্দ–বেদনার কথা অতি সহজেই ফুটে উঠে লোকসাহিত্যের মাধ্যমে। লোকসাহিত্যে নেই কোনো কালের বাঁধন। এর ঐতিহ্য হাজার বছরের। লোকসাহিত্য কোনো ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি নয়, সমাজের সাধারণ মানুষের সৃষ্টিশীলতার প্রতীক এটি। জগৎ ও জীবন থেকে সৃষ্ট এ সাহিত্য ক্রমান্বয়ে মানুষের মুখে মুখে ফিরে নতুন রূপ লাভ করে। বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতায় এটি বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

লোকসাহিত্য কী : Folklore কথাটির বাংলা প্রতিরূপ লোকসাহিত্য। ফোকলোর কথাটির উদ্ভাবক উইলিয়াম থমাস। ১৮৪৮ সালে সর্বপ্রথম লন্ডনে Folklore Society প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন পণ্ডিত 'লোকসাহিত্য' শব্দটিকে Folklore শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে মানতে রাজি নন। কারণ ইংরেজি Folklore শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে তারা লোকসাহিত্যের

পরিবর্তে লোকবিজ্ঞান, লোকশ্রুতি, লোককথা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। যে সাহিত্য পল্লিবাংলার সহজ–সরল মানুষের মনে আপনা থেকেই জন্ম নেয়, যেখানে কোনো আড়ম্বরতা থাকে না এবং যা নদীর স্রোতের মতো মানুষের মনে বহমান তাই লোকসাহিত্য। শহরের সাহিত্যকে সাজানো ফুলবাগিচার সাথে তুলনা করলে লোকসাহিত্যকে তুলনা করা হবে বনফুলের সঙ্গে।

বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের পরিচয় : ভাষা সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই লোকসাহিত্যের উদ্ভব। যুগ যুগ ধরে এ সাহিত্য মানুষের অগোচরে লালিত হচ্ছে। শিক্ষিত সমাজে এর স্থান না হলেও পল্লী বাংলার মানুষের হৃদয়ের সবটুকু স্থান দখল করে আছে লোকসাহিত্য। মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত গান, কাহিনি, গাথা, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা ইত্যাদি লোকসাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রকৃতির অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোও প্রকাশ পেয়েছে লোকসাহিত্যে। বাংলাদেশের প্রকৃতিই এ দেশের মানুষকে কাব্যিক করে তুলেছে। বাংলাদেশের নদী–নালা, দিগন্ত–বিস্তৃত মাঠ, পাখ–পাখালি, স্নিগ্ধ পরিবেশ এদেশের মানুষকে কল্পনাপ্রবণ ও আবেগপ্রবণ করেছে। ফলে তারা মনের সহজ প্রবণতা থেকেই সাহিত্য রচনা করে। ময়মনসিংহ, পাবনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং উত্তরবঙ্গে লোকসাহিত্যের প্রাচুর্যতা বেশি।

লোকসাহিত্যের বিষয় : বাংলা লোকসাহিত্য নদীর মতো প্রবাহিত, যা আপন স্রোতধারায় বিচিত্র। এতে জীবনের বিচিত্র রং ও বর্ণ ব্যবহার করে জীবনকে ফুটিয়ে তোলা হয় অতি সহজ ভাষায়। বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে লোকসাহিত্যকে প্রধানত ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : (১) ছড়া, (২) গান, (৩) গীতিকা, (৪) কথা, (৫) ধাঁধা, (৬) প্রবাদ–প্রবচন। এছাড়া মঙ্গলকাব্য, পাঁচালি, বাউল, শ্যামাসংগীত, লোকসাহিত্যের এক একটি প্রধান শাখা। যাত্রা, কবিগান, আখড়াই ও টপ্পা প্রভৃতি রচিত হয়েছে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে। এগুলো ছিল বাংলার লোকশিল্পের বাহন।

ছড়া ও স্বপ্নের জগৎ : লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলো ছড়া। প্রধানত শিশুদের আনন্দদানের জন্য ছড়া রচিত হয়েছিল। সাবলীল ভাষায় শিশুর মনে আনন্দের খোরাক জোগায় এই ছড়াগুলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'ছেলে–ভুলানো ছড়া' অনেকগুলো ছড়াকে সংগ্রহ করে সংরক্ষিত করেছেন। ছড়াগুলো শিশুহৃদয়ে কল্পনার রাজ্য তৈরি করে। যেমন–

'আম পাতা জোড়া জোড়া
মারব চাবুক চড়ব ঘোড়া ওরে বুবু সরে দাঁড়া
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া খেপেছে
চাবুক ছুড়ে মেরেছে।'

লোকগীতি : লোকসাহিত্যের অন্যতম উপকরণ লোকগীতি। লোকগীতিতে গ্রামের সহজ–সরল রূপটি ধরা পড়ে। লোকগীতি লোকের মুখে মুখে ফিরে নিত্যনতুন রূপ লাভ করে। লোকগীতিতে জীবনের জটিলতা নেই। স্বচ্ছ পানির মতোই স্বচ্ছ এর গাঁথুনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার জমিদারি কাজ পরিচালনা করতে পাবনা গিয়েছিলেন। সেখানে মাঝির কণ্ঠে লোকগান শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন–

'যুবতী ক্যান বা কর মন ভারী
পাবনাই থ্যাহে আন্যে দেব ট্যাহা দামের মেটেরি।'

পল্লির মাঠে–ঘাটে ছড়িয়ে রয়েছে জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, রাখালি, মারফতি গান। এই গানগুলোর ভাষা ও সুর বিচিত্র। এগুলোর মধ্যে মিশে আছে প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্য ও তত্ত্বজ্ঞান। ভাটিয়ালি সুরে মাঝি গান গায়–

'মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না
সারা জনম উজান বাইলাম
ভাটির নাগাল পাইলাম না।'

গীতিকা সাহিত্য : Ballad বা গীতিকা লোকসাহিত্যের একটি বড়ো অংশজুড়ে রয়েছে। গীতিকা সাহিত্যে সাধারণত কোনো দৈব দুর্ঘটনা বা কোনো বিয়োগান্ত প্রেমকাহিনির বর্ণনা থাকে। গীতিকা সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম হলো– নাথ–গীতিকা, মৈয়মনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা। বাংলা লোকসাহিত্যের আকাশে মৈয়মনসিংহ গীতিকা উজ্জ্বল নক্ষত্র। মহুয়া, মলুয়া, সোনাই, কাজল–রেখা, লীলাবতী এক একটি উজ্জ্বল অংশ। মহুয়া পালার দুটি পঙক্তি–

'জলভর সুন্দরী কন্যা জলে দিছ ঢেউ,
হাসিমুখে কও না কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ।'

রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা : বাংলায় শিশু–সাহিত্যের শাখায় পড়ে রূপকথা ও উপকথা। মেয়েলি ব্রতের সঙ্গে সম্পর্কিত কাহিনি অবলম্বনে তৈরি হয় ব্রতকথা। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রচলিত রূপকথাগুলোকে লিখিত রূপ দিয়েছেন। তাঁর 'ঠাকুরদার ঝুলি' 'ঠাকুরমার ঝুলি' রূপকথার গ্রন্থ হিসেবে সুপরিচিত। মেয়েলি ব্রতকথাগুলো লৌকিকদের দেবীর মাহাত্ম্যগানের উদ্দেশ্যে রচিত। ব্রতকথাগুলো বাংলা আদিমকাব্য। বিভিন্ন ধরনের ব্রত রয়েছে। যেমন– সেঁজুতি ব্রত, তুষ–তুষালি ব্রত, পুণ্যপুকুর ব্রত, সাবিত্রী ব্রত, লক্ষ্মীর ব্রত ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে মেয়েরা গৃহের শান্তি ও কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে, এ বিশ্বাস ছিল সবার মনে।

ধাঁধা : ধাঁধা লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন শাখা। এর মধ্যে সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। মাহবুবুল আলমের ভাষায়, 'এতে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে তাকে কেবল আদিম মানুষের সৃষ্টি মনে না করে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানবমনের সৃষ্টি বলে বিবেচনা করাই যৌক্তিক মনে হয়।' যেমন– (ক) আকাশ গুড় গুড় পাথর ঘাটা, সাতশ ডালে দুইটা পাতা। (খ) বাগান থেকে বেরুল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। (গ) আকাশ থেকে পড়ল এক বুড়ি, তার মাথায় চুলের ঝুড়ি। এই তিনটি ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে– চাঁদ ও সূর্য, আনারস এবং ঢোল।

প্রবাদ–প্রবচন : গ্রাম বাংলার সহজ–সরল মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানচর্চা হচ্ছে প্রবাদ–প্রবচন। প্রবাদ–প্রবচনে শব্দ–বিন্যাস খুব সংযত হয় তাই একে কাব্যিক মর্যাদা দেওয়া যায়। বাংলার কৃষক সমাজে প্রবাদ হলো জ্ঞান ও সত্য প্রচারের মাধ্যম। প্রবাদ বাক্যের মাধ্যমে তারা নৈতিক ধারণা পেত। এখনও পর্যন্ত এগুলো পল্লিসমাজে সযত্নে লালিত হচ্ছে। উদাহরণ–

(ক) 'নানা বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ
জগৎ ভরিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।'

(খ) 'চিড়া বলো পিঠা বলো ভাতের মতো না,
খালা বলো ফুফু বলো মায়ের মতো না।'

খনার বচন, ডাকের কথা প্রভৃতিও প্রবাদ বাক্যের অন্তর্গত। ডাক ও খনার বচন বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনের সাথে মিশে আছে। উদাহরণ–

(ক) চার চাষে ধান
তার অর্ধেক পান
ষোলো চাষে মূলা
তার অর্ধেক তুলা।

খ) কলা রুয়ে না কেটোপাত
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

লোকসাহিত্য সংরক্ষণ : গ্রামের অশিক্ষিত, অর্ধ–শিক্ষিত, সুফিসাধক, মাঝি–মাল্লা, চাষি, বৈরাগী ও লোককবিরা লোকসাহিত্যের রচয়িতা। কিন্তু এগুলো যখন প্রায় বিলুপ্ত তখন শুরু হলো সংরক্ষণের প্রচেষ্টা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লোকসাহিত্য সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। রেভারেন্ড লাল বিহারী তাঁর Folk Tales of Bengal বইটি রচনা করে লোকসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তারপর থেকেই লোকসাহিত্যের সংগ্রহের দিকে সবাই মনোযোগ দেয়। ড. দীনেশচন্দ্র সেন এবং চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' ও 'মৈয়মনসিংহ গীতিকা'। ড. সুনীল কুমার দে 'প্রবাদ সংগ্রহে' কয়েক হাজার ছড়া ও প্রবাদ সংগ্রহ করেছেন। মনসুরউদ্দীন সাহেব 'হারামনি', মযহারুল ইসলাম 'পাগলা কানাই' নাম দিয়ে লোকসাহিত্যের বিরাট এক অংশকে বইয়ে প্রকাশ করেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার বাংলা রূপকথাগুলো যেন প্রাণ দিয়েছেন তার 'ঠাকুরদার ঝুলি' এবং 'ঠাকুরমার ঝুলি' গ্রন্থে। বর্তমানে ড. আশরাফ সিদ্দিকী এবং ড. মযহারুল ইসলাম লোকসাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা করে যাচ্ছেন।

উপসংহার : লোকসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য। এটি সহজ ও সাবলীল ভাষায় গ্রামের সাধারণ মানুষের কথা বলে। লোকসাহিত্য খাঁটি বাংলা সাহিত্যের উদাহরণ। সুতরাং গ্রামীণ মানুষের হাজার বছরের লালিত এই সকল লোকসাহিত্য যথাযথ পরিচর্যা এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে বাংলার মানুষের মনে বেঁচে থাকবে হাজার বছর।

১১৪. বাংলাদেশের সমুদ্র জয়

ভূমিকা : যেকোনো বিজয়–ই আনন্দের। বাংলাদেশের ইতিহাসে এরকম বিজয়ের আনন্দ অনেকবারই এসেছে। তার সাথে যুক্ত হলো আরেকটি ব্যতিক্রমধর্মী বিজয় তথা সমুদ্র বিজয়। ১৯৭৪ সাল থেকে সমুদ্রের সীমা নির্ধারণ নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও মিয়ানমারের সাথে বিরোধ চলছিল। যার একটি সফল পরিসমাপ্তি ঘটল বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত এ বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে।

সমুদ্র এবং বাংলাদেশ : মহাসাগরের লবণাক্ত জলের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদাকার অংশকে সাগর বা সমুদ্র বলা হয়। সাধারণত সাগরের অংশবিশেষ ভূভাগ দ্বারা আবদ্ধ থাকে। ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, আরব সাগর বিশ্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাগরের উদাহরণ। বাংলাদেশের দক্ষিণেও রয়েছে বিস্তৃত জলরাশির বঙ্গোপসাগর, যা বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের ভূভাগ দ্বারা সংযুক্ত। আর তাই বঙ্গোপসাগরের ওপর নিজেদের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে বাংলাদেশের সাথে প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমারের দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছে। তবে বর্তমানে ভারত এবং মিয়ানমারের সাথে একটি সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। সেই সাথে সমুদ্রের ওপর বাংলাদেশের অধিকারও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

সমুদ্রসীমায় বাংলাদেশ–মিয়ানমারের দাবি : বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের মধ্যে বিরোধের মূল কারণ ছিল সমুদ্রসীমা নির্ধারণ পদ্ধতি নিয়ে। মিয়ানমারের দাবি ছিল সমান দূরত্ব অনুযায়ী সমুদ্রসীমা নির্ধারণ হবে। এ প্রেক্ষিতে সাগর এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার থাকবে ১৩০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত। এজন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমুদ্র এলাকা পাবে না। পাশাপাশি সমুদ্রের মহীসোপান অঞ্চলেও তাদের কোনো অংশ থাকবে না। অন্যদিকে রাষ্ট্রের নিজস্ব সাগর এলাকা হবে ৬ নটিক্যাল মাইল। অপরপক্ষে বাংলাদেশের দাবি ছিল ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ হবে। এজন্য বাংলাদেশের অধীনে অর্থনৈতিক এলাকা যেমন থাকবে ঠিক তেমনি সমুদ্রের অর্থনৈতিক অঞ্চলে অধিকার থাকবে। এছাড়া রাষ্ট্রের নিজস্ব সাগর এলাকা হবে ১২ নটিক্যাল মাইল।

সমুদ্র জয়ের রায় : জার্মানিতে অবস্থিত সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল International Tribunal for the Law of the Seas (ITLOS) বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের মধ্যকার সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে এক যুগান্তকারী রায় ঘোষণা করে। এই রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার উপকূল থেকে বঙ্গোপসাগরের ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। পাশাপাশি এর বাইরে বিশেষ করে মহীসোপান ছাড়িয়ে সামুদ্রিক সম্পদের ওপরও অধিকার লাভে সমর্থ হয়। এর আগে দীর্ঘদিনের ঝুলে থাকা সমস্যাটি সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের শরণাপন্ন হয়। ২০১০ সালে বাংলাদেশ তার সপক্ষে সকল প্রমাণ উপস্থাপন করলে মিয়ানমার ও তার সপক্ষে সকল দলিলপত্র জমা দেয়। যার প্রেক্ষিতে ২০১১ সালে ট্রাইব্যুনাল উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনে এবং ২০১২ সালের ১৪ মার্চ বাংলাদেশের পক্ষে রায় ঘোষণা করে।

বাংলাদেশের প্রাপ্ত সম্পদ : বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য ৭১১ কি.মি. এবং প্রতিবেশী মিয়ানমারের দৈর্ঘ্য ৫৮৭ কি.মি.। এই হিসাব অনুযায়ী ইটলস–এর রায়ে বাংলাদেশ পেয়েছে ১,১১,৬৩১ বর্গ কি.মি. এবং মিয়ানমারের অংশে পড়েছে ১,৭১,৮৩২ বর্গ কি.মি.। এছাড়া সমুদ্রে অবস্থিত ২৮টি ব্লকের মধ্যে ১৮টি ব্লকের মালিকানাও পেল বাংলাদেশ। সমুদ্রবক্ষের এই এলাকা প্রচুর তেল–গ্যাস সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে পরিচিত। আবার গভীর সমুদ্র জলরাশিতে মৎস্য সম্পদের পর্যাপ্ততা যেমন দেখা যায় ঠিক সমুদ্রের তলদেশেও রয়েছে প্রচুর খনিজ সম্পদ। বলা হয় কপার, ম্যাগনেশিয়াম, নিকেল ও কোবাল্টের মতো খনিজ সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে সমুদ্র তলদেশে।

ভারতের বিপক্ষে রায় ও বাংলাদেশের অর্জন : মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির পর ২০১৪ সালের ৭ জুলাই আবারো বাংলাদেশের বিজয় দেখেছে বিশ্ববাসী। এবার প্রতিপক্ষ ভারত। বঙ্গোপসাগরে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে চলা সমুদ্রসীমা নিয়ে এ বিরোধের অবসান ঘটায় বাংলাদেশ লাভ করেছে একটি স্থায়ী সমুদ্রসীমা, যার আয়তন ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি.। জার্মানিতে অবস্থিত স্থায়ী সালিশি আদালত বাংলাদেশের পক্ষে এ রায় দেয়। এ রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিপুল অঞ্চলজুড়ে তার পূর্ণ অধিকার ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। রায় অনুযায়ী বিরোধপূর্ণ ২৫,৬০২ বর্গ কি.মি.–এর মধ্যে বাংলাদেশ পেয়েছে ১৯,৪৬৭ বর্গ কি.মি.। এর ফলে অধিকাংশ গ্যাস ব্লক এখন বাংলাদেশের। ভারতের দাবিকৃত ১০টি গ্যাসব্লকের সবগুলোই পেয়েছে বাংলাদেশ, তবে বহুল আলোচিত দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের মালিকানা পায় ভারত।

সম্পদ রক্ষায় করণীয় : সমুদ্র জয়ের মাধ্যমে সমুদ্রবক্ষে বাংলাদেশ অর্জন করেছে বিশাল সম্পদ। সেই সম্পদ রক্ষায় বাংলাদেশকে কিছু করণীয় ঠিক করতে হবে। যেমন–

১. **দক্ষ জনশক্তি :** যেকোনো সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির বিকল্প নেই। তাই সমুদ্রের সম্পদ আহরণের জন্যও আমাদের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা প্রয়োজন। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে ইতোমধ্যে বরিশালে মেরিন বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও সমুদ্রবিদ্যা বিভাগটি চালু করা হয়েছে। তবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও এই বিভাগটি চালু করতে হবে।

২. **জরিপ জাহাজ :** অত্যাধুনিক কোনো জরিপ জাহাজ বাংলাদেশে নেই। যে কারণে বিদেশি জাহাজ আমাদের সমুদ্রসীমায় দূষিত পদার্থ ফেলে চলে যায় এবং মারাত্মক পরিবেশ দূষণ ঘটে। আর এর ফলে বাংলাদেশ তার গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যসম্পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই আধুনিক জরিপ জাহাজ সংগ্রহ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

৩. **নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ড :** বিদেশি অনেক মাছ ধরা জাহাজ আমাদের নির্ধারিত এলাকায় এসে মৎস্যসম্পদ আহরণ করে। এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন।

৪. **মিয়ানমারের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি :** মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক যে খুব ভালো তা বলা যাবে না। অথচ আমাদের জাতীয় স্বার্থে মিয়ানমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখনই উদ্যোগ নিতে হবে সম্পর্ক বৃদ্ধিতে। ব্যবসা–বাণিজ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটলে একদিকে যেমন তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে অন্যদিকে আমাদের অর্থব্যবস্থাও চাঙ্গা হবে।

উপসংহার : বঙ্গোপসাগরেরর ওপর অধিকার প্রশ্নে ৩৮ বছরের ঝুলে থাকা সমস্যাটির অবসান ঘটল ইটলস কর্তৃক ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে। এ রায়ের ফলে মিয়ানমার যেমন তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়নি। আবার বাংলাদেশও পেয়েছে তার ন্যায্য অধিকার। মোটকথা দু'দেশের মধ্যে অমীমাংসিত বিষয়টির সুন্দর সমাধান হলো।

১১৫. বিশ্বায়ন
অথবা, বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ

ভূমিকা

বিশ্ব আজ একবিংশ শতাব্দীতে তথ্যবিপ্লবের যুগে প্রবেশ করছে। মানুষের জীবনযাত্রার নানা ক্ষেত্রে জ্ঞান–বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির ক্রম–সম্প্রসারণ এক প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করেছে। মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করলেও প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে উন্নত যোগাযোগ নেটওয়ার্কের ফলে। সেই সাথে মানুষ ক্রমাগত তার জীবনযাপনের পরিবেশ থেকে ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার বাধা কাটিয়ে ওঠে জ্ঞান–বিজ্ঞানের , সুদূরপ্রসারী ও সম্প্রসারণশীল বিষয়, আবিষ্কার, ধারণা, সুবিধা ইত্যাদির সাথে নিজেকে যুক্ত করতে চাইছে। মানুষের অবস্থানের ভৌগোলিক সীমা আর মানসিকতার বন্দিদশা থেকে উত্তরণের এই প্রচেষ্টা এবং বিশ্বব্যবস্থার বহুমাত্রিকতার সাথে নিজেকে যুক্ত করার জন্য আধুনিককালে যেসব ব্যবস্থা ক্রমাগত তাত্ত্বিক রূপলাভ করছে তা–ই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া।

বিশ্বায়ন কী : সাধারণ অর্থে 'বিশ্বায়ন' সমগ্র বিশ্বকে আধুনিকতা ও অগ্রগতির এক বলয়ে সমন্বিত করার একটি তত্ত্ব বা ধারণা। যার সূত্রপাত ঘটেছে তথ্যপ্রযুক্তির অভাবিত বিকাশের মধ্য দিয়ে। তাই বিশ্বায়ন বলতে বিশ্বজুড়ে দ্রুত তথ্য আদান–প্রদানের সাম্প্রতিক অগ্রগতিকেই বুঝানো হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশ্বায়ন হচ্ছে সমগ্র বিশ্বকে একটিমাত্র বিশাল রাজ্যকে একত্রীকরণ। বিশ্বায়ন আজ একটি বহুমাত্রিক প্রত্যয় আর বহুমাত্রিক প্রত্যয় হিসেবে বিশ্বায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন– বিশ্বজুড়ে শক্তি ও ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার পটভূমি হলো লাগামহীন বিশ্বায়ন, যার অবধারিত পরিণতি হলো অর্থনৈতিক মাৎস্যন্যায়। মাৎস্যন্যায় শব্দের অর্থ হচ্ছে বড়ো মাছ কর্তৃক ছোটো মাছকে খেয়ে ফেলা। অর্থাৎ ধনী রাষ্ট্রগুলো আরও ধনী এবং গরিব রাষ্ট্রগুলো আরও গরিব হওয়ার এই প্রক্রিয়াকে বিশ্বায়ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিশ্বায়ন এই যোগাযোগেরই অপর নাম। ড. আলী আসগর তাই বিশ্বায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "উন্নত দেশ থেকে আমদানিকৃত সামগ্রী ধার করা জ্ঞান ও তথ্য বিশ্বায়নকে বুঝায় না বরং সৃজনশীল, উদ্ভাবন ও আবিষ্কার জ্ঞানের জগৎকে যে দ্রুত বদলে দিচ্ছে এবং সৃষ্টি করছে এক দ্রুত পরিবর্তনশীল অবিচ্ছিন্ন জগতের, তার সমগ্রতাই এক বহুমাত্রিকতা এনেছে।" বিশ্বায়ন তাই সংঘটিত হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিচিত্র ফসলকে দীর্ঘদিন ধরে শোষণ করে নিয়ে এবং সে সঙ্গে জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে।

বিশ্বায়ন ও অর্থনীতি : মানুষের জীবনের মূলভিত্তি অর্থনীতি। অর্থনীতির সাথে রাজনীতি, সংস্কৃতি সবকিছু জড়িত। তাই বিশ্বায়ন বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর মধ্যে একটি আন্তঃপারিবারিক জ্ঞানময় যোগাযোগ হলেও তা একটি অর্থনৈতিক প্রত্যয়। অর্থনীতিই বিশ্বায়নের প্রেরণা। ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন– "বিশ্বায়ন নতুন কোনো বিষয় নয়, এটা পুরোনো বাস্তবতারই নতুন নাম এবং বাস্তবতাটি হচ্ছে পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদই নতুনরূপে বিশ্বায়নের নাম ধরে এসেছে।" বিশ্ব অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ একটি আগ্রাসি এবং সম্প্রসারণশীল প্রক্রিয়া।

বিশ্বায়নে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব : সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যেকার স্নায়ুযুদ্ধের অবসান, সমাজতন্ত্রের পতন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যায় থেকে পুঁজিবাদের বিপুল বিজয় ঘটে। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিতন্ত্রের ইতিহাসে যুক্ত হয় তিনটি মাত্রা–

১. সামগ্রিকভাবে প্রবৃদ্ধির হার কমে আসা,
২. বিশ্বব্যাপী একাধিপত্য বিস্তারকারী (Monopoly) বহুজাতিক কোম্পানির সংখ্যা ও প্রভাব বৃদ্ধি এবং
৩. পুঁজির পুঞ্জীভবন বা লগ্নীকরণ (Financialization of Capital Accumulation Process)।

এসবই বিশ্বায়নের প্রভাব। পুঁজিবাদীগণ সারাবিশ্বে বাণিজ্য এবং পুঁজি বিনিয়োগ করে বিশ্বকে একটি বাজারে পরিণত করতে চায় তাদের উৎপাদিত পণ্যের এবং কাঁচামাল সংগ্রহের আরেকটা দিক হচ্ছে পুঁজি। যা তারা বিনিয়োগ করতে চায়, লগ্নি করতে চায় পুরো পৃথিবীতে, যেখানে সুবিধা সেখানে। দরিদ্র দেশগুলো এ পুঁজি আহ্বান করে, উৎপাদনশীল দেশগুলোর পণ্যের ক্রেতা হয়। ফলে দেশীয় উৎপাদনগুলো মার খায়।

বিশ্বায়নের ইতিবাচক দিক : ঘরে বসেই কম্পিউটার, ইন্টারনেটের মাধ্যমে কয়েক মুহূর্তেই সমগ্র বিশ্বের খোঁজখবর জেনে যাওয়া আর কল্পনার বিষয় নয়। বিশ্বায়নের যেসব ইতিবাচক দিক রয়েছে তার মধ্যে নিম্নলিখিত দিকগুলো উল্লেখযোগ্য :

১. বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন হচ্ছে।
২. বিশ্বায়নের ফলে যে বৃহৎ বাজার ব্যবহার ব্যাপ্তি হয়েছে তাতে বৃহদায়তন উৎপাদন ও বিপণন সহজসাধ্য হয়েছে।
৩. জ্ঞানদক্ষতা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে পরস্পর গ্রহণ–বর্জনের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে।
৪. অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৫. আন্তর্জাতিক সংঘাত হ্রাস করে শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে।

বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতি : মুক্তবাজার অর্থনীতি বিশ্বায়নের একটি সুপক্ব ফল। এক দেশের পণ্য, উৎপাদিত ফুল–ফসল থেকে শুরু করে সবকিছুই শুধু সেদেশের মানুষের ভোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে না, তার ওপর অন্য দেশেরও অধিকার আছে। এ অধিকার কার্যকর হবে পণ্যের আন্তঃবিশ্ব–অবাধ–প্রচলনের মাধ্যমে। বিশ্বায়ন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উৎপাদন ও ভোগের ব্যবস্থার মধ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ব্যবস্থার বিধি–বিধানের অনেক প্রতিবন্ধকতাই অপ্রয়োজনীয় করে তোলে। মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা সারাবিশ্বের পণ্য প্রচলন প্রক্রিয়াকে অবাধ ও গতিশীল করে বিশ্বকে একটি গ্রামে পরিণত করে তোলে। এ প্রসঙ্গে ফাদার আর ডব্লিউ টিম বলেন– "Globalisation refers to all the processes by which all the people of the world are part of a single global society." পণ্যের অবাধ বাণিজ্যের সাথে পুঁজিরও গতিশীলতা সৃষ্টি হয়। এরই ফলে আজ এক দেশে বসে অন্য দেশের ফল, খাদ্যদ্রব্য, বিলাসসামগ্রী, বিনোদন উপকরণ, সাংস্কৃতিক উপচার সবকিছুই ভোগ ও উপভোগ করা সম্ভব হচ্ছে। পণ্য আমদানির রাষ্ট্রীয় বাধা সম্পূর্ণ নিরসন ও ব্যাপক হারে শুল্ক হ্রাস, দেশের আমদানি–রপ্তানির রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অবমুক্ত করে যাবতীয় পণ্যের অবাধ ও সহজ আন্তঃদেশীয় চলাচলের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত দেশের পণ্যের গুণগত মানের উৎকর্ষতা সাধন মুক্তবাজার অর্থনীতির অভীষ্ট লক্ষ্য। এতে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হওয়ার কারণে উৎপাদন সামগ্রীর গুণগত মানের উৎকর্ষ অর্জিত হওয়ার এবং মূল্য স্থিতিশীল ও নেমে আসার নিশ্চয়তা থাকবে বলে মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রবক্তাদের অভিমত। পণ্যের অবাধ আন্তর্জাতিক প্রবাহের কারণে অর্থনীতির চাকা গতিশীল, সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয়সহ সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলে প্রতিটি দেশের অবকাঠামো উন্নতি এবং ফলশ্রুতিতে দেশের কলকারখানার সংখ্যার এবং উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ঘটবে। শুধু ধার্য শুল্ক প্রদান করে ব্যবসায়ীদের পণ্য আমদানিতে কোনো বাধা না থাকায় এবং বাজারের পণ্যমূল্য একশ্রেণির হাতে জিম্মি হয়ে পড়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা না থাকায় বাজার আপনাআপনি নিয়ন্ত্রিত থাকে।

বিশ্বায়নের নেতিবাচক দিক : বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব সাধারণত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির আওতায় বিশ্বায়ন উন্নত দেশের জন্য বিশ্বসম্পদের দ্বার খুলে দিলেও দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ দেশের জন্য তা বড়ো অভিশাপ বয়ে এনেছে। যেমন–

১. বিশ্বায়নের ফলে দরিদ্র দেশের মেধা অবাধে পাচার হচ্ছে ধনী দেশগুলোতে। এতে গরিব দেশ আরও গরিব এবং ধনী দেশ হচ্ছে।
২. বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে দরিদ্র দেশের বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে বেকার হচ্ছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক।
৩. বিশ্বায়নের ফলে রাষ্টীয় গোপনীয়তা রক্ষা করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।
৪. বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে।

বিশ্বায়নের প্রভাব ও বাংলাদেশ : উন্নয়নশীল , প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রম সম্পদে পরিপূর্ণ বাংলাদেশেও বিশ্বায়নের প্রভাব পড়ছে। বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের সম্পদ ও প্রযুক্তির যে বিস্ময়কর বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে তার ধাক্কা বাংলাদেশেও এসে লাগছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির সুফল হিসেবে উন্নত দেশগুলোর তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবস্থা, কম দামে পণ্যভোগ এবং বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে; গ্যাস সম্পদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো ও অন্যান্য শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশ নিজেকে যুক্ত করে নিচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রেও হাইব্রিড বীজসহ কৃষিভিত্তিক নানা ব্যাবসা–বাণিজ্যের দুয়ার বিদেশিদের জন্য খুলে

যাচ্ছে। তবে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশকে ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব এড়িয়ে বিশ্বায়নের সুফল পেতে হলে রাষ্ট্রকে কতগুলো নীতি–নির্ধারণ করতে হবে। এসবের মধ্যে রয়েছে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য ভৌত কাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে সামাজিক খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা, দারিদ্র্য নিরসন, সুশাসন নিশ্চিতকরণ, পরিবেশ সচেতনতা, মানুষের কর্মপরিধি বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের মানবিক উন্নয়ন ইত্যাদি।

বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের করণীয় : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য নিম্নলিখিত নীতি–নির্ধারণী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে :

১. রাষ্ট্রের ভৌত কাঠামোর উন্নয়ন।
২. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তাসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
৩. প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন করে তাতে তথ্যপ্রযুক্তিসহ গবেষণাধর্মী বিষয়গুলোতে আরও গবেষণা চালানো।
৪. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক আত্মনিয়োগ করা।
৫. অস্থিতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে চিরতরে নির্মূল করে সংযত ও সহনশীল তথা স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করা।

উপসংহার : তথ্যপযুক্তির অভাবনীয় বিকাশের ফল হিসেবে বিশ্ব আজ যে যোগাযোগের পর্যায়ে পৌঁছেছে বর্তমানে অস্তিত্ব রক্ষা করতে চাইলে কোনো দেশের পক্ষেই এ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব নয়। আত্মরক্ষা এবং আত্মবিকাশ উভয় কারণেই বিশ্বকে আজ এগিয়ে যেতে হবে বিশ্বায়নের দিকে। তবে বিশ্বায়নের সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষার কথাও দরিদ্র বা স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ভাবতে হবে। বিশ্বায়ন যেন ধনী দেশগুলোর প্রভুত্ব ও উপনিবেশ বিস্তার না করে সত্যিকার অর্থেই সারাবিশ্বকে একটি উদার, সর্বজনীন উন্নত আধুনিক জীবনের আওতায় নিয়ে আসা যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বিশ্বায়নকে আধিপত্যবাদ থেকে মুক্ত করে আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। বিশ্বায়ন আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছে নতুন এক প্রত্যাশার জগৎ, এক সম্ভাবনার জগৎ। যার অধিকারী আমরা হতে পারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে এবং সৃজনশীলতা, প্রেরণা ও কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়ে।

১১৬. টেকসই উনয়ন লক্ষ্যমাত্রা

ভূমিকা : আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ গঠিত হওয়ার পর থেকে এর উদ্দেশ্যগুলো অর্জনে সংস্থাটি অনেক সাফল্য লাভ করেছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সকলের সম্ভাবনা, মর্যাদা ও সমতা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশ উন্নয়নের সমন্বয়ে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (এসডিজি) অর্জনে জাতিসংঘ কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ নির্ধারিত এসডিজি অর্জনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সাথে বাংলাদেশও সমান তালে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এ কাজ খুব সহজ নয়। এ কাজে সরকার ও জনগণকে একযোগে কাজ করতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব : এসডিজি অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার পূর্বে আমাদের জানা দরকার অংশীদারিত্ব কী? উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠীই হলো অংশীজন। তারা যদি উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে চায় তাহলে অংশীজন হিসেবে তাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে উন্নয়নে তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। উন্নয়ন কর্মী বা সরকারের একার পক্ষে উন্নয়ন গতিধারাকে অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। যেমন– ধরা যাক, ভালো ফসল ফলানোর জন্য সরকার বা কোনো উন্নয়ন সংগঠন সার ও প্রয়োজনীয় কীটনাশক সরবরাহ করবে। কিন্তু যারা এটি ব্যবহার করবে তারা যদি অসচেতনভাবে মাত্রার অতিরিক্ত ব্যবহার করে তা কখনো পরিবেশবান্ধব হবে না। এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সচেতনতার সাথে পরিমিত সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা। কেবল ব্যক্তিক লাভের কথা চিন্তা না করে সামষ্টিক উপকারিতা কীভাবে আসবে সেটি চিন্তা করে কাজ করাটা হলো এক ধরনের অংশীদারিত্ব। যেকোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই পরিচালিত হোক না কেন তা যেন সকলের কথা ভেবে হয়। যার যতটুকু দায়িত্ব তা স্ব স্ব অবস্থানে থেকেই পালন করতে হবে। এসডিজি বাস্তবায়নে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু বেসরকারি খাত বা সংগঠন নয়, তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজের সর্বস্তরের অংশগ্রহণ ও মিলিত প্রচেষ্টায় একযোগে উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত তৎপরতাকে আর সুসমন্বিত করতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাব্য ফলাফল : বর্তমান পৃথিবী নামক গ্রহটি অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই এসডিজি বাস্তবায়ন করা জরুরি। বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভাব্য যেসব ফলাফল লাভ করবে তা নিম্নরূপ–

- দারিদ্র্যসীমা শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসা যাবে।
- মৌলিক চাহিদা অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার চাহিদা পূরণ হবে।

- জেন্ডার সমতাবিধান ও নারী এবং মেয়েদের ক্ষমতায়নের ফলে সমাজের সকল স্তরে নারী নির্যাতন হ্রাস পাবে।
- গ্রাম ও শহরে বিশুদ্ধ পানি ও সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা গেলে ভালোভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশ তৈরি হবে।
- বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন হবে।
- টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানি বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে নৈরাজ্য কমে আসবে এবং স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।
- গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী হলে রাজনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস পাবে।
- বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে অংশীদারিত্ব বাড়ানোর ফলে অনেক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিরসন হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ : বাংলাদেশ জাতিসংঘ নির্দেশিত 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' (এমডিজি) অর্জনে ইতোমধ্যে অনুসরণীয় সাফল্য দেখিয়েছে। বাংলাদেশকে বলা হচ্ছে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের রোল মডেল। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (Sustainable Development Goals) অর্জনের অংশীদারিত্বের পারস্পরিক দায়িত্ব পড়েছে বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশের ওপর। এর উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের সর্বত্র সার্বিক ও সার্বজনীন কল্যাণ। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন করতে হবে। পৃথিবীর সকল দেশ এ লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ পাঠে আমরা বাংলাদেশ এ লক্ষ্যগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে সে বিষয়ে জানব। একটি দেশকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাতে হলে সামগ্রিক উন্নয়নের কথা ভাবতে হয়। আর টেকসই উন্নয়ন হলো সামগ্রিক উন্নয়নের কাঠামোবদ্ধ পরিকল্পনা। টেকসই উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো সম্পদের অসম বণ্টন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য। আমরা একদিকে যখন দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলছি অন্যদিকে বিশ্বে তখন সম্পদের বৈষম্য বেড়েই চলেছে। ধনী–গরিবের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান দারিদ্র্যকে আরও প্রকল করে তুলেছে। বিশ্বে সম্পদের বৈষম্য যত বাড়বে ধনী ও গরিবের বিভক্তি তত প্রকট হবে। আর বিভক্তি যত বাড়বে, বিদ্বেষ–বিভেদও তত বাড়তে থাকবে। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী যে উন্নয়ন ঘটেছে তা ভারসাম্যহীন। এই উন্নয়ন হচ্ছে দেশে দেশে এবং মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী, বিভেদ বর্ধনকারী উন্নয়ন। এই প্রকট ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও বিভক্তি টেকসই উন্নয়নের পথে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশও এই চ্যালেঞ্জের বাইরে নয়। যদিও বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। তবে একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক হলো আয় ও ভোগ বৈষম্য। গত কয়েক বছরে এই বৈষম্য বাড়েনি বরং কিছুটা কমেছে, তথাপি বিদ্যমান বৈষম্য প্রকট। আমাদের সম্পদ বৈষম্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সমাজে এক শ্রেণির মানুষ ভূমি দখল, নদী দখল, বন দখল এমনকি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কুক্ষিগত করে অপরিমিত সম্পদশালী হয়েছে। এর ফলে ভারসাম্যহীন সমাজ গড়ে উঠছে ও পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের অব্যাহত যাত্রা এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাচ্ছে। ব্যক্তি পর্যায় থেকে সামষ্টিক পর্যায়–সর্বত্র জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাব টেকসই উন্নয়নের পথে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় : আমরা জেনেছি যে, টেকসই উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্র হলো আমাদের সমাজ, অর্থনৈতিক বিবেচনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ। এগুলোকে মৌলিক বিবেচ্য বিষয়ও বলা হয়ে থাকে। মূলত এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে যদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে সকল ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন আশা করা যায়। টেকসই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সরকারের একার পক্ষে, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে প্রত্যেককেই এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সচেতনতা রাষ্ট্রকে উন্নয়নের আরও এক ধাপ সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উন্নয়নের পথে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো পরিবেশ দূষণ। আমরা দেখতে পাই, একটানা বৃষ্টি হলেই বাংলাদেশের বড়ো বড়ো শহরগুলোতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। তখন যান চলাচল ব্যাহত হয়, রাস্তা–ঘাটের ক্ষতি হয়, স্বল্প আয়ের লোকদের কাজ বন্ধ থাকে, আমরা ঠিকমতো স্কুল, কলেজ বা কর্মস্থলে পৌঁছাতে পারি না, দোকানপাট বন্ধ থাকে, রোগ–ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। আসলে আমরাই আমাদের শহরগুলোকে নষ্ট করে ফেলছি। নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা না ফেলে যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা, পলিথিন ব্যাগ, চিপসের প্যাকেট ইত্যাদি ফেলছি। রাস্তার পাশের ড্রেনগুলো বন্ধ হয়ে পানি ঠিকমতো নির্গমন হচ্ছে না। দীর্ঘ সময়ব্যাপী পানি জমে নানা সমস্যা ও সংকট তৈরি করছে। এ অবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। সবার আগে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। আমরা জেনেছি যে বাংলাদেশকে এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হাজারও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হলো উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা টেকসই রাখা এবং এর গতি দ্রুততর করা। ২০২১ সাল নাগাদ ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং মধ্যম–আয়ের দেশ, ২০৩০ সাল নাগাদ এসডিজি অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন দেখছি। এগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে

সবাইকে নিয়েই আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় শামিল হতে হবে। তা না হলে আমাদের হয়তো প্রবৃদ্ধি বাড়বে কিন্তু তা কখনোই টেকসই রাখা সম্ভব হবে না। সবাই যাতে নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার ভোগ করে, সকলে যাতে মানব মর্যাদা পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানোন্নয়ন ও জাগরণ ঘটাতে হবে। জ্বালানি খাতকে বর্তমান বাজেটে অগ্রাধিকার দিলেও তা বাস্তবায়নে কঠোর তদারকি জোরদার করতে হবে। গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থলভাগ ও সমুদ্র অনুসন্ধানে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেকোনো উন্নয়নই ঘটুক না কেনো উন্নয়নের সাথে কিছু নেতিবাচক ফলাফল আর্থ–সামাজিক অবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়ে। যেমন– দেশ তথ্যপ্রযুক্তিতে অনেক এগিয়েছে ঠিকই কিন্তু পূর্ব সতর্কতা না থাকায় বর্তমানে আমাদেরকে অনেক দায় বহন করতে হচ্ছে। যেমন– কোমলমতি কিশোর–কিশোরীরা তথ্যপ্রযুক্তি অপব্যবহারের শিকার হচ্ছে। তাই যা কিছু ভালো তা বিবেচনা করার পূর্বে যদি তার সাথে বিপন্নতা, ঝুঁকি কতোটুকু সে দিকটা বিবেচনায় রেখে সতকর্তা অবলম্বন করা হয়। তাহলে অনেকাংশে ঝুঁকি মোকাবিলা করা সহজ হয়।

উপসংহার : আমরা যদি এ সকল বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে হাত দিই তাহলে ফলাফল কাঙ্ক্ষিত মানের হবে তা ধরে নেওয়া যায়। পৃথিবীর সব সমাজেই কিছু চলমান সমস্যা থাকে, আবার নতুন নতুন কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয় যা আর্থ–সামাজিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা তৈরি করে। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা সুষম ও সুসংহত করা এবং একে গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে মানব সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদের উন্নয়ন। বাস্তবতার আলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, গৃহীত কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন, অপচয়রোধ, দুর্নীতি দমন এবং দেশের নাগরিকদের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া আরও কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্তকরণ। পাশাপাশি রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

পরিবেশ

১১৭. পরিবেশ দূষণ: কারণ ও প্রতিকার
অথবা, পরিবেশ দূষণ ও বাংলাদেশ

[ব. বো. '১৯; রা. বো. '১৪, '০৩; কু. বো. '১৭, '০৫]

ভূমিকা : জীবজগতের প্রাণের ধারক এবং নিয়ামক হলো পরিবেশ। প্রাণিকুলের জন্যই পরিবেশের প্রয়োজন; তাই পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে নচেৎ মানুষ তথা জীবজন্তুর অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন। পরিবেশ যাতে স্বচ্ছ থাকে ও দূষণ না হতে পারে সেজন্য জীবজগতের সেরা সৃষ্টি মানুষ পরিবেশের সুস্থতা রক্ষার্থে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

পরিবেশ কী : আমাদের চারপাশে যেসব বস্তু ও উপাদান আছে সব নিয়েই আমাদের পরিবেশ। যেমন: গাছপালা, ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, জলবায়ু ও জলাশয়, পশুপাখি, জীবজন্তু প্রভৃতি।

পরিবেশ দূষণ কী : মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন এবং পশুপাখির জীবনধারণ যদি কোনোকিছুর প্রভাবে দূষিত হয় তাহলে পরিবেশ দূষণ হবে। দূষণ মানে দূষিত হওয়া। আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে প্রভাবিত মানবসভ্যতার জীবনযাপন যদি এই পরিবেশ দূষণ করে তাহলে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। মানুষ তার আরাম–আয়েশের ক্ষেত্রে কোনো উপাদানের বিষাক্তকরণের ফলে পরিবেশ দূষণ হলে তার জীবনযাপন অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম হতে বাধ্য।

পরিবেশ দূষণের স্বরূপ : আমাদের কাছে পরিবেশ হলো জীবনদাত্রীর মতো। পরিবেশ থেকে আমরা জীবনধারণের নানা উপকরণ সংগ্রহ করি। যে খাদ্যগ্রহণ করে আমরা বেঁচে থাকি, তা এই পরিবেশেরই দান। যে অক্সিজেনের অভাবে আমাদের প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা, তা এই পরিবেশই আমাদের দান করে। কিন্তু মানবজীবনের বিপুল চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে আমরা যখন বন কেটে বসত তৈরি করি; কারখানা, গাড়ি, সড়ক বানাই; রেললাইন পাতি— অমনি পরিবেশ বদলে যায়, প্রকৃতির সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হতে থাকে। আমাদের জীবনযাত্রার আজ একদিকে বিজ্ঞানের বিজয় গৌরব, অন্যদিকে দূষণের দুঃস্বপ্ন।

পরিবেশ দূষণ ও বাংলাদেশ : বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো পরিবেশ দূষণ। বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ এমন এক ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে নেমে এসেছে চরম বিপর্যয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন যন্ত্র ও গাড়ি–ঘোড়ার বিরূপ প্রভাব, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, নির্বিচারে বন উজাড় ইত্যাদির কারণে বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে।

পরিবেশ দূষণের কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবছর আমাদের দেশে যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় তার মূলেও রয়েছে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত সমস্যা। দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে বনভূমি না থাকায় বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হচ্ছে।

পরিবেশ দূষণের কারণ : পরিবেশ দূষণের কারণ স্থানভেদে ও কালভেদে ভিন্ন। তবে পরিবেশ দূষণের কারণ মোটামুটি নিম্নরূপ :

(১) অপরিকল্পিত নগরায়ণ; (২) নির্বিচারে বন উজাড়; (৩) জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি; (৪) নানা ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার; (৫) দ্রুত শিল্পায়ন; (৬) সার ও কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার; (৭) গ্রিনহাউজ ইফেক্ট (Green House Effect); (৮) নানা ধরনের গাড়ির বিষাক্ত ধোঁয়া এবং (৯) ইট তৈরির জন্য ইটের ভাঁটার প্রয়োজনে নির্বিচারে গাছগাছালি উজাড়করণ।

লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, ক্ষতিকর রাসায়নিক ও কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে মাটি নষ্ট হচ্ছে, দূষিত হচ্ছে পানি; অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। তাছাড়া শিল্প–কারখানাগুলো গড়ে তোলা হয়েছে, কিন্তু তাতে পরিকল্পনার কোনো ছাপ নেই।

ফলে দূষিত বর্জ্য পরিশোধনের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। আবার রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পানি দূষণ করছে ও মাটি দূষণ করছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে অতিরিক্ত গাড়ি ও কলকারখানার প্রয়োজন হয়। এসব গাড়ি ও কলকারখানা থেকে ধোঁয়া নির্গত হয়ে মানববসতিকে দূষিত করে তুলছে, ফলে মারাত্মকভাবে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। এর সঙ্গে আছে শব্দদূষণ, নগর ও শহরাঞ্চলে অনবরত কলকারখানা ও মোটরগাড়ির হর্ন, বাজি–পটকার আওয়াজ, লাউডস্পিকার ও মাইক্রোফোনের ব্যবহার, রেডিয়ো ও টেলিভিশনের আওয়াজ এবং অযথা হইচই করে শান্ত পরিবেশকে দূষিতকরণ— সবই পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। এই যে শব্দদূষণের ফলে মানবদেহে রক্তচাপ বৃদ্ধিসহ নানা ধরনের অসুখ–বিসুখের সৃষ্টি তা অবশ্যই প্রতিরোধযোগ্য। ট্রাক ও বাসের হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহারের জন্য কোনো ট্রাফিক আইন না থাকার কারণে ড্রাইভাররা বেপরোয়াভাবে হর্ন বাজিয়ে পথচারী ও গৃহবাসীদের নানা রোগশোকের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শব্দদূষণের ফলে শ্রবণেন্দ্রিয় অকেজো হয়ে পড়ছে। স্নায়ুতন্ত্রের ওপর কলকারখানার একঘেয়ে শব্দ মানুষের অনিদ্রা বাড়ায় ও নানা ধরনের স্নায়ু–রোগের উৎপত্তি ঘটায়।

গাছগাছালি তথা বৃক্ষনিধনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে; ফলে জলোচ্ছ্বাস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে চলেছে। তাপমাত্রা অনবরত বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তার ফলে কোনো কোনো নিচু দেশ সাগরের তলদেশে তলিয়ে যাবে। এ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞমহল। মানবজীবনে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করে কবি আক্ষেপ করে বলেন—

'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।'

তেজস্ক্রিয় দূষণ : পারমাণবিক যুদ্ধ ও পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা–নিরীক্ষার মধ্যে তেজস্ক্রিয় দূষণ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। ১৯৬৩ সালে একটি মার্কিন নিউক্লিও সাবমেরিন আটলান্টিক মহাসাগরে চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত হয় এবং তা থেকে প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রাকৃতিক পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া আজ অবধি পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ হয়েছে। এসব যুদ্ধে কোটি কোটি মানুষের জীবন সংহার হয়েছে, বিধ্বস্ত হয়েছে প্রকৃতির সুষমা। ইরাক–ইরান–কুয়েত যুদ্ধ, আফগানিস্তানের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্বরোচিত হামলা এবং ইরাকের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের অমানবিক হামলা বাতাসকে ভারী করে ছড়িয়েছে তেজস্ক্রিয়। ১৯৩২ সালে ব্রিটেনের নিকেল কারখানায় ১৯৫৩ ও ১৯৬৫ সাল জাপানে চীনামাটি ও নিগাটা উপসাগরে মাছের মাধ্যমে স্নায়বিক রোগের উৎপত্তি হয় ও অকালমৃত্যু ঘটায়। ১৯৫২ সালে লন্ডনের বহুসংখ্যক লোক ধোঁয়াজাত রোগে আক্রান্ত হয়।

প্রতিকারের উপায় : পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষার উপায়গুলো নিম্নরূপ—

(ক) পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রথমে জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি কমাতে হবে। সরকারিভাবে ঘোষণা করে দিতে হবে যে, প্রতি পরিবারে দুটি সন্তানই যথেষ্ট। এর অধিক সন্তানের পরিবার হলে জনসংখ্যার যে আর্থিক চাপ বাড়বে তা রোধ করা দুঃসাধ্য।

(খ) শব্দদূষণ বন্ধ করতে গেলে দূষণের যে ভয়াবহতা তা নানা বিজ্ঞপ্তি ও প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে জনগণকে সচেতনতা করতে হবে।

(গ) বনভূমি উজাড় করা হয় জ্বালানির জন্য এবং ইটের ভাঁটার জন্য, কিন্তু পানি বিদ্যুৎ ও সৌরশক্তি ব্যবহারের ফলে এই বনভূমি উজারকরণ রোধ করা যাবে। সরকারি ফরমান জারি করে ছোটো, বড়ো সব ধরনের গাছ কাটা নিষিদ্ধ করতে হবে। পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য দেশের মোট আয়তনের শতকরা ৩০ ভাগ বনভূমি নির্মাণ করা জরুরি, কিন্তু বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ শতকরা ১৭ ভাগ। এই বনভূমির ধ্বংসের দ্বারা দেশ যে বিরান হয়ে যাচ্ছে এ ব্যাপারে গণচেতনা বাড়ানো দরকার।

(ঘ) কৃষিকাজে রাসায়নিক সার ব্যবহারের বদলে জৈবসার ব্যবহার করা বিধেয়। যেমন : গোবর সারের ব্যবহার।

(ঙ) কীটপতঙ্গ পরিবেশ দূষণ রোধ করে। সুতরাং কীটনাশক ব্যবহার না করে পরিমিতভাবে সমন্বিত সার ব্যবহার করতে হবে।

(চ) পরিবেশ দূষণরূপ মারাত্মক ব্যাধি দূর করার জন্য ব্যক্তিবর্গকে রাজনীতিক ও পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে আলোচনা করে এটিকে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে।

উপসংহার : পরিবেশ দূষণ মানবজাতি তথা জীবজন্তুর জন্য মারাত্মক হুমকি। প্রকৃতপক্ষে দেশ–বিদেশের সর্বত্র মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে চেতনা বাড়ানো দরকার। মানুষের সঙ্গে যেমন মানুষের সম্পর্ক, তেমনি প্রকৃতির সঙ্গেও মানুষের মনোভাব সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। প্রকৃতির ওপর অযথা আধিপত্য না করে তার সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধ নির্মাণ করতে হবে এবং এভাবেই পরিবেশ দূষণ থেকে উদ্ধার পেতে পারে মানবজাতি। আমরা কবির কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারি—

"এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নব জাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

১১৮. পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে বনায়ন

[চ. বো. '১৭; য. বো. '১৪; দি. বো. '১২]

অথবা, বৃক্ষরোপণ অভিযান
অথবা, বনায়ন কর্মসূচি

ভূমিকা

বৃক্ষ হলো প্রাণপিতা। চিরকালীন মৌনকে ধারণ করে, সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে জীবনের বার্তা বহন করে এসেছে সে। অন্ধভূমির গর্ভ থেকে সে–ই প্রথম সূর্যের আহ্বান শুনেছিল। এই আদিপ্রাণ বৃক্ষই 'মরুর দারুণ দুর্গ হতে' মুক্তি দিয়েছিল মৃত্তিকাকে। কিন্তু আজ, দুর্যোগক্রমে বৃক্ষের অস্তিত্বকে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে সভ্যতাভিমানী মানুষ। আত্মসিদ্ধ চরিতার্থতায় অন্ধ হয়ে বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করে সে নিজের অস্তিত্বকে করেছে বিপন্ন। এ অবক্ষয় থেকে অরণ্যকে বাঁচাতে হবে, দেশকে বাঁচতে হবে। আবার মানুষের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য যেসব মৌলিক চাহিদা রয়েছে তার অধিকাংশই পূরণ করে বৃক্ষ। তাই মানবজীবনে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাইতো কবির ভাষায় বলতে হয়—

"অসীম শান্তির মাঝে প্রাণের সাধের গেহ
তরুর শীতল ছায়া, বনের শ্যামল স্নেহ।"

পরিবেশ ও বনায়ন : ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউটের মতে, বিশ্বের বনভূমি উজাড় হতে হতে অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে বিশ্ব পরিবেশ হুমকির মুখে পড়েছে। অথচ মানুষের বসবাসের উপযোগী ভারসাম্যপূর্ণ পৃথিবীর জন্য গাছপালার কোনো বিকল্প নেই। মানুষের অস্তিত্বের জন্য দরকার গাছপালা। অক্সিজেন দিয়ে গাছপালা কেবল আমাদের জীবন রক্ষা করে না, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষ পালন করে এক অনিবার্য ভূমিকা। বৃক্ষ বৃষ্টি ঝরিয়ে ভূমিতে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে, বাড়িয়ে দেয় মাটির জলধারণ ক্ষমতা। তাই বৃক্ষ তথা বনভূমিকে গণ্য করা হয় বায়ুমণ্ডলের বিশুদ্ধকরণ ও শীতলীভবনের অন্যতম অনুঘটন করে।

বাংলাদেশের বনাঞ্চলের অবস্থা : আমাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনের তুলনায় বাংলাদেশে বনভূমি খুবই কম। এখানে প্রায় ৫৬,০০০ বর্গমাইল এলাকায় মাত্র ১০,০০০ বর্গমাইল বনভূমি রয়েছে, তাও দিন দিন বিলুপ্ত হতে চলেছে। অতীতে এখানে বনমর্মরে শোনা যেত দোয়েল–কোয়েল–পাপিয়ার কূজন, শ্যামল বৃক্ষের বাগান সুশোভিত ছিল ফলে–ফলে, ছিল

ছায়াঢাকা মায়াময় পরিবেশ। কিন্তু নাগরিক জীবন ও সভ্যতার করালগ্রাসে সবুজ বাংলার সেই শ্যামল সুন্দর রূপ আজ তিরোহিত।

বৃক্ষজাত আসবাবপত্র ও অন্যান্য উপকরণ : ঘরবাড়ি নির্মাণ, খাট–পালঙ্ক, চেয়ার–টেবিল, আলমারি, নৌকা, গোরুর গাড়ি, বাস–ট্রাক নির্মাণে কাঠের ব্যবহার প্রচুর। প্যাকিং বক্স, কাগজ, দিয়াশলাই প্রভৃতি শিল্পে কাঁচামালের যোগান দিয়ে থাকে বৃক্ষ। দৈনন্দিন জীবনে বৃক্ষ নিঃশর্তভাবে আমাদের নানা প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। বৃক্ষ মানুষের প্রয়োজনে যে কাঠ ও বাঁশ যোগান দিয়ে থাকে তা আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আবশ্যক।

মানবজীবন ও বৃক্ষ : বনভূমিকে বাদ দিয়ে মানবসমাজের কল্পনা অর্থহীন। কারণ, বনভূমি সৃষ্টি করে জীবনের পরিবেশ। তারই আমন্ত্রণে পৃথিবীতে বর্ষা নামে, চলে ঋতুচক্রের বৈচিত্র্যময় আবর্তন। আবার বনভূমির আকর্ষণেই মাটি উর্বর ও কৃষিযোগ্য হয়। বিজ্ঞানীর ভাষায় অরণ্য তাই— 'Natural sponge'। আমাদের নিঃশব্দে অতিপ্রয়োজনীয় অক্সিজেন যোগায় বনভূমি; পরিবর্তে সে শুষে নেয় বিষাক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। মানুষের সাথে তার এই চুক্তি, প্রাণীকে রক্ষার ব্যাপারে সত্যিই এক আশ্চর্য 'Symbiosis' বা মিথজীবিতা।

তাই বলতে হয় ছন্দের তালে—

"দাও ফিরে সেই অরণ্য, লও এ নগর।"

বৃক্ষনিধনের কুফল : বনভূমির অভাবে জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি দেখা দেয়। বায়ুমণ্ডল ক্রমাগত উত্তপ্ত হয়ে দেশ আস্তে আস্তে মরুভূমিতে পরিণত হয়। দেশের নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। দেশ বন্যপ্রাণী ও বন্যপশু শূন্য হয়ে যায়।

খাদ্যের উৎস হিসেবে বৃক্ষ : বৃক্ষ কেবল ঘরবাড়ি নির্মাণ, জ্বালানি ও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না, খাদ্যের উৎস হিসেবেও বৃক্ষের অবদান অমূল্য। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কমলা, পেয়ারা, আপেল, নারিকেল, জামরুল প্রভৃতি রকমারি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফলের উৎস বৃক্ষ।

বৃক্ষরোপণ ও খাদ্যঘাটতি : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান ও খাদ্যঘাটতির দেশ। এ দেশের শতকরা চল্লিশ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। বেশিরভাগই অপুষ্টি ও অনাহারে ভোগে। সুতরাং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে খাদ্যঘাটতির সম্পূরক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হলেও বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত জরুরি। ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এদেশের ফসলাদি ও বৃক্ষরাজির জাত নির্ধারিত হয়েছিল দেশের মানুষের চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে। যেমন : বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত আউশ ধান ঘরে আসার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ঘাটতিকাল।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি : দীর্ঘদিন ধরে বন সম্পদের ওপর অত্যাচারের ফলে বিশ্ব পরিবেশে যখন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তখন গত দু–দশক ধরে পরিবেশ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। পরিবেশ বাঁচানোর তাগিদে বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে বৃক্ষরোপণ গুরুত্বসহকারে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়। ষাটের দশক থেকে এদেশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। তখন স্লোগান ছিল—

"চাষবাসহীন পতিত ভূয়ে,
বদলে দে ভাই গাছ রুয়ে।"

তবে এ ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ, বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারা, স্বকীয়তা, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক চাহিদা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রাখাও অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় জীবনে বৃক্ষের প্রভাব : বৃক্ষরাজি পরিবেশ, সংস্কৃতি এবং জাতীয় বোধকে প্রভাবিত করে। বৃক্ষরাজিকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় অনুভূতি, গান, গল্প, কবিতা, হাটবাজার, সামাজিক আচার–অনুষ্ঠান, সভাসমিতি ইত্যাদি সংঘটন হয়ে আসছে আবহমান কাল থেকে। বটতলা, আমতলা, তালতলা, কদমতলা, হিজলতলা আরও অনেক প্রসিদ্ধ স্থান গড়ে উঠেছে বৃক্ষরাজিকে কেন্দ্র করে। তাই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের নিজস্ব ঐতিহ্য দেশীয় গাছগাছড়া রোপণ, দেশীয় বৃক্ষরাজির মান ও জাত উন্নয়নে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ অত্যাবশ্যক।

বৃক্ষরোপণ ও আন্দোলন : অরণ্য ও বনভূমির এই সর্বাত্মক উপযোগিতার কথা মনে রেখেই বন সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণের তাৎপর্যটি আমাদের নতুন করে অনুভব ও উপলব্ধি করতে হবে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, জ্বালানির প্রয়োজনে নাগরিক সভ্যতার বিকাশে প্রতিবছর যে পরিমাণে বৃক্ষচ্ছেদন ও অরণ্যভূমির নিশ্চিহ্নকরণ ঘটছে— যা অদূর ভবিষ্যতে মানবজাতিকে বিপদের সম্মুখীন করবে এবং অচিরেই এই শ্যামল সুশোভন শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা শ্রীহীন ও সম্পদহীন হয়ে পড়বে। তাই বৃক্ষরোপণ, বন সংরক্ষণ, নতুন নতুন বীজ থেকে নতুন নতুন বৃক্ষের সৃজন ও বনভূমির নিয়মিত সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু এদিক থেকেই নয়, মানবজীবনের স্বাস্থ্যের সমৃদ্ধির জন্যও এই বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কেননা যন্ত্র

সভ্যতার যে বিশ্ব আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের প্রশ্বাসের মধ্য দিয়ে উদরস্থ করছি, তা থেকে একমাত্র গাছপালাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

বনায়ন ও বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা : বনাঞ্চল তথা বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বৃক্ষ প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং পরিবেশ দূষণ থেকে আমাদের রক্ষা করে। বৃক্ষ মানুষকে খাদ্য দেয়, পুষ্টি যোগায়, গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ কাজে কাঠের যোগান দেয়। মানুষের আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি দেয় এবং জ্বালানি দেয়। বৃক্ষ হতে কাগজের মণ্ড এবং বয়নশিল্পে কাঁচামাল ও দিয়াশলাই তৈরি হয়। বনাঞ্চলে ফল-ফুল, মধু ও মোম পাওয়া যায়। বনাঞ্চল বৃষ্টিপাতে সাহায্য করে গাছপালা মাটির ক্ষয়রোধ করে এবং ঝড়-তুফান হতে মানুষকে রক্ষা করে। এককথায় মানুষ হতে শুরু করে পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বৃক্ষের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বনায়ন কর্মসূচি সফল করার উপায় : বৃক্ষরোপণ অভিযান সফল করতে হলে সরকারের পাশাপাশি এদেশের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। এ ব্যাপারে বনবিভগের বৃক্ষের চারা উৎপাদন করে বিনামূল্যে তা জনগণের মধ্যে বিতরণ এবং চেতনার সঞ্চার করতে হবে। এজন্য রেডিয়ো, টেলিভিশন, মিনিপর্দা, মাইকে প্রচার করতে হবে। এমনকি পোস্টার ও সেমিনারের ভূমিকাও পালন করতে হবে।

জনগণ ও সরকারের করণীয় : বৃক্ষরোপণ অভিযানকে সফল করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ ব্যাপারে জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিটি গ্রাম, থানা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড পর্যায়ে এ অভিযান শুরু হয়েছে। দেশের সর্বত্র অনাবাদি জায়গায়, বাঁধের ওপর, রাস্তার পাশে, স্কুলকলেজের মাঠসহ বিভিন্ন স্থানে গাছ লাগানো হচ্ছে। সকলকেই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে তবেই এ কর্মসূচি সফল হবে।

উপসংহার : বৃক্ষ মানুষের পরম উপকারী বন্ধু। দেশ ও জাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ এক বিরাট পদক্ষেপ। আমাদের বেঁচে থাকা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে ও জীবনযাপনের মান উন্নয়নে বৃক্ষের অবদান অপরিসীম। বাংলাদেশের যে নৈসর্গিক শোভা দিন দিন অস্তমিত হতে চলেছে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বনায়ন প্রাপ্তির মাধ্যমে সেই হারানো পরিবেশকে আবার পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। বৃক্ষ কেবল সবুজ সতেজতা নয়— বৃক্ষের বহুমুখী উপযোগিতায় মানব ও প্রাণিকুল ধন্য। তাই যেকোনো মূল্যে বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ অভিযানকে সফল করে তুলতে হবে। তাইতো কবিতার ছন্দে বলতে হয়—

"প্রকৃতির মধ্যে তুমি বৃক্ষ
প্রাণের প্রথম বন্দনা
তোমারই প্রস্ফুটিত বীজে জীবনেরই
আলোক সম্ভাবনা।"

শিক্ষা ও শিক্ষার্থী

১১৯. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

ভূমিকা : শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষাই জাতির উন্নতির চাবিকাঠি। উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম এবং এতদিন তা ২৫-৩০ এর মধ্যে বিরাজমান ছিল। সম্প্রতি শিক্ষার সম্প্রসারণে সরকারি উদ্যোগের প্রেক্ষিতে কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৭৩.৯ শতাংশ।

প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব : দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষার এমন সম্প্রসারণ করতে হবে যাতে সকল শিশুই বিদ্যালয়ে আসতে পারে। আমাদের দেশে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যতের শিশুদের সবাই যদি শিক্ষিত হয় তা হলে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে দেশে অশিক্ষিত লোক থাকবে না। আর এখন যারা অশিক্ষিত থেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়স অতিক্রম করেছে তাদের গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এনে সাক্ষরতা দান করা সম্ভব হলে দেশে সাক্ষরতার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক। দেশে বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় ৬০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকাল। ৬+ থেকে ১০+ বয়সের শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ ও বিভিন্ন সমস্যার জন্য বিদ্যালয়ের গমনোপযোগী শিশুরা সবাই বিদ্যালয়ে যায় না এবং পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাচক্র শেষ করার আগেই শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার বিষয়টি ছিল নৈরাশ্যজনক। ফলে দেশে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত থাকলেও তার ফল আশানুরূপ ছিল না। শিক্ষার এই সংকট থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন : যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ করা হয় এবং ১৯৯২ সালে প্রথম উক্ত আইনের আওতায় ৬৮টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। ১৯৯৩ সাল থেকে সারা দেশে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই আইন পাশের আগে প্রায় এক কোটি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতো এবং আরও ষাট–সত্তর লাখ শিশু বিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকত। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের আওতায় প্রায় সব শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ করে দেওয়া হয় এবং এর জন্য অবকাঠামোগত ব্যাপক পরিবর্তনসাধন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করে প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণে ইতোমধ্যে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ : বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন চালু করার প্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। স্যাটেলাইট স্কুল ও কমিউনিটি স্কুল প্রতিষ্ঠায় সমর্থন দিয়ে শিশু ভর্তির সুযোগ বাড়ানো হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম উন্নয়নসাধন করে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা, পরিবেশ, সেনিটেশন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাক্রমকে জীবনভিত্তিক করা হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল সম্পর্কে প্রতিনিয়ত উদ্ভাবিত নতুন নতুন ধ্যান–ধারণা সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অবহিত রাখার প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ ও কর্মশিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। বিদ্যালয় পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বিদ্যালয় ভবনের পুনর্নির্মাণ ও মেরামতের মাধ্যমে শিশুদের জন্য সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্ত করার আগে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করার জন্য খাদ্য কর্মসূচির প্রবর্তন করা হয়েছে।

সামাজিক সম্পৃক্ততা : জনগণের সম্পৃক্ততা না থাকলে সকল উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জনগণকে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং অভিভাবক–শিক্ষক সমিতির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত হয়ে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়নে সাহায্য করছে।

এছাড়া জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন ও প্রাথমিক শিক্ষা উদ্‌যাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে ছাত্র–শিক্ষক, অভিভাবক ও জনগণের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং ছাত্র–শিক্ষককে উদ্‌বুদ্ধকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার ও উৎসাহদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

উপসংহার : সারা বিশ্বের ব্যাপক অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে জাতি হিসেবে আমরা পেছনেই থেকে যাব। আশেপাশের দেশেও দ্রুত শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির তুলনায় আমরা পশ্চাৎপদ। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই উদ্যোগের সাথে জনগণের আন্তরিকভাবে সম্পৃক্ত হওয়া দরকার।

১২০. বৃত্তিমূলক শিক্ষা

ভূমিকা : যে শিক্ষার বলে কোনো পেশা বা বৃত্তি অবলম্বন করা যায় তাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলে। মানুষকে নানা ধরনের পেশায় নিযুক্ত থেকে নিজ নিজ জীবিকা অর্জন করতে হয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষা সেই জীবিকার সন্ধান দেয়।

ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা : আমাদের শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ নেই। দেশে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে হয়তো উচ্চশিক্ষিত লোক সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত কাজের অভাবে প্রচুর বেকারেরও সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এই সংকট কাটানোর পরিকল্পনা না থাকার ফলে এখন যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে বের হয় তারা কোনো কাজ পায় না। অপরদিকে এত লোক শিক্ষিত হলেও কাজের উপযোগী লোক পাওয়া যায় না। এ থেকে দেখা যায় যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বাস্তব–জীবনে কাজে লাগে এ ধরনের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই আমাদের জনশক্তি কোনো কাজে আসছে না। বেকার সমস্যা জাতীয়–জীবনে আজ তাই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রচলন : বেকার সমস্যার সমাধান করার জন্য দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। কোনো পথ না থাকায় এখন সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি যদি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে তবে অধিকাংশ লোকই সেদিকে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা লাভ করে তারপর বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হতে পারে। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের পর চিকিৎসাবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি শাখায় পড়াশোনা করার কিছু সুযোগ আছে। তবে এই সুযোগ খুবই সীমিত। অল্প কয়েকজন মেধাবী ছাত্র ছাড়া আর কেউ সে সুযোগ পায় না। ফলে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী সাধারণ শিক্ষার জন্য ভিড় করে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আরও একটি সমস্যা আছে। যেসব ছাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে তারা সবাই সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষাজীবন শেষ করতে পারে না। এদের অনেকেই পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। তখন তারা বিপুল সংখ্যায় বেকারত্বের সম্মুখীন হয় এবং দেশের জন্য জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে।

এসব সমস্যা দূর করার জন্য দেশে ব্যাপক আকারে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। উচ্চতর পর্যায়ে চিকিৎসাবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা ইত্যাদি ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপক করা যেতে পারে। তাতে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণ করবে। এছাড়া স্কুলের নিচের দিক থেকে সাধারণ শিক্ষায় ব্যর্থ হয়ে স্কুল–কলেজ ছেড়ে যারা চলে যেত, তারাও বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করে জীবিকার পথ করে নিতে পারবে। কারিগরি শিক্ষা বা শিল্পসংক্রান্ত শিক্ষা তাই স্কুল–কলেজ থেকেই চালনা করা যেতে পারে। এমনকি মেয়েদের জন্যও নানা ধরনের উপযুক্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। ছোটোখাটো কাজ এর মধ্যে আসতে পারে।

প্রয়োজনীয়তা : বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে ইতোমধ্যে অনুভূত হলেও তার ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়নি। সাম্প্রতিককালে বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য অনেকগুলো কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এসব কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনেক ছাত্র শিক্ষা গ্রহণ করে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের বহু লোক বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশায় নিযুক্ত হচ্ছে। ফলে এ ধরনের পেশাগত দক্ষতার জন্য আরও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন।

উপসংহার : নিজের ও দেশের সর্বোত্তম স্বার্থে প্রত্যেকের উচিত নিজেকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো। বৃত্তিমূলক শিক্ষা আজকের বাস্তব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পন্থা নির্দেশ করে এবং তাতে জীবনকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যায়। তাই বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে বর্তমানে দৃষ্টি দিতে হবে।

১২১. মাতৃভাষায় শিক্ষা
অথবা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান

ভূমিকা

"জননীর স্তনদুগ্ধ যদ্রূপ অন্য সকল দুগ্ধ অপেক্ষা বল বৃদ্ধি করে;
তদ্রূপ জন্মভূমির ভাষা অন্য সকল ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্য প্রকাশ করে।"

— রাজনারায়ণ বসু

মাতৃভাষা হলো আমাদের মায়ের ভাষা। তাই মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করা নিজের মাকে অবহেলা করার শামিল। মাতৃভাষার সাথে আমাদের আত্মার যে যোগ থাকে, মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সেই যোগসূত্রে আবেগের প্রলেপ পড়ে। তাই আমাদের সকলের উচিত অন্তত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করা এবং মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে সমাজের সকল স্তরে ব্যাপক প্রয়াস চালানো। কেবল এই প্রয়াস দ্বারাই একটি ঐতিহ্য অনুরাগী, ইতিহাস সচেতন, সুসংস্কৃতিবান ও রুচিশীল সমাজ গড়ে।

ভাষা এবং মাতৃভাষা : মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সম্পর্কিত আলোচনার পূবে ভাষা ও মাতৃভাষা সম্বন্ধে সকল বিভ্রান্তি দূরীকরণে একান্ত প্রয়োজন আছে। মাতৃভাষার স্বরূপকে বোঝার জন্য সর্বপ্রথম ভাষা কী তা বোঝা প্রয়োজন। ভাষা হলো সুদীর্ঘকালের বিবর্তনে মানুষের ভাবপ্রকাশের নিমিত্ত একটি সুগঠিত সুসংবদ্ধ মাধ্যম। এই সংজ্ঞার দিকে প্রাথমিকভাবে নজর দিলে ভাষাকে নেহাতই একটি একটি তুচ্ছ জিনিস বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ভাষার প্রকৃত রূপ তা নয়। মানবসভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে ভাষার সাথে জড়িয়ে যায় ঐতিহ্য, গৌরব তথা সংস্কৃতির লালিত্য। বহু ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ভাষাকে কেন্দ্র করে আত্মপ্রকাশ করে একটি জাতি, গড়ে ওঠে জাতীয়তাবোধ, এক আবেগঘন সমাজ। সেই সমাজের বুকে জন্মগ্রহণ করা প্রতিটি শিশু জন্মের পর মাতৃভূমির বয়ানে যে ভাষা উচ্চারণ করতে শেখে, তাই ওই শিশুর মাতৃভাষা। মায়ের সাথে যেমন শিশু নাড়ির টান জড়িয়ে থাকে, তেমনি মাতৃভাষার সঙ্গেও জড়িয়ে থাকে নাড়ির টান।

মাতৃভাষা ও শিক্ষার মিথস্ক্রিয়া : ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষা হলো মানবজীবনের পরম সম্পদ তথা সর্বোত্তম বন্ধু। তাই এই বন্ধু এবং সম্পদের সঙ্গে আত্মার সংযোগ গড়ে ওঠা একান্ত কাম্য। একজন মানুষের মধ্যে শিক্ষার বিকাশ শুধু শিক্ষা গ্রহণ করলেই হয় না, একজন মানুষের অন্তরে শিক্ষার প্রকৃত বিকাশ ঘটে আত্মার সঙ্গে শিক্ষার মিলনের মাধ্যমে। অন্যদিকে মানুষের ভাবের মাধ্যম হলো ভাষা। তাই মানুষের অন্তরাত্মা যে ভাষা সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারে সেই ভাষাতেই প্রতিটি মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। মানুষের আত্মার সবচেয়ে কাছের ভাষা হল সেই মানুষের মাতৃভাষা। সে কারণে

মাতৃভাষার সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণের সার্থক মিথস্ক্রিয়া ঘটলে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে অশিক্ষার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে আনা সম্ভব হবে।

ভারতবর্ষে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ইতিহাস : ভারতবর্ষে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ইতিহাস খুব একটা নতুন না হলেও, খুব প্রাচীনও নয়। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভাষার মাধ্যম ছিল মূলত সংস্কৃত। উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মাতৃভাষা বিভিন্ন হলেও, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষাই ছিল মাধ্যম। এরপর মধ্য যুগে ভারতবর্ষে সুলতানি শাসনকালে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ধীরে ধীরে ফারসি ভাষার প্রচলন ঘটে। এই ফারসি ভাষায় শিক্ষাদানের প্রথা মোগল শাসন আমলের প্রায় শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বণিকদের মানদণ্ড রাজদণ্ডতে রূপান্তরিত হলে ভারতবর্ষের সকল সামাজিক ক্ষেত্রে নতুন ধরনের সংস্কার আসতে শুরু করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লর্ড মেকলের হাত ধরে ভারতবর্ষের শিক্ষা দানের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষা স্বীকৃতি পায়। তবে ইউরোপীয় সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা ধারণা ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরে প্রভাব বিস্তার করলে সমাজের বহু জ্ঞানীগুণী মানুষ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে সফল করতে থাকেন। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ সম্ভবত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তার হাত ধরেই রচিত হয় বাঙালির প্রাথমিক শিক্ষাপুস্তক বর্ণপরিচয়। এরপর ধীরে ধীরে সময় যতই বাড়তে থাকে ততই ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারের প্রবণতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা : সমাজের মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ব্যাপক ও বহুমুখী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ভাষা মানুষের কোনো ভুঁইফোড় আবেগ নয়। সমাজের জীবনচর্যার দীর্ঘকালীন বিবর্তনে একটি সুসংহত ভাষা সার্থক রূপ পায়। সেই ভাষার মধ্যে মিশে থাকে সংশ্লিষ্ট সমাজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি তথা ইতিহাসের দ্যোতনা। তাই নিজের মাতৃভাষার সঙ্গে সার্থকরূপে পরিচিতি গড়ে না উঠলে নিজের উৎপত্তিগত শিকড়ের সঙ্গে আন্তরিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। সমাজে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে সেই সমাজের মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাষাগত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি তথা ইতিহাসের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে তোলা যায়। তাছাড়া মাতৃভাষা হলো মানুষের কাছে ভাব প্রকাশের সবচেয়ে সহজ একটি মাধ্যম। সেই ভাষায় শিক্ষাদান করলে সমাজে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। সহজ ভাষায় উচ্চমানের শিক্ষাদানের ফলে মানুষ সহজেই শিক্ষা গ্রহণের দিকে আকৃষ্ট হয়। ফলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান আসলে একটি শিক্ষিত সমাজের ভিতই রচনা করে।

মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব : একজন মানুষের জীবনে মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম। মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করলে একদিকে যেমন নিজের মাতৃভূমির সাথে আত্মিক বন্ধন দৃঢ় হয়ে ওঠে, অন্যদিকে তেমন সেই সংশ্লিষ্ট মাতৃভূমির ভাষাগত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের সাথে সার্থক পরিচিতির ফলে একজন সত্যিকারের মানুষরূপে নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে সুবিধাগত অবস্থানে থাকা যায়। তাছাড়া কোনো বিদেশি বা বহিরাগত ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করলে শিক্ষা গ্রহণের সময় বিভিন্ন সরল বিষয়ও কেবল ভাষাগত অদক্ষতার কারণে জটিল বলে মনে হতে পারে। সেক্ষেত্রে মাতৃভাষা যেহেতু মানুষ জন্ম থেকে কোনোরকম বিশেষ পুথিগত চর্চা ছাড়াই আয়ত্ত করে, তাই শিক্ষা গ্রহণের তুলনামূলক বিভিন্ন জটিল বিষয়ক মাতৃভাষায় শিখনের সময় সহজ বলে মনে হয়। সে কারণে মাতৃভাষায় শিক্ষার ফলে একজন মানুষের সঙ্গে শিক্ষার সার্থক মিথস্ক্রিয়া সম্পন্ন হয় প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ ঘটতে পারে।

স্বাধীনতা–উত্তর ভারতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের দৃষ্টান্ত : ভারতবর্ষের ইতিহাসে শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে গৌণ করে অন্যান্য গুরুভাষাকে বেছে নেওয়া হলেও স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে ভারতবর্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হতে থাকে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দেশব্যাপী শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি গহণের সময় স্থির করা হয় দেশের অঙ্গরাজ্যগুলোতে সেখানকার স্থানীয় ভাষাতে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। এর ফলে মানুষের পক্ষে মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করা অনেক বেশি সহজসাধ্য এবং কম ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে উঠবে। তাছাড়া ভারতীয় সংবিধানের নির্দিষ্ট ধারা অনুসারে ভারতের প্রতিটি কোনায় বসবাসকারী প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী যাতে মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় তার জন্য রাজ্যগুলোকে নিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া আছে। সংবিধানে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানকে এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কেবল মাতৃভাষায় শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার মধ্যে লুকিয়ে থাকা শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপক সম্ভাবনার কারণে।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পথে প্রতিকূলতা : মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা যেমন রয়েছে, তার পাশাপাশি বর্তমান রয়েছে বেশকিছু গুরুতর সমস্যাও। তার মূল কারণ অবশ্য মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমাজের উপরতলার মানুষের ভিত্তিগত উৎসাহের অভাব। সরকারের তরফ থেকে মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত

হলেও সমাজের অভিজাত সম্প্রদায় এখনো ঔপনিবেশিক মানসিকতা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে না পারায় তারা ইংরেজিকেই শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রধান মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়ে থাকে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি স্বীকৃতি পাওয়ার ফলেও মানুষের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত উৎসাহের ক্ষেত্রে ভাটা দেখা যায়। এছাড়া প্রাচীন ঐতিহ্যগত নিদর্শনের অভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের (বিশেষত বিজ্ঞানশিক্ষা) নিমিত্ত যথাযথ মানের বই রচনার জন্য উপযুক্ত পরিভাষার অভাবও মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারের পথে একটি অন্যতম প্রধান প্রতিকূলতা হিসেবে কাজ করে। তবে এ প্রসঙ্গে হাল ছেড়ে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। শুধু পরিভাষার অভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেওয়ার প্রবণতা নিজের মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করারই শামিল। আশার কথা এই যে, বর্তমানকালে সমাজের অনেক বিদ্বজ্জনরা মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিভিন্ন জটিল বিষয় এর পরিভাষা তৈরির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন।

উপসংহার : মাতৃভাষা হলো মানুষের আবেগ–অনুভূতির প্রকৃত প্রকাশ মাধ্যম। তার জিয়নকাঠির স্পর্শেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়, বোধের গভীরে চিন্তার বুদবুদ করার দ্বার ভেঙে বাইরে এসে বাকমূর্তি ধারণ করে। আর অন্যদিকে শিক্ষা হলো মানবজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। মানুষের সকল ধনসম্পত্তি মানুষকে ছেড়ে চলে গেলেও অর্জিত শিক্ষা ও জ্ঞান কখনো মানুষের সঙ্গ ছাড়ে না। তাই সেই অর্জিত শিক্ষার সঙ্গে মানুষের অন্তস্তলের আবেগের যোগ থাকা একান্ত আবশ্যক। সেকারণে শিক্ষার সঙ্গে মানুষের অন্তরের আবেগকে যুক্ত করার জন্য প্রয়োজন মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের। প্রাণের ভাষা ও প্রাণের জ্ঞান একত্রিত হলে তবেই একজন সার্থক মানুষরূপে পৃথিবীর বুকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব হবে।

১২২. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

ভূমিকা : ইংরেজিতে একটি কথা আছে, Education is the backbone of a nation. অর্থাৎ, শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। মানুষের মেরুদন্ডের মতো শিক্ষাও একটি জাতির অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়। শিক্ষার মাধ্যমে জাতি এগিয়ে যায়, উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সন্তোষজনক চিত্র আমাদের চোখে পড়ে না। তবে আশার বিষয় হচ্ছে– শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষার মান, শিক্ষানীতি, শিক্ষার জন্য বরাদ্দ, শিক্ষার পরিবেশ প্রভৃতির উন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষা কী : শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ Education, যা ল্যাটিন শব্দ Educere বা Educatum থেকে এসেছে। মানুষের সত্যিকারের পরিচয় তার মনুষ্যত্ব ও যোগ্যতার মধ্যে। মানবসন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেই একজন পরিপূর্ণ মানুষের সব গুণ তার মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে না। এসব গুণাবলি তাকে নিজের সাধনায় অর্জন করতে হয়। এই যোগ্যতা বা গুণাবলি অর্জনের জন্য মানুষকে বিভিন্ন উৎস থেকে যে জ্ঞান অর্জন কতে হয় তাই শিক্ষা। শিক্ষা হলো– 'The harmonious development of body, mind and soul.' অথাৎ মানুষের মানবিক, দৈহিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের ধারাবাহিক পদ্ধতি হলো শিক্ষা।

শিক্ষার গুরুত্ব : ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই বাস্তব জীবনে চরম উৎকর্ষতা লাভ করা সম্ভব হয়। জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিক্ষার বিভিন পদ্ধতি প্রয়োগে জীবনকে উৎকর্ষমন্ডিত করা যায়। বিশ্বের বহুমুখী জ্ঞানভান্ডারের সাথে শিক্ষার মাধ্যমেই পরিচিত হওয়া যায়। অজানাকে জানা এবং সেই জানাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার কৌশল শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, যোগ্যতা ও মনুষ্যত্ব অর্জন এবং আধুনিক জ্ঞান–বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়ে তা থেকে জীবনকে উপকৃত করার মাধ্যম হলো শিক্ষা। সর্বোপরি, জীবনকে সাফল্যমন্ডিত, সৌন্দর্যমন্ডিত, অর্থবহ ও কৃতকার্য করার জন্য শিক্ষাই একান্ত ও মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে শিক্ষার চিত্র : বাংলাদেশে সাক্ষরতার শতকরা হার ৭৪.৬৬% (জনশুমারি ২০২২)। ইতোমধ্যে ৯৯ দশমিক ৬৪ শতাংশ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। ৩১ হাজার ২০৮টি সরকারি, রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩–৫ বছর বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক–প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। সরকারি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬৩ হাজারের বেশি শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বছরে প্রায় ৭৮ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। মাধ্যমিক পর্যন্ত সবার জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হচ্ছে। দেশের জিডিপির ১.৬ ভাগ ব্যয় হয় শিক্ষাক্ষেত্রে আর সরকারি সার্বিক ব্যয়ের মাত্র ১৫ ভাগ বরাদ্দ এই ক্ষেত্রের উন্নয়নে।

বর্তমানে দেশে শিক্ষার মান : দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে দেশে শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রসারণশীল হলেও শিক্ষার গুণগত মানের ক্রমাগত অবনতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রচুর পরিমাণে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠায় শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়ে তীব্র সমালোচনা হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক

উভয় পর্যায়ে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণে যোগ্যতার অভাব রয়েছে। লেখাপড়ায় দীনতা ও অসামঞ্জস্যতা থাকায় শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় পাশ করে যেনতেনভাবে ডিগ্রি অর্জনের জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করছে। শিক্ষার্থীরা কোচিং সেন্টারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, পাশের হার বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার গুণগত মান কমেছে ও বাস্তবমুখী শিক্ষার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার সংকট : বাংলাদেশে সাক্ষরতার শতকরা হার মাত্র ৫১.৮% হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড়ো কারণ শিক্ষাব্যবস্থার সংকট। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বহুমুখী সংকট রয়েছে। নিম্নে শিক্ষাব্যবস্থার সংকটগুলো সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো–

বাস্তবমুখী শিক্ষানীতির অভাব : স্বাধীনতা–পরবর্তী ১৯৭২ সালের 'কুদরাত–ই–খুদা শিক্ষা কমিশন' থেকে বর্তমান পর্যন্ত বেশকিছু শিক্ষানীতি প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয়, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে দরকার সুনির্দিষ্ট যুগোপযোগী শিক্ষানীতি যা আজও প্রকৃত অর্থে প্রণীত হয়নি।

মুখস্থনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা : ব্যাবহারিক শিক্ষার সুযোগ কম থাকায় ছাত্র–ছাত্রীদের মুখস্থনির্ভর শিক্ষা গ্রহণ করতে হচ্ছে। যদিও মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বর্তমানে সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু উচ্চ পর্যায়ে এখনো মুখস্থ বিদ্যাই ভরসা।

যুগোপযোগী শিক্ষার অভাব : বর্তমান যুগকে বিশ্বায়নের যুগ বলা হয়। তথ্যপ্রযুক্তির এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা প্রযুক্তিনির্ভর না হওয়ায় বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না, যা আমাদেরকে পিছিয়ে দিচ্ছে।

বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা : বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণের জন্য একটি সর্বজনীন, গণমুখী এবং বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গীকার করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষাদানের গুণগত মান, বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের উপকরণাদি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনীহা : বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজি কেবল একটি ভাষার নাম নয় বরং একটি টেকনোলজির অপর নাম। কিন্তু মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় নামসর্বস্ব ইংরেজি শেখানো হয় যা প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে ওঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ : বর্তমানে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অন্যদিকে শিক্ষকগণ শিক্ষাদানের আদর্শ ভুলে কোচিং কিংবা বাসায় পড়িয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

দক্ষ শিক্ষকের অভাব : বর্তমান সরকার শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করলেও শিক্ষকদের জন্য তেমন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখছে না। ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবে দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠছে না।

শিক্ষকদের আন্দোলন : বেতনভাতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বর্তমানে শিক্ষকরা আন্দোলনে রাস্তায় নামছে যা পড়াশোনার পরিবেশে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস : বর্তমানে শিক্ষা বিপর্যয়ের অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে প্রশ্নপত্র ফাঁস। একটি বিশেষ মহলের সহায়তায় এই ঘৃণ্য অপরাধটি সংঘটিত হচ্ছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃত মেধার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে না। যা আমাদের উন্নয়নের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

ছাত্ররাজনীতি ও সন্ত্রাস : বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি ও সন্ত্রাস অনুপ্রবেশ করায় পড়াশোনার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। রাজনীতিতে ছাত্ররা ব্যবহৃত হচ্ছে, ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন আন্দোলনে শিক্ষাঙ্গন স্থবির হয়ে পড়ছে।

শিক্ষাব্যবস্থায় সংকট সমাধানের উপায় ও আমাদের করণীয় : যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত, সে জাতি তত বেশি উন্নত। সুতরাং আমাদের সর্বাঙ্গীণ উনয়নের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার সংকট উত্তরণ অপরিহার্য। তাই সরকারের পাশাপাশি আমাদের সকলেরই নৈতিক দায়িত্ব শিক্ষাব্যবস্থাকে সমস্যামুক্ত করা। শিক্ষাব্যবস্থার সংকট সমাধানকল্পে আমাদের নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে–

- শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী, বিজ্ঞানসম্মত, কর্মমুখী, প্রযুক্তিনির্ভর ও বাস্তবসম্মত করতে হবে।
- শিক্ষাক্ষেত্রে সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং যাবতীয় শিক্ষাবৈষম্য দূর করতে হবে।
- প্রযুক্তিনির্ভর বাস্তবসম্মত ও বাস্তবায়নযোগ্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।
- শিক্ষাক্ষেত্রে যাতে পূর্ণমেধার বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়, এজন্য মুখস্থনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে হবে।
- ইংরেজিকে শুধু বিদেশি ভাষা হিসেবে না দেখে বিশ্বায়নের জন্য অপরিহার্য ভাষা হিসেবে পরিগণিত করতে হবে।
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোচিং সেন্টার, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বন্ধ করে শিক্ষার যথাযথ মান বজায় রাখতে হবে।

NABARUN PUBLICATION

– শিক্ষকদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষকদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।
– শিক্ষা প্রশাসনকে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে।
– প্রশ্নপত্র ফাঁস কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

শিক্ষানীতির নতুন রূপরেখা : নতুন নিয়মে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত কোনো পরীক্ষা হবে না, পুরোটাই মূল্যায়ন হবে সারা বছর ধরে চলা বিভিন্ন রকমের শিখন কার্যক্রমের ভিত্তিতে। দেশের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ব্যবস্থায় বড়ো রকমের পরিবর্তন এনে প্রণয়ন করা প্রাক্–প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের নতুন শিক্ষাক্রমের রূপরেখার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) যৌথ সভায় এই রূপরেখার অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০২২ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ শ্রেণিতে পরীক্ষামূলকভাবে নতুন শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়ন শুরু হয়। এমনকি প্রাথমিক স্তরে বিস্তারিত শিক্ষাক্রমও অনুমোদন দেওয়া হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাস্তবায়ন শেষে ২০২৩ সাল থেকে বিভিন্ন শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রম পর্যায়ক্রমে চালু হবে। এর মধ্যে ২০২৩ সালে প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি; ২০২৪ সালে তৃতীয়, চতুর্থ, অষ্টম ও নবম শ্রেণি; ২০২৫ সালে পঞ্চম ও দশম শ্রেণিতে চালু হবে নতুন শিক্ষাক্রম। এরপর উচ্চমাধ্যমিকের একাদশ শ্রেণিতে ২০২৬ সালে এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে ২০২৭ সালে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হবে। নতুন শিক্ষাক্রমে প্রাক্–প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিদ্যমান পরীক্ষার চেয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিক মূল্যায়ন (শিখনকালীন) বেশি হবে। এর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত কোনো পরীক্ষা হবে না, পুরোটাই মূল্যায়ন হবে সারা বছর ধরে চলা বিভিন্ন রকমের শিখন কার্যক্রমের ভিত্তিতে। পরবর্তী শ্রেণিগুলোর মূল্যায়নের পদ্ধতি হিসেবে পরীক্ষা ও ধারাবাহিক শিখন কার্যক্রম দুটোই থাকছে। নতুন শিক্ষাক্রমে এখনকার মতো এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা হবে না। শুধু দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে হবে এসএসসি পরীক্ষা। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে দুটি পাবলিক পরীক্ষা হবে। প্রতি বর্ষ শেষে বোর্ডের অধীনে এই পরীক্ষা হবে। এরপর এই দুই পরীক্ষার ফলের সমন্বয়ে এইচএসসির চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে। এছাড়া নতুন শিক্ষাক্রমে এখন থেকে শিক্ষার্থীরা দশম শ্রেণি পর্যন্ত অভিন্ন সিলেবাসে পড়বে। আর শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক না বাণিজ্য বিভাগে পড়বে, সেই বিভাজন হবে একাদশ শ্রেণিতে গিয়ে।

নতুন শিক্ষাক্রমে প্রাক্–প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ১০ ধরনের শেখার ক্ষেত্র ঠিক করা হয়েছে। এগুলো হলো ভাষা ও যোগাযোগ, গণিত ও যুক্তি, জীবন ও জীবিকা, সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব, পরিবেশ ও জলবায়ু, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি। প্রাক্–প্রাথমিকের শিশুদের জন্য আলাদা বই থাকবে না, শিক্ষকেরাই শেখাবেন।

উপসংহার : বাংলাদেশে সংকটমুক্ত একটি যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে প্রচলিত পদ্ধতিকে বাস্তবসম্মত ও দুর্নীতিমুক্ত করে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব। বাংলাদেশের শিক্ষাকে গুণগত মানের দিক থেকে উন্নত করতে পারলেই জাতীয় জীবনে উন্নয়ন সম্ভব হবে।

১২৩. নিরক্ষরতা দূরীকরণ
অথবা, সাক্ষরতা অভিযান

ভূমিকা

দেশের বহুবিধ সমস্যার মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের সমস্যা আশু প্রতিকারের অপেক্ষায় রয়েছে। অন্ন, বস্ত্র ও দেশরক্ষা সমস্যার সঙ্গে এ সমস্যার সমাধানের ওপর রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নতি ও প্রগতি নির্ভর করছে। এ সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য সরকার ও দেশবাসীর তৎপর হওয়া উচিত। কারণ, কোনো স্বাধীন জাতির পক্ষে মূর্খ ও নিরক্ষর হয়ে থাকা জাতীয় মর্যাদার পক্ষে বিশেষ হানিকর।

বাংলাদেশের নিরক্ষরতা : বাংলাদেশের শোচনীয় নিরক্ষরতা সভ্যতার কলঙ্কস্বরূপ। যুদ্ধ, ব্যাবসাবাণিজ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য, রাজনৈতিক প্রগতি এককথায় জীবনের প্রত্যেকটি প্রয়োজনের ব্যাপারে আমাদের এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং আধুনিক দুনিয়ার প্রগতিশীল জাতিসমূহের মধ্যে স্থান করে নিতে হবে। এজন্য সর্বাগ্রে আমাদের নিরক্ষরতার কলঙ্ক দূর করা প্রয়োজন।

কোনো উন্নত দেশেই নিরক্ষরতার প্রতি সে দেশের কর্তৃপক্ষ নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। পরাধীনতার স্বৈরাচারী শাসন হতে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলোও নিরক্ষরতার সমস্যা স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনার সাথে সমাধান করছে। নজিরস্বরূপ বলা যেতে পারে, অন্যতম মুসলিম রাষ্ট্র তুরস্কে বিশ বছরের মধ্যে শিক্ষার মান বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে; অথচ এ তুরস্ককে একসময় 'ইউরোপের রুগ্ণমানব' (Sick man of Europe) বলা হতো। ত্রিশ লক্ষ বাঙালির রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ পরাধীনতার

জিঞ্জির ভেঙে স্বাধীনতা লাভ করেছে। এখন দেশের লোককে শিক্ষিত ও শক্তিশালী হতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা বিভাগ দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা করছেন। এ পরিকল্পনায় দেশবাসীর আন্তরিক সমর্থন আছে। প্রাইমারি শিক্ষা জনশিক্ষার আওতায় পড়ে; কারণ, এটি জনশিক্ষার প্রাথমিক পদক্ষেপ। প্রাইমারি শিক্ষার প্রতি যেমন দেশ ও সরকারের আশু দৃষ্টির প্রয়োজন, তদ্রুপ বয়স্কদের শিক্ষার পরিকল্পনাও প্রয়োজন। আনন্দের কথা যে, বর্তমান সরকার প্রাইমারি শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। প্রাইমারি শিক্ষার ফল আস্তে আস্তে পাওয়া যাবে, কিন্তু বয়স্কদের শিক্ষার ফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে না। স্বাধীন দেশে অন্ধ, বোবা, বধিরদেরও রাষ্ট্রের খরচে শিক্ষার সুযোগ দান করা হয়। এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। দুঃখের বিষয় এক্ষেত্রে আমাদের দেশ অনেক পিছিয়ে আছে।

দুর্ভাগ্যবশত জীবিকার্জন অথবা জীবিকার্জনের প্রয়াসের দরুন বয়স্কদের পক্ষে লেখাপড়ার জন্য বেশি সময় দেওয়া সম্ভবপর নয়। অবশ্য মাতৃভাষার সাহায্যে সামান্য উদ্যমেই কার্যকরী জ্ঞান অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এটা তাদের বহির্জগতের সাথে পরিচয় করতে সাহায্য করে, সাধারণ জ্ঞান–প্রয়োগের শক্তি অর্জন এবং ভাষা–জ্ঞান শিক্ষার জন্য বিশেষ সুযোগ দান করে।

বয়স্কদের শিক্ষাপ্রণালি : এ সকল যুক্তির পর বয়স্কদের শিক্ষা অসম্ভব বা দুঃসাধ্য ব্যবহৃত মূলশব্দ (কি–ওয়ার্ড) ও চিত্রশব্দ (পিকচার–ওয়ার্ড)–প্রণালিতে বয়স্কদের মধ্যে দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের রীতির উৎকর্ষ সাধন করেছে। এ সমস্ত প্রণালিতে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ভাষার কাজ হচ্ছে। বাংলাদেশে বিচার–বিভাগের ইউরোপীয় কর্মচারী মি. বিভার আমাদের দেশের বহুসংখ্যক স্কুলে অনেক বছর পর্যন্ত এ সকল প্রণালির কাজ করেছেন। তাতে নিরক্ষরতার দুর্ভোগ কতকটা কেটে গেছে। তাঁর প্রকাশিত (Education of All within Six Months) 'ছয় মাসে শিক্ষালাভ' পুস্তকখানি তাঁর পরীক্ষিত প্রণালির বিশদ পরিচয় দান করছে। তাঁর প্রায় সমস্ত অবসরকাল তিনি এ দেশের নিরক্ষরতার উপকারার্থে ব্যয় করেছে।

বাংলা ভাষা চালু করা : বাংলা ভাষা চালু করার ব্যাপক পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলা একাডেমির ভাষা কমিটি বাংলা ভাষা সহজ করতে ও এর ব্যাপক সম্প্রসারণ করতে সুপারিশ করেছেন। এ সুপারিশ অনুসারে যে 'সহজ বাংলা' শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে, তার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে বাঙালি অথবা অবাঙালি যেকোনো ব্যক্তি বাংলা শিখতে পারবে। বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাংলা একাডেমিতে একটি কোর্স চালু করা হয়েছে। কয়েক বছর হলো এ কোর্স চলছে। এই 'সহজ বাংলা' পরিচয় বয়স্কদের শিক্ষার কাজকে সহজতর করছে। পরিষদের পরিচালনায় 'সহজ বাংলা' শিক্ষাপদ্ধতির দ্বারা বহু বয়স্ক ব্যক্তি বিভিন্ন কেন্দ্রে দ্রুত শিক্ষালাভ করছে।

আমাদের এখন একমাত্র স্বপ্ন আমাদের দেশের অশিক্ষিত ভাইবোনদের নিরক্ষরতার দুর্ভোগ হতে মুক্তি দেওয়া। আমাদের এ সকল ভাইবোন তথা দেশের বিরাট জনসমুদ্র নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কপালে শতবর্ষের পুরোনো হুকুমের করুণ কাহিনি লেখা। তারা ভাগ্যকে অভিশাপ দেয় না, তারা অন্য কাউকে দোষীও করে না। তারা জীবিত কিন্তু প্রাণহীন। এটাই আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের জীবনের ছবি। জনগণই আমাদের সমাজজীবনের ভিত্তি, আমাদের জীবিকার মূল।

উপসংহার : ছাত্রগণ তাদের অবসর ও ছুটির সময় যদি রুশ ও সমাজতান্ত্রিক দেশের ছাত্রছাত্রীদের ন্যায় জনশিক্ষার পশ্চাতে ব্যয় করে, নতুন পদ্ধতি অনুসারে বালক ও বয়স্কদের শিক্ষাদান কাজে ব্যয় করে তবে নিরক্ষরতার অন্ধকার অচিরেই দূর হয়ে যাবে এবং সেদিনই আমাদের স্বাধীনতালাভ সার্থক, সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ হবে।

১২৪. ছাত্রজীবন
অথবা, ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য
অথবা, ছাত্রসমাজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

ভূমিকা

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড়–বাদল
আমরা ছাত্রদল ॥

একটি স্বাধীন দেশের ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্ব কম নয়। 'অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা'—এ সত্যের অপলাপ করা কখনো চলে না। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে, দেশ ও সমাজের প্রতি ছাত্রসমাজের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

ছাত্রসমাজের ভবিষ্যৎ : ছাত্রসমাজই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তারাই ভবিষ্যতে দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতির দায়িত্ব বহন করবে। সেনানায়ক হয়ে রাষ্ট্র রক্ষা করবে এবং জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব করবে। এজন্য ছাত্রসমাজকে জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত ও শারীরিক শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে। দেশ রক্ষার জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের ছাত্রগণকে স্বেচ্ছায় সৈনিক জীবন গ্রহণ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন অটুট স্বাস্থ্য ও দুর্জয় সাহস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বেচ্ছায় সাড়া দিয়ে অসংখ্য বাঙালি ছাত্রছাত্রী পৃথিবীতে যে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা বাঙালি মাত্রই গর্বের বিষয়। তখন তারা দেশের ডাকে সাড়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। আহার নেই, পথ্য নেই তবু ছাত্রগণ যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এখন দেশ গঠনের কাজে তাদের এগিয়ে আসতে হবে। আজ নাগরিকদের অটুট স্বাস্থ্যের প্রয়োজন।

নানাবিধ জ্ঞানার্জন : ছাত্রজীবনে নানাবিধ ভোগবিলাস বর্জন করে ছাত্রদের জ্ঞানানুশীলনে যত্নবান হতে হবে। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনকে ছাত্রদের ভবিষবৎ মনে করতে হবে। কেননা, সর্বপ্রথম আত্মোন্নতি বিধানই জীবনের মূল উদ্দেশ্য। শুধু পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নেই ছাত্রদের মন আবদ্ধ রাখলে চলবে না; তাদেরকে বহির্জগতের জ্ঞানভান্ডার হতে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। জগতের কোথায় কী ঘটছে, কোন বৈজ্ঞানিক কী আবিষ্কার করছেন, কোন জাতি কীভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতে হবে। বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, অর্থনীতি, পৌরনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রে ছাত্রদের প্রকৃত জ্ঞানার্জন করতে হবে। কতকগুলো নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক বা নোট বই মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশ করলেই শুধু চলবে না, প্রকৃত জ্ঞানলাভ ও চিন্তাশক্তি বিকাশের পথে নানা বিষয়ে অনুশীলন আবশ্যক।

দেশাত্মবোধ : সমাজের ও দেশের কল্যাণসাধনই ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনের মূল লক্ষ্য। এজন্য ছাত্রজীবনেই দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে হবে। স্বদেশপ্রেম, মানবপ্রীতি, সেবাপরায়ণতা, স্বাবলম্বন, ধর্মনিষ্ঠা, ধৈর্যশীলতা প্রভৃতি মানবীয় গুণ এ সময় অর্জন করতে হবে। ছাত্রজীবনে জনসেবার বীজ উপ্ত হলে উত্তরকালে তা মহীরূহে পরিণত হয়ে ফলপ্রসূ হবে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে,

'পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি/এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে/আপনার কথা ভুলিয়া যাও।'

রাষ্ট্রের হিতসাধন : পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় যে, যখনই কোনো নব ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দীপনা জেগেছে, তখনই ছাত্রসমাজ নিজ নিজ দেশের নবজাগরণে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করে নতুন আদর্শে উন্নতিবিধান করেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, আমাদের দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামেও ছাত্রসমাজের দান একেবারে তুচ্ছ নয়। স্বাধীনতা অর্জন অপেক্ষা স্বাধীন রাষ্ট্রের মান–মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব কম নয়। এখন ছাত্রসমাজকে রাষ্ট্র গঠন ও উন্নতিবিধানমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

জনসেবা : আমাদের দেশের বর্তমান দুরবস্থার দিনে ছাত্রসমাজের দায়িত্ব কম নয়। এদিনে কেবল শিক্ষাকে ছাত্রজীবনের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। তাদেরকে কেবল পাঠ্যপুস্তক পাঠ ও খেলাধুলা করে কাটালে চলবে না। বন্যা, মহামারি ও দুর্ভিক্ষের সময় দেশের দুঃখ নিপীড়িত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। দেশের দুঃখ–দুর্দশায় তাদেরকে দেশবাসীর পাশে এসে দাঁড়াতে হবে এবং যথাশক্তি তাদের সেবা করতে হবে।

ছাত্রগণকে পল্লি উন্নয়ন কার্যেও সচেষ্ট হতে হবে। সেবা–সমিতি গঠনপূর্বক তারা সরকার হতে ওষুধপত্রাদি সংগ্রহ করে রুগ্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করে এবং রোগীদের সেবা–শুশ্রূষা করে তাদেরকে নিরাময় করতে পারে। গ্রামবাসীদের সহায়তায় ছাত্রগণ চেষ্টা করলে পল্লির অবাঞ্ছিত বন–জঙ্গল কেটে পুকুরাদির কচুরিপানা ও আবর্জনা দূর করে, রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে এবং পল্লির হিতকর নানা রকম কার্যসাধন করে তার স্বাস্থ্য ও শ্রীসম্পদ ফিরিয়ে আনতে পারে। দেশের নিরক্ষরতা দূর করার জন্য ছাত্রসমাজকে চেষ্টা করতে হবে। নিরক্ষর লোকদের জন্য নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হলে উচ্চশ্রেণির ছাত্রগণ বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করতে পারবে।

ঐক্য ও প্রীতি স্থাপন : ছাত্রসমাজের মধ্যে কোনোরূপ জাতিগত বা সম্প্রদায়গত অনৈক্য বা প্রাদেশিকতার মনোভাব থাকা উচিত নয়। তাদেরকে সকল প্রকার সংকীর্ণতা পরিহার করে পরস্পর প্রীতি ও ঐক্য বজায় রাখতে হবে। নিজেদের মধ্যে ছাত্রসংগঠন করে ঐক্য ও প্রীতির আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা দরকার। ছাত্রসমাজের মধ্যে জাতীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং যাতে দেশের শিক্ষাদীক্ষা দেশের জাতীয় আদর্শের অনুকূল হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

উপসংহার : এ জগৎ শিক্ষা ও কর্মের ক্ষেত্র। শিক্ষাকে কেবল ছাত্রজীবনের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চেয়ে আমরা নিতান্ত হীনতার পরিচয় দিচ্ছি। আজীবন শিক্ষা করলেও বিদ্যাশিক্ষা কখনো সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং আমাদের সকলকেই

জীবনব্যাপী জনসাধারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য কার্যগুলোর প্রতিও যত্নবান হতে হবে। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তাই কাজী নজরুল ইসলাম বলেন—

আমরা রচি ভালোবাসার
আশার ভবিষ্যৎ
মোদের স্বর্গ–পথের আভাস দেখায়
আকাশ–ছায়াপথ!
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর
স্বপ্ন দেখা হোক সফল
আমরা ছাত্রদল।

১২৫. ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক

ভূমিকা : ছাত্ররা জ্ঞানার্জনের যে সাধনায় নিয়োজিত হয়, তাতে শিক্ষকগণ উদার সহযোগিতা প্রদান করেন। শিক্ষকগণের সুচিন্তিত নির্দেশনায় ছাত্ররা শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে। শিক্ষকের কল্যাণধর্মী স্নেহচ্ছায়ায় শিক্ষার্থীর জীবন বিকশিত হয়। শিক্ষক ছাত্রদের সামনে জ্ঞানের আলো তুলে ধরেন। শিক্ষকের প্রদর্শিত জ্ঞানসম্পদে ছাত্ররা নতুন জীবন লাভ করে। এ জীবনই তার বিকাশের, যোগ্যতা প্রদর্শনের আর গুণাবলি চর্চার। এ সবই শিক্ষকের অকৃত্রিম আশীর্বাদপুষ্ট হলেই সম্ভব হয়ে ওঠে। এই পটভূমিকায় ছাত্র–শিক্ষকের পরম পবিত্র সম্পর্ক গড়ে ওঠে, মহত্ত্বের এক অনাবিল সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটায়।

সম্পর্কের স্বরূপ : বাবা–মায়ের পর শিক্ষকই যে ছাত্রের কাছে দ্বিতীয় পিতা বা মাতার মর্যাদায় আসীন হন তার মূলে রয়েছে ছাত্রের জীবনে শিক্ষকের বিশেষ ভূমিকা। তাই ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকাই বিশেষ কার্যকর হলেও ছাত্র–শিক্ষক উভয়ের ভূমিকা ও অবস্থানের ওপর ঐ সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ভর করে এবং সম্পর্কটি মধুর ও পবিত্র হলে তার ভিত্তিতেই ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবন সার্থক ও মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। ছাত্র–শিক্ষকের সম্পর্কের মধ্যে একটি পরম আন্তরিকতার সুর ধ্বনিত হয়। ছাত্ররা জ্ঞান আহরণের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গমন করে। যেখানে শিক্ষার বিচিত্র উপকরণের সমাবেশ থাকে। সব ধরনের উপকরণের সহায়তায় জ্ঞান বিতরণ করেন শিক্ষক। শিক্ষককে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বললেও অযৌক্তিক বলা হবে না। ছাত্ররা জ্ঞানার্জনের প্রস্তুতি ও আগ্রহ নিয়ে শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়। নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক অত্যন্ত আন্তরিকতায় জ্ঞানদানে প্রবৃত্ত হন। আগ্রহী ছাত্রের কাছে নিজের হৃদয়মন উজাড় করে দিতে শিক্ষকের কোনো কার্পণ্য নেই। বরং ছাত্র যদি সুযোগ্য হয় তাহলে শিক্ষক জ্ঞান বিতরণে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন। নিজের মানসশিষ্য বলে ছাত্রদের বিবেচনা করে শিক্ষক তাঁর সর্বোত্তম জ্ঞানদানে তৎপর হন। ছাত্র তখন আর দূরে থাকে না। হয়ে ওঠে শিক্ষকের একান্ত আপনজন। একজন মানুষের জীবনের পরিপূর্ণতা বলতে বুঝায় জীবনের বিকাশ, ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ। এই সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে শিক্ষকের অগ্রণী ভূমিকার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এক্ষেত্রে শিক্ষক যথেষ্ট পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল ও অধ্যবসায়ী হয়ে শিক্ষার্থীর মনের খোরাক মেটাতে সচেষ্ট হন। শিক্ষক তাঁর মেধা দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে প্রচণ্ড কৌতূহল জাগিয়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "None but those who have the spirit of forbearance are fit to be teacher' : কৌতূহল জাগানো ও কৌতূহল নিবৃত্ত করা শিক্ষকের কাজ। ছাত্ররা অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠ নিতে যায়। জ্ঞান বিতরণের বেলায় বিদ্যাদান ও বিদ্যা গ্রহণের বেলায় ছাত্র–শিক্ষকের মাঝে আর্থিক সম্পর্কের স্বরূপটি উপেক্ষিত। শিক্ষক ছাত্রদের তৈরি করেন, তাদের যোগ্য করে তুলে জ্ঞানের দ্বারা হৃদয় পূর্ণ করেন। এভাবে দান ও গ্রহণের মাধ্যমে ছাত্র–শিক্ষকের মধ্যে একটি নিবিড় ও অচ্ছেদ্য বন্ধন সৃষ্টি হয়। ফলে শিক্ষাজীবনে ছাত্ররা যেমন শিক্ষকের কাছ থেকে উপকৃত হয়, তেমনি পরবর্তীকালেও শিক্ষকের আশীর্বাদ ছাত্রের জীবনে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। অপরদিকে শিক্ষার্থী যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে শিক্ষকের কাছে থেকে জ্ঞান অর্জন করে, সেই শ্রদ্ধাবোধ তার শিক্ষা জীবনের শেষেও অম্লান হয়ে থাকে। ছাত্রের কাছে শিক্ষকের স্মৃতি চিরউজ্জ্বল হয়ে থাকে। কিন্তু শিক্ষকের কাছে,

'ব্যক্তি ডুবে যায় দলে
মালিকা পরিলে গলে
প্রতিফুলে কেবা মনে রাখে?'

অতীত দিনের সম্পর্ক : মানুষের জ্ঞানচর্চার শুরু থেকেই ছাত্র–শিক্ষকের সম্পর্কের সূচনা হয়েছে। তাই এই সম্পর্ক সুদীর্ঘ দিনের। অতীতে ছাত্র–শিক্ষকের সম্পর্ক ছিল পরমাত্মীয়ের। শিষ্যেরা গুরুগৃহে অবস্থান করে বিদ্যার্জনের পাঠ গ্রহণ করত।

তখন তারা গুরুর পরিবারের একজন হয়ে উঠত এবং সংসারের সকল কাজে জড়িত থেকে জ্ঞানার্জনে তৎপর হতো। তারপর এক সময় পাঠ সমাপন করে গুরুদক্ষিণা দিয়ে শিষ্য নিজগৃহে ফিরে এসে সংসার ধর্মে নিয়োজিত হতো। এভাবে শিষ্য ও গুরুর মধ্যে একটি অনাবিল সম্পর্কের বিকাশ ঘটত। গুরু শিষ্যকে সর্বোত্তম জ্ঞান দিয়ে গড়ে তুলতেন। নিজের বিদ্যা শিষ্যকে দান করে গুরু–শিষ্যের মধ্যেই বেঁচে থাকতেন। গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তি–শ্রদ্ধাও ছিল অপরিসীম। প্রাচীন ভারতে ও গ্রিসে শিক্ষক–শিক্ষার্থীর মধ্যে এভাবে এক অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়ে উঠত। সেই ঐতিহ্যের আদলে ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শিক্ষক হচ্ছে ছাত্রের friend, philosopher and guide. গুরুর মতো পরামর্শ দেন বলে শিক্ষক ছাত্রের বন্ধু, ন্যায়–অন্যায়ের পার্থক্য নির্দেশ করে ছাত্রকে নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করেন বলে তাঁর ভূমিকা দার্শনিকের। আবার জীবনের সর্বক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করে ছাত্রের ভবিষ্যৎ চলার পথকে সুগম করে দেন বলে তিনি গাইড বা পথপ্রদর্শক। রবীন্দ্রনাথ ছাত্র–শিক্ষকের পরস্পর সম্পর্ককে বিচার করেছেন পরস্পর নির্ভর, সৌহার্দমূলক সম্পর্ক হিসেবে। সে সম্পর্ক কেবল পুথিগত বিদ্যা শেখানো ও শেখার মধ্যে আবদ্ধ নয়।

বর্তমান অবস্থা : সুদূর অতীতের সুসম্পর্কের দিনগুলোর অস্তিত্ব এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে আধুনিক যুগে। এ যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে। অতীতে অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা বিতরণ করা হলেও সেখানে অর্থ প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল না। শিক্ষক নিজেকে নিঃশেষ করেই জ্ঞান বিতরণ করতেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এখন শিক্ষক–শিক্ষার্থীর সম্পর্ক নিতান্ত আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শিক্ষকের কর্তব্যবোধকে করেছে সংকুচিত এবং শিক্ষার্থীর অবাধ কৌতূহলের গতিকে করেছে সীমিত, শ্লথ। এখন অর্থ দিয়ে বিদ্যা কেনা হয়। অর্থ লাভের তাড়নায় বহু শিক্ষক শিক্ষার্থীর গৃহে ছুটে যান এবং অর্থই বিদ্যাদানের উপায় হিসেবে গণ্য হয়। এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রূপ নিয়েছে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে। নামি–দামি বিদ্যালয়ে বৃহৎ অনুদান দিয়ে ছাত্র ভর্তি করতে হয়, উচ্চ বেতনে পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের। কোচিং সেন্টারের নামে শিক্ষার্থীদের স্বল্প পড়ায় পাশ করার নিশ্চয়তা দেন শিক্ষক সমাজ। ফলে ছাত্র–শিক্ষকের সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক বিনষ্ট হচ্ছে। তাদের মধুর সম্পর্কের মাঝখানে অর্থের সম্পর্ক এসে দুজনকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এখন ছাত্রের মুখও চিনে রাখার প্রয়োজন নেই, শিক্ষকেরও শ্রদ্ধা পাওয়ার আশা বিসর্জন দিতে হয়। আজকের দিনে ছাত্র–শিক্ষকের মধুর সম্পর্কের করুণ পরিণতি ঘটছে। শিক্ষাব্যবস্থায় এখন যে অনাচার প্রবেশ করেছে তাতে সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে পড়েছে। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে বাধা দিলে শিক্ষক লাঞ্ছিত হন উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের হাতে। সন্ত্রাসী তৎপরতায় আজকাল শিক্ষাঙ্গন মুখরিত। সেখানে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখার অবকাশ নেই।

এখনকার কর্তব্য : শিক্ষার্থীদের জীবনের যথার্থ বিকাশের স্বার্থে ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্কের এই ন্যক্কারজনক অবনতি অবশ্যই রোধ করতে হবে। ছাত্রদের যদি শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধার সম্পর্কের মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়া যায় তাহলে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উপকার পাওয়া যেতে পারে। এর জন্য শিক্ষাঙ্গনকে লেখাপড়ার কেন্দ্র হিসেবে রূপ দিতে হবে। সর্বপ্রকার অনাচার মুক্ত করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা কর্তব্য। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হবে সম্পূর্ণ সন্ত্রাসমুক্ত। এ প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক আখড়ায় পরিণত করা যাবে না। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। শিক্ষককে পরম আন্তরিকতা সহকারে দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিক্ষকের এই অবদান আজকাল কোনো একক শিক্ষকের ওপর বার্তায় না, তা সমষ্টিগতভাবে শিক্ষক সম্প্রদায়ের ভূমিকাকেই নির্দেশ করে। এই কারণে একজন শিক্ষাবিদ সুন্দরভাবে শিক্ষকের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন, "The world seldom notices who teachers are, but civilization depends on what they do." আদর্শ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের জ্ঞান ও গুণে মুগ্ধ শিক্ষার্থী শিক্ষককে দেবতাতুল্য মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে। ছাত্ররা শিক্ষককে আদর্শ হিসেবে মেনে নেয়। তাই শিক্ষকের মধ্যে আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে হবে। শিক্ষকের মনোযোগ থাকবে ছাত্রদের কল্যাণের প্রতি। আর ছাত্রদেরও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ও নিয়মনীতি মেনে নিয়ে পাঠাভ্যাস করতে হবে। এভাবে ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হলে ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে।

উপসংহার : ছাত্র–শিক্ষকের মধ্যে পরস্পর সমঝোতা না হলে বিদ্যার্জনের সাধনা সার্থক হয় না। সেজন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সমস্ত অবৈধ কার্যকলাপ থেকে দূরে রাখতে হবে। তখনই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানে অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠবে। পরিবেশ সুন্দর হলেই ছাত্র–শিক্ষক পরস্পরের কাছাকাছি আসবে এবং অনাবিল সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পঠন–পাঠনের যথাযথ সুযোগ পাওয়া যাবে। ছাত্রদের মনে রাখতে হবে, উপযুক্ত শিক্ষালাভ করলেই জীবনে যোগ্য হওয়া যায়। অন্যদিকে শিক্ষকগণ নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। ছাত্র–শিক্ষকের মধ্যে এভাবে সুসম্পর্ক বজায় থাকলেই শিক্ষাদান ও গ্রহণ সার্থক হবে, আর জাতি লাভ করবে সুযোগ্য উত্তরাধিকারী।

১২৬. কাগজ
অথবা, প্রধান নিত্যপ্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রী : কাগজ

ভূমিকা

বর্তমানে কর্মজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মনে হয়, কাগজ ব্যতীত জগতে কাজ–কারবার এক মুহূর্তও চলতে পারে না। আলো–বাতাসের মতোই মানুষ কাগজকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বলে মনে করে। কাগজ লেখার শ্রেষ্ঠ উপকরণ বলে সভ্যজগতের সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে।

কাগজের ইতিহাস : কাগজ সর্বপ্রথম কোথায় এবং কখন আবিষ্কৃত হয়েছিল তার কোনো সঠিক তথ্য–প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্ণমালার যখন সৃষ্টি হলো তখন লেখার বিবিধ উপকরণ ও লেখাপত্র আবিষ্কারের চেষ্টা চলতে লাগল। বাংলাদেশ ও ভারতের প্রথম জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো পুরুষপরম্পরায় কণ্ঠস্থ করে রাখার চেষ্টা হতো। ব্যাবিলনের অধিবাসীরা মাটির টালিতে অক্ষরগুলো খোদাই করে তা পুড়িয়ে নিত। এরূপে লাখো ইটের স্তূপে তাদের গ্রন্থাগার পরিপূর্ণ হতো। এর পরবর্তী যুগে বাংলাদেশ–ভারতে ভূর্জপত্রে ও তালপত্রে হস্তলিখিত পুঁথি রচিত হতো। এর কিছু পরবর্তী যুগে মিশরীয়গণ শরগাছের শাঁস হতে একপ্রকার কাগজ জাতীয় বস্তু তৈরি করতে শিখল। ইউরোপের অধিবাসীগণ মেষের চর্মে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করত; খ্রিষ্টানগণ তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল মেষের চর্মে লিখে দেশ–বিদেশে প্রচার করত। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের প্রারম্ভে চীনদেশে সর্বপ্রথম কাগজের জন্ম হয়। এর পর আরবেরা চীনাদের নিকট হতে কাগজ তৈরির কৌশলটি শিখে নেয়। পরে বাগদাদে কাগজ শিল্পের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। অতঃপর কাগজ তৈরির কৌশলটি শিখে নিলে তা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে হল্যান্ড, ইতালি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে কাগজ তৈরির কাজ প্রসারিত হয়ে পড়ে। ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম কাগজ তৈরির কল স্থাপিত হয়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন ফরড্রিনার। অতঃপর ডিকিন্‌সন এ কাগজ কলের আরও উন্নতিসাধন করেন। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র কাগজের মিলসমূহে যে কোটি কোটি টন কাগজ তৈরি হচ্ছে, তা ফরড্রিনার ও ডিকন্‌সনেরই চেষ্টা ও সাধনার ফল।

কাগজের উপকরণ : বর্তমান যুগে অনেক সুলভ ও সহজপ্রাপ্য উপকরণ হতে কাগজ তৈরি হয়। বাঁশ, ছিন্নবস্ত্র, খড়, তুলা, শুষ্ক বৃক্ষপত্র, ঘাস, কাঠ, পাট প্রভৃতি হতে কাগজ প্রস্তুত হয়। প্রথমত বাঁশের খণ্ডগুলোকে কলের চাপে চূর্ণ করা এবং পরে একে ক্ষার পানিতে মুখবন্ধ বয়লারের মধ্যে উপযুক্ত বাষ্পের চাপে কয়েক ঘণ্টা ধরে ফুটানো হয়। তারপর এ মন্ডকে ব্লিচিং পাউডারের সাহায্যে পরিষ্কার করে এর মধ্যস্থিত পানি কলের সাহায্যে নিষ্কাশন করা হয়। এরূপে পাতলা পাতের মতো মণ্ডের সঙ্গে ফিটকিরি, রজন, জিলেটিন ইত্যাদি রাসায়নিক বস্তু মিশিয়ে আধুনিক কাগজ প্রস্তুত করা হয়। আবার প্রয়োজনবোধে মণ্ডের সঙ্গে বিভিন্ন রং মিশিয়ে রঙিন কাগজ তৈরি করা হয়।

বিভিন্ন প্রকার কাগজ : আমরা যে কাগজ ব্যবহার করি এবং যে কাগজে পুস্তকাদি মুদ্রিত হয়, তা কয়েক রকম আকারের হয়ে থাকে। যেমন : ফুলস্ক্যাপ, ক্রাউন, ডবল ক্রাউন, ডিমাই, ডবল ডিমাই, রয়েল প্রভৃতি। এ সকল কাগজের গ্রাম পাউন্ড হিসেবে ওজন হয় এবং ওজন অনুসারে বিভিন্ন মূল্যে বিক্রি হয়। আমাদের দেশে পূর্বে ছেঁড়া ন্যাকড়া, তৃণ ও বৃক্ষপত্র ইত্যাদি হতে একপ্রকার মোটা কাগজ তৈরি হতো। এ কাগজকে 'তুলট কাগজ' বলা হয়। এখনো চট্টগ্রাম ও ঢাকার বিক্রমপুর অঞ্চলের কোনো কোনো লোক এ প্রকারের কাগজ তৈরি করে থাকে। তবে মিলে প্রস্তুত কাগজ অপেক্ষাকৃত মসৃণ ও সুলভ হওয়ায় হাতে তৈরি কাগজের চাহিদা যথেষ্ট লোপ পেয়েছে।

ছাগল, মেষ ও উটের চামড়া হতে একরকম কাগজ তৈরি হয়ে থাকে। এরূপ কাগজকে 'পার্চমেন্ট কাগজ' বলা হয়। পাঁচ টাকা, দশ টাকা, একশ টাকা প্রভৃতি বেশি দামের নোট ওই কাগজে ছাপা হয়ে থাকে। কাগজের ওপর হতে কালি শুষে নেওয়ার জন্য যে কাগজের প্রচলন হয়েছে তাকে 'ব্লটিং' পেপার বা চোষ কাগজ বলা হয়। দৈনিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি সংবাদপত্র যে কাগজে মুদ্রিত হয় তাও পৃথক একপ্রকারের কাগজ; একে 'নিউজপ্রিন্ট' বলে।

বাংলাদেশি কাগজ : কাগজশিল্পের ব্যাপারে বাংলাদেশ আজ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। দেশে কাগজের চাহিদা মেটানোর জন্য তিনটি কাগজের মিল স্থাপিত হয়েছে। এ তিনটি মিলের উৎপন্ন কাগজ দ্বারা অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে কিছু কিছু বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। কারখানা তিনটি হচ্ছে— 'চন্দ্রঘোনা পেপার মিল্‌স', 'খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল্‌স' ও 'পাকশী পেপার মিল্‌স'। 'চন্দ্রঘোনা পেপার মিল্‌স' হতে প্রত্যহ ত্রিশ টন কাগজ উৎপন্ন হয়। 'খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল্‌সেও' পূর্ণোদ্যমে কাজ চলছে। আমাদের দেশে কাগজ তৈরির জন্য উপকরণের ও কাঁচামালের অভাব নেই। ওইগুলো কাজে লাগিয়ে কাগজশিল্পের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করলে বাংলাদেশ অচিরেই সফলতা লাভ করতে পারবে এবং বিভিন্ন দেশে প্রচুর কাগজ রপ্তানি করতেও সমর্থ হবে।

উপসংহার : কাগজশিল্পের অগ্রগতির সাথে জাতীয় উন্নয়ন ও প্রগতি জড়িত। তাই সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে তরুণ শিল্পোদ্যোক্তাদের এ শিল্পের উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে এ শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করবে।

১২৭.পরীক্ষায় দুর্নীতি
অথবা, পরীক্ষায় দুর্নীতি ও তার প্রতিকার

ভূমিকা

ন্যায়নীতি, সত্য চিরদিনই মানুষের জীবনের একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করেছে। নীতিহীন জীবনের যেমন কোনো মূল্য নেই, তেমনি নীতিবান মানুষের মর্যাদা ও গৌরব চিরদিনই সকলে প্রদান করে এসেছে। এ সংসারে যেসব মহাপুরুষ, মহামানব সুনীতিকে আশ্রয় করেছিলেন, তাঁরা আজ মানবজাতির নমস্য ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন। পক্ষান্তরে, দুর্নীতির আশ্রয়ে পরিপুষ্টি লাভ করলে অথবা অসাধু জীবনে পরিচালিত হতে গেলে তার পরিণাম যে কোনোক্রমেই মঙ্গলজনক হতে পারে না সে কথা বোধ করি কাউকে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা করে না। আমাদের বর্তমান সমাজ দুর্নীতিগ্রস্ত। সর্বত্র দুর্নীতির রাজত্ব। কী কর্মজীবন, কী ব্যাবসাবাণিজ্য, কী ছাত্রজীবন— যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক না কেন দুর্নীতি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

দুর্নীতির বিষ আজ আমাদের সমাজ–অঙ্গে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, তার ফল দিন দিনই ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, মুনাফাখোর প্রতিদিন মানবসমাজে এমনভাবে বিষ ছড়াচ্ছে যে, তার হাত থেকে নিষ্কলুষ ছাত্রসমাজও রেহাই পাচ্ছে না। বরং ছাত্রসমাজের দুর্নীতি জাতির মেরুদণ্ডকে কুরে কুরে খাচ্ছে। স্কুল–কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এজন্য যে, ছাত্রসমাজ ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে পারল এবং তাদের শিক্ষা কতটা কার্যকর হলো সেটা নিরূপণের জন্যই তো পরীক্ষা–পদ্ধতির পবর্তন। সুতরাং পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য মহৎ। অথচ আজ এমন মহৎ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে।

যে ছাত্র সারা বছর পড়াশোনা না করে পরীক্ষা ভবনে প্রবেশ করে, প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়ার মতো জ্ঞান তার হবে কী করে? কাজেই সে পরীক্ষায় নজররক্ষীদের (Invigilators) ফাঁকি দেয় অথবা কখনো পকাশ্যভাবেই নকলের আশ্রয় গ্রহণ করে, বই থেকে টোকাটুকি করে। ফল হলো যে, ওই ছাত্র লেখাপড়া না করেও পরীক্ষার বৈতরণী পার হয়ে গেল। কিন্তু সে নিজের এবং জাতির যে চরম সর্বনাশ ঘটালো, সে বিষয়ে একবারও খেয়াল করল না। ওই ছাত্রের জীবন অন্তঃসারশূন্য হবে, হতে বাধ্য।

দুর্নীতির কারণ : গোটা ছাত্রসমাজের এ যে অধঃপতন তার কারণ কী? ছাত্রগণ এখন দুর্নীতিবাজ হয়ে উঠেছে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বর্তমান সমাজব্যবস্থা এবং শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে। হালে মানুষ আসল ছেড়ে দিয়ে মেকি ও নকলের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটছে। ছাত্রদের যারা অভিভাবক অর্থাৎ তাদের পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক–শিক্ষয়িত্রী এবং সমাজের অন্যান্য যাঁরা তাদের চারপাশ ঘিরে আছে সবাই এক বিষাক্ত সমাজ–পরিবেশের মানুষ। সর্বত্র মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, ছলচাতুরী, যেমন–তেমন করে একটা ডিগ্রি অর্জন করে একটা চাকরি বাগাতে পারলেই যেন দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল, এ রকমের একটা মনোভাব সবাইকে উগ্র রকমে পেয়ে বসেছে।

পরীক্ষায় দুর্নীতির প্রধান কারণ হলো ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা। আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা এমনভাবে তৈরি যে তাতে ছাত্রদের পড়াশোনায় কোনো আনন্দ নেই। যে কাজে কোনো আনন্দ নেই সে কাজ করতে মানুষ উৎসাহ পায় না এটা মানুষের প্রকৃতি। অর্থাৎ কাজের প্যাটার্নের ওপর মানুষের আনন্দ–নিরানন্দ নির্ভরশীল। কাজেই আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রদের জন্য বোঝাস্বরূপ। শিক্ষার্থীর যেখানে শিক্ষাগ্রহণের পেছনে আনন্দ নেই অথচ ডিগ্রির লোভ আছে সেখানে ফাঁকিটাই স্বাভাবিক এবং এ জন্যই ছাত্ররা সারা বছর শিক্ষণীয় বিষয় অবহেলা করে, পরীক্ষার সময় দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়।

পরীক্ষার পাঠ্যসূচি দিন দিনই কঠিনতর হচ্ছে। স্কুল–কলেজে লেখাপড়ার পাঠ একরকম চুকে গেছে বললেই চলে। তার ওপর রয়েছে অনভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী; তাঁরা শিক্ষকতা ছাড়াও অন্যান্য কাজে জড়িয়ে পড়েন, ফলে ছাত্রসমাজকে এক অনাচারের পথে ঠেলে দেন। যেখানে অর্থ হলো সামাজিক মান–মর্যাদার মাপকাঠি সেখানে একমাত্র শিক্ষকতা করে সামান্য বেতনে সংসার নির্বাহ করাকে কোনো শিক্ষকই একমাত্র কাম্য বলে মনে করতে পারছেন না। কাজেই তাঁকে অর্থের ধান্ধায় অন্য কাজেও আত্মনিয়োগ করতে হচ্ছে।

আর একটি কথা। অভিভাবকমাত্রই জানেন যে, স্কুল–কলেজে মোটেই পড়ানো হয় না এবং যখন–তখন যেকোনো সময় বিনা নোটিশে অধিকাংশ স্কুল ছুটি হয়ে যায়, পড়াশোনা হয় না। বাড়িতে একগাদা 'হোমটাস্ক' করার হুকুম দেওয়া হয়। কিন্তু সেগুলো কোনো শিক্ষক অথবা অভিভাবকের সহায়তা ব্যতিরেকে সমাধান করা কোনো ছাত্রছাত্রীর পক্ষে সম্ভবপর নয়। যে বাড়িতে কারও সাহায্য পাওয়া যায় না সে ছাত্রদের অবস্থা যে কি দাঁড়ায় তা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষকরাও বেতন কম পান,

ফলে তাঁদের 'প্রাইভেট টিউশনি' করে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের ধান্ধায় থাকতে হয়। প্রাইভেট টিউশনিতে রোজগার কিছু হলেও তা করে শিক্ষকের সময় এবং শক্তি দুই–ই ব্যয় হয়। কাজেই স্কুল–কলেজে শিক্ষক ততটা মনোযোগ দিতে পারেন না। তাছাড়া, বেতন কম বলে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। ভালো ছাত্র না হলে যে ভালো শিক্ষক হওয়া যায় না সে কথাটাই আমরা হালফিলে ভুলে গেছি এবং ভালো শিক্ষক না হতে পারলে তাঁর শিক্ষা কখনই ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না। শিক্ষকের প্রভাব ছাত্রদের সাফল্যের এক মস্তবড়ো শর্ত। শিক্ষাদান পদ্ধতির ত্রুটির জন্য ছাত্রগণ দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে।

দুর্নীতির প্রতিকার কী : বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ফলে আমাদের দেশের ছাত্রসমাজকে অনুসৃত দুর্নীতির হাত থেকে রক্ষা করতে হলে কোন নীতি গ্রহণ বাঞ্ছনীয় এ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। **প্রথমত,** পরীক্ষার তারিখ স্থির করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ডসমূহের কর্তৃপক্ষের। লক্ষ রাখতে হবে যে, ছাত্রদের কোনো দাবিদাওয়া বা হুমকির কাছে তাঁরা যেন পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন না করেন এবং এ ব্যাপারে সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। **দ্বিতীয়ত,** স্কুল–কলেজে যথারীতি ও নিয়মিত পড়াশোনা হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করা হোক। **তৃতীয়ত,** বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করে গণমুখী এবং মানসিক তৃপ্তিজনিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন বাঞ্ছনীয়। ছাত্রগণ যেন আনন্দচিত্তে পড়াশোনা করতে পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখতে হবে। **চতুর্থত,** অভিভাবক ও শিক্ষকমণ্ডলীর (যাঁরা সকলে উৎসাহ দেন বা সাহায্যে অগ্রসর হন) মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন। ছেলে হোক, মেয়ে হোক বা না–হোক সবাইকে কঠোরভাবে দুর্নীতির জন্য দণ্ডবিধান করতে হবে। তাদের বুঝতে দিন যে, নকল করা মহাপাপ। নকল করলে কঠোর শাস্তি পেতে হয় এবং সেজন্য কারও কোনো ক্ষমা নেই। এতে পরিণামে কারও মঙ্গল হয় না। **পঞ্চমত,** কেবল একটি বাৎসরিক পরীক্ষার ওপরই ছাত্রদের পরবর্তী পর্যায়ে প্রমোশন দেওয়া চলবে না। তাদের লেখাপড়ার মান নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেক স্কুল, কলেজে মাসিক পরীক্ষা গ্রহণের রীতি চালু থাকা বাঞ্ছনীয়। ছাত্রছাত্রীদের বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে উক্ত মাসিক পরীক্ষার ফলাফলও বিচারাধীন করতে হবে। তাছাড়া মৌখিক প্রশ্নালোচনা, টিউটোরিয়াল প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা চাই।

উপসংহার : ছাত্ররাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিক এবং কর্ণধার। সুতরাং ন্যায়নীতি শিক্ষার দিকে তাকে তালিম দেওয়া কর্তব্য। কেবল পরীক্ষার বৈতরণী পার হলেই ছাত্ররা মানুষ হওয়ার যোগ্যতা লাভ করতে পারে না, সেজন্য প্রয়োজন মনুষ্যত্ব, নিষ্ঠা, সততা ও নিয়মানুবর্তিতা। এ কথাটি বাল্যকাল থেকেই তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাহলে আশা করা যায়, দুর্নীতিগ্রস্ত ছাত্রসমাজ একদিন জাতির মুখ উজ্জ্বল করতে পারবে।

১২৮. জাতি গঠনে নারী সমাজের ভূমিকা *[য. বো. '১৭]*

অথবা, **নারীশিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন** *[চ. বো. '১৯; কু. বো. '১৩]*

অথবা, **অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীসমাজের ভূমিকা** *[রা. বো. '১৭]*

ভূমিকা

সাম্যের গান গাই–
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই ॥

বিদ্যা শিক্ষা করা নারী–পুরুষ উভয়ের জন্য আবশ্যিক। সাংসারিক জীবনকে উন্নতরূপে গঠন করে তুলতে হলে নারীকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। নারীই ভবিষ্যৎ মাতৃত্বের ধারা বহন করে। আজকের মানবশিশু আগামীকালের নাগরিক। জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ এ শিশুদের শিক্ষিত করে তোলার প্রাথমিক গুরুদায়িত্ব হলো মায়ের; তাই মাকে শিক্ষিত হতে হবে।

নারীশিক্ষা সম্বন্ধে মতামত : নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্তমান যুগে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু সমাজের এক শ্রেণির লোক মনে করেন, স্ত্রীলোকেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করলে গৃহকর্মে অবহেলা করবে। নারীকে অন্তঃপুর হতে বাইরে আসতে দিলে পারিবারিক জীবনে অসুবিধা দেখা দেবে। অপরপক্ষে, অনেকে মনে করেন সুস্থ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নারী–পুরুষ উভয়েরই সমভাবে কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে হবে। এজন্য উভয়েরই সমান শিক্ষার প্রয়োজন।

নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা : নারীশিক্ষার প্রয়োজন বর্তমান যুগে বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। সমাজজীবনের প্রতিক্ষেত্রেই শিক্ষিত নারীর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ মুখ্যভাবে নারীশিক্ষার ওপর নির্ভর করে। পুত্র–কন্যাদের লালনপালন ও প্রাথমিক শিক্ষাদান জননীর দায়িত্ব বলে স্বীকৃত। জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যাতে দুনিয়াতে মানুষের মতো মানুষ বলে পরিচয় দিতে পারে, সে বিষয়ে জননীকে দৃষ্টি দিতে হলে প্রয়োজন শিক্ষিত জননীর। দেশের লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এরা যদি অশিক্ষিত–নিরক্ষর থেকে যায় তবে সমগ্র জাতি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন

ক্ষেত্রে অগ্রগতি ব্যাহত হবে। নারীর অজ্ঞানতা আমাদের পারিবারিক জীবনে অনেত দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করবে। শুধু পুরুষের মানসিক উৎকর্ষই জীবনকে সুখময় ও কল্যাণকর করে তুলতে পারে না।

পুরুষের ন্যায় নারীকেও সমাজের কল্যাণ, আনন্দ পরিপুষ্টির জন্য কাজ করতে হবে। এজন্য নারীরও সুশিক্ষা লাভ করা দরকার। শিক্ষা মানুষের দৃষ্টি প্রসারিত করে, মনের ঔদার্য বৃদ্ধি করে এবং বৃহত্তর জীবনের স্বাদগ্রহণ করতে উৎসাহ ও প্রেরণা দেয়।

বর্তমান যুগে নর–নারী উভয়েরই শিক্ষালাভ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ, জটিল অর্থনৈতিক সমস্যাজড়িত সমাজের দায়িত্ব উভয়কেই নিতে হবে। শিক্ষিত নারীর হাতে সংসারের ভার ন্যস্ত হলে সংসার সুখের হবে। সংসারের দৈনন্দিন আয়–ব্যয়ের হিসাবনিকাশ প্রভৃতি বহু নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে শিক্ষিত নারীর প্রয়োজন।

আমাদের নারীসমাজ অবরোধ প্রথার জন্য বহুকাল শিক্ষালাভ করতে পারেনি। সৌভাগ্যক্রমে দু–চারজন ভ্রান্ত ধারণা ও সংকীর্ণতার গন্ডি পার হয়ে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন।

'কোনোকালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়–লক্ষ্মী নারী।'

জ্ঞানবিজ্ঞানে মুসলিম নারী : জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় বহু মুসলমান নারী দক্ষতার পরিচয় দান করেছেন। ইসলামের অতীত গৌরবময় যুগে আরব মহিলাগণ, স্পেনীয় মুসলিম মহিলাগণ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবময় কৃতিত্বের যে পরিচয় দিয়েছেন, তা আমরা ইতিহাস পাঠ করে জানতে পারি। হজরত মুহম্মদ (সা.)–এর স্ত্রী উমমূল মু'মেনিন হজরত আয়েশা (রা) স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে (জঙ্গে জমল) গিয়েছেন। বহু বীরাঙ্গনা মুসলিম মহিলা রণক্ষেত্রে গমন করে আহতদের সেবা–শুশ্রূষা করেছেন। মুসলিম মহিলাগণ নানা সভাসমিতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। ইমাম হুসাইন (রা)–এর বিদুষী কন্যা সৈয়দা সখিনার গৃহে ধর্মালোচনার জন্য বহু শিক্ষিত মহিলা সমবেত হতেন। খলিফা মুয়াবিয়ার পত্নী মায়মুনা, খলিফা আবদুল মালেকের পত্নী উম্মুল বাননি, খলিফা মাহদীর পত্নী খায়জুরান ও খলিফা হারুন–অর–রশীদের পত্নী যুবাইদা প্রমুখ মহিলাগণ সমাজসেবা, রাজনীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। মুসলিম–ভারতের জাহান আরা, জেবুন্নেসা, চাঁদ সুলতানা, নূরজাহান, রোকেয়া প্রমুখ বহু মুসলমান নারী সাহিত্য, কাব্য, শিল্প, রাজনীতি ও সমাজসেবা ইত্যাদিতে অসাধারণ প্রতিভার স্বর্ণস্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

নারী–পুরুষের শিক্ষাব্যবস্থার পার্থক্য : নারীর পক্ষে পুরুষের সঙ্গে পৃথিবীর বহিরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে সর্বক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে প্রতিযোগিতা করা সম্ভবপর নয়; কারণ, পুরুষ ও নারীর দৃষ্টিগত গঠনবৈচিত্র্যই ভিন্ন। স্বভাবত নারী পুরুষ অপেক্ষা কোমল স্বভাবের। অধিকন্তু নারী যদি পুরুষের সঙ্গে বহিরাঙ্গনে এসে দাঁড়ায় তবে অন্তঃপুরের ভার নেবে কে? অন্তঃপুরের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করলে সমাজব্যবস্থায় গোলযোগ দেখা দেবে। এজন্য নারীকে প্রথমে অন্তঃপুর সামলিয়ে পরে বাইরে পদক্ষেপ করতে হবে। বাইরের কর্মজগতে পুরুষের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা না করে পারিবারিক ব্যবস্থার কল্যাণের জন্য নারীকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। এজন্য নারীশিক্ষার উপযোগী গৃহস্থালিবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা দরকার সূচিশিল্প, রন্ধনশিল্প, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শিশু মনস্তত্ত্ব, সংগীত এবং তার সঙ্গে গণিত, বাংলাভাষা, ইংরেজি, ভূগোল, ইতিহাস, ধর্মীয় শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়কে পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করলে সমাজের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

উপসংহার : উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হলে আমাদের নারীসমাজ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত আসন লাভ করবে। ফলে গার্হস্থ্য–জীবন মাধুর্যমন্ডিত হয়ে উঠবে। অশিক্ষিত নারীদের নিকট হতে আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির আশা করা বাতুলতামাত্র। নিরক্ষরতা সামাজিক নানা অমঙ্গলের কারণ, এ সত্য উপলব্ধি করে আমাদের দেশের নারীজাতিকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য আশা করি সকলেই সচেষ্ট হবেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় বলেছেন—

সেদিন সুদূরে নয়–
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীর জয় ॥

১২৯. আধুনিক জীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব

ভূমিকা :

বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে
বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে।
— হুমায়ুন আজাদ

বই বা গ্রন্থের সারিবন্ধ সংগ্রহকে বলা হয় গ্রন্থাগার বা লাইবেরি। সভ্যতার অন্যতম উপাদান হলো গ্রন্থ। মানুষের ধ্যানধারণা অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা থাকে গ্রন্থের মাধ্যমে। গ্রন্থের মাধ্যমে মানুষের চিন্তা–ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। গ্রন্থ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা রাখে গ্রন্থাগার। সৃজনশীল মেধাবিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থাগারে সঞ্চিত গ্রন্থ ঘুচিয়ে দেয় কালের ব্যবধান।

গ্রন্থাগার জাতির মেধা ও মননের প্রতীক : মানুষের জ্ঞান আহরণের প্রধান উৎস গ্রন্থ। আর গ্রন্থাগার হচ্ছে গ্রন্থের আগার বা সংগ্রহশালা। গ্রন্থাগার একটি জাতির মেধা, মনন, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধারণ ও লালন করে। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার যে ভূমিকা পালন করে তার কোনো বিকল্প নেই।

গ্রন্থাগার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনই মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়। স্বাধীনভাবে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বন্ধুর মতো সামনে এসে দাঁড়ায়। গ্রন্থাগারে থাকে নানা ধরনের বইয়ের সমাহার। এর মাধ্যমে সবশ্রেণির মানুষই উপকৃত হয়। এ গ্রন্থাগারে এলে জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন করার সুযোগ পাওয়া যায়। কবির ভাষায়—

যে–বই জুড়ে সূর্য ওঠে
পাতায় পাতায় গোলাপ ফোটে
সে–বই তুমি পড়বে।

গ্রন্থাগার ও মানুষের প্রত্যাশা : সীমিত আয়ুর মানুষ জ্ঞানার্জনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গ্রন্থাগারের শরণাপন্ন হয়। আগ্রহী পাঠকের জন্য গ্রন্থাগার জ্ঞানার্জনের যে সুযোগ করে দেয়, সে সুযোগ অন্য কোথাও নেই। গ্রন্থাগার গ্রন্থের বিশাল সংগ্রহশালা, যা মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন করে জ্ঞানের মণিমুক্তা সংগ্রহের সুযোগ পায়।

গ্রন্থাগারের উৎপত্তি ও বিকাশ : সব ধরনের জ্ঞানকে একত্র করে স্থায়িত্বদানের উদ্দেশ্য থেকেই গ্রন্থাগারের সৃষ্টি। গ্রন্থাগারের ইতিহাস বেশ পুরোনো। যখন থেকে বই প্রকাশিত হতে থাকে, তখন থেকেই বই সংগ্রহের তাগিদে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়ে আসছে। মানুষ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সন্তুষ্টির জন্য আবশ্যকীয় বস্তু সংগ্রহের প্রয়োজনে, জীবনের নিশ্চয়তার জন্য, শিক্ষা ও নৈতিক উন্নতিকল্পে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সামাজিক জীবনযাপন করে। আদিকালেও সমাজজীবন ছিল; বর্তমানে তার প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে চলেছে। মানুষের অনুসন্ধান–স্পৃহা নব নব প্রাপ্তির আনন্দনেশায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ক্রমে মানুষের জ্ঞানভান্ডার ভরে উঠতে থাকে। এরূপ ক্রমলব্ধ জ্ঞান স্মৃতিশক্তিতে ধরে রাখা একসময় অসম্ভব হয়ে ওঠে। মানুষ জ্ঞানলব্ধ ও সংগৃহীত জ্ঞান স্থায়ীভাবে ধরে রাখার মাধ্যম খুঁজতে থাকে। গাছের বাকল, পাহাড়ের গা, প্যাপিরাস, চামড়া, পাথর, বাঁশ ইত্যাদির ব্যবহার আয়ত্ত করে। ফলে মানুষের জ্ঞানভান্ডার বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হতে থাকে। ক্রমবিস্তৃত জ্ঞানভান্ডার নিজেদের এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা মানুষ একসময় অনুভব করে। এগুলো নিজ নিজ ঘরের কোণে, মন্দির, উপাসনালয়ে এবং রাজকীয় ভবনে সংরক্ষণ করতে শুরু করে।

প্রথম গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় রোমে। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের জন্য খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। রোম ছাড়াও প্রাচীনকালে ব্যাবিলন, মিশর, চীন, ভারত ও তিব্বতে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। ইসলামের আবির্ভাবের ফলে মুসলমানদের শাসন আমলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেক সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। সভ্যতার ইতিহাসে স্পেনে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশটি বিশ্বের জ্ঞানী–গুণীদের মিলনমেলার তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছিল।

গ্রন্থাগারের উপযোগিতা : গ্রন্থাগারের উপযোগিতা নিয়ে সংশয়ের কোনো সুযোগ নেই। চিন্তাশীল মানুষের কাছে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা অনেক বেশি। গ্রন্থাগার জ্ঞান আহরণের সহজ মাধ্যম। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা উন্নত দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। কেননা মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে বই কিনে পড়ার সামর্থ্য অনেকেরই থাকে না। গ্রন্থাগার সেই অভাব পূরণ করে।

গ্রন্থাগার ও আধুনিক বিশ্ব : আধুনিক বিশ্বে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা দিনে দিনে বাড়ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাই বড়ো বড়ো গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়ে আসছে। লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, প্যারিসের Bibliotheqne National, মস্কোর লেনিন গ্রন্থাগার, ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অব কংগ্রেস প্রভৃতি বিশ্বের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারগুলোর অন্যতম। এসবের আদর্শ অনুসরণ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশসহ আমাদের দেশেও গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়াম প্রভৃতি আমাদের দেশের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার।

গ্রন্থাগারের উপকারিতা : গ্রন্থাগার শুধু সমাজসংস্কারের কাজই করে না, তা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের স্থায়ী উপকরণ হিসেবেও ভূমিকা পালন করে। সামাজিক শান্তিশৃঙ্খলা বলতে যে আনন্দকে বোঝানো হয়, তার জন্য অনিবার্য পূর্বশর্ত মানসিকভাবে বিকশিত সমাজ, যা তৈরি করতে পারে গ্রন্থ। গ্রন্থাগার সকলের জন্য উন্মুক্ত। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা নেই

এখানে, নেই হানাহানি–কলহ; সুতরাং জাতির মর্যাদাবোধের উন্নয়নে প্রতিটি নাগরিকের উচিত নিয়মিত গ্রন্থাগারে উপস্থিত হয়ে পড়ালেখা করা এবং সমাজ গড়ায় সহায়ক রাজনীতির জ্ঞানার্জন করা।

যে–বই জ্বালে ভিন্ন আলো
তোমায় শেখায় বাসতে ভালো
সে–বই তুমি পড়বে।

গ্রন্থাগারের শ্রেণিবিভাগ : গ্রন্থাগারকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (১) ব্যক্তিগত, (২) পারিবারিক ও (৩) সাধারণ। স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গ্রন্থাগারের পরিসর সীমিত। সাধারণ গ্রন্থাগার যেহেতু সর্বসাধারণের জন্য, সেহেতু এর পরিসরও অনেক ব্যাপক এবং বিস্তৃত। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রশিক্ষকের প্রয়োজনে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন ক্লাব, প্রতিষ্ঠানও নিজস্ব উদ্যোগে গ্রন্থাগার স্থাপন করে থাকে।

গ্রন্থাগারের সাফল্য : প্রমথ চৌধুরী গ্রন্থাগারকে 'মনের হাসপাতাল' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, "গ্রন্থপাঠে মনের অসুখের নিরাময় হয়।" গ্রন্থাগারের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার ওপর। শুধু কিছু বইপত্র সংগ্রহ করে একটি ঘরে গ্রন্থের সমাবেশ ঘটালেই গ্রন্থাগারের সাফল্য আসে না। গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্বভার তার ওপর অর্পিত। তিনি গ্রন্থসমূহের শ্রেণিবিন্যাস করে গ্রন্থগুলো বিন্যস্ত করেন, ক্যাটালগ তৈরি করেন। বর্তমান বিশ্বে ডিউই পদ্ধতি বা দশমিক পদ্ধতিতে বইয়ের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। গ্রন্থাগার থেকে বই খুঁজে পেতে এ পদ্ধতি বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

উপসংহার : গ্রন্থাগার হলো অবাধ ও মুক্তশিক্ষার ক্ষেত্র। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অনেকটা প্রথাবদ্ধ। তাই শিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগারের বিশেষ অবদান রয়েছে। সামাজিক অবক্ষয় রোধে এবং অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে গ্রন্থাগার বিশেষ ভূমিকা রাখে। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী প্রতিটি লোক নিজস্ব রুচি অনুযায়ী নিজের মনকে জ্ঞানের রাজ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই বিশ্বজুড়ে গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা বেড়ে চলেছে। কবির ভাষায়—

যে–বই তোমায় দেখায় ভয়
সেগুলো কোন বই–ই নয়
সে–বই তুমি পড়বে না।

১৩০. শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

ভূমিকা : ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। হানাদার পাকবাহিনীর পরাজয়ের পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। কিন্তু এটা দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের তরুণ ও যুব সম্প্রদায় সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারছে না।

ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তারা সব যুগেই প্রগতিশীল আন্দোলনের জন্মদান করেছে। বিশেষভাবে বলা চলে যে, এশিয়ার ছাত্রসমাজ বরাবরই সংগ্রামী চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মৃত্যুঞ্জয়ী ছাত্ররাই বুলেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল। ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়ে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অকুতোভয়ে অগ্রসর হয়েছিল। শত যুবকের ও শহিদের উষ্ণ রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়— এসবই তো ইতিহাস।

ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের বিপথগামিতা : নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য দৃঢ় শপথ গ্রহণের দিন যখন বাঙালির দ্বারপ্রান্তে ঠিক তখনই দেশ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। চারদিকে কেবল স্বার্থপরতা, হীনম্মন্যতা এবং দুর্নীতির অচলায়তনের পাহাড়। দেশের সর্বসাধারণের মানসপটে স্বাধীনতার মহান আদর্শ জাগ্রত থাকা সত্ত্বেও মাত্র দেড় দশক সময়ের মধ্যে তারা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিলো, সে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। দেশের পরিস্থিতির দিকে একবার তাকালে আমরা কী চিত্র দেখতে পাই? ব্যবসায়ী মহলে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি চলছে, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল, জ্ঞান–সাধনায় দুর্নীতি ও অমানবিক কার্যকলাপে দেশ ছেয়ে গেছে। সরকারি–বেসরকারি যেকোনো অফিস–আদালত বলুন, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা–স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলুন সর্বত্রই দুর্নীতি চলছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উচ্চমূল্যের কারণে মানুষমাত্রই যেখানে শৃঙ্খলাহীনতার তলায় খাবি খাচ্ছে সেখানে দেশের শিক্ষায়তনগুলোর যুবক ও ছাত্রসমাজ হাতে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। লেখাপড়া, উচ্চ গবেষণা এবং দেশের ভবিষ্যৎকে জলাঞ্জলি দিতে তারা কসুর করছে না। কিন্তু কেন? এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠবে। ছাত্রদের সঠিকপথে পরিচালিত করতে গেলে যে বলিষ্ঠ শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রয়োজন তা শিক্ষায়তনগুলোর কর্তৃপক্ষ নিতে পারছেন না। তার পেছনে অবশ্যই অকাট্য কারণ বিদ্যমান।

রাজনীতি ও ছাত্রসমাজ : প্রথমেই দেশের রাজনীতিবিদদের কথা আসে। তাঁরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে ছাত্র ও যুবকদের দলে টানছেন এবং আখের গোছাতে ব্যস্ত রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় তো দূরের কথা—গ্রামের স্কুলের সরলপ্রাণ ও কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা এসব রাজনৈতিক দলের শিকার হচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে, যেখানে বাধাহীন উপায়ে প্রত্যেকটি ছাত্র ও ছাত্রীর বিদ্যা অর্জন করার কথা সেখানে তারা যে কীভাবে মূল্যবান ভবিষ্যৎকে জলাঞ্জলি দিতে বসেছে তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। আরও একটি কথা— আমরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও কি প্রাণ ঢেলে ছাত্রদের পড়াই? না, পড়াই না। দুর্বল শিক্ষানীতির চাপে আমরা এখন কেবলি খাবি খাচ্ছি। তাই ছাত্ররাও ডুবতে বসেছে। এভাবে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় অরাজকতা। কোন সেশনের ছাত্র কোন সেশনে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হচ্ছে এর জবাবদিহি কে করবে?

দ্বিতীয়ত, সমাজের নানা স্তরে অবিশ্বাস্যভাবে নীতিহীনতা ও আদর্শহীনতা প্রবেশাধিকার পেয়েছে। 'শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস' কথাটি সাম্প্রতিককালের বহু আলোচিত একটি প্রসঙ্গ। বিষয়টি এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে দেশের প্রত্যেক বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক–শিক্ষিকা, অভিভাবকসহ সবাই চিন্তিত। লেখাপড়া ধুলোয় লুটিয়ে যেতে বসেছে, লাইব্রেরির হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মূল্যবান বই অব্যবহারের ফলে ধুলায় ধূসরিত হচ্ছে। বিদ্যাপীঠের গ্রন্থাগার ও সেমিনার কেন্দ্রগুলোর কর্মচারীবৃন্দ কর্মবিরতির অবকাশে বসে বসে ঝিমাচ্ছেন।

কলুষিত শিক্ষাঙ্গন : শিক্ষাঙ্গন শিক্ষা, জ্ঞান–সাধনা ও উচ্চ গবেষণার কেন্দ্রস্থল। দুঃখের বিষয় সেখানে আজ শিক্ষাদানের ব্যবস্থাদি বাধাগ্রস্ত। আজকের যুবক ও তরুণেরা মানসিক মূল্যবোধ ও অবক্ষয়ের অতল তলে নেমে গেছে। তাদের সামনে আর আদর্শ নেই। সম্মান ও মর্যাদার দীপ্তি নেই, সত্য ও বিশ্বাসের দীপ্তি দেশ থেকে বিতাড়িত। লোকে বক্তৃতা দেয়, বাহবাও কুড়ায়, কেউ কেউ আবার ওই পর্যন্তই। শিক্ষাঙ্গনের মাঝখানে শহিদ মিনারের মহান আদর্শ ও সত্য বিদ্যমান। তবু সেখানে ছাত্র, যুবকেরা অন্যায় ও অসত্যের অনিবার্য পরিণামকে মেনে নিয়েছে। আবাসিক হল ও ছাত্রাবাসগুলোতে বোমা, ছুরি, বন্দুক, হকিস্টিক ও নানা রকম স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র আমদানি করে এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে; বোমা মেরে একদল ছাত্র আরেক দল ছাত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করছে। বলা দরকার যে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীরা আজ দেশের নানা রাজনৈতিক দলের অঙ্গদল হিসেবে কাজ করে। আমরা জানি যে ছাত্ররা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রাম–গঞ্জ থেকে আসে। অধিকাংশ ছাত্র নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। অভিভাবকেরা ছেলেদের শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান, কিন্তু ছাত্ররা লেখাপড়া জ্ঞানসাধনাকে নির্বাসন দিয়ে অছাত্রসুলভ কর্মকাণ্ডে নিজেদের জড়িত রেখেছে, ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির পায়ে কুঠারাঘাত করছে। তারা জেনেও পান করছে অশিক্ষার হলাহল।

বাংলাদেশ যেখানে তরুণ ও যুবকদের সাহসিকতাপূর্ণ ও মানবিক কর্মকাণ্ডে দ্রুত সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করবে সেখানে তাদের চরিত্রদোষ ও হীনম্মন্যতাবোধ শিক্ষাঙ্গন তথা সমাজ জীবনকে বিষাক্ত ও কলুষিত করে তুলেছে। দেশের প্রশাসনের কাজে যারা জড়িত আছেন, তাঁরাও দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। সুতরাং কোনো প্রকার কুশাসন নয়, কোনো প্রকার দুর্নীতি নয়, মিথ্যাচার নয়, শুধু দেশের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে কুশাসন, দুর্নীতি ও মিথ্যাচার বন্ধ করতে হবে, নচেৎ ছাত্রসমাজ তথা দেশ অপমৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে না। শুধু মুখে নীতিকথা আওড়ানো নয়, সভাসমিতিতে বক্তৃতা ও ভাষণ দেওয়া নয়, প্রত্যেকটি মানুষ সততা ও নৈতিকতাকে দেশসেবার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে গ্রহণ করুন। আত্মত্যাগের লক্ষ্যে যদি আমাদের সবার কর্মকাণ্ড পরিচালিত না হয় তাহলে রাষ্ট্রের সামনে মহাবিপদ ঘনিয়ে আসবে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। জাপান, চীন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এসব দেশ দুর্নীতিমুক্ত বলেই আজ তাঁরা পৃথিবীর মানুষের নমস্য।

উপসংহার : ছাত্র ও যুবসম্প্রদায় আজ দেশের সব শিক্ষাঙ্গনে যেসব রাজনৈতিক ক্রিয়াকালাপের মধ্যে, পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছে তা থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যবস্থাদি গ্রহণ একান্তই বাঞ্ছনীয়। অত্যন্ত কঠোরভাবে এসব বন্ধ করে দেশ গঠনের মহামন্ত্রে তাদের উদ্‌বেলিত না করতে পারলে প্রকৃত কল্যাণ নেই।

১৩১. ছাত্র–রাজনীতি

অথবা, আমাদের রাজনীতি ও ছাত্রসমাজ

অথবা, ছাত্র রাজনীতির সুফল ও কুফল

ভূমিকা : মানুষের জীবনকে উপলব্ধি করলে দেখা যাবে এই সমগ্র জীবন কয়েকটি বিশেষ পর্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেকটি পর্যায়ে প্রতিটি মানুষের জীবনে সুনির্দিষ্ট কর্তব্য রয়েছে। সেই কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করতে পারলে তবেই একটি মার্জিত জীবনের অধিকারী হওয়া সম্ভব। আমাদের জীবন কর্মের ওপর ভিত্তি করে আবর্তিত হয়। যথাসময়ে যথার্থ কর্মই মানুষের পরবর্তী জীবনকে সুখী করে তোলে। জীবনের এই পর্যায়গুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পর্যায়টি হলো মানুষের ছাত্রজীবন। এই ছাত্রজীবনে মানুষ শেখে চিন্তা করতে, নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অনন্ত সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করে ভবিষ্যৎ

জীবনকে গড়ে তুলতে। তবে এসবের পাশাপাশি এও মনে রাখা দরকার যে, আমাদের সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে রাজনীতির একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। রাজনীতিহীন হয়ে আধুনিক পৃথিবী চলতে পারে না। আমাদের এই ছাত্রসমাজ হলো পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। তাই জীবনের হাতেখড়ির পর্যায় থেকে সেই ছাত্রসমাজ যদি রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে তাহলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ এর চাকার গতিও শ্লথ হয়ে যাবে। আবার ছাত্রজীবনে রাজনীতির অতিরিক্ত প্রভাব এই পর্যায়ের মূলমন্ত্র 'ছাত্রনং অধ্যয়নং তপ'–কেও ব্যাহত করে। তাই জীবনের এই পর্যায়ে রাজনীতি এবং ছাত্রনীতির মধ্যে একান্ত সুসাম্য বজায় রেখে চলাই বাঞ্ছনীয়।

ছাত্রজীবনের স্বরূপ : প্রবন্ধের সূচনাপর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ছাত্রজীবন হলো মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের এই পর্যায় হলো জীবনকে প্রকৃতরূপে গড়ে তোলার কারিগর। এই কারিগরের কার্যক্রম ব্যাহত হলে জীবন গড়ে উঠতে পারে না। ছাত্রজীবনের এই গুরুত্বের কথা মাথায় রেখেই প্রাচীনকালে ভারতীয় শাস্ত্রে ছাত্রজীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলা হয়েছিল। প্রাচীনকালে ছাত্রগণ চতুরাশ্রমের প্রথম এই পর্যায়ের নীতি অনুযায়ী গুরুগৃহে থেকে কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে বিদ্যা চর্চা করতেন। তবে কালের নিয়মে সমাজের সার্বিক চরিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানকালে প্রাচীনযুগের ব্রহ্মচর্যের মতো ছাত্রজীবন আর তেমন কঠোরতার বন্ধনে আবদ্ধ নেই। সময়ের সাথে সাথে বর্তমান ছাত্রজীবনে মুক্তচিন্তার বিকাশ এর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে ছাত্রজীবনের মূল চরিত্রও গিয়েছে আমূল বদলে। কিন্তু পাশাপাশি এও মনে রাখা দরকার, মানুষের ছাত্রজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য আজও পরিবর্তিত হয়নি। প্রাচীনকালের মতোই বর্তমান ছাত্রজীবনও জীবন গড়ার কারিগর রূপেই প্রতিভাত হয়। তাই সেই প্রকৃত উদ্দেশ্য যাতে সাধিত হয়, মূল লক্ষ্যে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকেও খেয়াল রাখা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

রাজনীতির স্বরূপ : রাজনীতি শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ করলে যা দাঁড়ায় তা হলো রাজার নীতি। তবে এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ 'রাজার নীতি' শব্দদ্বয়ের সংকীর্ণ বেড়াজালে আবদ্ধ নয়; বরং তা অত্যন্ত ব্যাপক। সমাজজীবনে রাজনীতি বলতে প্রকৃত অর্থে যা বোঝায় তা হলো কূটনীতি। বিশ্বজুড়ে বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের মতে, এই পৃথিবীতে রাজনীতিহীন হয়ে কোন কিছু অস্তিত্বশীল থাকতে পারে না। পরিবারের সামান্যতম খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে দেশ তথা আন্তর্জাতিক বিশ্বের নানা নীতিনির্ধারণ, সবকিছুর সাথে রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এই পৃথিবীতে রাজনীতি নিয়েও বিশেষ আলোচনা তথা অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে। সর্বোপরি, ছাত্রসমাজ আমাদের পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। সেজন্যে তাদেরকে সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে সচেতন করে গড়ে তুলতে পারলে তবেই একটি সুন্দর বিশ্ব তৈরি করা সম্ভব।

সমকালীন প্রেক্ষাপটে রাজনীতি ও ছাত্রজীবন : সময়ের সাথে সাথে ছাত্রজীবনের মূল চরিত্র যেমন বদলেছে তেমনি বদল ঘটেছে রাজনীতির সার্বিক চরিত্রেও। আধুনিক যুগে মানুষের জীবন থেকে নৈতিকতা ধীরে ধীরে লোপ পাওয়ার ফলে, রাজনীতিও নৈতিকতাহীন এবং অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে। নৈতিকতাহীন অজস্র মানুষ আঞ্চলিক, জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতির চালক হয়ে আজ সমগ্র রাজনৈতিক জগৎকে চালিত করছেন। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বর্তমানকালে রাজনীতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে দুর্নীতির পঙ্কিলশয্যায় পতিত হয়েছে। সেই পঙ্কিল শয্যায় পা ডুবিয়ে পদ্ম ফুলের বীজ রোপণ করতে আজ আর কেউই আগ্রহী নয়। তাই দেশের ভবিষ্যৎও আজ অন্ধকারের দিকে ধাবমান। শুধু তাই–ই নয়, বর্তমান যুগে পঙ্কিল রাজনীতির সীমাহীন দুর্নীতি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে সমাজের প্রতিটি অংশকে। ছাত্রসমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। ফলে এই দুর্নীতির গ্রাসে একটি ছাত্রজীবনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে ব্যাহত হওয়ার কারণে বিশ্বের জ্ঞানমূলক ভবিষ্যৎও সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। একদিকে দেশজুড়ে রাজনৈতিক সংকট অন্যদিকে সামাজিক ও নৈতিক সংকট; এই উভয় সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের দেশ তথা জাতির ভবিষ্যৎ।

ছাত্রজীবনে রাজনীতির প্রভাব : ছাত্রজীবনে রাজনীতির প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। রাজনীতির প্রভাবে প্রভাবিত আজ প্রায় সমগ্র বিশ্বের ছাত্রসমাজ। এর মধ্যে অন্যতম হলো তৃতীয় বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো। এসব দেশগুলোতে ছাত্রসমাজের ওপর রাজনীতির প্রভাব অতিমাত্রায় সুস্পষ্ট। বিশেষভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে যেখানে সকলের সংগঠন করার অধিকার স্বীকৃত, সেখানে ছাত্রসমাজ এই রাজনীতির দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেই স্কুল জীবন থেকে ছাত্রদের শিকার হতে হয়েছে শিক্ষকদের মধ্যেকার দলীয় রাজনীতির। বিদ্যালয় জীবনে এই ধরনের রাজনৈতিক প্রবণতা ছাত্রদের জীবনে গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে। অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় সরল মনের ছাত্র–ছাত্রীদের হৃদয়ে রাজনৈতিক জটিলতার বীজ বপন হলে সেই বীজ তাদের ভবিষ্যতের মহীরুহকে বেড়ে ওঠার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া ভারতবর্ষের কলেজ তথা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে রাজনৈতিক উত্থান–পতনের কথা সারা পৃথিবীতে সুবিদিত। এই সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্র–ছাত্রীরা তাদের ছাত্রজীবনের বাইরে ব্যক্তিগতভাবে দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সেই প্রভাব এসে পড়ে সমগ্র ছাত্রসমাজের মূলভিত্তির ওপর।

ছাত্রজীবনে রাজনীতির উপকারিতা : শুনতে খানিকটা আশ্চর্যজনক লাগলেও ছাত্রজীবনে রাজনীতির বেশ কয়েকটি উপকারী দিকও বর্তমান। আসলে এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটি জিনিসেরই ক্ষতিকর এবং উপকারী দুই দিকই রয়েছে। রাজনীতিও তার ব্যতিক্রম নয়। তেমন দিকগুলোর কথাই নিম্নে আলোচনা করা হলো :

- রাজনীতি ছাত্রসমাজকে তার সমকালীন আর্থসামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত করে তোলে।
- রাজনীতির মাধ্যমেই বাইরের পৃথিবীর সাথে ছাত্রসমাজের যোগসূত্র রচিত হয়।
- বহির্বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাপারে ছাত্রসমাজ সচেতন হয়ে ওঠে।
- সুচিন্তিত ও মার্জিত রাজনীতি ছাত্রসমাজের চরিত্র গঠনেও সাহায্য করতে পারে।
- তাছাড়া যেহেতু রাজনীতি এ পৃথিবীর অন্যতম সামাজিক চালিকাশক্তি, তাই ছাত্রসমাজ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে নিজেদেরকে সেই চালিকাশক্তির সাথে যুক্ত করতে পারে।
- রাজনীতিতে ছাত্রসমাজের অংশগ্রহণ তাদের মধ্যে থেকে ভবিষ্যতের নেতৃত্বকে তুলে আনে।
- জীবনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা ভবিষ্যতের নেতৃত্বকে বলিষ্ঠ এবং পরিণত করে।
- সর্বোপরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই ছাত্রসমাজ তাদের দাবিদাওয়া ও মতামতকে সমগ্র দেশ তথা বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করতে পারে।

আধুনিক বিশ্বে রাজনীতির অবক্ষয় : সুস্থ স্বাভাবিক রাজনীতির উপকারিতার কথা সমাজে বহুচর্চিত হলেও, বর্তমানকালে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সুস্থ স্বাভাবিক রাজনীতির উপযুক্ত নেই। আধুনিক বিশ্বে ক্রমেই ঘটে চলেছে মানুষের মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয়। সেই অবক্ষয়ের প্রভাব এসে পড়েছে রাজনীতিতেও। তাছাড়া বহুদলীয় রাজনীতি তথা ক্ষমতার প্রতি লালসার ব্যাপক বাড়বাড়ন্তের যুগে সমাজে নীতি–আদর্শের যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়েছে। দেশ তথা রাজ্যের উচ্চস্তরের নেতাদের ব্যাপক দল পরিবর্তন ছাত্রসমাজকে প্রকৃতপক্ষে বিভ্রান্তির মুখে ফেলে দিচ্ছে। এই বিভ্রান্তির বশবর্তী হয়ে ছাত্রসমাজও রাজনীতির দ্বারা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হচ্ছে। ফলে যত সময় এগোচ্ছে ততই রাজনীতি সমাজজীবনে তার উচ্চতর আসন থেকে দুর্নীতির পঙ্কশয্যায় নিমজ্জিত হচ্ছে।

ছাত্রজীবনে রাজনীতির ক্ষতিকর দিক : বর্তমান যুগে রাজনীতির ব্যাপক নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে ছাত্রসমাজের ওপর এর উপকারিতাগুলো গৌণ হয়ে ক্ষতিকর দিকগুলোই প্রকটরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। আধুনিক বিশ্বে রাজনীতির ব্যাপক নৈতিক অবক্ষয় ছাত্রসমাজের চরিত্রগঠনের বদলে তাদের ক্রমশই দুর্নীতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে সমাজের বহু সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অসৎ চরিত্রের অধিকারী হয়ে গড়ে উঠছে। শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতির ব্যাপক প্রবেশ সেখানকার শিক্ষার সুস্থ পরিবেশকে বিনষ্ট করছে। বহু ক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির ফলে বহু শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হচ্ছে। দলীয় রাজনীতির বলি হয়ে বহু ছাত্র–ছাত্রী বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। এরই মধ্যে ছাত্র–ছাত্রীদের একটি বড়ো অংশ চিরাচরিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর আস্থা হারিয়ে উগ্রপন্থাকে বেছে নিচ্ছে। যার সুযোগ নিচ্ছে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন অসাধু মানুষ ও সংস্থা। তারা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ছাত্রসমাজকে আরও বেশি করে উগ্রপন্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ভারতবর্ষের মতো দেশে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

সমাধান সূত্র : বর্তমানকালে ছাত্রজীবন তথা শিক্ষাঙ্গনে অবক্ষয়িত রাজনীতির প্রবেশ যে অসুস্থ পরিবেশের সৃষ্টি করছে অবিলম্বে তার প্রতিকার আবশ্যিক। সেই প্রতিকার হেতু কয়েকটি সমাধান সূত্রের কথা আলোচনা করা হলো :

- ছাত্রসমাজকে আরও বেশি নৈতিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে।
- বিদ্যালয় স্তর থেকে রাজনীতিকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করতে হবে।
- শিক্ষকদের নিজেদের রাজনৈতিক প্রবণতা সম্পর্কে আরও অনেক বেশি সচেতন হতে হবে।
- উচ্চশিক্ষার অঙ্গন থেকে যথাসম্ভব দলীয় রাজনীতিকে অপসারিত করতে হবে।
- সুস্থ রাজনীতির প্রসারের উদ্যোগ নিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমের দ্বারা তাদের সচেতন করে তোলার দিকেও জোর দিতে হবে।

উপসংহার : রাজনীতি এবং ছাত্রসমাজ দুইই আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য এবং অন্যতম প্রধান অঙ্গ। জীবনের একপর্যায়ে গিয়ে ভাবলে এই দুই অঙ্গ পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাদের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ একপ্রকার অসম্ভব এবং তার প্রয়োজনও নেই। সেজন্য শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির অপসারণের থেকে আমাদের বেশি জোর দিতে হবে মানুষের মূল্যবোধ গড়ে তোলার দিকে। নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে উঠলে রাজনীতি যখন পরিমার্জিত হবে তখন নিজে থেকেই ছাত্রজীবনে রাজনীতির ক্ষতিকর দিকগুলো অপসারিত হবে। ছাত্রসমাজ তখন বিদ্যাচর্চা, নৈতিক শিক্ষা তথা রাজনৈতিক সচেতনতা দ্বারা নিজেদের বলিষ্ঠ চরিত্র গড়ে তুলে ভবিষ্যতে দেশ তথা পৃথিবীকে সুযোগ্য নেতৃত্বদানের উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

সাম্প্রতিক

১৩২. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

সাবাশ বাংলাদেশ,
এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয় 7

ভূমিকা : বিদ্যুৎ আবিষ্কার মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের এ যুগে বিদ্যুৎ ছাড়া কিছু কল্পনাই করা যায় না। বিদ্যুতের কারণেই আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম, আরাম–আয়েশ, বিনোদন এত সহজ হয়েছে। সর্বোপরি স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য বিদ্যুৎ আমাদের নিত্যসঙ্গী। বর্ধিত জনসংখ্যা ও অত্যাধুনিক বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কী : পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্লান্টের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াজাত ইউরেনিয়াম অথবা থোরিয়াম–এর নিউক্লিয়াস ভেঙে দুটি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে এবং দুটি অথবা তিনটি নিউট্রন নিঃসৃত হয়। এ ফিউশান পদ্ধতির মাধ্যমে চেইন রিঅ্যাকশন সৃষ্টি করা যায়। ফলে এ শক্তি বিরাট তাপের সৃষ্টি করে যাকে পরবর্তী সময়ে বিদ্যুতে পরিণত করা যায়। এ বিদ্যুৎকেই পারমাণবিক বিদ্যুৎ বলে।

অবস্থান : রাজধানী ঢাকা থেকে ২০০ কিলোমিটার উত্তর–পশ্চিমে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার অন্তর্গত পাকশী ইউনিয়নের রূপপুর গ্রামে নির্মিত হচ্ছে 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র'। এ বিদ্যুৎকেন্দ্রটি পদ্মা নদীর ওপরে নির্মিত হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও লালন শাহ সেতুর পাশেই নদীতীরে অবস্থিত।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : ১৯৭২ সালেই বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন 'আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা'–র সদস্য হয়। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনকে পরবর্তী সময়ে আণবিক শক্তি সংস্থা বহুভাবে বহুমাত্রিক সাহায্য করে যাচ্ছে। পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান, কোরিয়া, চীন, তুরস্ক এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি করেছে। আমাদের দেশের পরমাণুবিজ্ঞানীরা ১৯৬১ সালে পাকিস্তান আমলে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব করেন। তখন তৎকালীন সরকার ২৫৩ দশমিক ৯০ একর জমি বরাদ্দ দেয়। ওই সরকার বেশকিছু পর্যালোচনার ভিত্তিতে ১৯৬৩ সালে পাবনার রূপপুরে ৭০ মেগাওয়াটের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের অনুমোদন দেয়। ১৯৬৪ এবং ১৯৬৬ সালে বিদ্যুৎকেন্দ্র বিষয়ে আলোচনা হয় কানাডিয়ান সরকারের সাথে যা পরবর্তী কয়েক বছর সুইডিশ সরকার এবং নরওয়েজিয়ান সরকারের সাথেও আলোচনা চলতে থাকে, কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তব কোনো অগ্রগতি হয়নি। ১৯৬৪ সালে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য সকল যন্ত্রপাতি বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে জাহাজে করে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেই জাহাজ পাকিস্তান (তৎকালীন পশ্চিম–পাকিস্তান) তাদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে চট্টগ্রাম বন্দরে না এনে করাচিতে নিয়ে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিষয়ে আলোচনা হলেও কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ ও রাশিয়া পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষর : পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার রাশিয়ার সাথে ২০০৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি একটি সমঝোতা স্মারক বা MOU স্বাক্ষর করে। তা বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য বর্তমান সরকারের উদ্যোগে ২০১০ সালের ২১শে মে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ও রাশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারবিষয়ক একটি Framework চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মস্কোতে। যার ফলশ্রুতিতে ২৫শে ডিসেম্বর ২০১৫ সালে পাবনার রূপপুরে দুই হাজার চারশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করার জন্য রাশিয়ার এটমস্ট্রয় এক্সপোর্ট নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ সরকার। চুক্তি বাস্তবায়নের সময়কাল ধরা হয়েছে সাত বছর। বিদ্যুৎকেন্দ্রটির ২০২৩ সালে প্রথম ইউনিট এবং ২০২৪ সালের অক্টোবরে দ্বিতীয় ইউনিটের উৎপাদনে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎকেন্দ্রটির মেয়াদকাল হবে ষাট বছর।

পারমাণবিক জ্বালানির সম্ভাবনা : পারমাণবিক জ্বালানির মাধ্যমে কার্বন নির্গমন কম হয় বলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় না। পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। আর এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে আলোকিত হবে বাংলাদেশ এবং বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে গ্রাম থেকে গ্রামে।

পারমাণবিক জ্বালানির অসুবিধা : একটি পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন চুল্লি স্থাপনের পূর্বে ওই অঞ্চলের পরিবেশ, ভূকম্পন প্রবণতা, হাইড্রোলজি, আবহাওয়াবিদ্যা, জনসংখ্যা এবং পরিবহণ ও সামরিক স্থাপনাসমূহ নিয়ে গভীরভাবে বিচার–বিশ্লেষণ করতে হয়। এ ছাড়াও বিস্ফোরণ, অগ্নিকান্ড, বিকিরণ ও দুর্ঘটনার কারণে মহাবিপর্যয় ঘটতে পারে। এ বিদ্যুৎকেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণে আন্তর্জাতিকমানের নিউক্লিয়ার বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুর্ঘটনার ফলে ক্যানসারের সংক্রমণ, শিশুদের শারীরিক প্রতিবন্ধিতা, জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়াও জীবজগৎ ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতিসাধন হয়। আর এটি নির্মাণে প্রচুর অর্থ খরচ হয়।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন : পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিশ্বের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১৬% আসে। বিশ্বের ৩১টি দেশে এই বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স। যুক্তরাষ্ট্র মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ২০ শতাংশ এবং ফ্রান্স ৭৮ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, চীন, পাকিস্তানেও এ বিদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে।

উপসংহার : দ্রুত জনসংখ্যা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ফলে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলমান এ সংকট দূর করার জন্য বাংলাদেশকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে হবে। তাই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে নতুন নতুন চুক্তি স্বাক্ষর ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩৩. এভারেস্টে বাংলাদেশ

ভূমিকা :

"বল বীর—
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি, নত–শির ওই শিখর হিমাদ্রির!"

সেই হিমাদ্রি–শিখরে আজ বীরের উত্তরসূরিরা উড়িয়েছে বাংলার লাল–সবুজের পতাকা। মুসা ইবাহিম, মোহাম্মদ আবদুল মুহিত, নিশাত মজুমদার এবং ওয়াসফিয়া নাজরীন বাংলাদেশের জন্য বয়ে এনেছেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট জয়ের আনন্দ। সেই আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার আকাশে, বাতাসে। ই–থারে ভেসে পৌঁছে গেছে এদেশের ষোলো কোটি মানুষের কাছে। তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে উল্লাসে মেতে উঠেছে পুরো দেশ। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের বহু দেশে ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালির এভারেস্ট বিজয়ের এ আনন্দ।

এভারেস্ট অভিযাত্রায় কৌতূহলী মানুষের প্রচেষ্টা : পৃথিবীর বুকে বিস্ময়, রহস্য আর ভয়ংকর সুন্দরের হাতছানি ও আকাশছোঁয়ার স্পর্ধা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যেসব পবতশৃঙ্গ, সেগুলোর মধ্যে রাজাধিরাজ হচ্ছে হিমালয়ের এভারেস্ট। শ্বেতশুভ্র বরফে ঢাকা আর রহস্যের মায়াজালে বোনা এ পর্বতশৃঙ্গ বহু যুগ ধরে মৃত্যুময় হাতছানি দিয়ে ডেকেছে মানুষকে। আর মানুষ অজেয়, দুর্ভেদ্য প্রকৃতির সেই রহস্যকে জয় করার স্বপ্নে নেমেছে অভিযাত্রায়। এ এভারেস্ট অভিযাত্রার রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৮,৮৪৮ মিটার। এ শৃঙ্গের গুরুত্ব প্রথম ধরা পড়ে ১৮৫২ সালে। বাঙালি সার্ভেয়ার রাধানাথ শিকদার প্রথম অঙ্ক কষে দেখান যে, এভারেস্টই পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ। পরে সেই সময়কার ভারতবর্ষের ইংরেজ সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার জর্জ এভারেস্টের নামানুসারে এর নাম রাখা হয় এভারেস্ট। তখন থেকে এভারেস্ট অভিযাত্রায় কৌতূহলী মানুষের প্রচেষ্টা অব্যাহত। অসংখ্য মানুষের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এভারেস্ট খুব সহজে লুণ্ঠিত হতে দেয়নি নিজের গৌরব, বহুকাল ধরে পরাজয় মানেনি মাউন্ট এভারেস্ট। কিন্তু একদিন মানুষের অদম্য প্রচেষ্টার কাছে হার মানতে বাধ্য হয় পৃথিবীর এ সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। ১৯৫৩ সালের ২৯শে মে তেনজিং নোরগে ও এডমন্ড হিলারি যখন এভারেস্টের চূড়ায় নিজেদের পদচিহ্ন এঁকে দিলেন তখন এভারেস্টের গর্বকে চূর্ণ করে রচিত হলো মানুষের গর্বিত ইতিহাস। এর পরে বহু পর্বতারোহী মৃত্যুকে উপেক্ষা করে এভারেস্ট জয়ে অংশ নিয়েছেন। কেউ পেরেছেন, কেউবা পারেননি, আবার কেউ হারিয়েছেন তাঁদের জীবন। এতকিছু সত্ত্বেও ২০০৮ সালের ৫ই আগস্ট পর্যন্ত পাওয়া এক বেসরকারি হিসাবমতে, ৬৪টি দেশের তিন হাজার ৬৮১ জন পর্বতারোহী এভারেস্ট জয় করেছেন। সংখ্যাটা এত দিনে আরও বেড়ে গেছে। আর এভারেস্ট জয়ীদের এ তালিকায় একমাত্র বাংলাদেশি সদস্য লালমনিরহাটের ৩০ বছর বয়সি মুসা ইব্রাহীম।

প্রথম এভারেস্ট বিজয় : শ্বেতশুভ্র বরফে ঢাকা আর রহস্যের মায়াজালে ঘেরা এই অপূর্ব পর্বতশৃঙ্গ বহু যুগ ধরে মৃত্যুময় হাতছানি দিয়ে ডেকেছে মানুষকে। হিমালয়ের চূড়ায় পা রাখার জন্য ১৮২৮ সাল থেকে সোয়া'শ বছর ধরে চেষ্টা করেছে

মানুষ। কিন্তু বারবারই ব্যর্থ হয়েছে। কারণ দুরারোহ দুর্গম হিমালয় সারা বছর সাদা বরফে ঢাকা থাকে। আর এর প্রতিটি গর্তে আছে মৃত্যুর ফাঁদ। তবুও মানুষ হাল ছাড়েনি, চেষ্টা চালিয়ে গেছে। অবশেষে ১৯৫৩ সালে এক অভিযাত্রী দল মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এগিয়ে যান এভারেস্ট অভিযানে। ১৯৫৩ সালে প্রথম ২৪ ফুট উঁচু তাঁবু গাড়লেন জন হান্টের অভিযাত্রী দল। ২৮শে মে ২৭ হাজার ফুট উচ্চতায় অষ্টম তাঁবু ফেলা হলো। সেখানে প্রচন্ড তুষারঝড়, অসহনীয় শীত শুরু হলো। ২৯শে মে সকালে তাপমাত্রা নেমে আসে শূন্যেরও ১৬ ডিগ্রি নিচে। সেই প্রতিকূল আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে তেনজিং নোরগে এবং এডমন্ড হিলারি উঠে গেলেন ২৮,০০০ ফুট উচ্চতায়। তারপর পাহাড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করার দুঃসাহসী, তেজি তেনজিং নোরগ তরতর করে উঠে যান বাকি পথ। এভারেস্টের বুকে প্রথম পা রেখে, ওপর থেকে রশি নামিয়ে টেনে তুললেন হিলারিকে। তারপর তারা দুজন মিলে এভারেস্টের চূড়ায় ওড়ালেন নেপাল, ভারত, ব্রিটিশ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা। এভাবে শেষ হয় এভারেস্টের প্রথম বিজয় অভিযান।

বাংলাদেশের এভারেস্ট বিজয় : "হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ"— সুকান্তের সেই বাংলাদেশও এভারেস্ট বিজয়ের গৌরব অর্জন করেছে। প্রযুক্তিগত দিক থেকে অনগ্রসর বাংলাদেশকে আধুনিক প্রশিক্ষণের জন্যই দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে এভারেস্টের বুকে লাল–সবুজের পতাকা উত্তোলনের জন্য। প্রথম এভারেস্ট জয়ের সাতান্ন বছর পর ২০১০ সালে বাংলাদেশের পতাকা উড়ে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্টে। বাংলাদেশের জন্য এ গৌরব এনে দেয় মুসা ইব্রাহিম। মুসা ইব্রাহিমের পথ ধরে মোহাম্মদ আবদুল মুহিত, নিশাত মজুমদার এবং ওয়াসফিয়া নাজরীন সগৌরবে বাংলার পতাকা তুলে ধরেন হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়ায়। তাদের অদম্য চেষ্টায় বাংলাদেশ আজ সম্মানিত।

মুসা ইব্রাহিম : মুসা ইব্রাহিম প্রথম বাংলাদেশি এভারেস্ট বিজয়ী। মুসা ইব্রাহিমের জন্ম ১৯৭৯ সালে লালমনিরহাটের মোগলহাটে। তার বাবা আনসার আলী এবং মা বিলকিস বেগম। মুসা ইব্রাহিম ঠাকুরগাঁওয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইসস্টিটিউট থেকে মাস্টার্স করেন। তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি পেশায় সাংবাদিক। ২০০২ সালে অন্নপূর্ণ ট্রেইলে অভিযানের মধ্য দিয়ে তিনি স্বপ্নপূরণের দিকে অগ্রসর হন। সেবার তিনি ১২,৪৬৪ ফুট উচ্চতায় উঠেছিলেন। এরপর তিনি একটার পর একটা পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ ও অভিযানে অংশ নিতে থাকেন। তিনি মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে দুই দফায় ৬ বছরের দুটো পেশাদারি পর্বতারোহণ নেন। প্রশিক্ষণ ও পর্বতারোহণের ধারাবাহিক জয়ের শেষ পর্যায়ে ২০১০ সালের ২৩শে মে ভোর ৫টা ৫৫ মিনিটে এভারেস্টের শীষে লাল–সবুজের পতাকা ওড়ান তিনি। এভারেস্ট জয় ছিল মুসা ইব্রাহিমের বহুদিনের স্বপ্ন। সাতান্ন বছর পরে বাংলাদেশের মুসা ইব্রাহিম পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পা রাখলেন। এভারেস্ট জয় করে মুসা বুঝিয়ে দিলেন, বাঙালি এক সাহসী জাতি, বীরের জাতি, দুর্জয়কে জয় করা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতি।

মোহাম্মদ আবদুল মুহিত : মোহাম্মদ আবদুল মুহিত ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার গঙ্গাপুরে ১৯৭০ সালের ৪ই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা মনোয়ার হোসেন মিয়া ও মা আনোয়ারা বেগম। পরিবারে ৭ ভাইবোনের মধ্যে মুহিত বড়ো ছেলে। তিনি পুরান ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে এসএসসি (১৯৮৫), নটর ডেম কলেজ থেকে এইচএসসি (১৯৮৭) এবং ঢাকা সিটি কলেজ থেকে বিকম (১৯৮৯) পাশ করেন। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শেষে মুহিত ২০১০ সালেই মুসা ইব্রাহিমের পাশাপাশি এভারেস্ট জয়ের জন্য যান, কিন্তু বিরূপ আবহাওয়ার কারণে তিনি সেবার ব্যর্থ হন। অবশেষে বাংলা মাউন্টেনিয়ারিং এ্যান্ড ট্রেকিং ক্লাবের একজন সদস্য হিসেবে ২০১১ সালের মার্চের শেষ সপ্তাহে এভারেস্ট জয়ের লক্ষ্যে আবার যাত্রা করেন। এ যাত্রা তিনি সফল হন এবং দ্বিতীয় এভারেস্ট বিজয়ী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

নিশাত মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম নারী হিসেবে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট জয় করেন নিশাত মজুমদার। তার জন্ম ১৯৮১ সালে লক্ষ্মীপুরে। তার বাবার নাম আবদুল মান্নান মজুমদার ও মা আশুরা মজুমদার। চার সন্তানের পরিবারে নিশাত মজুমদার দ্বিতীয়। নিশাত ১৯৯৭ সালে ফার্মগেটের বটমূলী হোম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, ১৯৯৯ সালে শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং ঢাকা সিটি কলেজ থেকে হিসাববিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ২০০৩ সালে এভারেস্ট বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তিতে বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ চূড়া কেওক্রাডং জয় করেন। এ জয়ই তাকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয়ের নেশায় আচ্ছন্ন করে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালের ১৯শে মে শনিবার সকাল নয়টা ৩০ মিনিটে নিশাত মজুমদার এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম নারী এভারেস্ট এবং বিজয়ী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন নিশাত মজুমদার।

ওয়াসফিয়া নাজরীন : ওয়াসফিয়া নাজরীন বাংলাদেশের দ্বিতীয় নারী এভারেস্ট বিজয়ী। প্রথম বিজয়ী নিশাত মজুমদারের এক সপ্তাহ পরে তিনি এভারেস্টের চূড়ায় ওঠেন। ওয়াসফিয়ার জন্ম ২৭শে অক্টোবর, ১৯৮২ সালে ঢাকায় স্কলাসটিকা স্কুল থেকে 'ও' এবং 'এ' লেভেল সম্পন্ন করে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় এগনেস স্কট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। সেখানে সামাজিক

মনোবিজ্ঞান ও স্টুডিও আর্ট বিষয়ে পড়াশোনা করার পর স্কটল্যান্ডেও কিছুদিন পড়াশোনা করেন। ২০১২ সালের ২৬শে মে শনিবার সকাল পৌনে ৭টায় বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্টে পা রাখেন ওয়াসফিয়া। তিনিই সবচেয়ে কম বয়সি বাংলাদেশি এভারেস্ট বিজয়ী।

উপসংহার : "হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ"— সুকান্তের সেই বাংলাদেশ ছিল অবিভক্ত বাংলাদেশ। কিন্তু আজ স্বাধীন বাংলাদেশ লাল–সবুজের পতাকা নিয়ে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান নিয়েছে। এই অবস্থানের পেছনে প্রথম অবদান মুসা ইব্রাহিমের। পরে পর্যায়ক্রমে মোহাম্মদ আবদুল মুহিত, নিশাত মজুমদার এবং ওয়াসফিয়া নাজরীনের। তারা বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে পর্বত আরোহণের ক্ষেত্রে মর্যাদার আসনে স্থান করে দিয়েছেন। অন্যদিকে পুরুষের পাশাপাশি সমানসংখ্যক নারী বিজয়ীরা, নারীদের পুরুষের সমমর্যাদায় অভিসিক্ত করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে বাংলাদেশি নারী–পুরুষের এভারেস্ট বিজয়ের অভিযান এবং সফলতা অর্জন নতুন প্রজন্মের জন্য কঠিন বাধা অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছানোর বিশাল অনুপ্রেরণা।

১৩৪. রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট ও বাংলাদেশ

অথবা, রোহিঙ্গা সমস্যা ও সমাধানের উপায় *[ঢা. বো. '২৫; য. বো. '১৯]*

ভূমিকা

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সমস্যা সাম্প্রতিক সময়ে স্মরণকালের সবচেয়ে বড়ো সংকট। মিয়ানমারে সরকারি বাহিনীর নিপীড়নের শিকার হয়ে প্রাণ বাঁচাতে ছুটে আসা রোহিঙ্গাদের মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ আশ্রয় দেয়। বর্তমানে এ দেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা দশ লক্ষ ছাড়িয়েছে। প্রতিদিনই স্রোতের মতো বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এই অসহায় মানুষগুলো। মানবিক বিপর্যয়ের শিকার এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় ও পর্যাপ্ত সুযোগ–সুবিধা দিতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। আর এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে শীঘ্রই ফেরত পাঠানো সম্ভব না হলে বাংলাদেশ পড়তে পারে এক গভীর সংকটে।

রোহিঙ্গাদের ইতিহাস : রোহিঙ্গা মায়ানমারের একটি মুসলিম সংখ্যালঘু জাতি, যাদেরকে অনেক মায়ানমারি বৌদ্ধরা বাংলাদেশের অবৈধ অভিবাসী হিসাবে হিসেবে গণ্য করে। রোহিঙ্গারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মায়ানমারে বসবাস করে আসছে এবং বাংলাদেশ সরকার মায়ানমার শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য বলছে। মায়ানমারে তাদের নাগরিকত্ব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং তাদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে অত্যাচারিত সংখ্যালঘু হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। রোহিঙ্গারা মায়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী এবং চরমপন্থি বৌদ্ধদের হাতে নির্যাতিত। মায়ানমার রোহিঙ্গাদের অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। ১৯৭০ সাল থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশে উদ্বাস্তু হয়ে বাস করতে শুরু করে। ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী আনুমানিক ৩,০০,০০০– ৫,০০,০০০–এর মতো শরণার্থী বাংলাদেশে অবস্থান করছে। অধিকাংশ শরণার্থী টেকনাফ–কক্সবাজার হাইওয়ে বরাবর অবস্থিত নাফ নদীর সমান্তরালে বাস করে, যা বাংলাদেশ ও মায়ানমার সীমান্তে অবস্থিত। বেশিরভাগ শরণার্থীরা কক্সবাজার বা এর কাছাকাছি অবস্থিত, পর্যটনশিল্পের ওপর নির্ভরশীল একটি উপকূলবর্তী এলাকায় বাস করে।

বাংলাদেশ মনে করে, শরণার্থীদের দ্বারা এলাকাটির পর্যটন প্রত্যাশা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শরণার্থীদের অপরাধ এবং কক্সবাজারে ২০১২ রামু সহিংসতার জন্যও দোষারূপ করা হয়। বাংলাদেশ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের এদেশে অনাগমনমুখী নীতি তৈরির অনুসরণ করছে। অধিকাংশ শরণার্থী অনিবন্ধিত রয়ে গেছে, শুধুমাত্র ৩২ হাজার শরণার্থী নিজেদের ইউএনএইচসিআর এবং বাংলাদেশ সরকারের সাথে নিবন্ধন করেছে। আনুমানিক ২,০০,০০০–এর অধিক শরণার্থী অনিবন্ধিত অবস্থায় বাংলাদেশে বসবাস করছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্ট, ডিসেম্বর ২০১৬–এর একটি প্রতিবেদনে বলেছে মায়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী ধর্ষণ, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং রোহিঙ্গাদের বাসভবন দখলে তত্ত্বাবধান করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শরণার্থীরা আদিবাসী জনগোষ্ঠী সরিয়ে দিচ্ছে। এছাড়াও তাদের ইয়াবা আমদানি করার জন্য নিন্দা করা হচ্ছে।

রোহিঙ্গা সমস্যা উদ্ভবের কারণ : ২০১৭ সালের ২৫শে আগস্ট কথিত সন্ত্রাসী হামলার জবাবে রাখাইনে ভয়ংকর পোড়ামাটি নীতিতে অভিযান চালায় মিয়ানমার সেনাবাহিনী। 'অপারেশন ক্লিয়ারেন্স' নামক এ অভিযানে রাখাইন সেনা ও মগদের হাতে হাজারো রোহিঙ্গা মুসলিম নিহত হয়। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ৪৭১টি গ্রামের মধ্যে ২১৪টি গ্রাম। উদ্ভূত এ রোহিঙ্গা সমস্যার পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ ও বহু অতীত ইতিহাস। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

১. **ব্রিটিশ সমস্যা উদ্ভবের কারণ :** ১৭৮৪ সালে ব্রিটিশরা আরাকান রাজ্য দখলে নিলে বাংলা ও ভারতের অনেক রাজ্যের সাথে বার্মার (বর্তমান মিয়ানমার) যোগাযোগ বেড়ে যায়। ব্রিটিশদের কাছে রোহিঙ্গা মুসলমানরা বেশি গুরুত্ব পায় এবং বিভিন্ন সরকারি পদে আসীন হয়। এ বিষয়টি রাখাইনদের মনে অসন্তোষের জন্ম নেয়।

২. **ব্রিটিশদের মিয়ানমার দখলে সহায়তা :** ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশরা মিয়ানমার দখলে নেয়। আর এতে রোহিঙ্গারা তাদের সাহায্য করে। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাশা ছিল মুনলমানদের জন্য আলাদা রাজ্য গঠন করা। এ বিষয়টি রাখাইনরা ভালোভাবে নেয়নি।

৩. **পূর্ব–পাকিস্তানের অংশ হওয়ার প্রচেষ্টা :** ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের সময় রোহিঙ্গারা তাদের অঞ্চলকে পূর্ব–পাকিস্তানের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। তাদের এ চেষ্টাকে মিয়ানমারের ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে চিহ্নিত করে। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর বৈষম্য ও নিপীড়নের এটিও একটি কারণ।

৪. **নে উইনের ক্ষমতা দখল :** ১৯৬২ সালে সামরিক শাসক নে উইন মিয়ানমারের ক্ষমতা দখল করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি রোহিঙ্গা মুসলমানদের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। রোহিঙ্গাদের পূর্ব স্বীকৃত অধিকার ও সুবিধাসমূহ বানচাল করে দেন। তিনি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বাতিল করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রোহিঙ্গাদের কথা বলার সুযোগটুকু নষ্ট হয়।

৫. **১৯৪২ সালে রোহিঙ্গা হত্যা :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে ১৯৪২ সালে জাপানিরা ব্রিটিশদের কাছ থেকে বার্মা দখলে নেয়। রাখাইনরা এ সময় ব্রিটিশদের কাছ থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত রোহিঙ্গাদের আক্রমণ করে। এভাবে তারা প্রায় পাঁচ হাজার রোহিঙ্গা মুসলমানকে হত্যা করে।

৬. **রোহিঙ্গাদের পালটা প্রতিশোধ :** এই হত্যায় পালটা প্রতিশোধ হিসেবে উত্তর রাখাইন অঞ্চলে প্রায় ২০ হাজার রাখাইনকে হত্যা করে রোহিঙ্গারা। সংঘাত তীব্র হলে জাপানিদের সহায়তায় রাখাইনরা রোহিঙ্গাদের কোণঠাসা করে ফেলে। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত মিয়ানমার জাপানিদের দখলে থাকে। এ তিন বছরে কমপক্ষে ২০ হাজার রোহিঙ্গা মিয়ানমার ছেড়ে বাংলায় চলে আসে।

রোহিঙ্গাদের প্রতি নানা বৈষম্য : ১৯৬২ সালে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করার পর ধীরে ধীরে রোহিঙ্গাদের প্রতি রাষ্ট্রীয় বৈষম্য বাড়তে থাকে। এসব বৈষম্যের মধ্যে রয়েছে—

১. **১৯৮২ সালে নাগরিকত্ব আইন পাশ :** ১৫ই অক্টোবর ১৯৮২ সালে মিয়ানমারে নাগরিকত্ব আইন পাশ হয়। এই আইন অনুসারে মিয়ানমারে পূর্ণাঙ্গ, সহযোগী ও অভিবাসী—এই তিন ধরনের নাগরিকত্বের বিধান রাখা হয়। এই আইনে রোহিঙ্গাদের নির্দিষ্ট একটি গোত্র হিসেবে অস্বীকার করা হয় এবং তাদের পূর্ব বাংলা থেকে আসা অবৈধ জনগোষ্ঠী হিসেবে দাবি করা হয়।

২. **নাগরিক কার্ড থেকে বঞ্চিত করা :** ১৯৮৯ সাল থেকে মিয়ানমার তিন ধরনের নাগরিক কার্ডের প্রচলন করে। পূর্ণাঙ্গ নাগরিকদের জন্য গোলাপি, সহযোগী নাগরিকদের জন্য নীল এবং অভিবাসী নাগরিকদের জন্য সবুজ রঙের কার্ড দেওয়া হয়। চাকরি, ব্যাবসাবাণিজ্য, পড়াশোনা, চিকিৎসাসেবাসহ সব ধরনের কাজকর্মে এই কার্ড ব্যবহার করা হয়। ফলে রোহিঙ্গাদের পক্ষে মিয়ানমারে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে।

৩. **নির্দিষ্ট গ্রামে বন্দি :** মিয়ানমারের সামরিকজান্তা রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে না। আর তাই রোহিঙ্গারা নিজ গ্রামেই বন্দি মানুষের মতো জীবনযাপন করে। গ্রামের বাইরে যেতে হলে তাদের নাসাকাকে ঘুস দিয়ে ট্রাভেল পাশ নিতে হয়।

৪. **বিয়েতে বাধা :** ১৯৯০ সালে আরাকান রাজ্যে একটি স্থানীয় আইন জারি করা হয়। এ আইন অনুযায়ী এ অঞ্চলে বাস করা রোহিঙ্গাদের বিয়ের পূর্বে সরকারি অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়।

৫. **জন্মনিয়ন্ত্রণ :** দুইটির অধিক সন্তান নেবে না—এমন মুচলেকা দিতে হয় নবদম্পতিকে।

৬. **চিকিৎসা ও শিক্ষায় সীমিত অধিকার :** রোহিঙ্গাদের জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো অত্যন্ত অপ্রতুল ও নিম্নমানের। স্বাস্থ্যসেবার জন্য হাসপাতালগুলোতে রোহিঙ্গাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা চালু থাকলেও সেখানে নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা সমস্যা : মিয়ানমারে ধারাবাহিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়ে ১৯৭৮ সাল থেকে রোহিঙ্গারা প্রতিবেশী বাংলাদেশে আসা শুরু করে। ২৫শে আগস্ট ২০১৭ থেকে মিয়ানমার সেনাবাহিনী দেশটির রাখাইন রাজ্যকে রোহিঙ্গামুক্ত করতে যে সামরিক অভিযান শুরু করে তার নামকরণ করা হয় 'অপারেশন ক্লিয়ারেন্স'। এ অভিযানে

মিয়ানমার সেনাবাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের কুখ্যাত যুদ্ধকৌশল 'Three All Policy' অনুসরণ করে। এ কৌশলের মূলকথা সবাইকে হত্যা করো, সবকিছু পুড়িয়ে দাও, সবকিছু লুট করো। এর পর থেকে ঢলের মতো এ দেশে আসতে থাকে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা। বর্তমানে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা ১০ লক্ষাধিক। দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে মিয়ানমারের বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হলে নানা সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন :

১. **জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাবে :** বাংলাদেশ এমনিতেই জনবহুল দেশ। তার ওপর এই বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গার এ দেশে আগমনে স্বাভাবিকভাবেই দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ওপর চাপ বৃদ্ধি পাবে।

২. **অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি :** এই বিপুলসংখ্যক মানুষের চাহিদা পূরণ করার মতো আর্থিক সামর্থ্য আমাদের নেই। এ দেশে তাদের অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হলে অর্থনৈতিক সংকটও মারাত্মক আকার ধারণ করবে।

৩. **দেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে :** রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এ দেশে তাদের সার্বিক চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে নানা ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপেও যুক্ত হতে পারে। ইতোমধ্যেই তারা এ দেশের স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে নানা নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে।

৪. **মাদক ও চোরাচালানের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে :** পত্রপত্রিকায় প্রায়ই রোহিঙ্গাদের মাদক চোরাচালানের অপরাধে গ্রেফতার হতে দেখা যাচ্ছে। এ বিষয়টি খুবই উদ্‌বেগজনক। এই বিপুলসংখ্যক মানুষ যদি এই ভয়ংকর পেশায় জড়িয়ে পড়ে তাহলে আমাদের এই সোনার বাংলার সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করবে, সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে।

৫. **সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হবে :** এই বিপুলসংখ্যক মানুষের দেখাশোনার জন্য যে জনবল দরকার বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তা কষ্টকর। ফলে তারা সহজেই বিভিন্ন আইন পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে পারে। আর এর ফলে এ দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে।

উপসংহার : রোহিঙ্গা সমস্যার সাথে বাংলাদেশ কোনোভাবেই যুক্ত হতে পারে না। ইতোমধ্যে যে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা এ দেশে অনুপ্রবেশ করেছে তাদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে বাংলাদেশকে মিয়ানমারের সাথে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করতে হবে এবং নিজ জন্মভূমিতে যাতে নাগরিক হিসেবে রোহিঙ্গারা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়, সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনৈতিক উদ্যোগ নিতে হবে।

ভ্রমণ

১৩৫. কুয়াকাটা সৈকতে একদিন *[ব. বো. '০৮]*
অথবা, সমুদ্রসৈকতে একদিন *[ঢা. বো. '১১; রা. বো. '০৯]*
অথবা, সৈকত ভ্রমণ : কুয়াকাটা

ভূমিকা

অনেকেরই সখ ভ্রমণ করা। বিচিত্র ধরনের অভিজ্ঞতাও লাভ করা যায় ভ্রমণের মাধ্যমে। যুগে যুগে আমাদের দেশেও পর্যটক এসেছেন। মুগ্ধ হয়েছেন নানা স্থান ভ্রমণ করে। অথচ তার অনেক কিছুই আমাদের দেখা হয়নি। কবি যথার্থই বলেছেন, 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া।' তাই নিজের সখ পূরণ করতেই কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত ভ্রমণে রওনা হলাম।

কুয়াকাটার অবস্থান : বরিশাল বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি বিভাগ। বরিশাল বিভাগের একটি অন্যতম জেলা পটুয়াখালী। এ জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে কুয়াকাটা পর্যটন অঞ্চল। সম্প্রতি এখানে পর্যটনের হলিডে হোমস নির্মাণ করা হয়েছে।

কুয়াকাটার বিবরণ : কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত বাংলাদেশের দক্ষিণে সুন্দরবনের প্রান্ত ছুঁয়ে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়েছে। কুয়াকাটার মূল সৈকত ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ। এটি একটি বিচিত্র্যধর্মী পর্যটন স্থান। এখানে রয়েছে রাখাইনপাড়া, কালাচানপাড়া, নাইউরিপাড়া, মথাউপাড়া, আমখলাপাড়া, লক্ষ্মীখলাপাড়া, মিশ্রীপাড়া ইত্যাদি। এ সমস্ত পাড়ায় শতাধিক রাখাইন পরিবার বসবাস করে। স্থানীয় পরিমাপে প্রায় ৬৪ বিঘা অঞ্চল জুড়ে আছে রাখাইন সম্প্রদায়ের বসবাস। রাখাইন পাড়ার প্রধানকে বলা হয় মাতব্বর বা হেডম্যান।

যাতায়াত ব্যবস্থা : কুয়াকাটায় সড়ক পথে যাওয়া যায়। সম্প্রতি রাজধানী ঢাকা থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত সরাসরি বিআরটিসি বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে। প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে বিআরটিসির বাস ছেড়ে যায় কুয়াকাটার উদ্দেশে। কুয়াকাটা থেকে ঢাকার উদ্দেশে বাস ছাড়ে প্রতিদিন বেলা দুইটায়। এছাড়াও ঢাকা থেকে বরিশাল ও পটুয়াখালীর উদ্দেশে প্রাইভেট বাস

সার্ভিস চলাচল করে। ঢাকা থেকে জলপথেও বরিশাল এবং পটুয়াখালী যাওয়া যায়। তারপর কুয়াকাটা পর্যন্ত সড়ক পথে যাওয়া যায়।

কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে একদিন : কুয়াকাটা নিঃসন্দেহে একটি আকর্ষণীয় স্থান। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে গেলাম। এর দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে বৌদ্ধমন্দির ছাড়াও নানা ধরনের মন্দির রয়েছে। কুয়াকাটা কেরানীপাড়ায় টিলার ওপর একটি বড়ো ধরনের বৌদ্ধমন্দির রয়েছে যা সীমা মন্দির নামে খ্যাত। আমরা প্রথমেই মন্দিরটি দেখে নিলাম। টিন ও কাঠের তৈরি এ মন্দিরের নির্মাণ সৌকর্য ইন্দোচীনের অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে। মন্দিরের ভেতরে রয়েছে একটি বিশাল আকৃতির মূর্তি। এ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে প্রায় ১০০ বছর আগে। তারপর ঘুরে নিলাম কুয়াকাটার ফয়েজ মিয়ার নারকেল বাগান। এটি একটি মনোরম দর্শনীয় স্থান। পাকিস্তানি আমলে প্রায় ২০০ একর জমি লীজ নিয়ে এ বাগান তৈরি করা হয়েছে। এতে গড় হিসেবে প্রায় সাড়ে তিন হাজার নারকেল গাছ এবং এক হাজার পাঁচশটি নারকেলের চারা থাকে। এখানে লতাচাপালি নামে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কুয়াকাটা থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে মহিপুরে একটি কলেজ আছে।

কুয়াকাটা বিশেষ কারণে একটি আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রসৈকত। এখানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুটোই উপভোগ করা যায়। এ দৃশ্য আমাদের সকলকে দারুণভাবে অভিভূত করেছে। তবে এখানে প্রযুক্তিগত সুযোগসুবিধা এখনো গড়ে ওঠেনি। একমাত্র সমুদ্র দর্শন ছাড়া আর কোনো সুবিধা নেই। নেই পর্যাপ্ত বিদ্যুতের ব্যবস্থা। তবু সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য উপভোগের দৃষ্টিকোণ থেকে কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

উপসংহার : একটি দীর্ঘ সমুদ্রসৈকত কুয়াকাটা। এর মধ্য দিয়ে আমাদের পর্যটনশিল্পের বহু উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে, যদি পরিকল্পিতভাবে কুয়াকাটাকে গড়ে তোলা হয়।

১৩৬. নৌকা ভ্রমণ

ভূমিকা : আমাদের দেশে চলাচলের জন্য নৌকা একটি চমৎকার বাহন। সারা বছর ধরে বহু নদীতে নৌকা চলে। বর্ষাকালে নৌকার ব্যবহার আরও বেশি হয়। তখন এমন অবস্থা হয় যে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গমনের একমাত্র উপায় থাকে নৌকা। আমাকেও বর্ষাকালে নৌকায় এদিক–ওদিক যেতে হয়। তবে আমার প্রথম দীর্ঘ নৌকা ভ্রমণের কথা আমার মনে অনেক দিন জেগে থাকবে। নদীতে নৌকা ভ্রমণে অভ্যস্ত না থাকার জন্য এই ভ্রমণের সুযোগ খুব লোভনীয় বলে বিবেচিত হয়েছিল। একটি ভিন্ন স্বাদের ভ্রমণ হিসেবে আমার কাছে বিবেচিত হয়ে তা বেশ স্মরণীয় হয়ে আছে।

ভ্রমণের উদ্দেশ্য : নৌকা ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল আনন্দ ও অভিজ্ঞতা অর্জন। নদীতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিল না বলে এ ব্যাপারে মনে বেশ কৌতূহল ছিল। নদীনালা–খালবিলের দেশ বাংলাদেশে এ ধরনের অভিজ্ঞতা না থাকা খুব গৌরবের নয়, জানি। তবু সুযোগ যখন আগে আসেনি— এবার সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দ্বিধা দেখা দেয়নি। বহুদিন আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়া হয়নি। সেখানে গেলে আপনজনেরা আনন্দিত মনে গ্রহণ করবে তারও একটা লোভ মনে জেগেছিল। তবে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জীবনে যে একটা আনন্দময় সম্পদ হতে পারে তাও কিন্তু মনে উঁকি দিয়েছিল। গ্রাম–বাংলার প্রকৃত রূপটি খুব কাছে থেকে দেখা যাবে এমন উপরিপাওনা কম কীসের।

ভ্রমণকারীর অভিজ্ঞতা : এক ছুটির সময়ে পনেরো কিলোমিটার দূরের আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার ব্যবস্থা হলো। বর্ষাকালই এই এলাকায় বেড়ানোর উত্তম সময়। সারাদিনের পাড়ি। আমরা পাঁচজন নৌকায় উঠলাম। দুজন মাঝি। সকাল আটটায় নৌকা ছেড়েছিল। পথ সোজা নয়। কিছুটা খাল পার হয়ে বিলে গিয়ে পড়তে হবে। তারপর নদী দিয়ে দীর্ঘ পথ অনেক ঘুরে ফিরে যাবে বলে পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে। তাই কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে নেওয়া হলো। বিছানা বিছিয়ে বেশ আরামেই শুয়ে বসে যাওয়া যাবে।

দিনটি ছিল চমৎকার। বাতাসে পাল তুলে দিয়ে মাঝি হাল ধরে আছে। খালের পথটুকুর দুধারে মানুষের বাড়িঘর। কাজে নিয়োজিত মানুষের ছবি দুদিকে। কিন্তু বিলে পড়লে বিরাট এলাকা জনশূন্য এবং নির্জন মনে হলো। কোথাও কেউ নেই। তারপর নদীর পথ। বাতাস না থাকলেও ঢেউয়ের আঘাতে নৌকা দুলে ওঠে। তীর ঘেঁষে আমাদের ছোটো নৌকা চলতে থাকল। হঠাৎ ঝড়ের সূচনা হলো। মাঝি তাড়াতাড়ি তীরে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঝড় থেমে গেল। আমরা আবার চলতে থাকলাম। নদীতে অসংখ্য নৌকা আসা–যাওয়া করছে। কত বিচিত্র জীবন সেখানে। দুদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা চলেছি।

বিশেষ ঘটনার বর্ণনা : বিচিত্র দৃশ্য দেখতে দেখতে আমাদের নদীর পথটুকু প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। হঠাৎ কাছে একটা প্রবল কোলাহলে আমরা চমকে উঠলাম। বেশ কিছুটা দূরে ফেরি পারাপার করছিল একটি ছোটো নৌকা। নৌকাটি যাত্রী বোঝাই। এক

পার থেকে অপর পারে যাবে। একটি অল্পবয়সি ছেলে হাল ধরে বসেছিল। তার বুড়ো বাপ টানছিল দাঁড়। হঠাৎ কী কারণে নৌকাটি কাত হয়ে দুলে ওঠে। নৌকার একদিকে বসা ঘোমটাপরা বউয়ের কোলের শিশুটি ছিটকে পড়ে পানির মধ্যে। ধর ধর বলতে না বলতেই অথই পানিতে তলিয়ে গেল শিশুটি। আকস্মিক ঘটনায় মাও চিৎকার করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তবে তাকে ডুবতে দিলো না নৌকার যাত্রীরা। তাকে টেনে অজ্ঞান অবস্থায় নৌকায় তুলল ঠিকই কিন্তু শিশুটির আর খোঁজ পাওয়া গেল না। ততক্ষণে আমাদের নৌকাটি কাছে এসেছে। সব দেখে আমরা বেদনাহত হলাম। একসময় নদীর স্রোতের টানে আমরা আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশে চলে গেলাম এবং একসময় যথাস্থানে উপনীত হলাম।

উপসংহার : নৌকা ভ্রমণটি আমাদের কাছে উপভোগ্য হয়েছিল। তবে নদীতে দেখা দুর্ঘটনাটি মনকে বেদনাহত করে তুলেছিল। সময়ের আবর্তে সে নির্মম বেদনা তলিয়ে গেছে। কিন্তু মনে আছে নৌকা ভ্রমণের আনন্দময় স্মৃতি।

১৩৭. দেশভ্রমণ
অথবা, দেশভ্রমণের উপযোগিতা
অথবা, দেশভ্রমণে শিক্ষা ও আনন্দ

ভূমিকা

দেশ ভ্রমণ আমাদের শিক্ষার একটি অঙ্গ। আমরা যা পাঠ করি, তা চোখে না দেখলে আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমরা যখন কোনো স্থানে উপস্থিত হই, তখন সেখানকার কোনো দূর অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি আমাদের স্মৃতিপটে জাগ্রত হয়।

দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা : এ বিশাল পৃথিবীতে আমরা একটি ক্ষুদ্র জীবমাত্র। এর বিশালতা অনুভব করা আমাদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। স্রষ্টা অসীম বিশ্বকে দেশ–বিদেশের নানা প্রকার জীবজন্তু ও বিচিত্র নৈসর্গিক দৃশ্য দ্বারা অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। বিভিন্ন দেশে পর্যটন ভিন্ন আমরা সে সকল উপলব্ধি করতে পারি না। দেশ পর্যটন ছাড় মনে যথার্থ আনন্দ ও জ্ঞান লাভ হয় না। পৃথিবীতে অসংখ্য জাতি ও সম্প্রদায়ের বাস। এ জাতিগুলো পৃথিবীর সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে বাস করছে। এমন বহু জাতি আছে, যাদের সঙ্গে দৈহিক বর্ণ, আচার–অনুষ্ঠান, পোশাক–পরিচ্ছদ, রীতি–নীতি প্রভৃতিতে আমাদের কোনো মিল নেই। দেশভ্রমণ ব্যতিরেকে আমরা তাদের সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে পারি না।

শুধু বইপাঠ করেই আমরা যথাযথ ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সামাজিক জ্ঞান অর্জন করতে পারি না। এ সকল বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানার্জনের জন্য দেশভ্রমণ আবশ্যক। কবি, শিল্পী ও চিত্রকরগণেরও কর্তব্য দেশভ্রমণ করে নানা দেশের প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করা। এতে তাঁরা নিজ প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে পারবেন।

দেশ পর্যটনের ফলে ভূগোলতত্ত্ব ও ভূবিদ্যা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারা যায়। প্রাচীনকাল হতে বহু পর্যটক, ভূতত্ত্ববিদ নানা দেশ ভ্রমণ করে ওই সকল দেশ সম্বন্ধে নানা কথা লিপিবদ্ধ করে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। হিউয়েন সাঙ, ফা–হিয়েন, ইবনে বতুতা প্রমুখ বিখ্যাত পর্যটক সেকালের ভারত পরিভ্রমণ করে যে সকল মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, সেগুলো ইতিহাসের প্রধান উপকরণ। ভূতত্ত্ববিদগণ বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করে বিভিন্ন জনপদ, দুস্তর মরুভূমি দুরারোহ গিরিশৃঙ্গ, গভীর অরণ্য পর্যটন করেছেন বলে আমরা জগতের বহু তথ্য জানতে পেরেছি।

উপকারিতা : দেশ ভ্রমণ করলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, কার্যদক্ষতা বাড়ে এবং মনের সংকীর্ণতা দূর হয়। যারা কূপমণ্ডূক, তারা আপনার গৃহসীমার বাইরে গমন করে না; ফলে তাদের জ্ঞান প্রসারিত হয় না, হৃদয় সংকীর্ণ ও অনুদার থাকে। পক্ষান্তরে, নানা দেশভ্রমণ করলে বহুদর্শিতা লাভ করা যায়। বহুদর্শিতা থাকলে সাহস বৃদ্ধি পায় এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে সে কার্যে সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারি।

দেশ পর্যটনের ফলে আমরা ব্যাবসাবাণিজ্যের কৌশল ও তত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত হতে পারি। কোন দেশে কোন দ্রব্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, কোন দেশে কোন দ্রব্যের চাহিদা রয়েছে— দেশভ্রমণের ফলে তা বিশেষভাবে জানা যায়। অন্য দেশে কোন জিনিস নেই, আমাদের দেশে আছে এবং আমাদের দেশে কোন জিনিস নেই, অন্য দেশে এরূপ দ্রব্যসমূহের আমদানি–রপ্তানি করতে পারলে মানুষের উপকার হয় এবং নিজেও যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়। দেশ পর্যটনের ফলে এ সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে।

দেশভ্রমণে শিক্ষা : প্রাচীনকাল অপেক্ষা আধুনিককালে পর্যটনের উপায় ও ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজ হয়েছে। বর্তমানকালে আমরা অনায়াসে নানা দেশে ভ্রমণ করে বৈচিত্র্যময় জগতের অনেক কিছু সবিস্ময়ে দেখতে পারি। পর্যটন ও পর্যবেক্ষণই কোনো দেশ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভে সাহায্য করতে পারে। পর্যটন দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করতে পারি। আধুনিককালে

ইতিহাসে ও ভূগোলের উচ্চ শ্রেণির ছাত্রগণ যাতে পর্যটন দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে পারে, সেজন্য তাদের প্রতিষ্ঠান হতে পর্যটনের ব্যবস্থা করা হয়। এটি অতীব কল্যাণকর ব্যবস্থা। ভ্রমণের ফলে অতীতপূর্ব বা শ্রুতপূর্ব বিষয়গুলো মনে চমৎকারভাবে জাগরূক হয়। বইপাঠ করে যে সকল বিষয় অবগত হওয়া যায়, সেগুলো মনের পটে প্রকৃষ্টরূপে চিত্রিত হয় না; প্রত্যক্ষ দর্শনে এটি ভালোভাবে চিত্রিত হয়।

উপসংহার : আধুনিককালে রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীনকালের ন্যায় দেশ পর্যটনে অধিক অর্থ বা সময় ব্যয় করতে হয় না, কষ্টও করতে হয় অনেক কম। আজকাল আমরা অনায়াসে পৃথিবীর যেকোনো অংশ ভ্রমণ করে এর প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্য দর্শন করে অভিজ্ঞতা ও আনন্দ লাভ করতে পারি। পূর্বকালে অধ্যয়ন সমাপনের পর ছাত্রদের দেশভ্রমণের ব্যবস্থা ছিল। আজকালও কোনো কোনো দেশে এ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় দেশভ্রমণের ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা দরকার। তা হলে ছাত্রছাত্রীগণ নানা দেশ পর্যটন করে শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারবে।

১৩৮. ট্রেনে ভ্রমণ

সূচনা : খুব ছোটোবেলায় আমি একাধিকবার ট্রেন ভ্রমণ করেছি। কিন্তু সেসব আমার ভালো মনে নেই। যে ট্রেন ভ্রমণটি আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল তা হলো চট্টগ্রাম থেকে শ্রীমঙ্গালের উদ্দেশে যাত্রা।

ভ্রমণ কী? : অজানাকে জানার জন্য মানুষের রয়েছে দুর্নিবার আকর্ষণ। নতুন নতুন জিনিস স্বচক্ষে দেখে সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য মানুষ পাড়ি জমায় দেশ–বিদেশের নানা স্থানে। অজানাকে জানার উদ্দেশ্যে এই স্থানান্তরের নামই ভ্রমণ। ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ বিশ্বকে সবচেয়ে ভালোভাবে অনুভব করার সুযোগ পায়।

ভ্রমণের পথসমূহ : স্থল, জল, আকাশ সমস্তই এখন মানুষের করায়ত্ত। এই সবগুলো পথেই রয়েছে ভ্রমণের অবারিত সুযোগ। স্থলপথে বাস, ট্রেন, রিকশা ইত্যাদির মাধ্যমে ভ্রমণ করা যায়। নদীপথে লঞ্চ, নৌকা আর আকাশপথে বিমান, হেলিকপটার মানুষের ভ্রমণের বাহন। তবে দীর্ঘ দূরত্বে আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য ট্রেন ভ্রমণের জুড়ি নেই।

ট্রেন ভ্রমণের শুরু : তখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। হাতে লম্বা ছুটি, শীতও তখন মাত্র শুরু হচ্ছে। এমনি সময়ে আমার ছোটো খালা আমাদের মৌলভীবাজারে আমন্ত্রণ জানালেন। যাত্রার তারিখ ঠিক করে বাবা টিকিট কেটে আনলেন। যাত্রার দিন অটোরিকশায় চড়ে চট্টগ্রাম স্টেশনে পৌঁছলাম। প্ল্যাটফর্মে কুলিরা ছুটে এলো। কিন্তু আমরা যার যার ব্যাগ নিজেরাই কাঁধে তুলে নিলাম। প্ল্যাটফর্মে নানা ধরনের মানুষের ভিড়। কেউ আমাদের মতোই যাত্রী। কেউবা এসেছে আত্মীয়স্বজনকে বিদায় বা অভ্যর্থনা জানাতে। আরও আছে কুলি, ফেরিওয়ালা ও ভিক্ষুক।

রেলস্টেশনের অভিজ্ঞতা : প্রায় দশটার সময় ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এলো। আমরা দ্রুত ট্রেনে উঠলাম। আমাদের সিট পড়েছে সামনাসামনি। আমি ও আমার ভাই জানালার পাশের সিট দুটো দখল করলাম। বাবা জানালেন, ট্রেন ছাড়তে দেরি হবে। শুনে আমার ছোটো ভাই খুব রেগে গেল। বাবাকে বলল, 'যাও, ওদের বকে দিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি ট্রেন ছাড়তে বলো। খালারা আমাদের জন্য কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন!' ওর কথা শুনে আমরাতো হেসেই খুন।

ট্রেনে বসে দেখা দৃশ্য : যাহোক, ট্রেন ছাড়ল প্রায় আধা ঘণ্টা পর। ট্রেন চলতে শুরু করল। প্রথমে ধীরে ধীরে তারপর বেশ দ্রুত। প্রথম দিকে দেখা গেল শহরের সেই পরিচিত দৃশ্য–দালানকোঠা, দোকানপাট, বাস–ট্রাক, রিকশা–সাইকেল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই দৃশ্য পালটে গেল। বিস্তীর্ণ ধানখেত, সবুজ মাঠ ও মাঠে চরে বেড়ানো গোরু–ছাগলের দল চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে উঠল। ট্রেন ছোটার সঙ্গে মনে হলো রেললাইনের পাশে গাছপালা, বিদ্যুতের খুঁটি, ঘরবাড়ি, লোকজন, রাস্তা, পুল—সব যেন উলটোদিকে ছুটে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে দূরে ছোটো ছোটো বাড়িগুলোকে মনে হতে লাগল যেন একেকটা দ্বীপ। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। হঠাৎ চোখে পড়ল রেললাইনের সমান্তরাল মহাসড়ক। তাতে ছুটে চলেছে বাস, ট্রাক। একটা বাস আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু যানজটে আটকে তাকে পিছিয়ে পড়তে হলো। প্রায় এক ঘণ্টা পর আমরা একটা বড়ো পুল পার হলাম। বাবা জানালো, আমরা ফেনী নদী পার হচ্ছি। কয়েকটা নৌকা চোখে পড়ল। এরপরই দৃশ্য পালটে গেল। আবার সেই গ্রাম আর মাঠের দৃশ্য।

ট্রেনের ভেতরের অবস্থা : এদিকে ট্রেনের কামরায় এক অন্ধ বাউল গান শুরু করল। খুব সুন্দর তার গলা। কয়েকটা গান গাওয়ার পর সে সবার কাছে হাত পাতল। আমরা তাকে দশটা টাকা দিলাম। একটু পরপরই বিভিন্ন ফেরিওয়ালা আসতে থাকল। একটা স্টেশনে ট্রেন থামলে কমলাওয়ালা উঠল। বাবা তার কাছ থেকে তিন ডজন কমলা কিনে নিলেন। দুপুরের দিকে মা টিফিন ক্যারিয়ার খুললেন। খুব মজা করে হাতে হাতে আমরা পরোটা আর মাংস ভুনা খেলাম। হঠাৎ বাইরে

তাকাতে চোখে পড়ল— সারি সারি তালগাছ আর সে গাছে ঝলছে বাবুই পাখির বাসা।

বিভিন্ন স্টেশন : ট্রেনের জানালার পাশে বাসায় দেখতে পেলাম অনেকগুলো নাম না–জানা স্টেশন। একে একে ট্রেন পেরিয়ে গেল। মিরেরসরাই, সীতাকুণ্ডের ভেতর দিয়ে যাওয়ার পথে চোখে পড়ল বেশকিছু পাহাড়ের সারি। সিলেট থেকে শ্রীমঙ্গল যাওয়ার অনেকটা পথ ঘন সবুজ জঙ্গল আর ছোটো ছোটো টিলায় ঘেরা। বেশকিছু নয়নাভিরাম চা বাগানের দৃশ্যও চোখে পড়ে। ট্রেনে ভ্রমণের সময় চমৎকার এই স্থানগুলো আমাকে মুগ্ধ করে রাখে।

শেষ স্টেশন : দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এলো আমাদের ট্রেন ভ্রমণ। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে আমরা পৌঁছে গেলাম শেষ স্টেশন শ্রীমঙ্গলে। ব্যাগপত্র সব গুছিয়ে নেমে এলাম ট্রেন থেকে। প্ল্যাটফর্মে খালু আর খালাতো ভাইবোনেরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাদের সঙ্গে চললাম মৌলভীবাজারের উদ্দেশে।

উপসংহার : জীবনে অনেকবার আমি ট্রেনে চড়েছি। গেছি এক শহর থেকে আরেক শহরে। কিন্তু শ্রীমঙ্গলে যাওয়ার স্মৃতি আজও ভুলিনি।

উৎসব ও মেলা

১৩৯. একটি গ্রাম্যমেলা
অথবা, বাংলাদেশের গ্রাম্যমেলা

ভূমিকা

স্থানটির নাম সোনাতলা। সোনাতলার পাশ দিয়ে গিয়েছে ক্ষুদ্রকায় ফুলজোড় নদী। ফুলজোড় নদীর পাড়ে গ্রাম্য বাজার। সে বাজারে ফিবছর একবার মেলা বসে। মেলায় বহু দূরাঞ্চল হতে দোকানি পসারিরা আসে, দোকান সাজায় হরেক রকমের জিনিস দিয়ে। চৈত্র মাসের শেষ দিন অর্থাৎ বছর শেষে এ মেলা উপলক্ষ্য করে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে লোকজনের মধ্যে কী যে ধুম পড়ে যায় তা বর্ণনাতীত।

মেলার দ্রষ্টব্য জিনিসপত্র : সোনাতলার বাজারে বড়ো কোনো স্থায়ী দোকান নেই; কাজেই দূরদূরান্ত হতে যেসব দোকানদার সওদা নিয়ে আসে তারা মেলার নির্দিষ্ট দিনের দুই–তিন দিন আগেই এসে উপস্থিত হয়। মেলার দর্শনীয় জিনিসগুলোর মধ্যে যেগুলো দর্শক ও লোকজনের মন কেড়ে নেয় সেগুলো হলো মাটির পুতুল, শোলার পুতুল, তুলোর পুতুল (নানা ধরনের জন্তু ও পাখি), মিষ্টির ছাঁচ, রঙিন হাঁড়ি, বাটি, ছেলেমেয়েদের খেলনা, বেলুন, কাঠের তৈরি আসবাবপত্র প্রভৃতি।

মেলায় বড়োদের অপেক্ষা যেন ছোটোদের উৎসাহই বেশি। তারা ভেঁপুর দোকানির কাছ হতে ভেঁপু ক্রয় করে, বাঁশি ক্রয় করে, রংবেরঙের পাখি ক্রয় করে। আর এগুলো পেয়ে তাদের মনের খুশি যেন পাখা মেলে উড়তে চায়। মেলার একপাশে থিয়েটার, যাত্রা, বায়োস্কোপ চলতে থাকে। থিয়েটার মণ্ডপের সম্মুখে ঢোল বাজে, বংশীধ্বনি হতে থাকে, অল্প মূল্যের টিকিট ক্রয় করে কৌতূহলী দর্শকবৃন্দ থিয়েটার দেখতে মণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করে। দেখা শেষে তারা বের হয়ে আসে। আবার অন্য দল টিকিট ক্রয় করে ভেতরে প্রবেশ করে। এভাবে চলে থিয়েটারের উৎসব।

মেলার আরেক কোনায় বেজায় ভিড়। কী ব্যাপার? না, সেখানে এক অসীম সাহসী সাইকেল–জাদুকর একটি গর্তের মধ্যে সাইকেল খেলা দেখায়। গর্তটি ওপর দিকে চওড়া এবং তা ধীরে ধীরে নিচের দিকে সরু হয়ে নেমে গিয়েছে। সাইকেল জাদুকর সেখানে খেলা দেখায়। প্রথমে ঘণ্টা বাজে এবং সে সঙ্গে শুরু হয় সাইকেল খেলা। গর্তের মধ্যে সাইক্লিস্ট এত দ্রুত সাইকেল চালনা করে যে, তা চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর। তবে এ খেলায় খেলোয়াড়ের জীবনের ঝুঁকি আছে। অনেক সময় দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে।

মেলার এক দিকে পুতুল নাচ চলে, নাগর দোলায় চেপে ছেলেমেয়েরা ঘুরপাক খেতে থাকে। বছরের শেষ দিন; চারদিকে একটা গুমট ভাব যেন ঝড়ের সংকেত। কোনো কোনো বছর ঝড়ের কবলে পতিত হয় গ্রাম্যমেলা, আবার কোনো কোনো বছর নির্বিঘ্নে মেলার দিন অতিবাহিত হয়। কিন্তু গ্রামের লোকেরা ধূলিধূসরিত অবস্থায় মেলায় ক্রয়–বিক্রয় করে।

মেলার উপকারিতা : আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে গ্রাম্যমেলা শুধু মনের শান্তিই দেয় না, অর্থেরও শক্তি যোগায়। মেলায় কৃষি ও কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদি বেচাকেনা হয়। মেলাকে কেন্দ্র করে গ্রামের কামার, কুমার, তাঁতি, সুতারদের মধ্যে বিভিন্ন জিনিস বানানোর হিড়িক পড়ে যায়। তাই দেখা যায়, মেলার মাধ্যমে গ্রামীণ অনেক মানুষের কিছু উপার্জনের পথও প্রশস্ত হয়।

মেলার অপকারিতা : সারা বছরে এ একটামাত্র দিন। বহু লোক এ দিনটির দিকে চাতকের মতো চেয়ে থাকে। কবে এ দিন আসবে? হইহুল্লোড় ও আনন্দের আগমনি গেয়ে অসংখ্য নরনারীর কাছে গ্রামের মেলা বছরান্তে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু

আনন্দের মধ্যেই নিহিত থাকে নিরানন্দের বীজ। মেলায় অসৎ লোকেরা সুযোগের সন্ধানে ফিরে। মেলার প্রাঙ্গণে ক্রেতা–বিক্রেতার সঙ্গে আসে চোর ও পকেটমারের দল; যেখানেই ভিড় সেখানেই তাদের আনাগোনা। কাজেই মেলায় গমন করে সারাক্ষণ পকেটের দিকে নজর রাখতে হয়। এ ভীতি ও আশঙ্কাই অনেক ক্ষেত্রে মেলার আনন্দকে মাটি করে।

অর্থনৈতিক বিঘ্ন : সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের ফলে লোকজনের জীবনযাপন নিতান্তই দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। সে আনন্দ যেন কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে। এখন মেলা বসলেও গ্রামের মানুষের আনন্দের পাখি আর যেন পাখা মেলে না। কেন এমন হলো? এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে?

উপসংহার : গ্রাম অঞ্চলের লোকেরা মেলাকে নাম দিয়েছে 'আড়ং'। এ আড়ং দেখার আনন্দ গ্রামবাসীকে উৎফুল্ল করে, আনন্দিত করে। মেলা মানুষের আনন্দের উৎস। মূলত গ্রামের কৃষিজীবী মানুষের একঘেয়েমিতা দূর করে আনে প্রফুল্লতা। তাই এই মেলা সব ধর্মের লোক পালন করে থাকে। একে অন্যের সাথে আনন্দ ভাগ করে নিয়ে হয়ে ওঠে মিলনমেলা।

গণমাধ্যম, যোগাযোগ ও নাগরিক অধিকার

১৪০. যোগাযোগ উন্নয়নে মুঠোফোন

ভূমিকা : সেলুলার ফোন বা মুঠোফোন হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের একটি বিস্ময়কর অবদান। এ ফোনের আকার–আকৃতি ও ব্যবহার পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে এটিকে মুঠোফোন বলা হয়ে থাকে। এটি টেলিফোনের সর্বাধিক সংযোজন। মুঠোফোন আজ বিশ্বের মানুষের জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যম। এর ব্যাপক উপযোগিতা সারাবিশ্বে এটি দ্রুত সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বর্তমান বিশ্বে এমন কোনো দেশ নেই যেখানে মুঠোফোনের ব্যবহার নেই। সেলুলার বা মুঠোফোন বিশ্ববাসীকে যেন এক নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে এসেছে। এ মুঠোফোন সারা বিশ্বের যোগাযোগের সর্বাধিক অবস্থাকে নতুনত্ব দান করেছে।

মোবাইল ফোন কী : মুঠোফোন হলো ছোটো আকারের একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস। যার মধ্যে শব্দ বা তথ্য গ্রহণ এবং প্রেরণ করার জন্য ইনপুট এবং আউটপুট ইউনিট থাকে। এটি যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকতম সংস্করণ। টেলিফোন বা ল্যান্ডফোন ব্যবহারের জটিলতা দূর করতে এ ফোনের আবিষ্কার। হাতের মুঠোয় সহজে বহনযোগ্য সেটে সিমকার্ড বা রিমকার্ড ব্যবহার করে এ ফোন ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বিশ্বে মোট চার প্রযুক্তির মোবাইল ফোন রয়েছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশে দুটি প্রযুক্তির ব্যবহার চালু রয়েছে। তাহলে জিএসএম প্রযুক্তি ও সিডিএমএ প্রযুক্তি।

মোবাইল ফোনের প্রচলন : বিজ্ঞানী গ্রাহামবেল উনিশ শতকে টেলিফোন আবিষ্কার করেন। টেলিফোন আবিষ্কারের পরবর্তী সময়ে এটিকে আরও সহজতর ও সর্বত্র বহনযোগ্য করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এ প্রচেষ্টার ফলে আবিষ্কৃত হয় মোবাইল ফোন বা সেলুলার ফোন। আধুনিক বিস্ময় হিসেবে আবির্ভূত হয় এটি। বাণিজ্যিকভাবে সেলুলার ফোনের প্রচলন শুরু বিশ শতকের শেষ পর্যায়ে। ফোন প্রথম ব্যবহৃত হয় জার্মানিতে। পরবর্তীতে সারাবিশ্বে পর্যায়ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে সেলুলার ফোন। ১৯৯৩ সালে সিটিসেল কোম্পানির মাধ্যমে বাংলাদেশ মোবাইল ফোনের জগতে প্রবেশ করে।

মোবাইল ফোন সংযোগ : একটি মোবাইল ফোনের সংযোগ পেতে হলে অনিবার্য কিছু উপাদানকে বৈজ্ঞানিক বিধিসম্মতভাবে সমন্বিত করতে হয়। সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি মোবাইল হ্যান্ডসেট, যার মাধ্যমে আবশ্যক উপাদানগুলোকে যথাযথভাবে ধরে রাখা যায়। সিমকার্ড, পিনকোড ও প্যাক কোড, ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য ও ছবি—এ তিনটি আবশ্যক উপাদানের কোনো একটি বাদ থাকলে মোবাইল সংযোগ সম্ভব নয়। সিমকার্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি নেটওয়ার্ক, যা দ্বারা ফোনটি নিয়ন্ত্রিত হয়। স্থানে স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নেটওয়ার্ক টাওয়ারগুলো সিমকার্ডের সঙ্গে শতভাগ যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

যোগাযোগে মুঠোফোনের ইতিবাচক দিক : মোবাইল ফোন বর্তমানে অত্যাবশ্যকীয় উপাদানে পরিণত হয়েছে। এর আবিষ্কার যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক পরিস্থিতি পালটে দিয়েছে। মানবজীবন হয়েছে অধিকতর গতিশীল। মানবজীবনে মোবাইল ফোনের ইতিবাচক দিকগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো—

১. **সহজ যোগাযোগ মাধ্যম :** বিশ্বের যেকোনো মানুষের সাথে যেকোনো মুহূর্তে যোগাযোগের সহজ মাধ্যম হচ্ছে মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মুহূর্তেই আমরা আমাদের যেকোনো তথ্য বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারি। ব্যাবসাবাণিজ্য, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, শিক্ষা, চাকরি, তথ্যের আদান–প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে যোগাযোগের জন্য মোবাইল ফোন সহজতর যোগাযোগ মাধ্যম।

২. **বিনোদনের মাধ্যম :** মোবাইল ফোন বর্তমানে বিনোদনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা রেডিয়োর অনুষ্ঠান শুনতে পারি, রেকর্ডকৃত গান বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখতে পারি। অর্থাৎ, মোবাইল ফোন ক্লান্তি দূর করে আমাদেরকে প্রাণবন্ত করে তুলে। কাজেই এই কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মোবাইল ফোন অবসর সময় কাটানোর গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এবং যোগযোগের ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অনেক বেশি।

৩. **ইন্টারনেট ব্যবহার :** সাম্প্রতিক সময়ে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু হয়েছে। মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা যেকোনো সময় বিশ্বের যেকোনো খবরাখবর জানতে পারি এবং তথ্য আদান–প্রদান করতে পারি। মোটকথা, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে গোটা বিশ্ব যেন আজ আমাদের হাতের মুঠোয়।

৪. **ব্যাংকিং লেনদেন :** সম্প্রতি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যাংকিং লেনদেন শুরু হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া যায় এবং টাকা ওঠানো যায়। এতে মানুষের সময় ও শ্রম উভয় সাশ্রয় হয়। অধিকন্তু আমাদের দেশে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সেবা ইতোমধ্যে চালু হয়েছে।

৫. **সঠিক তারিখ ও সময় নির্ণয় :** মোবাইল ফোনের বহুমুখী ব্যবহারের মধ্যে তারিখ ও সময় নির্ণয় অন্যতম। প্রতিটি মোবাইলে তারিখ ও সময় নির্ণয়ের জন্য ঘড়ি ও ক্যালেন্ডার সংযোজন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া ক্যালেন্ডার থেকে বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সময় জানা যায়।

৬. **হিসাবনিকাশের কাজে ব্যবহার :** মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা হিসাবনিকাশের কাজ সমাধান করতে পারি। এটি বর্তমানে সহজে বহনযোগ্য ক্যালকুলেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাথে একটি মোবাইল থাকলে আমরা প্রয়োজনীয় মুহূর্তে হিসাবনিকাশ দ্রুত করতে পারি।

৭. **তথ্য সংরক্ষণ :** সাম্প্রতিক সময়ে মোবাইল ফোনে এমন সব সফটওয়্যার সংযোজন করা হচ্ছে যাতে করে মোবাইলে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। এ ক্ষেত্রে অনেকে মোবাইল ফোনকে মিনি কম্পিউটার বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

৮. **রেকর্ডিং :** বর্তমান সময়ে বাজারে যেসব মোবাইল ফোন পাওয়া যায় তার অধিকাংশে ক্যামেরা, ভিডিয়ো ক্যামেরা, অডিয়ো রেকর্ডিং সুবিধা রয়েছে। এসব সেট দিয়ে বিভিন্ন স্মরণীয় মুহূর্তের দুর্লভ ছবি যেমন ধারণ করে রাখা সম্ভব তেমনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানও রেকর্ডিং করে রাখা যায়।

মোবাইল ফোনের অপকারিতা : ভালো–মন্দ নিয়েই পৃথিবীর সকল কিছুর সৃষ্টি। প্রতিটি যন্ত্রের মাঝে তার ভালো দিক যেমন আছে, তেমনি খারাপ দিকও আছে। নিচে মোবাইল ফোনের অপকারিতা বর্ণনা করা হলো—

১. **আর্থিক অপচয় :** মোবাইল অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য হলেও বর্তমানে এটি ফ্যাশন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অনেকে ফ্যাশন হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে অপ্রয়োজনেও মোবাইল ব্যবহার করছে। এতে আর্থিক অপচয় হচ্ছে।

২. **শারীরিক ক্ষতি :** সাম্প্রতিক সময়ে গবেষণায় দেখা গেছে মোবাইল ফোন আমাদের বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ক্ষতিসাধন করে। যেমন : অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারের ফলে মানুষের শ্রবণশক্তি ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়। আবার গবেষকদের কেউ কেউ বলেছেন— মোবাইল ফোন অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে মানুষের ব্রেইন ক্যানসার হতে পারে।

৩. **যুবসমাজের অবক্ষয় :** মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যুবক শ্রেণি নানাবিধ অশ্লীল ভিডিয়ো দেখে। ফলে ধীরে ধীরে তাদের মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে।

বাংলাদেশে মোবাইল ফোন : বাংলাদেশ সর্বপ্রথম মোবাইলের জগতে প্রবেশ করে সিটিসেল কোম্পানির মাধ্যমে। ১৯৯৩ সালে এ সুবর্ণ সুযোগটি এদেশের মানুষ গ্রহণের সুযোগ পায়। ১৯৯৬ সালে সরকার গ্রামীণ ফোন, একটেল এবং সেবা— এ তিনটি কোম্পানিকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন দিলে দেশবাসী তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। এখন মোবাইল ফোন ব্যবহার কোনো অসাধারণ ঘটনা নয়, এ যেন নিয়মিত আহার–নিদ্রার মতো সাধারণ ঘটনা।

উপসংহার : তথ্যপ্রযুক্তির প্রবল উৎকর্ষের যুগে মোবাইল এখন সুলভ সামগ্রী। যোগাযোগ–ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে এর প্রয়োজনীয়তাও সমাজে সর্বাধিক। তাই বিজ্ঞানের এ অকৃপণ দানকে মানুষও গ্রহণ করেছে অকৃপণভাবে।

১৪১. রেডিয়ো বা বেতারযন্ত্র
অথবা, জাতীয় জীবনে বেতারের ভূমিকা
অথবা, জনমত গঠনে বেতারের ভূমিকা

অথবা, বিজ্ঞানে বেতারযন্ত্রের ভূমিকা

ভূমিকা

বেতার বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর অবদান। বেতারযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে দূরদূরান্তে দ্রুত সংবাদ আদান–প্রদানের জন্য টেলিফোন বা টেলিগ্রামের সাহায্য নিতে হতো। এ জন্য প্রয়োজন হতো হাজার হাজার মাইলব্যাপী তারের সংযোগসাধন, যা ছিল খুবই ব্যয়বহুল। কিন্তু রেডিয়ো আবিষ্কারের পর তারের সংযোগের ঝামেলা আর রইল না। তাই এ আশ্চর্য যন্ত্রটির নাম রাখা হয় 'বেতার' অর্থাৎ তার ছাড়াই খবরাখবর প্রদানের যন্ত্র।

আবিষ্কার : রেডিয়ো বা বেতার আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতের এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। মানুষের মেধা ও চিন্তাশক্তির অভিনব প্রকাশ। এ অদ্ভুত যন্ত্রটি আবিষ্কার আকস্মিক বা একজনের চেষ্টার ফল নয়। নানা দেশের নানা জনের কঠোর সাধনার ফল হিসেবে আবিষ্কৃত হয়েছে বেতারযন্ত্র। এই সাধকদের মধ্যে হাইনরিক হার্ৎস, ওলিভার প্রমুখ মনীষীর নাম চিরস্মরণীয়। এ প্রসঙ্গে বাঙালি বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর নামও উল্লেখযোগ্য। এর পরিণত রূপদান করেন ইতালির বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মার্কনি, তাই তিনি বেতারযন্ত্রের আবিষ্কার বলে পরিচিত। ১৯০১ সালে তিনি তাঁর নবাবিষ্কৃত বেতারযন্ত্রের পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষার সাফল্যে পৃথিবী এক অত্যাশ্চর্য জিনিস লাভ করল। এতে বিনা তারে পৃথিবীর দূরতম স্থানসমূহের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হলো। মানুষ আরও কাছে এলো একে অপরের।

আবিষ্কারের রহস্য : বেতার আবিষ্কার তৎকালীন বিশ্বে এক অভূতপূর্ব বিস্ময়ের ব্যাপার। তারবিহীন ছোট্ট বাক্সজাতীয় যন্ত্রের মধ্যে দূরবর্তী এলাকার খবর, গান, বাজনা, বক্তৃতা, আবৃত্তি, অভিনয় ভেসে আসা বিস্ময়ের ব্যাপার বইকি। কীভাবে বিজ্ঞান সে অসাধ্যসাধন করল সেটা সত্যি ভাববার বিষয়। আমরা আগে জানতাম যে, বায়ুর মধ্যে ইথার নামক এক ধরনের পদার্থ রয়েছে। এ ইথারের মাধ্যমে আলোকতরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। বেতার সমমানের বিদ্যুতের সাহায্যে উচ্চারিত শব্দকে বেতারতরঙ্গে পরিণত করে এবং দূরদূরান্তে পাঠিয়ে দেয়। বেতারযন্ত্র সেই শব্দ গ্রহণ করে অন্যের কাছে তা গ্রহণযোগ্য করে তোলে। তখন স্পষ্টভাবে সবকিছু শুনতে পাওয়া যায়। এরপর এটা নিয়ে আরও গবেষণা চলানো হলো। এটাকে আরও উন্নত করা যায় কীভাবে। অবশেষে এলো কাঙ্ক্ষিত সাফল্য।

প্রয়োজনীয়তা : বেতারবাতা সভ্যজগতের এক বিশেষ অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভূ–উপগ্রহ স্থাপিত হওয়ায় বেতারের বিশাল উন্নতি সাধিত হয়েছে। মানুষের কণ্ঠকে পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে স্বর–বিস্তারকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। বর্তমানে সারাবিশ্ব বেতারের উন্নতির ফলে একটি পরিবারে পরিণত হয়েছে। বেতারের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হয়েছে। এতদিন বেতারযন্ত্র শুধু বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহৃত হতো। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে এর ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস বেতারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। ফলে সাগরের নৌযানগুলো নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসতে পারে। সাগরের জাহাজে বেতার ব্যবহৃত হয় যাতে বিপদের সময় অন্য জাহাজের সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে। বেতারের মাধ্যমে সরকারি জরুরি কোনো ঘোষণা মুহূর্তের মধ্যে জনগণের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়। বর্তমানে সেনাবাহিনী, সরকারি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগসমূহের মধ্যেও বেতার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যের প্রচারের জন্য বেতারের সাহায্য নিয়ে থাকে। বেতারের মাধ্যমে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। বর্তমান বিশ্ব বেতার কার্যক্রম ছাড়া একেবারেই অচল। বেতার শুধু পৃথিবীতে নয় মহাশূন্যেও তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। চাঁদের জগৎ থেকেও আমাদের নিকট সকল তথ্য এবং ছবি পাঠানো আজ আর মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। হয়তো বেতারের মাধ্যমে একদিন সৌরলোকের বিভিন্ন গ্রহ–উপগ্রহেও আমাদের অধিকার অর্জিত হবে।

আমাদের দেশে বেতার ব্যবস্থা : পৃথিবীর প্রতিটি দেশে আজও বেতারের চাহিদা কমেনি। বাংলাদেশে মোবাইলের মাধ্যমে FM ব্যান্ড আজ বেশ জনপ্রিয় এবং প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। সরকারি চ্যানেলের পাশাপাশি অনেকগুলো বেসরকারি চ্যানেল আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছে।

উপসংহার : রেডিয়ো বা বেতার সভ্যতার বাহন হিসেবে কাজ করে চলেছে। এর ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। বেতারতরঙ্গ দ্বারা সাঁজোয়া গাড়ি চালানোর ব্যবস্থা, উড়োজাহাজ চালানোর পরিকল্পনা ইত্যাদি অধিকাংশই আজ বাস্তবায়িত হতে চলেছে ও হচ্ছে। বেতার মানবসভ্যতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বেতার অদূর ভবিষ্যতে তার চাহিদা ও কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে— এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

১৪২. টেলিভিশন
অথবা, জাতীয় জীবনে টেলিভিশনের ভূমিকা

ভূমিকা

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই

দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

টেলিভিশন আধুনিক বিজ্ঞানের একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার। প্রাত্যহিক জীবনের সুখ–দুঃখের মাঝে চিত্তবিনোদনের জন্য বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন টেলিভিশন। দূরমাধ্যম–শিক্ষার সার্থক মাধ্যম এটি। শিক্ষাগ্রহণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় সম্পর্কে দার্শনিকরা বলেন যে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ। কিন্তু সাধারণত আমরা যেকোনো একটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি। শুধু বই পড়ে আমাদের যে শিক্ষা হয় তা একান্তই মনন ও চিন্তন সাপেক্ষ। চিত্র দর্শন ও দেশভ্রমণের মাধ্যমে যে শিক্ষা তা দেখার মাধ্যমে শিক্ষা। তবু দেশভ্রমণ বা চিত্র সংগ্রহের ব্যাপারটা খুব সহজ নয় বলে আমরা সে প্রয়োজন মেটাতে পারি টেলিভিশনের মাধ্যমে। টেলিভিশন আবিষ্কারের ফলে এ শিক্ষার পথ সহজ হয়েছে।

টেলিভিশন কী : টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা দূরের কথা শুনতে পাই, আবার যে কথা বলে তাকেও দেখতে পাই। টেলিভিশন শব্দটি ল্যাটিন টেলি (Tele) এবং ভিসিও (Visio) শব্দ হতে এসেছে। টেলি (Tele) শব্দের অর্থ 'দূরত্ব' এবং ভিসিও (Visio) শব্দের অর্থ 'দেখা' অর্থাৎ দূর হতে দেখা বা দূরদর্শন।

টেলিভিশন আবিষ্কার : শব্দের মতো ছবিও বায়ু তরঙ্গে দূরে যেতে পারবে— এ বিশ্বাস নিয়ে টেলিভিশনের প্রাথমিক গবেষণা আরম্ভ হয়। সর্বপ্রথম জার্মানি দার্শনিক পল নেপকো টেলিভিশন সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর তত্ত্বের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণা চালানো হয়। তারপর এই জনপ্রিয় গণমাধ্যমটি ১৯২৬ সালে আবিষ্কার করেন ইংরেজ বিজ্ঞানী জন এল বেয়ার্ড। ১৯৩৬ সালে সর্বপ্রথম সফলভাবে টেলিভিশন চালু হয় ইংল্যান্ডে। তখন টেলিভিশনের আকৃতি ও কার্যক্রম অন্যরকম ছিল। ক্রমান্বয়ে এর উন্নতি সাধিত হয়। টেলিভিশন বর্তমান রূপ ধারণ করে ১৯৪৫ সালে। এখনো টেলিভিশন নিয়ে চলছে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা— এরই অনিবার্য ফল হলো আধুনিকতম টেলিভিশন।

টেলিভিশনের গঠন–কৌশল : টেলিভিশনের ক্যামেরায় যে ছবি ধরা হয় তাকে ইলেকট্রন পদ্ধতিতে পরিণত করা হয় ভোল্টেজ সিগন্যালে। একেই বলে ভিডিয়ো সিগনাল বা চিত্রসংকেত। টেলিভিশন টাওয়ার থেকে সেই চিত্রসংকেতকে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রেরণ করা হয় চারদিকে। আর টেলিভিশন এন্টেনার সেই চিত্রসংকেতকে গ্রহণ করে পাঠিয়ে দেয় টেলিভিশনের ভেতর। টেলিভিশনের পর্দাটি কাচের তৈরি। তবে কাচের ভেতরের পিঠে 'ফসফর' নামে একটি প্রতিপ্রভ পদার্থের আস্তরণ লাগানো থাকে। এ প্রতিপ্রভ আস্তরণের ফলে ইলেকট্রন কণা টেলিভিশনের পর্দায় কোনো একটি জায়গায় আঘাত করলেই সেখান থেকে বিচ্ছুরিত হয় আলো। সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটে আলোর গতিতে অর্থাৎ সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার বেগে। ফলে শব্দসংকেত ও চিত্রসংকেত টেলিভিশন কেন্দ্রে থেকে একসাথেই প্রেরিত হয়। দুটি সংকেতের সামঞ্জস্য বিধানের ফলে একইসাথে ছবির দর্শন ও শব্দের শ্রবণ সম্ভব হয়।

টেলিভিশনের ব্যবহার : টেলিভিশনের ব্যবহার পৃথিবীর সকল উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আমাদের দেশে টেলিভিশনের প্রথম ব্যবহার আরম্ভ হয় ১৯৬৫ সাল থেকে। আমাদের দেশে টেলিভিশন মূলত বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে গণশিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানমালায় যুক্ত রয়েছে।

টেলিভিশন শিক্ষা ও চিত্তবিনোদনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম : ইউরোপের দেশগুলোতে জনশিক্ষার ব্যাপারে টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে আমাদের দেশেও শিক্ষাবিষয়ক অনুষ্ঠান টেলিভিশনে চালু হয়েছে। আমাদের দেশে টেলিভিশন চিত্তবিনোদনের জন্য শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। দেশ–বিদেশের সংবাদ, দেশি–বিদেশি সিনেমা, নাটক, নৃত্যগীতি, বিতর্ক–প্রতিযোগিতা প্রভৃতি আনন্দদায়ক অনুষ্ঠানগুলো টেলিভিশনে দেখানো হয়।

জাতীয় জীবনে টেলিভিশনের গুরুত্ব : সার্থক প্রচার মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনের বিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান। শ্রবণ ও দর্শনের নানা রকম সুযোগ টেলিভিশনের মাধ্যমে লাভ করা যায় বলে জনগণের মধ্যে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। টেলিভিশনের মাধ্যমে মানুষের সুপ্ত প্রতিভার জাগরণ ঘটিয়ে তা বিশ্বের মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়।

জনশিক্ষায় টেলিভিশন : শিক্ষা একটি জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষার অগ্রগতি ছাড়া কোনো জাতি উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। নিরক্ষরতা যেকোনো জাতির জন্য একটি মারাত্মক অভিশাপ। আর আমাদের দেশের মানুষ এই অভিশাপের শিকার। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ নিরক্ষর। আর টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করে নিরক্ষর জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা যায়।

বিনোদন হিসেবে টেলিভিশন : বিনোদন জীবনের একটি অংশ। জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে মানুষ সারাদিন পরিশ্রম করে। সারাদিন কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আর কি–ই বা করার থাকে একজন মানুষের। আর মনের প্রফুল্লতার জন্য এ সময়ে তার একটু বিনোদন প্রয়োজন। আর এই প্রফুল্লতা আসতে পারে টেলিভিশনের মাধ্যমে।

খেলাধুলায় টেলিভিশন : ব্যক্তিজীবনে যেমন, তেমনি সমগ্র জাতীয় জীবনেও খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। খেলাধুলা থেকে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শেখা যায়। চরিত্র গঠনেও খেলাধুলার উপযোগিতা কম নয়। আজ বিশ্বের বহু দেশে নানা ধরনের খেলা হচ্ছে। হচ্ছে বিশ্বকাপ ফুটবল, বিশ্বকাপ ক্রিকেট, অলিম্পিক গেমস, হকি, টেনিস ইত্যাদি। আর এসব খেলাধুলা টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হয়।

কৃষি উন্নয়নে টেলিভিশন : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক নিরক্ষর বলে তারা আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ। প্রয়োজনীয় সময় জমিতে চাষ দেওয়া, উন্নত বীজ সংগ্রহ করা, মাটির প্রকৃতি অনুসারে চারা রোপণ করা, পরিমাণমতো কীটনাশক ও সার ব্যবহার করা, সময়মতো জমিতে সেচ দেওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে অধিকাংশ কৃষকেরই ধারণা নেই। নিরক্ষর বলে বই পড়ে এসব জানার সুযোগ নেই তাদের। টেলিভিশনের মাধ্যমে নানা অনুষ্ঠান করে এ সমস্যা যথেষ্ট পরিমাণে দূর করা যায়।

সচেতনতা সৃষ্টিতে টেলিভিশনের ভূমিকা : বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর। তাই তারা জীবনের ও জাতির বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন নয়। টেলিভিশন সমাজের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন বিষয় জনগণের সামনে সুন্দরভাবে তুলে ধরে। যেমন : এইডস, আর্সেনিক, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ দূষণ, বিভিন্ন কুসংস্কার ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা ও রোগ সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলে টেলিভিশন। কোনো নতুন বিষয় সম্পর্কে টেলিভিশনের মাধ্যমেই জনগণ জানতে পারে এবং পরিচিত হতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে টেলিভিশন : টেলিভিশনের মাধ্যমে তথ্য প্রদান, বিনোদন ও সমাজ সচেতনতামূলক কার্যপ্রণালি অনুষ্ঠানাকারে প্রচারিত হচ্ছে। সাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক ও উচ্চশিক্ষা বিস্তারে টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। টেলিভিশনের মাধ্যমে একসাথে অনেক লোককে হাতে–কলমে কারিগরি শিক্ষা দেওয়া যায়। আমাদের দেশে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাসহ, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা ও চিকিৎসা–বিষয়ক কয়েকটি অনুষ্ঠান চালু রয়েছে। প্রচারিত এসব অনুষ্ঠানমালা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিকল্প হলেও এর বাস্তব সুফল পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন সমাজ ও রাষ্ট্রের অনেকেই।

জনমত গঠনে টেলিভিশন : জনমতই গণতন্ত্রের নিয়ন্ত্রক। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সদাজাগ্রত জনমত সরকারকে স্বৈরাচারী হওয়ার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। একদিকে জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষা, অভাব–অভিযোগ প্রভৃতি একমাত্র জনমতের মাধ্যমেই প্রকাশিত হতে পারে, অপরদিকে সরকারের সাফল্যের জন্য জনমতের সমর্থন খুবই প্রয়োজন। গঠনমূলক আলোচনা ও সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে টেলিভিশন।

টেলিভিশনের উপকারিতা : টেলিভিশন আজ আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটা শিক্ষার মাধ্যম। টেলিভিশন বিশ্বের সুদূর কোনো একপ্রান্তের সংবাদ ও ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে অন্যপ্রান্তে প্রত্যক্ষ ও জীবন্তরূপে পরিবেশন করতে পারে। টেলিভিশনের মাধ্যমে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ছাড়াও কৃষি, শিল্প, পরিবার পরিকল্পনা ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। আমাদের এ অনুন্নত দেশে টেলিভিশনের ভূমিকা অন্যতম। সুতরাং টেলিভিশনের উপকারিতা যথেষ্ট।

অপকারিতা : টেলিভিশন যেমন আমাদের বিশুদ্ধ আমোদ বিতরণ এবং শিক্ষাদানের কাজ করে, তেমনি এর কিছু কিছু অপকারিতাও রয়েছে। টেলিভিশন অধিক সময় ধরে দেখলে দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হয়। ডিস এন্টিনার প্রভাবে আজকাল টেলিভিশনে অনেক অশ্লীল ছবি প্রদর্শন করা হচ্ছে। অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান বালক–বালিকা ও যুবক–যুবতীদের অধঃপতনের দিকে পরিচালিত করে।

উপসংহার : বর্তমান যুগে টেলিভিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম। মানুষের যুগ–যুগান্তরের স্বপ্ন ও কল্পনা আজ টেলিভিশনের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠেছে। জনমত গঠন, সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ প্রচার, দেশি–বিদেশি ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সচেতন করতে এবং শিক্ষা–সংস্কৃতির প্রসারে টেলিভিশনের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। টেলিভিশন শুধু আজকের মানুষের জন্যই নয়, ভবিষ্যতের জন্যও এক গুরুত্বপূর্ণ প্রচার মাধ্যম। কাজেই আমরা আশা করব, মানুষের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের সুপরিচালনা দেশে কল্যাণ আনয়ন করবে।

১৪৩. দৈনন্দিন জীবনে সংবাদপত্র

অথবা, জাতীয় জীবনে সংবাদপত্রের ভূমিকা
অথবা, জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা
অথবা, আধুনিক জীবন ও সংবাদপত্র

ভূমিকা : আধুনিক যুগে সংবাদপত্র সভ্য মানুষের সভ্যতার অঙ্গবিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যুগের মানুষ সংবাদপত্রের অস্তিত্বহীনতার কথা কল্পনাও করতে পারে না। সংবাদপত্র মানুষের কর্মজীবনের গতিকে অসাধারণভাবে প্রসারিত করেছে। বিশাল পৃথিবীকে আমাদের হাতের মুঠোয় তুলে ধরার ভার নিয়েছে সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রের উৎপত্তি : সর্বপ্রথম ভেনিসে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। একাদশ শতাব্দীতে চীনে একপ্রকার সংবাদপত্র মুদ্রিত হতো। পাক–ভারতের মোগল সম্রাট শাহেনশাহ আওরঙ্গজেবের আমলে রাজকর্মচারীদের মধ্যে একপ্রকার হস্তলিখিত সংবাদপত্র বিলি হতো। ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথের সময়ে সর্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় বলে শোনা যায়। ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে 'ইন্ডিয়া গেজেট' প্রকাশিত হয়। এটাই ভারতের সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র বলে অনেকে মনে করেন। অবিভক্ত বাংলায় সর্বপ্রথম খ্রিষ্টান মিশনারিগণ কর্তৃক প্রচারিত 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব–পাকিস্তান) প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'আজাদ'।

বিভিন্ন প্রকার সংবাদপত্র : মুদ্রণযন্ত্রের উন্নতির ফলে সংবাদপত্রের সংখ্যা হয়েছে অগণিত। বর্তমানে পৃথিবীর সভ্য দেশগুলোতে দৈনিক, সাপ্তাহিক, অর্ধসাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, বার্ষিক প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এ সকল পত্রিকায় রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, জ্ঞানবিজ্ঞান, ব্যাবসাবাণিজ্য, সাহিত্য ও শিল্পকলা প্রভৃতি মানবসমাজের যাবতীয় আবশ্যকীয় বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা : জগতে লোকশিক্ষার জ্ঞানবিস্তার ও সর্বজাতি সমন্বয়ে যতগুলো পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে, এর মধ্যে সংবাদপত্রের আসন সর্বশ্রেষ্ঠ। এটি আধুনিক সুসভ্য জগতে নানাবিধ কল্যাণকর কার্যসাধনে নিয়োজিত। সংবাদপত্র পাঠ না করলে কারও জ্ঞান ও শিক্ষা পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না। পুস্তকের শিক্ষা সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। সংবাদপত্রের শিক্ষা অসীম ও অভিনব। সংবাদপত্র পাঠ করলে মানুষের পার্থিব জ্ঞান আহরণের পথ প্রশস্ত হয়। পূর্বে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে মানুষ যে জ্ঞান লাভ করত ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করত, আজ সংবাদপত্রের কল্যাণে আমরা ঘরে বসেই তা করতে পারি। আজকালকার সংবাদপত্র শুধু সংবাদপত্র নয়, অধুনা এতে সংবাদ ব্যতীত নানা প্রকার সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, চিত্র, নানারূপ গবেষণামূলক বিষয়, বিজ্ঞান ও ক্রীড়াবিষয়ক বিবরণ, বাজারদর, শেয়ার–মার্কেটের খবর প্রকাশিত হয়। সুতরাং তা শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, বণিক, বালক, বৃদ্ধ সকল শ্রেণির লোকেরই জ্ঞান বৃদ্ধি করে; সকলেরই কৌতূহল নিবৃত্তি করে থাকে।

শিক্ষা বিস্তারে সংবাদপত্র : সংবাদপত্রের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা, তথ্য পকাশ করা ও বিশেষ করে প্রণোদিত করা। সংবাদপত্র বহুক্ষেত্রে পাঠককে কোনো বিশেষ ব্যাপারে অংশ নিতে প্ররোচিত করে। তখন প্রখর সত্যের আলোকে কোনটি সত্য এবং কোনটি অসত্য তা সে চিনতে শেখে। উনিশ শতকের বাংলায় যে নবজাগরণের উদ্‌বোধন ঘটেছিল, তাতে বিরাট ভূমিকা ছিল সংবাদপত্রের। সংবাদপত্র পাঠ করেই মানুষ জানতে পেরেছিল, বুঝতে পেরেছিল, কেন দেশে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটা উচিত, বাল্যবিবাহ সমাজে ও জীবনে কতখানি ক্ষতিকর, বিধবা বিবাহ কতখানি শাস্ত্রসম্মত, অন্ধ ধর্মচেতনা জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসারকে কতখানি আবদ্ধ করে রাখে। বর্তমানে আমাদের সংবাদপত্রগুলোতে শিক্ষা বিভাগ চালু হয়েছে। এতে কিছুটা হলেও শিক্ষার্থীরা উপকৃত হচ্ছে এবং শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র : সংবাদপত্রের গুরুত্ব শুধু সংবাদ পরিবেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণকে যথার্থ গণতন্ত্র চর্চায় উদ্‌বুদ্ধ করাও সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। জনমত গঠনে সংবাদপত্রের অপরিমিত শক্তি রয়েছে। সংবাদপত্র কোনো বিষয়ে সমাজের শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে এবং দেশের সংহতি ও প্রগতিকে বিশৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যেতে পারে। কারণ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্র স্বাধীন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত। তবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার যাতে অপপ্রয়োগ না ঘটে, জনগণের গণতান্ত্রিক মানসিকতায় ফাটল ধরে এমন প্রতিবেদন যাতে প্রচারিত না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান : সংবাদ সরবরাহ করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে। বাংলাদেশে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা সংক্ষেপে 'বাসস' নামে একটি সংবাদ সংস্থা রয়েছে। রয়টার (Reuter) নামক সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর সর্বত্র শাখা বিস্তার করেছে। তা পৃথিবীর সকল দিক হতে খবর সংগ্রহ করে তারযোগে পৃথিবীর সকল দেশে প্রেরণ করে থাকে। এ সকল সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে সংবাদ ক্রয় করে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

সংবাদপত্রের হিতকর ও অহিতকর প্রভাব : জাতীয় জীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব অসীম। এ যুগে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার আছে সংবাদপত্রের মাধ্যমে তার মতামত প্রকাশ করার। তা জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করে এবং জনসাধারণের সাংস্কৃতিক মনকে জাগ্রত করে। তা জনমত গঠনের বিশেষ সহায়ক। সমাজসংস্কার ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে এর দান অতুলনীয়। তা সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের সংযোগসাধন করে। প্রায়ই দেখা যায়, সাংবাদিকগণ ও পরিচালকগণ সংবাদপত্রকে দলগত ও

সম্প্রদায়গত স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবহার করেন। এতে জনসাধারণ বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়। এরূপ সাংবাদিকতা দেশ ও জাতির পক্ষে বিপজ্জনক। তা অবশ্য বর্জনীয়।

উপসংহার : রাষ্ট্রের বিধিব্যবস্থা প্রচারক্ষেত্রে ও জাতি গঠনের কাজে সংবাদপত্রের দান অসামান্য। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তাই সাংবাদিকতায় আমাদের আরও অগ্রসর হতে হবে। উন্নত ধরনের সংবাদপত্রগুলো যদি দল-নিরপেক্ষ হয় তা হলে দেশের ও সমাজের পক্ষে আরও মঙ্গলজনক হবে। ন্যায় ও সত্যকে পাথেয় করে জনসাধারণকে নানাবিষয়ক শিক্ষার আলো দান করার গুরুদায়িত্ব সংবাদপত্রকে বহন করতে হবে। তা হলেই আমাদের সাংবাদিকতা সার্থক হবে, আমাদের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী হবে।

স্মৃতিচারণ

১৪৪. তোমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন
অথবা, স্মরণীয় ঘটনা

ভূমিকা : সেই ছেলেটা! সেই জবা গাছটা! চলতে চলতে আজও থেমে যাই তার তলায়, আর মনে পড়ে সেই দিনের কথা। ঢং ঢং ঢং ঢং ছুটির ঘণ্টা পড়ল। ঘণ্টা যেন বাজতেই চায় না। কী নিদারুণ উদ্‌বেগে আর আনন্দে যে স্কুলে প্রথম তিনটি পিরিয়ড কাটলো। মাস্টার সাহেবের ক্লাসের একটি কথাও কানে ঢোকেনি। স্কুলে গিয়েই যখন শুনলাম কে একজন অদ্ভুত ধরনের লোক আসবে নানা রকম আশ্চর্য জিনিস দেখাবে। মনে মনে ভাবছিলাম সেই Hamelin-এর কথা— অদ্ভুত তার বেশভূষা, অদ্ভুত তার নাক, আরও অদ্ভুত তার কাজ। বেশ মনে পড়ে ষষ্ঠ শ্রেণির মধ্যে আমি সকলের আগে স্কুলের মাঠে দৌড়ে গিয়ে হাজির হলাম। তারপর সারা স্কুলের ছেলে হইচই করে সেখানে এসে হাজির হলো।

স্কুলের মাঠে ছেলে আর ধরে না। মাঠের এক কোনায় একটি লম্বা বাঁশ মাটি থেকে আকাশের দিকে উঠে গেছে। আসার সময় সেটা দেখে আসিনি, বুঝলাম তখন পোঁতা হয়েছে; কী হবে কী জানি। সেদিকে নজর ছিল না; চঞ্চল চোখ চারদিকে কীসের সন্ধান করছিল। ছেলেরা গোলমাল করছে, নানা রকম মন্তব্য করছে। তাদের গোলমাল ছাড়িয়ে ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্ শব্দ হলো। "বাজিকর এসেছে! বাজিকর!"—একটা সাড়া পড়ে গেল। 'বাজিকর'। চমৎকার নাম তো।

লোকটিকে দেখলাম। মাথায় আধময়লা একটা পাগড়ি, তারই পাশ দিয়ে পাকা শণের মতো লম্বা সাদা চুল দুইদিকে বাবরি করে নেমে এসেছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। লম্বা সাদা গোঁফ পাকিয়ে লতিয়ে গালের দুইপাশে ঝুলে পড়েছে। কোটরের ভেতর থেকে একটা চোখ জ্বলজ্বল করছে, আরেক চোখে ছানিপড়া। সে মুখটি আজও ভুলিনি, কোনোদিন ভুলতে পারব কিনা জানি না। লোকটার গায়ে শতচ্ছিন্ন একটা কালো কোট, পরনে লুঙ্গির মতো করে পরা একটা ময়লা চিরকুট কাপড়। কাঁধে হেলানো একটা লাঠিতে মস্ত বড়ো একটা ঝোলা ঝুলছে। লোকটার সঙ্গে একটা ছেলে। প্রথমে ছেলেটিকে চোখে পড়েনি, এবার দেখলাম ঠিক আমার বয়সের একটি ছেলে, পরনে নীল হাফপ্যান্ট, গায়ে কিছু নেই। শুনলাম ছেলেটি বুড়োর নাতি। এরা দুজনে দুজনের আত্মীয়। এরা দুজনে আশ্চর্য খেলা দেখায়। ছেলেটাও দেখাতে পারে। উঃ! এটুকু ছেলে; আমার চেয়ে একটুও বড়ো নয়। আমিও যদি ওর মতো বাজিকর হতে পারতাম!

বাজিকরের আর্থিক অবস্থা : "শোনো ছেলেরা," হেডমাস্টার সাহেবের গলা। সব চুপ। তিনি বললেন, "এই লোকটি আমাদের আশ্চর্য রকমের খেলা দেখাবে। তোমরা কিছু কিছু পয়সা এদের দাও। এরা দুদিন খায়নি।" ইস দুইদিন খায়নি! এই ছেলেটাও। চীনাবাদাম খাবার পাঁচ টাকা পকেট থেকে বের করলাম। সেই ছেলেটাই ভিড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে হাত পেতে সকলের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে। 'বাবুজি' বলে আমার সামনে এসে হাত পেতে দাঁড়াল। একটা গোটা দশ টাকা সঙ্গে থাকলে সেদিন ওকে দিতে একটুও দ্বিধাবোধ করতাম না। এদিকে বুড়ো বাজিকর তার সরঞ্জাম ঝোলা থেকে বের করে সাজিয়ে ফেলেছে। আর একবার প্রাণ-নাচানো শব্দ উঠল, ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্। তারপর বুড়ো কত রকম অদ্ভুতভঙ্গিতে বকে যেতে লাগল।

খেলা শুরু হয়ে গেল। দেখতে দেখতে এক কৌটা চাল মুড়ি হয়ে গেল। সেকেন্ড মাস্টার সাহেবের ফাউন্টেন পেন হেডমাস্টার সাহেবের জামার পকেট থেকে বের হলো। নিমাইয়ের সিল্কের জামাটা চেয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে পুড়িয়ে ছাই করে, তারপর ঝোলার ভেতর থেকে আস্ত বের করে আনা হলো। ঝাঁপির মধ্যে বসে রইল ছেলেটা ঢাকনি চাপা দিয়ে। বুড়ো একখানা তলোয়ার এফোঁড়-ওফোঁড় করে চালিয়ে দিলো তার মধ্য দিয়ে। ঢাকনা খুলে বের করা হলো একটা কালো ভেড়া; ইচ্ছে হলো এই বুড়োর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। সমস্ত পৃথিবীটা যেন বুড়োর বশ।

দুর্ঘটনার বর্ণনা : হঠাৎ সকলে চুপ করে গেল, শেষ খেলা শুরু হচ্ছে। একটা অধীর প্রতীক্ষায় ছেলেরা চেয়ে আছে সামনের দিকে। সেই ছেলেটা বাঁশ বেয়ে উঠে যাচ্ছে। প্রত্যেকে নিশ্বাস শুনতে পাচ্ছে। বুকের স্পন্দনটা নিজের কানে শোনা যাচ্ছে। পড়ে যাবে না তো? না, ঠিক উঠেছে, সাহস বটে, ছেলেটা বাঁশের মাথায় উঠে বসলো। তারপর অত উঁচুতে বাঁশের মাথায় বসে শুয়ে, দাঁড়িয়ে নানা রকম খেলা দেখাল। পরিস্থিতিটা সহজ হলেও তখনও বুক টিপটিপ করছিল। মাস্টার সাহেবরা বারবার ছেলেটাকে নামার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন, কিন্তু বুড়ো ছেলেটাকে আরও উৎসাহিত করছে। এবার ছেলেটা বাঁশের মাথায় পেটের ওপর ভর দিয়ে হাত–পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো, কিন্তু উঠতে গিয়ে হাত ফসকে গেল। বাঁশ জোরে কেঁপে হাতের নাগালের বাইরে চলে গেল। গেল! গেল! সমস্বরে চিৎকার উঠল। আমি ততক্ষণে চোখ বুজে ফেলেছি।

করুণ স্মৃতি : দুদিন খায়নি, ঘাড়টা একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে, মুখ দিয়ে অনেকটা রক্ত উঠেছে, আহা মরে গেল, —কথাগুলো কানে এলো। চোখ মেলে দেখি একদল ছেলে তাকে বয়ে নিয়ে চলেছে হাসপাতালের দিকে। বোঁচকা–বুঁচকি ফেলে বুড়ো পাগলের মতো ছুটছে তাদের পেছনে। বুড়োর গলা ভেঙে গেছে অর্ধস্ফুটস্বর কানে এলো—বাহাদুর ইব্রাহীম। মাঠ ফাঁকা হয়ে গেল। আমি একা দাঁড়িয়েছিলাম। মাঠের কোণে সবুজ ঘাসের ওপর এক ছাপ রক্ত। স্কুলের ছেলেরা সেই কোণটিকে ঘিরে একটা জবাগাছ লাগিয়েছিল। আজও তার ফুলগুলো মনে হয় তারই রক্তে রাঙা হয়ে আছে। আর আমি কোনোদিন বাজি শিখতে চাইনি। শুধু যতবার এখান দিয়ে যাই, ততবারই মনে হয়, এই গাছটা, সেই ছেলেটা।

অর্থনীতি, শ্রম ও সমস্যা

১৪৫. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

ভূমিকা : পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ হচ্ছে এশিয়া। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বদ্বীপ। বাংলাদেশের একদিকে সাগর এবং অপর তিন দিকই পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রভাব অপরিসীম। বাংলাদেশের যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় উদ্যোগ, মূলধন এবং প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এজন্য যথাযথই বলা হয়, "Bangladesh is a rich country inhabited by poor people." অর্থাৎ, "গরিব লোকের বসবাস সংবলিত বাংলাদেশ একটি ধনী রাষ্ট্র।" বস্তুত প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের অভাবে বাংলাদেশ আজও অনুন্নত রয়ে গেছে। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক সম্পদ : প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত সম্পদকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। জল, স্থল, বায়ু, খনিজ পদার্থ, নদ–নদী, আবহাওয়া, জীবজন্তু প্রভৃতি মানুষকে বহু সম্পদ উপহার দিয়েছে। এই সকল সম্পদ মানুষের উৎপাদন ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। বস্তুত দেশের ভূভাগ ও প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণের ওপর জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে।

প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব : প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব দেশের উন্নয়নে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার দেশের শিল্পোন্নয়নে সহায়তা, জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করে।

২. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সর্বদা প্রাকৃতিক সম্পদের পথ ধরে অগ্রসর হয়। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও পরাধীন আমলে এর যথোচিত ব্যবহার হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশে পরিকল্পিত উপায়ে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করে শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করা যেতে পারে।

৩. প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা দেশের উৎপাদন ব্যাহত এবং অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ।

৪. একটি দেশের খাদ্য, বস্ত্র, কৃষি ও শ্রমের দক্ষতা সে দেশের জলবায়ু, অরণ্য ও পর্বতমালার ওপর নির্ভর করে। অপর দিকে সমুদ্র ও নদী দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধি করে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ : দেশে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃতি ও বিন্যাস ভিন্নতর। প্রাকৃতিক সম্পদের উপকরণসমূহ দেশের উৎপাদনব্যবস্থা তথা সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো :

কয়লা : শক্তির অন্যতম উৎস কয়লা। কলকারখানা, রেলগাড়ি, জাহাজ প্রভৃতি চালাবার জন্য কয়লা ব্যবহৃত হয়। জ্বালানি হিসেবেও কয়লা ব্যবহৃত হয়। কয়লা সম্পদে বাংলাদেশ তত উন্নত নয়। এদেশের দিনাজপুর, ফরিদপুর, রাজশাহী, সিলেট, বগুড়া, নওগাঁ প্রভৃতি জেলায় উৎকৃষ্টমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। ১৯৮৫ সালে দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া এলাকায় বিরাট কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে।

চুনাপাথর : সিলেট জেলার জাফলং , জকিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ জেলায় ভাজ্গারঘাট, বাগালিবাজার, লালঘাট এবং চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডু ও কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন দ্বীপে চুনাপাথর পাওয়া যায়। সিমেন্টের কাঁচামাল হিসেবে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গ্লাস, সাবান, কাগজ, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি শিল্পে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়।

তামা : বাংলাদেশের রংপুর জেলার রাণীপুকুর ও পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সঙ্গে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব খনি হতে তামা উত্তোলনের জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বাসনপত্র, মুদ্রা প্রভৃতি প্রস্তুত করতে তামার প্রয়োজন হয়।

চীনামাটি : বাংলাদেশের নেত্রকোনার বিজয়পুর এবং রাজশাহী জেলার পত্নিতলায় চীনামাটি পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে নেত্রকোনা জেলার বিজয়পুর গ্রামে প্রায় ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং কয়েক মিটার প্রস্থ এলাকা জুড়ে প্রধান খনি অবস্থিত। এ খনিতে সঞ্চিত চীনামাটির পরিমাণ আনুমানিক ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার টন। বাংলাদেশের মোট চাহিদার প্রায় ৫০ ভাগ চীনামাটি এ খনি হতে উত্তোলন করা হয়। পত্নিতলার চীনামাটির খনিটি ৪১১ মিটার মাটির নিচে এবং স্তরটি প্রায় ৯ মিটার পুরু। চীনামাটি প্রধানত বাসনপত্র, বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর, স্যানিটারি সরঞ্জাম ইত্যাদি তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কৃত্রিম বস্ত্র ও বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক শিল্পেও চীনামাটি ব্যবহৃত হয়।

খনিজ তেল : বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে খনিজ তেল আছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। হরিপুরের প্রাকৃতিক গ্যাসের সপ্তম কূপে তেল পাওয়া গেছে। এ কূপ থেকে দৈনিক প্রায় ৬০০ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল তোলা হচ্ছে। অপরিশোধিত তেল চট্টগ্রামের তেল শোধনাগারে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। অপরিশোধিত তেল থেকে পেট্রোল, কেরোসিন, বিটুমিন ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়।

সিলিকা বালু : প্রধানত কাচ নির্মাণে সিলিকা বালু ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া রাসায়নিক দ্রব্য, রং, অগ্নিরোধক ইট ইত্যাদি তৈরিতে সিলিকা বালু ব্যবহার করা হয়। সিলেটের নয়াপাড়া, ছাতিয়ানি, শাহজী বাজার ও কুলাউড়া; চট্টগামের দোহাজারী; জামালপুরের গারো পাহাড়ের বালুঝুরি এবং কুমিল্লা জেলার কালিকাপুর মৌজায় সিলিকা বালু পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ১ লক্ষ চার হাজার বর্গফুট সিলিকা বালু উৎপাদিত হয়।

গ্যাস : বাংলাদেশ পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় খনিজ সম্পদে পিছিয়ে আছে। তবে এদেশ প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ, যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা ৭০ ভাগ পূরণ করে থাকে। ফেব্রুয়ারি ২০০০ পর্যন্ত দেশে আবিষ্কৃত মোট গ্যাসক্ষেত্র ২২টি। বর্তমানে ১২টি ক্ষেত্রের ৪৪টি কূপ হতে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। বর্তমান বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের পরিমাণ প্রায় ১৩.৭৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। গ্যাস নানা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

কঠিন শিলা : বাঁধ নির্মাণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজে কঠিন শিলা ব্যবহৃত হয়। রংপুর জেলার রানীপুকুর ও শ্যামপুর এবং দিনাজপুরে কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। রংপুরের রানীপুকুর থেকে বৈদেশিক সহযোগিতায় শিলা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন : বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার কম নয়। কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে ফার্নেস তেলের পরিবর্তে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। যেমন : সিরাজগঞ্জ, শাহীবাজার, আশুগঞ্জ, ঘোড়াশাল, শাহবাজপুর ইত্যাদি। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় কম হয়।

শিল্প–কলকারখানার জ্বালানি : প্রাকৃতিক গ্যাস আমাদের শিল্প–কলকারখানায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এতে জ্বালানি সমস্যা লাঘব হয়। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

গন্ধক : অ্যাসিড পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, বারুদ, কীটপতঙ্গনাশক ঔষধ, দিয়াশলাই, আতশবাজি প্রভৃতি তৈরিতে গন্ধক ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রাম জেলার কুতুবদিয়া দ্বীপে গন্ধক পাওয়া গেছে।

নুড়ি পাথর : সিলেট জেলার লুবা, ভোলাগঞ্জ ও জিয়নগঞ্জ; দিনাজপুর জেলার পঞ্চগড় এবং লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রচুর নুড়ি পাথর পাওয়া যায়। প্রধানত রাস্তাঘাট, গৃহ, পুল, কালভার্ট, রেললাইন প্রভৃতি নির্মাণে নুড়ি পাথর ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি নুড়ি পাথর পাওয়া যায় সিলেটে।

খনিজ বালি : চট্টগ্রাম জেলার কুতুবদিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকায় প্রচুর Radio Actire Sand পাওয়া গেছে। এর মোট পরিমাণ ৫ লক্ষ টন বলে অনুমান করা হয়। এতে প্রচুর ভারী খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকায় এটি ভারী ধাতব শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লবণ : খনিজ সম্পদ হিসেবে লবণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে কোনো লবণের খনি না থাকলেও সমুদ্রের লোনা পানি আটকে কুটিরশিল্পের ভিত্তিতে উপকূলীয় জেলাগুলোতে প্রচুর লবণ উৎপাদন করা হয়। সরকারের অর্থানুকূল্যে এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বছরে প্রায় ২ কোটি মন লবণ উৎপাদন করা হয়। লবণ উৎপাদনশিল্পে প্রায় ৫০–৬০ হাজার লোক নিয়োজিত রয়েছে। লবণ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উপসংহার : অতএব দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তেল ও কয়লার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব রয়েছে। তাছাড়া মূলধন ও প্রযুক্তির অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান ও আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

১৪৬. দুর্নীতি : উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ
অথবা, দুর্নীতি : কারণ ও প্রতিকার

ভূমিকা

"দুর্নীতি নীতি নয়
নীতি সে যে মন্দের
সমাজের শত্রু সে
যত প্রতিবন্ধের।"

আজ বাংলাদেশে বহু মানুষের কাছে দুর্নীতিই নীতি। সাধারণ মানুষের কথা ছেড়েই দিলাম, সমাজের যারা গণ্যমান্য, সম্ভ্রান্ত হিসেবে বহুখ্যাত; দুর্নীতি থেকে তাঁরাও মুক্ত নন। বিভিন্ন মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ বহু সরকারি অফিসার— পদাধিকারবলেই যাঁরা সমাজের কাছ থেকে প্রচুর সুযোগ–সুবিধা পেয়ে থাকেন তাঁরাও অসাধু উপায়ে অর্থ রোজগার এমনকি ঘুস–কেলেঙ্কারিতে যখন–তখন জড়িয়ে পড়েন। তাঁরা জনগণকে বলেন, দেশের বৃহত্তর কল্যাণে ত্যাগ–স্বীকার করতে অথচ নিজেরা গড়ে তোলেন ভোগের পাহাড়। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষবাষ্পের মতো ছড়িয়ে পড়া সর্বগ্রাসী দুর্নীতির ভয়াল কালো থাবায় বিপন্ন আজ মানবসভ্যতা। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, সংস্কৃতি, শিল্প, ব্যাবসা–বাণিজ্যসহ সর্বত্রই চলছে দুর্নীতি।

দুর্নীতি কী : দুর্নীতির ইংরেজি শব্দ 'Corruption' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ corruptus থেকে এসেছে, যার অর্থ ধ্বংস বা ক্ষতিসাধন। জাতিসংঘ প্রণীত 'ম্যানুয়াল অন অ্যান্টি করাপশন পলিসি' অনুযায়ী ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারই দুর্নীতি। তাই বলা চলে— দুর্নীতি সমাজের প্রচলিত নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থি বিশেষ ধরনের অপরাধমূলক আচরণ। প্রকৃত গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায় দুর্নীতি। দুর্নীতি বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষতিকর সামাজিক ব্যাধিগুলোর অন্যতম।

দুর্নীতির কারণসমূহ : দুর্নীতি সংঘটনে বেশ কিছু কারণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তিগত কারণের পাশাপাশি পদ্ধতিগত কিছু কারণও দুর্নীতির বিস্তার ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সাধারণভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে দুর্নীতির মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়—

আইনগত ও প্রশাসনিক কারণ :

১. **রাজনৈতিক প্রভাব :** প্রশাসনিক কর্মকর্তারা নিজেদের স্বার্থে রাজনৈতিক দলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন বলে জনপ্রশাসনের আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়।

২. **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব :** প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শাসন আমল থেকেই দুর্নীতি চলে আসছে।

৩. **দায়িত্বে অবহেলা :** নির্দিষ্ট দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব পালনে অবহেলাও দুর্নীতির অন্যতম কারণ।

আর্থসামাজিক কারণ :

১. **ক্রমবর্ধমান ভোগবাদী প্রবণতা :** বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে ভোগবাদী প্রবণতা বেড়ে গেছে তাই লোভ–লালসার কারণে দুর্নীতি বাড়ছে।

২. **নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় :** নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে মানুষ বৃহৎ স্বার্থের কথা ভুলে যায় বলে দুর্নীতি বিস্তৃত হচ্ছে।

৩. **আয়–ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতা :** দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে সাধারণ জনগণ বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের পক্ষে তাদের স্বাভাবিক আয়ে জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এটাকে অনেকে দুর্নীতির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন।

দুর্নীতি ও বাংলাদেশ : দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও সুশাসন আজ হুমকির মুখে পতিত হয়েছে। এ দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা দুর্নীতির ঘুণে আক্রান্ত হয়ে দিনে দিনে ভঙ্গুর হয়ে যাচ্ছে। সমাজজীবনে দুর্নীতির কারণে স্বাধীনতার ৪৯ বছর পরও বাংলাদেশের অর্থনীতি কিংবা জীবনযাত্রার মান অনুন্নত রয়ে গেছে। বার্লিনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ট্রান্সফারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রকাশ করা বিশ্বজুড়ে দুর্নীতির ধারনাসূচক (সিপিআই) ২০১৫–এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম।

দুর্নীতির প্রভাব : সমাজের নানা ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রভাব রয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হলো :

১. **অর্থনৈতিক প্রভাব :** দুর্নীতির ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ে, উন্নয়ন ব্যাহত হয় ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হয়। একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, বিগত ৩৫ বছরে বাংলাদেশে ৫০–৬০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। অতিরিক্ত মুনাফা আদায়, বিভিন্ন অজুহাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করা, চোরাকারবার, খাদ্যে ভেজাল দেওয়া, শুল্ক, খাজনা ইত্যাদি ফাঁকি দেওয়াসহ এ ধরনের অর্থনৈতিক দুর্নীতি বর্তমানে বাংলাদেশকে গ্রাস করেছে।

২. **রাজনৈতিক প্রভাব :** দুর্নীতির কারণে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির কারণে সরকার ও রাষ্ট্রের ওপর জনগণের আস্থা নষ্ট হয় এবং জাতি ক্রমান্বয়ে দিক–নির্দেশনাহীন ও নিরাপত্তাহীন বোধ করে।

৩. **সামাজিক প্রভাব :** দুর্নীতির ফলে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। ক্ষমতাবান শ্রেণির মানুষেরা দুর্নীতির কারণে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে এবং অন্যদিকে দরিদ্র–শ্রেণির মানুষের আয় না বাড়ার ফলে ধনী–দরিদ্রের আয়ের বৈষম্য বেড়ে যায়।

সমাজজীবনে দুর্নীতি/নানা ক্ষেত্রে দুর্নীতি :

১. **প্রশাসনিক দুর্নীতি :** বর্তমানে বাংলাদেশের কোনো সরকারি দপ্তরই দুর্নীতিমুক্ত নয়। ঘুস, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ, ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশাসনে ব্যাপকহারে দুর্নীতি হয়ে থাকে।

২. **আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দুর্নীতি :** উন্নত দেশে পুলিশ প্রশাসন যেখানে জনগণের বন্ধু সেখানে আমাদের দেশের সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, খুন, হত্যা, ধর্ষণের অন্যতম কারণ হলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দুর্নীতি।

৩. **শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে দুর্নীতি :** পরীক্ষায় ব্যাপক নকল প্রবণতা, প্রাইভেট টিউশন, কোচিং সেন্টার, শিক্ষাক্ষেত্রে অযোগ্য নিয়োগ প্রভৃতি এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে।

৪. **অর্থনৈতিক দুর্নীতি :** ব্যবসায়ী মহল কর্তৃক মজুতদারির মাধ্যমে দ্রব্যমূল্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন, চোরাকারবার, খাদ্যে ভেজাল, কর ফাঁকি, ঋণখেলাপি ইত্যাদি অর্থনৈতিক দুর্নীতির মাধ্যমে দেশ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

দুর্নীতি রোধের উপায় : দুর্নীতিকে সমাজ থেকে পুরোপুরি নির্মূল করা না গেলেও সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব। দুর্নীতি রোধে নিম্নোক্ত উপায়সমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করবে :

১. **রাজনৈতিক সদিচ্ছা :** দুর্নীতি রোধের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জন করতে হলে প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার। রাজনৈতিক মূল্যবোধ থেকে তারা যদি সৎ ও আন্তরিক হয় তবে দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব।

২. **কার্যকর সংসদ :** সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন কার্যকর সংসদ। তা না হলে দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভব নয়।

৩. **স্বাধীন বিচার বিভাগ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা :** দেশে স্বাধীন বিচার বিভাগ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। বিচার বিভাগকে প্রশাসন ও সংসদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে। আইনের যথাযথ প্রয়োগ হলে মানুষ দুর্নীতি পরিহার করবে।

৪. **সক্রিয় দুর্নীতি দমন কমিশন :** দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য দলনিরপেক্ষ, স্বাধীন ও সক্রিয় দুর্নীতি দমন কমিশন প্রয়োজন। দুর্নীতি দমন কমিশনের যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে।

৫. **সুষম বেতন কাঠামো ও পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণ :** সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বাজার মূল্যের সাথে সমন্বয় করে সুষম বেতন কাঠামো এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পারিশমিক নির্ধারণ করতে হবে।

৬. **দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করা :** দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে নাগরিক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক সংগঠনগুলো যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে তৎপর হয় তাহলে দুর্নীতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ হবে।

৭. **গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা :** দুর্নীতি রোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীন গণমাধ্যম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

জাতীয় উন্নয়নে দুর্নীতির প্রভাব : দুর্নীতি আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রকেই গ্রাস করে ফেলেছে। যেমন :

(ক) **দুর্নীতি ও জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়া :** দুর্নীতির ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় সরকারি খাতের জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়া। জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত রাখতে দুর্নীতি প্রতিহত করতে হবে।

(খ) **দুর্নীতি ও প্রবৃদ্ধি :** দুর্নীতি এ দেশের উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে অন্যতম অন্তরায়। দুর্নীতি রোধ করা গেলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ২–৩ শতাংশ বেড়ে যেত এবং মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হতো।

(গ) **দুর্নীতি ও বিনিয়োগ :** ব্যাপক দুর্নীতির ফলে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। UNDP-এর মতে, দুর্নীতি কমাতে পারলে বাংলাদেশে প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ অন্তত ৫ শতাংশ এবং বার্ষিক জিডিপির হার ০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেত।

(ঘ) **দুর্নীতি ও মানব উন্নয়ন :** দুর্নীতির প্রভাবে মানব উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। মানব উন্নয়নের সূচক বৃদ্ধি করতে হলে প্রয়োজন সুনীতি, সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা এবং সুশিক্ষা।

(ঙ) **দুর্নীতি ও দারিদ্র্য বিমোচন :** দুর্নীতির কারণে প্রতিবছর গড়ে ১২০০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। ফলে দুর্নীতির কারণে দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি–বেসরকারি নানা প্রয়াস ব্যাহত হচ্ছে।

দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগ : দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন করা হয়। ১৯৫৭ সালে দুর্নীতি প্রতিরোধ চিহ্নিত করা হয়। ২০০৩ সালে গৃহীত দুর্নীতি দমন আইনের ওপর ভিত্তি করে ২০০৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৭ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন পুনর্গঠন ও বিধিমালা প্রণয়নসহ ব্যাপক সংস্কারের ফলে কমিশনের লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

উপসংহার : দেশের আইনব্যবস্থা আরও কঠোর করলে, শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করলে, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শের কথা নতুনভাবে প্রচার করে জনসাধারণের মধ্যে বিবেকবোধ উদ্দীপ্ত করলে সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে। দেশের প্রতি তরুণদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে। দুর্নীতির কালো হাত সমাজজীবনকে গ্রাস করছে তাই এ সামাজিক ব্যাধিকে নির্মূল করার দায়িত্ব সকলকে নিতে হবে।

১৪৭. বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যা ও তার প্রতিকার
অথবা, বাংলাদেশের খাদ্যে ভেজাল ও তার প্রতিকার

ভূমিকা

দেশে সারা বছর পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাব হলে দেখা দেয় খাদ্য সংকট। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের মোট জনসাধারণের জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন সে তুলনায় উৎপাদন কম হলে যে সমস্যা দেখা দেয় তাকে সে দেশের খাদ্য সমস্যা বলে। এর ফলে জনসংখ্যার একটি অংশ পর্যাপ্ত খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়। খাদ্যের অভাবে অনাহারের পাশাপাশি পুষ্টিহীনতা, রোগব্যাধিসহ নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। খাদ্য সমস্যা একটি দেশের জন্য তাই গুরুতর অভিশাপ। কেননা তা সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতেও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোই মূলত খাদ্য সংকটের মতো দুঃসহ সমস্যার শিকার হয়। বাংলাদেশও এ অভিশাপ থেকে রেহাই পায়নি। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী শতকরা আশি ভাগ মানুষই ক্ষুধা ও অপুষ্টির শিকার আর এর প্রধান কারণই হলো দেশে বিরাজমান খাদ্য সংকট।

বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যার স্বরূপ : বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সম্পদ কৃষিজমি। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আবাদি জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন অনেক কম। খাদ্যের এ ঘাটতি মেটাতে প্রতিবছর প্রচুর

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হয়। তারপরও দেশে খাদ্যের অভাব থেকেই যায়। এর পেছনে কিছু প্রাকৃতিক এবং বেশ কিছু মানবসৃষ্ট কারণ বিদ্যমান।

খাদ্য সমস্যার কারণ : বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যার কারণ বহুমাত্রিক। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। উন্নত দেশগুলোতে খাদ্যশস্য আমদানি করে খাদ্য সমস্যা মেটানোর আর্থিক সংগতি রয়েছে। ফলে সেসব দেশে খাদ্য সংকট নেই। কিন্তু বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ তো নয়ই, পর্যাপ্ত আমদানির মতো আর্থিক সংগতিও বাংলাদেশের নেই। বাংলাদেশে এ খাদ্য সংকটের কারণগুলো হলো :

১. লাগামহীন জনসংখ্যার তুলনায় কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ কম। চাষাবাদও হয় প্রাচীন পদ্ধতিতে।
২. উন্নত বীজ, সার এবং কৃষকের অজ্ঞতার অভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না।
৩. প্রকৃতির বৈরী আচরণে মাঝে মাঝে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ফলে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়।
৪. একই প্রক্রিয়ায় চাষাবাদের ফলে জমির উবরতা শক্তি হ্রাস পায়। এ ছাড়া ত্রুটিপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থার কারণে কৃষিজমি ছোটো ছোটো খণ্ডে ভাগ হয়ে যায়, যা শস্য উৎপাদনের বড়ো বাধা।
৫. নগরায়ণের ফলে আবাদি জমির পরিমাণ দিন দিন কমে আসছে।
৬. ভূমিহীন কৃষকেরা বর্গাচাষ করে ন্যায্য ফসল পায় না, ফলে উৎপাদনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। কৃষিঋণের অপর্যাপ্ততার ফলেও উৎপাদন ব্যাহত হয়।
৭. মুনাফালোভী অসাধু ব্যবসায়ীরা পণ্যমূল্য বাড়ানোর লক্ষ্যে স্বল্প সময়ের জন্য খাদ্য মজুদ করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে। চোরাচালানের ফলেও খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়।
৮. উন্নত দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যবাদী নীতির স্বার্থে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাদ্য সংকট তৈরির জন্য এক ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ এ উপনিবেশবাদী খাদ্য রাজনীতির শিকার।
৯. কীটপতঙ্গের আক্রমণে বাংলাদেশে প্রতিবছর ব্যাপক ফসলহানি ঘটে। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণেও কখনো কখনো উৎপাদিত ফসল নষ্ট হয়ে যায়।
১০. বাংলাদেশে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য উন্নত ব্যবস্থা নেই। ফলে দীর্ঘ সময়ের জন্য খাদ্য মজুদ রাখা সম্ভব হয় না।

খাদ্য সমস্যার প্রতিকার : বাংলাদেশে খাদ্য সংকটের ঘাটতি মেটাতে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে প্রতিবছর খাদ্য আমদানি করতে হয়। এর বিরূপ প্রভাব পড়ে জাতীয় অর্থনীতিতে। উন্নয়ন হয় ব্যাহত। তাই এ ভয়াবহ সমস্যার দ্রুত সমাধানে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। এগুলো হলো :

১. চাষাবাদের জন্য উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ এবং নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা অত্যন্ত জরুরি।
২. উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং তাদেরকে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
৩. প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। খাল খনন, নদী খনন ইত্যাদির মাধ্যমে বন্যার সময় অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
৪. একই জমিতে বিভিন্ন সময় শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে হবে।
৫. পতিত ও অনাবাদি জমি কৃষিকাজে ব্যবহার করতে হবে। কৃষিখাতে সরকারি বরাদ্দ বাড়াতে হবে।
৬. সহজ শর্তে কৃষককে ঋণ দিতে হবে। বর্গাচাষিদের উপযুক্ত পাওনা দিলে তারা অধিক উৎপাদনে আগ্রহী হবে।
৭. অসাধু ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারি, মজুতদারদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
৮. উন্নত বিশ্বের আধিপত্য থেকে মুক্তি পেতে বাংলাদেশের জনগণকে সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে সংগঠিত হতে হবে।
৯. খাদ্যশস্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর সহজসাধ্য করার জন্য যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
১০. সুষ্ঠুভাবে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে গুদাম ও হিমাগার নির্মাণ করতে হবে।

উপসংহার : আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে খাদ্য সমস্যা মানুষের জন্য এক ভয়াবহ অভিশাপ। এ যেন 'নীরব দুর্ভিক্ষ'। তাই খাদ্য সংকটকে প্রধান জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নত করতে হবে। তা নিরসনে সরকারকে সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে। পাশাপাশি জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে সচেতনভাবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে অর্থনীতি হবে গতিশীল, প্রগতি হবে অবশ্যম্ভাবী।

১৪৮. অর্থনৈতিক উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা

ভূমিকা : যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে একটি দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে কৃষিপণ্য, শিল্পের কাঁচামাল এবং

শিল্পজাত পণ্য সামগ্রী সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে স্থানান্তর করতে সুবিধা হয়। এর ফলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। শিল্প ও ব্যাবসার প্রসার ঘটে। এজন্য যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা : বাংলাদেশ আকারে ছোটো হলেও এখানে নানা রকম বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এদেশে নদী–নালা, খাল–বিল ও হাওড় পরিপূর্ণ বলে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা কঠিন। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে দক্ষিণাঞ্চলের অনেক অমিল রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের মানুষ যোগাযোগের জন্য স্থলপথের ওপর নির্ভরশীল। আবার দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ যোগাযোগের জন্য জলপথের ওপর নির্ভরশীল। এদেশের আবহাওয়া সবসময় এক থাকে না। বর্ষাকালে দেশের অধিকাংশ জায়গা পানির নিচে চলে যায়। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমস্যা দেখা দেয়। বাংলাদেশের এই ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে এখানে নানা ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বর্তমানে প্রায় সারাদেশকেই যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রকারভেদ : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বিশ্ব আজ যোগাযোগ ও তথ্যবিপ্লবের যুগে প্রবেশ করছে। মানুষ তার সকল বাধা–বিপত্তি ও সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে নিজেকে যোগাযোগের মহাসড়কে যুক্ত করছে। বর্তমান বিশ্বে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও উন্নয়ন এখন সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় যেসব মাধ্যমগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলো নিচে দেওয়া হলো–

রেলপথ : বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর দর্শনা হতে জগতী পর্যন্ত ৫২.৮ কি.মি. রেলপথ চালু হয়। রেলপথ সাধারণত ৩ প্রকারের হয়ে থাকে। এগুলো হলো মিটার গেজ, ব্রড গেজ এবং ডুয়েল গেজ বা মিশ্র গেজ। বাংলাদেশে প্রথম আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চালু হয় ১৯৮৬ সালে। ২০১১ সালের ৪ ডিসেম্বর রেল ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আলাদা রেলমন্ত্রণালয় গঠিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৪৪১টি রেলস্টেশন আছে। দেশের রাজধানী, শহর ও বন্দরের সাথে যোগাযোগের জন্য রেলপথের গুরুত্ব অপরিসীম। ২০১৩ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসারে বাংলাদেশে মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ২৮৭৭ কি.মি.। এদের মধ্যে ১৮৪৩ কি.মি. মিটার গেজ, ৬৫৯ কিমি ব্রড গেজ এবং ৩৭৫ কি.মি. হলো ডুয়েল বা মিশ্র গেজ।

সড়ক পথ : বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বাংলাদেশের সড়ক পথ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কিন্তু আমাদের দেশের সড়ক ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত নয়। বাংলাদেশে সড়ক পরিবহণের সাথে নিয়োজিত সরকারি সংস্থাটির নাম হলো বিআরটিসি। এটি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩ সালের প্রতিবেদন অনুসারে এদেশে ৩৫৭৫ কি.মি. জাতীয় মহাসড়ক, ৪৩২৩ কি.মি. আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ১৩৬৭৮ কি.মি. জেলা রোড রয়েছে। তবে সাম্প্রতিককালে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলেও পূর্ণাঙ্গ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব এখনও হয়নি।

নৌপথ : বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থায় নৌপথের বিশেষ অবদান রয়েছে। নদী–মাতৃক দেশ হওয়ায় অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব সর্বাধিক। বাংলাদেশ নৌ–পরিবহণ সংস্থার নাম হলো 'বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ–পরিবহণ কর্তৃপক্ষ'। বর্তমানে বাংলাদেশের নদীপথের দৈর্ঘ্য ৮৪০০ কি.মি.। বাংলাদেশে সারা বছর নাব্য নদীপথের দৈর্ঘ্য ৫২০০ কি.মি.। নৌপথে স্টিমার, লঞ্চ, কার্গো, ইঞ্জিনচালিত নৌকা ও সাধারণ নৌকা চলাচল করে। দেশে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণেও এর অবদান রয়েছে। আমাদের দেশের মোট যাত্রী ও পণ্যসামগ্রীর প্রায় ৭৫ ভাগই নৌপথে পরিবাহিত হয়।

বিমানপথ : আকাশপথে বিমানের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে যাওয়া সম্ভব। ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ৩টি বিমানবন্দর রয়েছে। এগুলো হলো ঢাকায় অবস্থিত হজরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রামে অবস্থিত শাহ–আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও সিলেটে অবস্থিত ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি ১৯৮০ সালে চালু হয়। বাংলাদেশের যশোর, কক্সবাজার, বরিশাল, রাজশাহী, ঈশ্বরদী, সৈয়দপুর এবং ঠাকুরগাঁয়ে অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর রয়েছে। বাংলাদেশের বিমান পরিবহণের উন্নতির জন্য প্রথম বেসরকারি এয়ারলাইন্স চালু হয় ১৯৯৫ সালের ১৬ জুলাই। বেসরকারি বিমান সংস্থাগুলোর মধ্যে অ্যারোবেঙ্গল এয়ারলাইন্স, জিএমজি এয়ারলাইন্স, বেস্ট এভিয়েশন এবং এয়ার পারাবত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে অন্যান্য মাধ্যমের ভূমিকা : শুধু পরিবহণ ব্যবস্থার মাঝেই আমাদের যোগাযোগ সীমাবদ্ধ নয়। যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরও কিছু মাধ্যম আছে যেগুলো আমরা নিত্যদিন ব্যবহার করে যাচ্ছি। এগুলো যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করছে। যেমন– ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া। এই ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া বলতে মোবাইল, টেলিফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদিকে বুঝানো হয়। এই প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারের ফলে মানুষ ঘরে বসেই বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের খবর নিতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন গণমাধ্যম আমাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ডাক ব্যবস্থা : ডাক ব্যবস্থা বাংলাদেশের যোগাযোগের সবচেয়ে প্রাচীন মাধ্যম। ভারতীয় উপমহাদেশে ১৭৭৪ সালে ডাক সার্ভিস চালু হয়। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ইসরাইল ব্যতীত পৃথিবীর সকল দেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। ডাক বিভাগকে আধুনিক করার জন্য ১৯৮৬ সালে পোস্ট কোড চালু করে। ২০১৩ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসারে বাংলাদেশে ডাকঘরের সংখ্যা ৯৮৮৬টি।

টেলিফোন ও মোবাইল : ২০০১ সালের ১৬ এপ্রিল বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল ফোন চালু হয় ১৯৯০ সালের ৫ জানুয়ারি। ১৯৯২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে কার্ড ফোন চালু হয় এবং ১৯৯৩ সালের ৮ আগস্ট সেলুলার ফোন চালু হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে ৬টি মোবাইল ফোন কোম্পানি রয়েছে। সেগুলো হলো– সিটিসেল, গ্রামীণফোন, রবি, বাংলালিংক, টেলিটক এবং এয়ারটেল। বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি মোবাইল ফোন কোম্পানি টেলিটক বাংলাদেশ লি. ২০০৫ সালে যাত্রা শুরু করে। ২০১৩ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসারে বাংলাদেশে ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯.৮৪ কোটি।

টেলিভিশন : ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ২টি পূর্ণাঙ্গ সরকারি টেলিভিশন কেন্দ্র এবং ১৪টি উপকেন্দ্র বা রিলে কেন্দ্র রয়েছে। ২০০০ সালে বেসরকারি নিয়ন্ত্রণে 'একুশে টিভি' নামে একটি টিভি চ্যানেল খোলা হয়। তবে ইতোমধ্যে অনেকগুলো স্যাটেলাইট বাংলা চ্যানেল এদেশে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করছে। এগুলো হলো– চ্যানেল আই, এটিএন বাংলা, এনটিভি, বাংলা ভিশন, বৈশাখী ইত্যাদি।

বেতার : ১৯৪৭ সালে এদেশে মাত্র একটি বেতারকেন্দ্র ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশ বেতারের ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। বেতারের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের কার্যক্রমে বেশ কয়েকটি ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। এগুলো হলো– বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, আরবি ও নেপালি ইত্যাদি। এছাড়াও ১২টি বেসরকারি এফএম রেডিয়ো রয়েছে। গ্রাম অঞ্চলে রেডিয়োগুলো তাদের বার্তা প্রচার করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় আবহাওয়া সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া হয় এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী মানুষগুলোকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে বলা হয়। এভাবে বেতারের মাধ্যমে নানা ধরনের উন্নতি সাধিত হয়।

ভূ–উপগ্রহ কেন্দ্র : বর্তমানে বিশ্বে যোগাযোগের জন্য ভূ–উপগ্রহ কেন্দ্র একটি শক্তিশালী মাধ্যম। বাংলাদেশে ভূ–উপগ্রহ কেন্দ্রের সংখ্যা ৪টি। এগুলো হলো– রাঙামাটির বেতবুনিয়া, গাজীপুরের তালিবাবাদ উপগ্রহ ভূ–কেন্দ্র। ঢাকার মহাখালী এবং সিলেট ভূ–উপগ্রহ কেন্দ্র। এদের মধ্যে রাঙামাটির বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ–কেন্দ্র সর্বপ্রথম ১৯৭৫ সালে চালু হয়।

টেলেক্স, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট : বর্তমান যুগে বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে দ্রুত সংবাদ আদান–প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। ফ্যাক্সের মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো দেশে মুহূর্তের মধ্যে শব্দ, ছবি, ডকুমেন্ট ইত্যাদি প্রেরণ করা যায়। আবার ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। ১৯৯৬ সালের ৪ জুন বাংলাদেশে প্রথম ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব : যোগাযোগ এবং যাতায়াত ব্যবস্থাকে যেকোনো দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত বলা হয়ে থাকে। যেসব দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত সেসব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও উন্নত। কোনো দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষি পণ্যের এবং শিল্পজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ, শ্রমিকদের চলাচল, ব্যাবসা–বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন উন্নত যোগাযোগ ব্যাবস্থা। যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে বিপুল সংখ্যাক মানুষের জীবিকার প্রশ্ন জড়িত। পল্লি যোগাযোগের জন্য সড়ক যোগাযোগ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উপকূলীয় অঞ্চলের যোগাযোগে, দুর্যোগ মোকাবিলা, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং রাজস্ব আয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে নৌ–ব্যবস্থার বিকল্প নেই। এছাড়াও সংবাদপত্র আদান–প্রদান, প্রশাসনিক কাজ এবং দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্বও কম নয়।

উপসংহার : মানবজীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হলে মানবসম্পদের উন্নয়ন এবং মানুষের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আর এ দুটি বিষয়ই যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষকে গতিশীল করে। যেহেতু যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নয়নের মূলশক্তি বলা যায় তাই আমাদের দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

১৪৯. মুক্তবাজার অর্থনীতি

ভূমিকা : অর্থনীতিতে বাজার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বাজার সম্পর্কিত ধারণা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। পণ্যবাজার, মুদ্রাবাজার, শ্রমবাজার ইত্যাদি ধারণাগুলোও অর্থনীতির ধারার ক্রমাবর্তনের ফসল। এই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সময়ে সারাবিশ্বের বাজার নিয়ন্ত্রক হিসেবে 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান করে নিয়েছে। এ বাজার ব্যবস্থাটি নিয়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকে আলোচনা–সমালোচনা থাকলেও গণতান্ত্রিক বিশ্বে ধারণাটি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

বাজার অর্থনীতি : মুক্তবাজার অর্থনীতি নিয়ে আলোচনার পূর্বে বাজার অর্থনীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের শুরুতেই উৎপাদনের উপাদান তথা উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময়, ভোগ ইত্যাদি বিষয় জড়িত ছিল। উৎপাদনের উপাদানগুলোকে ঘিরেই মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সমাজের তাগিদেই সৃষ্টি হয় বাজার ব্যবস্থার। অর্থাৎ বাজার হলো অর্থনীতির বিকাশের একটি পর্যায়। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এই বাজার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই মানুষের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। যাকে বাজার অর্থনীতি নামে অভিহিত করা হয়। এই বাজার অর্থনীতি এমন এক ধরনের ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদন হয় বিক্রয়ের জন্য এবং উৎপাদনকারী বিক্রয়ে চূড়ান্তভাবে সর্বোচ্চ মুনাফা প্রত্যাশী।

মুক্তবাজার অর্থনীতি বলতে কী বোঝায় : 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' এমন এক ধরনের বাজার ব্যবস্থা যেখানে সরকার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তি তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে পারে। এটাকে কেউ কেউ পুঁজিবাদী অর্থনীতি হিসেবেও আখ্যায়িত করে থাকে। এ পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিশেষ অধিকার রক্ষিত হয়। মুক্তবাজার অর্থনীতির মূল উপাদান হলো পণ্য ক্রয়ে ক্রেতার নিজস্ব পছন্দের অধিকার। আবার পণ্য ও শ্রম বিক্রয়ে এবং ব্যাবসা কাঠামোতে উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। কোনো রকম সরকারি নিয়ন্ত্রণ বা বাধ্যবাধকতা না থাকায় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সৃজনশীল ও উৎপাদনশীল ব্যবসায়ে আগ্রহী হয়। বাজারে পণ্য ক্রয়–বিক্রয়কালে প্রতিযোগিতার কারণে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যহীনতা থেকেই উৎপত্তি হয় মুক্তবাজার অর্থনীতি।

মুক্তবাজার অর্থনীতির বিবর্তন : উৎপাদন ও বিনিময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ততা থেকেই বাজার অর্থনীতির উদ্ভব হয়েছিল। বাজার অর্থনীতির আধুনিক ও পরিবর্তিত রূপ হলো মুক্তবাজার অর্থনীতি। বাজার ব্যবস্থা বিকাশের গোড়ার দিকে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা সরকার কঠোরভাবে বিভিন্ন পন্থায় বাজার নিয়ন্ত্রণ করত। এই নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে সর্বপ্রথম আঠারো শতকের শেষের দিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যাবসার অনুমতি দেয় 'Allow to do' নামে প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে। এ ব্যাপারটি ধীরে ধীরে ব্যাবসা–বাণিজ্যের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উনিশ শতকে ইউরোপে মুক্তবাজার ধারণাটি গ্রহণ করা হয় যা 'Laissez faire policy' নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী 'Free Enterprise Economy' নামে ধারণাটি সমাদৃত হয়। বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে মুক্তবাজার অর্থনীতি ব্যবস্থা চালু হয়।

মুক্তবাজার অর্থনীতির স্বরূপ : মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাজারকে কেন্দ্র করে সে দেশের পণ্যের গুণগতমান, ক্রয়–বিক্রয় এবং মূল্য নির্ধারিত হয়। এ ব্যবস্থায় সাধারণ ব্যক্তিবর্গের ভোক্তা, শ্রমিক এবং বিনিয়োগকারী হিসেবে নিযুক্ত থাকা আবশ্যক। ভোক্তাদের ক্রয়ের ইচ্ছার ওপর উৎপাদন প্রভাবিত হয়। বিনিয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে এবং শ্রমিকরা নিজেই কাজের সন্ধান করে। এ ব্যবস্থায় পণ্য ও সেবা বিনিয়োগের কেন্দ্রস্থল হলো বাজার। উৎপাদিত পণ্য ও সেবার চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রিত হয়। মুক্তবাজার ধারণায় ব্যক্তি তার দক্ষতার কারণে উচ্চতর আয় দাবি করতে পারে। এই পদ্ধতিতে সরকার সরাসরি বাজার নিয়ন্ত্রণ করে না তবে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থরক্ষায় সরকার বাজার রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং আইন তৈরি করে।

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে পণ্য সম্পর্কিত ধারণা : ব্যাবসা মাত্রই সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের প্রচেষ্টা। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সঠিক পদ্ধতিতে এ লাভ অর্জিত হয় এবং ভোক্তাও লাভবান হয়ে থাকে। মুক্তবাজার ব্যবস্থায় উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত পক্ষগুলো স্বতন্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। এমনকি উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত সকল বিষয়গুলোকে সম্পূর্ণরূপে অর্থমূল্যে বিচার করা হয়। এক্ষেত্রে মালিক, শ্রমিক, শ্রম, মেধা, কর্মদক্ষতা সবকিছুকেই বাজার অনুযায়ী পণ্যমূল্যে বা অর্থমূল্যে বিচার করা হয়ে থাকে। শ্রম, মেধা, কর্মদক্ষতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলেও মুক্তবাজার ব্যবস্থায় তা অস্বীকৃত। যার কোনো অর্থমূল্য নেই তাকে শ্রম হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। তাই এ পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে নারীর গৃহস্থালির কাজ, সন্তান ধারণ ও লালন–পালন, গৃহ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কর্ম অনুৎপাদনশীল শ্রম হিসেবে বিবেচিত। যদিও তা সভ্যতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভালোবাসা, সাহিত্যকম, যৌনকর্ম, মানবিক কাজ ইত্যাদি বিষয়গুলোকেও ব্যাবসায়িক উপযোগিতার দৃষ্টিকোণে দেখা হয়। এক কথায় মুক্তবাজার ব্যবস্থায় সবকিছুই অর্থমূল্যে বিবেচ্য।

ইতিবাচক দিক : বর্তমান বিশ্বে মুক্তবাজার ব্যবস্থাটি একটি আধুনিক ও আদর্শতম ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত। এতে চাহিদা ও যোগানের ওপর নির্ভর করে পণ্য সমাগম হওয়ার কারণে বাজারে অধিক পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত হয়। ফলে ক্রেতা নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী পণ্য বাছাই ও ক্রয় করতে পারে। প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার হওয়ার কারণে পণ্যমূল্যও কম হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে ভোক্তার সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় এবং ভোক্তা অধিকার রক্ষিত হয়। মুক্তবাজার ব্যবস্থা ভোক্তাদের অনুকূলে থাকে। সবকিছুকে অর্থের মানদণ্ডে গণ্য করা হয় বলে শ্রম বা কারিগরি দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। দক্ষতার সাথে ব্যবহৃত হয় আধুনিক প্রযুক্তি। এ পদ্ধতিতে মালিক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, সংগঠক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, ভোক্তা সকলেই পণ্য পরিকল্পনা,

বাছাই কিংবা পছন্দের ক্ষেত্রে আপন আপন স্বাধীনতা ভোগ করে। সরকারি নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণে সবাই স্বাধীনভাবে স্বীয় কাজ করতে সক্ষম। অধিক মূলধন, বিনিয়োগের সুযোগ, অধিক স্বাধীনতা, অধিক ভোক্তা সন্তুষ্টি, অস্বাভাবিক মুনাফারোধ ইত্যাদি কারণে মুক্তবাজার জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অবাধ বাণিজ্য নীতি থাকার কারণে দেশীয় পণ্য আন্তর্জাতিক পর্যায়েও পরিচিতি লাভ করে। মুক্তবাজার ব্যবস্থায় এ ধরনের সুবিধার কারণে বিশ্বব্যাপী তা আজ স্বীকৃত।

নেতিবাচক দিক : সমগ্র বিশ্বেই মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রচলন রয়েছে। এটাকে গণতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থাও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু উন্নত দেশগুলো থেকে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের গণতান্ত্রিক রীতি ও আচরণ ভিন্নতর বলে এর নেতিবাচক দিকও রয়েছে। এতে বাজার ব্যবস্থা মুক্ত হওয়ায় ব্যবসা–বাণিজ্য নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক পরিসরে বিস্তৃত হয়। ফলে উন্নত দেশের পণ্যসামগ্রী চাহিদার শীর্ষ স্থান দখল করে। প্রতিযোগিতায় উন্নত দেশের সঙ্গে দেশীয় কোম্পানি টিকতে পারে না। ফলে দেশীয় কোম্পানিগুলো হুমকির সম্মুখীন হয় এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সারাবিশ্বে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। ফলশ্রুতিতে বন্ধ হয়ে যায় দেশীয় কারখানা। বেকার হয়ে পড়ে হাজার হাজার শ্রমিক। দেশীয় ক্রেতারা বিদেশি পণ্যে বেশি আকৃষ্ট হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় জাতীয় অর্থনীতি। বাজার দখল করার কৌশল হিসেবে উন্নত দেশগুলো ব্যবহার করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে। ফলে সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক শোষণ। এসব নেতিবাচকতার কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনও লক্ষ করা গেছে।

মুক্তবাজার অর্থনীতির জনমত মূল্যায়ন : দেশীয় শিল্প ধ্বংস এবং বেকারত্ব বাড়ার আশঙ্কায় এ ব্যবস্থাকে অনেকেই অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। তবে এরূপ আশঙ্কা থাকলেও মুক্তবাজার ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশীয় পণ্যের প্রতিযোগিতার কারণে পণ্যের মান বৃদ্ধি পায়। আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্যের মান ভালো হলে দেশের সুনাম বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের পোশাক এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণেও এ পদ্ধতি অধিকাংশের কাছেই গ্রহণযোগ্য।

উপসংহার : বিশ্ববাস্তবতার প্রেক্ষাপটে মানসম্মত পণ্যের যোগান ও ভোক্তা সন্তুষ্টি রক্ষায় মুক্তবাজার অর্থনীতির অবদান অনস্বীকার্য। দেশীয় পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্যকে উৎকৃষ্টরূপে উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টিতে মুক্তবাজারের অবদান রয়েছে। জাতীয় অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষা ও দেশি–বিদেশি বিনিয়োগের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকল্পে মুক্তবাজার অর্থনীতির কোনো বিকল্প নেই। তাই বিশ্বজুড়ে এ ব্যবস্থা আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

১৫০. শ্রমের মর্যাদা
অথবা, জাতীয় জীবনে শ্রমের গুরুত্ব
অথবা, সভ্যতা বিকাশে শ্রমের অবদান
অথবা, পরিশ্রমের মর্যাদা

ভূমিকা

জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পরিশ্রমের মর্যাদা অপরিহার্য। সর্বস্তরের মানুষের পক্ষে পরিশ্রমের মর্যাদাবোধ পরিশ্রমেরই যোগ্য পুরস্কার। পরিশ্রমলব্ধ কর্মের সাফল্যের যে আনন্দ, তা সত্যই নির্মল ও উপযোগী। কোনো এক মনীষী বলেছেন, "ক্ষণস্থায়ী জীবনটাকে পরিশ্রম দ্বারা যত বেশি পারা যায় কাজে লাগিয়ে নাও।"

শ্রমের প্রকারভেদ : শ্রম প্রধানত দুই প্রকার—দৈহিক বা কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রম। মানবসমাজে দু'ধরনের শ্রমেরই মূল্য আছে। যারা দেহ খাটিয়ে পরিশ্রম করে, তাদের শ্রমকে দৈহিক বা কায়িক শ্রম বলে। আর যে শ্রমে বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগানো হয়, তাকে বলে মানসিক শ্রম। জীবনপথে চলতে গেলে উভয় প্রকার শ্রমেরই প্রয়োজন আছে।

শ্রম সম্মানহানিকর নয় : কায়িক পরিশ্রম আত্মসম্মানের পক্ষে কিছুমাত্র হানিকারক নয়, বরং এটি মানবসমাজে উন্নতির শ্রেষ্ঠ উপায়। সর্বাধিক পার্থিব উন্নতি ও অভ্যুদয় শ্রমসামর্থ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানবজাতির স্থিতি ও পরিপুষ্টির গোড়ায় রয়েছে অপরিহার্য শ্রমশক্তি। জগতের সকল কার্যই শ্রমসাপেক্ষে। কায়িক পরিশ্রমেই শিল্পী ও বিজ্ঞানী উদ্ভাবনীশক্তিকে বাস্তব সত্যে পরিণত করে একে মানুষের মঙ্গলে নিয়োজিত করেন। মানসিক শক্তি ও কায়িক শ্রম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটির অভাবে অন্যটিও পঙ্গু হয়ে পড়ে। চিন্তা ও চেষ্টা, বুদ্ধি ও শক্তি, অর্থ ও সামর্থ্য পরস্পর যুক্ত হলে এ জগতে সকল কার্যই সিদ্ধ হতে পারে।

মনীষী কার্লাইল বলেছেন, "আমি মাত্র দুটি লোককে সম্মান করি, সম্মানের যোগ্য তৃতীয় নেই। প্রথমত, আমার সম্মানের পাত্র ওই কৃষক এবং শ্রমশিল্পী, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করছেন, মানুষ হয়ে মানুষের মতো জীবনযাপন করছেন। ওই যে আতপ–তপ্ত পাণ্ডুর বদনমণ্ডল, ওই যে ধূলিধূসর দেহ, ওই যে কর্ম–কঠোর কর্কশ করযুগল, তাই আমার

শ্রদ্ধার যোগ্য। দ্বিতীয়ত, আমার সম্মানের পাত্র তিনি, যিনি আত্মোন্নতি সাধন করতে নিরত আছেন, যিনি শরীরে নয়, আত্মার খাদ্যসংস্থান, জ্ঞান–ধর্ম অনুশীলনে ব্যাপৃত আছেন—এ দু ব্যক্তি আমার ভক্তিভাজন।"

শ্রমই উন্নতির মূল : ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত বা জাতিগত সকল উন্নতির মূলেই রয়েছে শ্রম ও অধ্যবসায়। যে জাতি যত পরিশ্রমী সে জাতি তত উন্নত। পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল জাতি উন্নতি করেছে, তার মূলে আছে শ্রম। ব্যক্তিগত পরিশ্রম হতে সমষ্টিগত পরিশ্রমই জগতের বর্তমান সভ্যতার উন্নতি করেছে। আজও মানুষের পরিশ্রমের বিরাম নেই। পাশ্চাত্য দেশসমূহ অন্যান্য জাতির ওপর একমাত্র শ্রমশক্তিবলেই প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। জগতে যে মহাপুরুষেরা নিজেদের বা জাতির উন্নতিসাধন করেছেন তাঁরা সকলেই ছিলেন পরিশ্রমী।

জাতীয় জীবনে শ্রমের প্রয়োজনীয়তা : আমাদের বেকার সমস্যা দূর করে জাতীয় জীবনকে সুন্দরভাবে গঠন করতে হলে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। আজকাল মধ্যবিত্ত শ্রেণির বহু শিক্ষিত লোক কর্মের অভাবে বেকার বসে আছেন। বেকার সমস্যার প্রধান কারণ চাকরির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই চাকরির প্রত্যাশী এবং কৃষিশিল্পাদি কায়িক শ্রমজনক কার্যকে কুসংস্কারবশত হীন ভেবে তা করতে অনিচ্ছুক। তা সত্যই আমাদের জাতিগত দুর্বলতার কারণ। কায়িক কর্মে কোনো হীনতা নেই। আলস্য ও পরান্ন ভোজনেই হীনতা। কর্মমাত্রই মহৎ; কারণ কর্ম ব্যতীত লোকরক্ষা হয় না।

বাংলাদেশে শ্রমের স্থান : বাংলাদেশে শ্রমবিভাগ ছিল প্রধানত বর্ণগত। যারা উঁচু বর্ণের তারা কোনো কাজ করত না। নিচু বর্ণের লোকেরা দৈহিক বা কায়িক পরিশ্রমের কাজ করত। তাতে সমাজে একটা ধারণা জন্মেছিল যে, যারা শারীরিক পরিশ্রম করে, তারা সমাজে সম্মানের পাত্র নয়। এভাবে কায়িক পরিশ্রম আমাদের দেশে অবজ্ঞা পায়। এটাই আমাদের অবনতির মূল কারণ।

শ্রমের সুফল : সমাজের কোনো কাজই পরিশ্রম ছাড়া সম্পাদিত হয় না। সমস্ত কাজই পৃথিবীর কাজ। পৃথিবীতে যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি তত বেশি উন্নত। পৃথিবীর মানুষ হিসেবে সকল কাজই আমাদের করণীয়। তাতে যেমন কাজের কোনো জাতিভেদ নেই, যারা সেই কাজ করে তাদেরও কোনো জাতিভেদ নেই। সুতরাং পরিশ্রম করা মোটেই সম্মান হানিকর নয়।

শ্রমবিমুখ জাতির পতন অনিবার্য। জগতের মহামনীষীরা সকলেই পরিশ্রম করেছেন এবং শ্রমের মর্যাদা দিয়ে গেছেন। শ্রমকে ঘৃণার চোখে বিচার করলে দেশে উৎপাদনের জোয়ার আনা যায় না।

উপসংহার : আমাদেরকে অন্যান্য জাতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কায়িক শ্রমের মর্যাদা দিতে হবে। বৃথা আভিজাত্যের অহংকার ত্যাগ করে পরিশ্রমকে মর্যাদার বস্তু বলে গ্রহণ করতে হবে। পরিশ্রম না করে দীনহীন জীবনযাপন করার ন্যায় মারাত্মক অপরাধ আর কিছু নেই। যত তাড়াতাড়ি এ অপরাধজনক কাজ হতে মুক্ত হওয়া যায়, ততই জাতির পক্ষে মঙ্গল।

১৫১. কুটিরশিল্প
অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়নে কুটিরশিল্পের ভূমিকা

ভূমিকা

কুটিরবাসী গরিব লোকেরা নিজগৃহে স্বহস্তে যেসব পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে, সেগুলোকে সাধারণত কুটিরশিল্প বলা হয়। কলকারখানায় যেমন যন্ত্রের সাহায্যে এককালে অতি অল্প ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন করা যেতে পারে, তা কুটিরশিল্পে সম্ভব নয়। কিন্তু শিল্পীর হস্তে উৎপাদিত দ্রব্য যেমন সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়, কলকারখানায় প্রস্তুত দ্রব্য সেরূপ হয় না।

বাংলাদেশে কুটিরশিল্প : কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এক গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। বাংলাদেশের শিল্পখাত অনেকাংশেই কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। তাঁতশিল্প, চামড়াশিল্প, মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেতশিল্প, ধাতুশিল্প, অলংকারশিল্প প্রভৃতি কুটিরশিল্পের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যে গড়া একটি সমৃদ্ধ জনপদ হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশ। এছাড়াও রন্ধনশিল্প, সুতাশিল্প, রেশমশিল্প ইত্যাদিও কুটিরশিল্পের আওতাভুক্ত। বিভিন্ন ধরনের লোক কুটিরশিল্পে কাজ করে। যেমন– কর্মকার, কুমার, সূত্রধর, শাঁখারি এরাই কুটিরশিল্পের প্রধান ধারক ও বাহক হিসেবে পরিচিত।

কুটিরশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে যা যা করা প্রয়োজন তা হলো—

১. কুটিরশিল্পের সাথে জড়িত কারিগরদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
২. বিদেশি শিল্পদ্রব্যের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে হবে।
৩. দেশের নারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এই শিল্পের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।
৪. শিল্পজাত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার দিকে মনোযোগী হতে হবে।
৫. নতুন নতুন কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য সরকারকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করতে হবে।
৬. কুটিরশিল্পের বাজার দেশের মধ্যে সম্প্রসারিত করে দেশের বাইরেও এ বাজারের প্রসার ঘটাতে হবে।

৭. সর্বোপরি সরকারকে কুটিরশিল্পের উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে।

কুটিরশিল্পের শ্রেণিভেদ : বাংলাদেশের কুটিরশিল্প বহু শ্রেণিতে বিভক্ত। তার মধ্যে মৃৎশিল্প, শাঁখার ব্যাবসা, কাঁসার ব্যাবসা, কর্মকারের ব্যাবসা, স্বর্ণকারের ব্যাবসা, তাঁতির ব্যাবসা, চর্মকারের ব্যাবসা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া টুপি, সাবান, লজেন্স, ঝুড়ি, ঝাঁকা, ঝাঁটা, মাদুর, পাটি, চাটাই, মোড়া, জাল, কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্যাদির ব্যবসায়ও কুটিরশিল্পের ব্যাবসা। বহু লোক এখনো কুটিরশিল্পের ব্যাবসা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

একদা বাংলাদেশের বিখ্যাত কুটিরশিল্প মসলিন কাপড় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো, এটি দেশি ও বিদেশি ব্যক্তিগণের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল। অনেক রাজা, রানি ও উচ্চ শ্রেণির লোক ছিলেন এর সমঝদার।

কুটিরশিল্পের অতীত অবস্থা : বাংলাদেশের কুটিরশিল্প একদা পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করত। তখন কুটিরশিল্প কেবল এদেশবাসীর অভাবমোচন করত না, বিদেশ হতেও অর্থ আহরণ করে জাতীয় ধনভান্ডার পূর্ণ করত। মাত্র অর্ধশতাব্দী পূর্বেও আমাদের গ্রামসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সহযোগিতার মূল খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল কৃষকগণ উৎপাদন করত এবং বিভিন্ন শ্রেণির কারুশিল্পীরা প্রস্তুত করত নানা প্রকারের শিল্পদ্রব্য। এরূপ একের চাহিদা অন্যে পূরণ করত। তখনকার দিনে এদেশবাসীর প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য তাদেরকে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো না। কাজেই দেশবাসীর আর্থিক জীবন ছিল সচ্ছল ও অভাবমুক্ত।

কুটিরশিল্পের বর্তমান অবস্থা : বর্তমানে আমাদের কুটিরশিল্পের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এনামেল, অ্যালুমিনিয়াম, চীনামাটির বাসনপত্রাদি, এদেশের মৃৎশিল্প ও শঙ্খশিল্পের প্রায় বিলোপসাধন করেছে। আধুনিক মেয়েরা শাঁখা পরা পছন্দ করেন না; কাজেই শঙ্খশিল্পের চাহিদা কমে এসেছে। লৌহনির্মিত অধিকাংশ দ্রব্যই কলে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষাকৃত সস্তায় বিক্রি হয় বলে কর্মকারগণ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এরূপে আমাদের দেশের প্রধান কুটিরশিল্পগুলো মৃতপ্রায় হয়ে আছে। পাখা, ঝুড়ি, ঝাঁকা, মাদুর, মোড়া, চাটাই, পাটি প্রভৃতি কুটিরশিল্পগুলো কোনোরকমে বেঁচে আছে। কিন্তু এগুলোর আর্থিক অবস্থার উন্নতির ব্যাপারে সরকার খুব বেশি সহায়তা করেন না।

কুটিরশিল্পের অবনতির কারণ : আমাদের কুটিরশিল্পগুলো অবনতির কারণ অনেকগুলো। **প্রথমত**, কলের প্রতিযোগিতা। যেসব দ্রব্য কলে প্রস্তুত হয়, ওই গুলো অল্প খরচ ও অল্প সময়ে উৎপাদিত হয়। কিন্তু কুটিরশিল্পগুলোতে তদপেক্ষা অধিক ব্যয় হয় এবং সময়ও লাগে বেশি। এজন্য কুটিরশিল্প যন্ত্রশিল্পের নিকট হার মানতে বাধ্য হয়েছে। **দ্বিতীয়ত**, আমাদের রুচির পরিবর্তনে দেশীয় কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যগুলো গুণে শ্রেষ্ঠ হলেও আমরা কলে প্রস্তুত দ্রব্যসমূহের বাহ্য ঔজ্জ্বল্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্যে মুগ্ধ হয়ে সেগুলো ক্রয় করি। **তৃতীয়ত**, দেশি শিল্পের উন্নতিবিধান করতে হলে যে পরিমাণ স্বদেশপ্রেম ও ত্যাগ–স্বীকার দরকার, আমাদের মধ্যে তার অভাব। দ্রব্য ক্রয়ের পূর্বে আমরা তা স্বদেশি কি বিদেশি তা চিন্তা না করে তা সুলভ কী মূল্যবান, তাই বিবেচনা করি। আমাদের এ স্বার্থপরতার ফলে দেশি কুটিরশিল্পগুলোর চরম অবনতি ঘটেছে।

কুটিরশিল্পের পুনরুদ্ধার : দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতিবিধান করতে হলে আমাদের কুটিরশিল্পের উদ্ধার ও উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে; শুধু কলকারখানার ও যান্ত্রিক উৎপাদন দেশের আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। এজন্য বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের পাশে কুটিরশিল্পগুলোর স্থান দিতে হবে। আমাদের অর্ধমৃত ও জীবনমৃত কুটিরশিল্পগুলোকে উদ্ধারপূর্বক যুগোপযোগী করে এর সংস্কার সাধন করা দরকার। এছাড়া আমাদের মনোভাবেরও পরিবর্তন ঘটাতে হবে। বাইরের চাকচিক্যে মুগ্ধ না হয়ে স্বদেশের দ্রব্যগুলো ক্রয় করা উচিত। তা হলে দেশীয় শিল্পীরা উৎসাহিত হয়ে অধিক যত্নসহকারে শিল্পগুলোর উন্নতিসাধন করতে সচেষ্ট হবে।

উপসংহার : আধুনিক যুগকে 'যন্ত্রযুগ' বলা হয়; কিন্তু বর্তমানে যন্ত্রের কার্যকারিতা ব্যর্থ হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। জগতের আর্থিক সমস্যার কল্যাণে ব্যক্তিবিশেষ ধনী হয়ে ওঠে আর লাখ লাখ শ্রমিক দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে পীড়িত হতে থাকে। যান্ত্রিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমেরিকার স্থান জগতে প্রথম কিন্তু সেখানেও লাখ লাখ লোক দুর্দশাগ্রস্ত ও বেকার হয়ে আছে। কুটিরশিল্প অর্থকে এক স্থানে রাশিকৃত হতে দেয় না বরং সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। তাতে দেশের সকল মানুষই লাভবান হতে পারে।

১৫২. কৃষি উদ্যোক্তা

ভূমিকা :

সব সাধকের বড়ো সাধক আমার দেশের চাষা,
দেশ মাতারই মুক্তিকামী, দেশের সে যে আশা।
দধীচি কি তাহার চেয়ে সাধক ছিল বড়ো?

পুণ্য অত হবে নাক সব করিলে জড়ো।

অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে এবং জনবল কাজে লাগিয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ উপার্জনের প্রত্যাশায় যখন কোনো কাজ করার পরিকল্পনা করে, তখন তাকে উদ্যোগ বলে। যারা এই উদ্যেগ গ্রহণ করে তাদের বলে উদ্যোক্তা। প্রতিটি পেশাকে কেন্দ্র করে উদ্যোক্তা হওয়া সম্ভব। একজন উদ্যোক্তা আত্মনির্ভরশীল হন এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন। কৃষিকে উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি বাংলাদেশে নতুন। বিপুল জনসংখ্যা, কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস, বেকারত্ব– এ সবকিছুর ভেতরে একদল তরুণ কৃষিকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করছেন। শিক্ষিত তরুণদের কৃষিক্ষেত্রে উদ্যোগ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তা : কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তার মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন কৃষক তাঁর পণ্য বাজারে বিক্রির চেয়ে পরিবারের চাহিদা মেটানোকে বেশি গুরুত্ব দেন অথবা কিছুটা বিক্রির জন্য এবং কিছুটা পরিবারের চাহিদা মেটাতে ব্যয় করেন। অন্যদিকে, একজন কৃষি উদ্যোক্তার মূল লক্ষ্য বাজারজাতকরণ ও মুনাফা তৈরি। তাই একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে ব্যাবসায়িক মনোবৃত্তির হতে হয় এবং তার কাজে প্রচুর ঝুঁকি থাকে। ড্যানিয়েল ওয়েবস্টা বলেন, "যখন কৃষিকাজ শুরু হয় তখন তা একটি শিল্প অনুসরণ করে। তাই কৃষকরাই মানব–সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা।"

কৃষি উদ্যোগের ক্ষেত্রসমূহ : শস্য, প্রাণিসম্পদসহ কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়কে কৃষি উদ্যোগের আওতায় আনা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে অবশ্যই মূলধন, জমির পরিমাণ, মাটির গুণাগুণ, অবকাঠামো, বালাই ব্যবস্থাপনা, লোকবল, পরিবহণ ব্যবস্থা, বাজার চাহিদা, উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। ধান, গম, ডাল, আখ, পাট, ঘাস, শাকসবজি, ফুল, ফল, মসলা, মধু, মাশরুম, রেশম, মাছ প্রভৃতির চাষ ও উৎপাদন; গোরু–ছাগল, হাঁস–মুরগি প্রভৃতি প্রাণিসম্পদের লালনপালন; গাছের চারা, জৈব সার, বায়োগ্যাস, দুধ ও দুধজাত পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন ইত্যাদি কৃষি উদ্যোগের আওতাভুক্ত। কৃষি সম্পর্কে তাই জর্জ ওয়াশিংটন বলেছেন– "কৃষি মানুষের সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর, সবচেয়ে উপকারী এবং সবচেয়ে মহৎ কর্মসংস্থান।"

কৃষি উদ্যোক্তার করণীয় : একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে নিম্নোক্ত করণীয় সম্বন্ধে অবগত থাকা উচিত :

ক. উদ্যোক্তাকে প্রথমেই তার পণ্যের বাজার সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখতে হবে।

খ. প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে অপচয় ও ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হয়। কারণ তাঁর এই উদ্ভাবনী বুদ্ধি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে সাহায্য করবে।

ঘ. কৃষিখাতে উদ্যোক্তাকে অনেক রকমের ঝুঁকি নিতে হয়। এসব ক্ষেত্রে লাভ–ক্ষতি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে হবে এবং ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার সম্ভাব্য প্রস্তুতি রাখতে হবে।

ঙ. উদ্যোক্তা যে ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করবেন, সে বিষয়ে যাবতীয় তথ্যের নিয়মিত খোঁজ–খবর রাখা জরুরি। উপযুক্ত খাবার, সার, কীটনাশক, আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ প্রযুক্তি সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। সম্প্রতি স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের ব্যবহার উদ্যোক্তাদের সাফল্যে ভূমিকা রাখছে।

চ. একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কয়েকজন উদ্যোক্তা একসঙ্গে কাজ করতে পারেন। এতে বড়ো ধরনের কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয় এবং ঝুঁকি হ্রাস পায়। তবে অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে অংশীদার নির্বাচন করা উচিত।

ছ. পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ, শ্রমিক ও পণ্য পরিবহণ, বাজার পরিস্থিতি ও প্রতিযোগীদের কথা চিন্তা করে কাজে অগ্রসর হলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

কৃষি উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কয়েকটি উদ্যোগ : কৃষি উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ইদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন :

ক. সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো কৃষির ধরন অনুযায়ী স্বল্প সুদে বিভিন্ন অঙ্কের ঋণ প্রদান করছে।

খ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎসসম্পদ অধিদপ্তর উদ্যোক্তাদের যেকোনো প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

গ. বছরব্যাপী চাষ করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে 'ডিজিটাল শস্য ক্যালেন্ডার ও 'বালাইনাশক নির্দেশিকা দেওয়া আছে, যা ঠিক সময়ে ঠিক ফসল ফলাতে সাহায্য করে। ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করে কৃষিসংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষিপ্রযুক্তি সম্বন্ধে জানাতে 'কৃষিপ্রযুক্তি ভান্ডার' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিদ্রব্যাদি বাজারদর, কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ভিত্তিতে প্রেরণ করে।

কৃষি উদ্যোক্তা হতে করণীয় : উদ্যোক্তা হওয়ার বাসনা মনের গভীরে অনেকে লালন করেন। কৃষিতে উদ্যোক্তা হতে অনেকের ইদানীং বেশ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। যিনি নতুন কোনো ব্যাবসা নিয়ে চিন্তা করেন যা আগে কেউ করেননি অথবা পুরোনো কোনো ব্যাবসাকে নতুন রূপে নিয়ে এসে মানুষের আগ্রহ বা চাহিদা সৃষ্টি করতে পারেন সহজ কথায় তিনিই উদ্যোক্তা। কৃষির উদ্যোক্তা হলো কৃষিপণ্য নিয়ে ব্যাবসা করা। এক সময় কৃষি ছিল একটি অসম্মানজনক পেশা। তখন কৃষিকে ক্রমাবনতিশীল পেশা হিসাবে ধরা হতো। একটু শিক্ষিত হলেই লোকলজ্জার ভয়ে এ কাজ থেকে দূরে থাকতে চাইত। কিন্তু সে যুগ আর নেই। যুগের পরিবর্তনে কৃষির অভাবনীয় সাফল্যে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সুবাদে সেই সব এখন পৌরাণিক গল্পের মতোই। এখন কৃষিতে ঝুঁকছে এমএ পাশ ছেলেরা। সে সময় গ্রামের একজন ছেলে বিএ পাশ মানে অনেক কিছু। তার কদরও সে রকম ছিল। এখন ঘরে ঘরে বিএ পাশ, এমএ পাশ। কৃষিও এখন তাদের কাছে সম্মানজনক পেশা হিসেবে উঁকি দিচ্ছে! শুধু প্রয়োজন নিজের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উদ্যোক্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। যারা পারছে তারা সফল হচ্ছে। এরকম সফলতার গল্প বলে শেষ করা যাবে না। কৃষির অভাবনীয় সাফল্যে দিনদিন শিক্ষিত তরুণ কৃষি পেশাকে সাদরে গ্রহণ করছে। প্রযুক্তির প্রসারে এ কাজ করা বর্তমানে সহজও বটে। কৃষিপণ্য আমদানি–রপ্তানি করেও অনেক তরুণ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। জেরিকো সানচেজ বলেছেন– "কৃষির মাধ্যমে দিনের শেষে আপনি এমন একটি পণ্য তৈরি করেছেন যা অন্য লোকেরা উপভোগ করতে চলেছে, এটি একটি সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি।" ইদানীং রীতিমতো উচ্চশিক্ষিত ও স্মার্ট ছেলেরা অফিসে হানা দিচ্ছে কী করে একটি ফলের বাণিজ্যিক বাগান করা যায় তার পরামর্শ নিতে। শুধু একা আসে না, আসে দুই–চার বন্ধু মিলে। সবাই এ মহৎ পেশায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করতে চায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে তারাও বলতে চায়— আমরা চাকরি খুঁজবো না, চাকরি দেবো। বাস্তবে দিচ্ছেও তাই। চারিপাশে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে আছে বহু উদ্যমী শিক্ষিত তরুণ। প্রয়োজন তাদের উদ্‌বুদ্ধ করা, সাহস জোগানো আর সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা, প্রণোদনার ব্যবস্থা করা। তারা সুযোগ পেলে সত্যিই সত্যিই সোনার বাংলাকে সোনায় ভরে দিতে পারে। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার উদ্যোক্তা শ্রেণি তৈরির ওপর বেশ জোর দিচ্ছে। নারী উদ্যোক্তার প্রতি বিশেষ নজর তো আছেই! তবে কৃষিতে নতুনভাবে উদ্যোক্তা হতে চাইলে বেশকিছু বিষয় মেনে চলা উচিত। যেমন : ইচ্ছে ও আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে, সাহসী হতে হবে, ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা থাকতে হবে, আর্থিকভাবে সচ্ছল না হলেও আর্থিক ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করার ইচ্ছে থাকাসহ ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের নৈতিক গুণাবলি থাকতে হবে। সফল ও ভালো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে নিজের মেধা ও উদ্ভাবনীশক্তি কাজে লাগিয়ে আরও ভালো কিছু করার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকতে হবে। এককভাবে সম্ভব না হলে সমমনা বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে এ কাজে নামতে পারে। থমাস জেফারসন বলেন– "কৃষি হলো আমাদের সবচেয়ে বুদ্ধিমান সাধনা, কারণ এটি শেষ পর্যন্ত প্রকৃত সম্পদ, ভালো নৈতিকতা এবং সুখে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখবে।" কৃষি গবেষণা ও সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে পারে। বর্তমানে ইউটিউব ও অনলাইন চ্যানেলে অনেক সফল উদ্যোক্তাদের গল্প হরহামেশাই দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকেও ধারণা নেওয়া যেতে পারে। জানার জন্য যত উৎস আছে সব বিশ্লেষণ করে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে এ কাজে নেমে পড়তে পারে। এ কাজে ঝুঁকি থাকবেই। ঝুঁকি মোকাবিলা করার উপায় বের করতে হবে। দেশে বর্তমানে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার চাকরির জন্য হণ্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বছরের পর বছর সময় নষ্ট হচ্ছে। চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা শেষ হলে হতাশায় ভুগছে। যারা চাকরি পাচ্ছে তারা ভাগ্যবান। তাই বলে নিজেকে হতাশায় নিমজ্জিত না রেখে নিজেই উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগটি গ্রহণ করাই শ্রেয়। এ ব্যাপারে সরকারের সহায়তার হাতও বেশ প্রসারিত। শুধু অনুসন্ধান দরকার, দরকার সৎ ইচ্ছে ও একাগ্রতা। বর্তমানে কৃষিতে অনলাইন ব্যাবসাও অনেক জমজমাট। কে কোন ধরনের কাজে উদ্যোক্তা হবে সেটা তার পছন্দের ওপর নির্ভরশীল। দেশের বর্তমান কৃষি বৈশ্বিক কৃষির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভ্যালু এডেড এগ্রিকালচার–এর দিকে ঝুঁকছে। বাগান করার মতো নিজের জায়গা না থাকলে কয়েক বন্ধু মিলে জমি বর্গা নিয়ে কন্ট্রাক ফার্মিং করে শুরু করতে পারে। কৃষির অন্য এন্টারপ্রাইজ নিয়েও ভাবা যেতে পারে। প্রক্রিয়াজাত পণ্য নিয়ে অন–লাইন ব্যাবসা শুরু করা যায়। দেশের কৃষি গবেষণা ও সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে আরও বেশি মনোনিবেশ হওয়া জরুরি।

"মাঠ থেকে ধান তোলে চাষী
মুখে তার সোনা রাঙা হাসি
আনে তারা ভূতলে সবুজের প্রাণ,
দিয়ে যায় নানা ফসলের ঘ্রাণ।

তাদের পরিশ্রমী অন্নের জন্য
আমাদের উদর আজ ধন্য।”

সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট শুধু কাঁঠাল থেকে প্রায় ১০–১২ রকমের প্রক্রিয়াজাত পণ্য উদ্ভাবন করেছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের অনেক প্রযুক্তি রয়েছে। বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতিতে ছোটো আকারে এসব প্রযুক্তি গ্রহণ করে অনলাইন ব্যাবসা শুরু করা যেতে পারে। বান্দরবানে ব্রিটিশ–আমেরিকার টোব্যাকো কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে তারেক ও তোহা নামে দুজন উচ্চশিক্ষিত যুবক ছোটো আকারে কাজুবাদাম প্রক্রিয়াজাতকারী কারখানা গড়ে তুলেছে। সাফল্যের মুখও দেখা শুরু করেছে। তাদের কারখানায় কাজ করে অনেকের পরিবার চলছে। তারা আগে একা চাকরি করত এখন অন্যদেরও চাকরি দিচ্ছে। সরকারিভাবে কৃষিবিভাগ থেকে আর্থিকভাবে সহায়তাও মিলছে। একসময় হয়তো তারা কাজুবাদাম বিদেশে রপ্তানি করে মাথা উঁচু করে সমাজে দাঁড়িয়ে যাবে। ভিয়েতনামে দেখেছি এক অজপাড়া গ্রামের এক শিক্ষিত যুবক কোনো এক ফলের বীজ থেকে বোতাম বানিয়ে সে দেশের সরকারের নজর কেড়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় রাতারাতি বোতাম তৈরির বড়ো উদ্যোক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উদ্যোক্তা হতে হলে নিজের ইচ্ছের পাশাপাশি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাও জরুরি। দেশে কৃষির অনেক উদ্ভাবন ও আবিষ্কার রয়েছে। কৃষির এ নব নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে নিজের মেধা খাটিয়ে শিক্ষিত প্রজন্ম এ আধুনিক কৃষি পেশায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করে নিজে বাঁচবে, অপরকে বাঁচাবে সে সঙ্গে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সমৃদ্ধির দিকে সে প্রত্যাশা করছি।

উপসংহার : একজন কৃষি উদ্যোক্তা সফল হলে একদিকে যেমন দারিদ্র্য দূরীভূত হয়, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতি শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা পায়। তবে কৃষি উদ্যোক্তাকে অবশ্যই সততার সঙ্গে কাজ করা উচিত। কারণ তাঁর পণ্য চূড়ান্ত বিচারে খাবারের চাহিদা মেটাবে। কবির ভাষায়–

মুক্তিকামী মহাসাধক মুক্ত করে দেশ,
সবারই সে অন্ন জোগায় নাইক গর্ব লেশ।
ব্রত তাহার পরের হিত, সুখ নাহি চায় নিজে,
রৌদ্র দাহে শুকায় তনু, মেঘের জলে ভিজে।
আমার দেশের মাটির ছেলে, নামি বারংবার
তোমায় দেখে চূর্ণ হউক সবার অহংকার।

১৫৩. হরতাল

ভূমিকা : হরতাল বাংলাদেশের একটি প্রধান আলোচ্য এবং বিবেচ্য বিষয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদদের ভাষায় ‘হরতাল’ বা ‘ধর্মঘট’ গণতন্ত্রের ভাষা হলেও শব্দটির ব্যবহার কেবল রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ নয়। ‘হরতাল’ শব্দের আভিধানিক অর্থ—বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য দোকান, হাট কিংবা কাজকর্ম প্রভৃতি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা। ইংরেজি ভাষায় হরতালকে Strike এবং হিন্দি ভাষায় ‘বন্ধ্’ বলা হয়। শব্দগত পরিচিতি থেকে এ কথা বলা যায় যে, হরতাল প্রক্রিয়া খুব বেশি দিনের আবিষ্কার নয়। কথা বলার অধিকার এবং শ্রমের বিনিময়ে আর্থিক পাওনা ন্যায্যভাবে আদায় করার বিশেষ পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াই ‘হরতাল’ বা 'Strike' নামে পরিচিত।

হরতালের উৎপত্তি : হরতাল শব্দটি বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে গুজরাটি ভাষা থেকে। হরতাল শব্দের অর্থ—বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য যানবাহন, হাটবাজার, দোকানপাট, অফিস–আদালত প্রভৃতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ করা। আদিতে হরতাল ছিল ব্যবসায়ীদের কারবারসংক্রান্ত দাবিদাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে চাপ সৃষ্টি ও প্রতিবাদ প্রকাশের কৌশল হিসেবে দোকানপাট, গুদামঘর প্রভৃতি বন্ধ রাখা। ১৯২০–৩০ এর দশকে ভারতের রাজনীতিতে হরতাল নতুন মাত্রা যোগ করে। এ সময় মহাত্মা গান্ধী তার নিজ এলাকা গুজরাটে পরপর অনেকগুলো ব্রিটিশবিরোধী বন্ধ বা ধর্মঘটের ডাক দিয়ে হরতালকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের রূপ দেন। বাংলাদেশে হরতাল জনগণের দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনের একটি সংবিধানিকভাবে স্বীকৃত রাজনৈতিক পন্থা।

হরতালের কারণ : শাসকের বিরুদ্ধে শোষিতের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংগ্রামের একটি হাতিয়ার হলো হরতাল। কলকারখানা, শিল্প–প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সরকারি–বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের দাবি আদায়ের জন্য এ হরতাল পালিত হয়। শাসকের সঙ্গে যখন বিভিন্ন ধরনের আলোচনা ও প্রাপ্য দাবি আদায়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে

বিরোধী দল, সরকারি দলের নানা কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জন্য হরতাল কর্মসূচি পালন করে। রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক মুক্তি, সামাজিক সাম্য ইত্যাদি নানা ইস্যুতে দেশে হরতাল সংঘটিত হয়ে থাকে। উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোতে হরতালের প্রবণতা বেশি। ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় উক্ত দেশগুলোর জাতীয় জীবনে বঞ্চনার মাত্রা উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অধিক। ফলে অধিকারবঞ্চিত মানুষ তাদের দাবিকে হরতালের মাধ্যমে দেশের চালিকাশক্তিগুলো স্থবির করে অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়।

হরতালের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : দাবি আদায়ের জন্য সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ ব্যক্ত করা বাংলার ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। শুধু সময় ও স্থানভেদে এর ধরন ও পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে। ইউরোপীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শিল্পশ্রমিকরা বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে মাঝে মাঝেই ধর্মঘটের আয়োজন করে আসছে। শিল্পশ্রমিকদের ধর্মঘট পরবর্তীকালে রাজনৈতিক অঞ্চলেও বিস্তারিত হয়। রাজনৈতিক ধর্মঘট যা প্রায়শই হরতাল নামে অভিহিত হয়। ঔপনিবেশিক শাসকদের উৎখাতের আন্দোলনে হরতাল একটি শক্তিশালী উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়। ২০–এর দশক থেকে ৫০–এর দশক পর্যন্ত হরতাল ও ধর্মঘটকে সমার্থক হিসেবেই ধরা হয়। ষাটের দশক থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে হরতালকেই ধর্মঘটের চেয়ে অধিকতর জোরদার অস্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। ৮০–এর দশকে হরতাল বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে একটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিরোধী দলসমূহ এরশাদের শাসনকে (১৯৮২–৯১) অবৈধ ঘোষণা করে ঘন ঘন হরতাল ডেকে প্রশাসনকে অকেজো করে দেয় এবং তার সরকারের পতন ঘটে। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী দলসমূহ বেগম খালেদা জিয়ার সরকারকে (১৯৯১–৯৬) উপর্যুপরি হরতালের মাধ্যমে তীব্র চাপে রাখে। শেখ হাসিনার প্রশাসনও (১৯৯৬–২০০১) হরতালের চাপ থেকে মুক্ত ছিল না। রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে হরতাল ঔপনিবেশিক আমলে ফলপ্রসূ ছিল। কিন্তু অনেকের মতে, একটি আধুনিক স্বাধীন রাষ্ট্রে এ অস্ত্রের প্রয়োগ অসংগতিপূর্ণ।

হরতাল নয় কর্মসূচি : জেনারেল এইচ এম এরশাদের শাসনামলে কড়া মার্শাল 'ল' পরিস্থিতির বাইরেও কয়েকবার সংবাদপত্রের ওপর হুকুম জারি হয়— বিরোধী দলগুলো হরতাল, ধর্মঘট ও অবরোধ ডাকলেও সংবাদপত্রে তা লেখা যাবে না। তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী আনোয়ার জাহিদ ছিলেন এ নীতির উৎসাহী সমর্থক। তিনি সম্পাদকদের ডেকে সামরিক আইনের ধারাসমূহ না মেনে চললে কঠোর শাস্তির হুমকি দেন। সাংবাদিকরা অবশ্য এ অন্যায় আদেশের কাছে নতি স্বীকার করেনি। তার স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দল ও জোটের ডাকা হরতাল কর্মসূচির কথা জনগণকে ঠিকই জানিয়ে দেন। তবে একটু কৌশল করে। হরতালের পরিবর্তে লেখা হয় কর্মসূচি। যেমন : আজ দেশব্যাপী অর্ধদিবস কর্মসূচি, দেশব্যাপী পূর্ণ দিবস কর্মসূচি পালিত, তিন জোট টানা ৪৮ ঘণ্টা কর্মসূচি ডেকেছে প্রভৃতি।

হরতালের প্রয়োজনীয়তা : অতীত ও বর্তমানের আলোকে হরতাল কর্মসূচিতে ভালোমন্দ দুটো দিকই পরিলক্ষিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী নীতির অবসানকল্পে তথা পুঁজিবাদের অপকৌশলকে রোধ করতে এমনকি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে হরতাল কমসূচির ভূমিকা বা প্রয়োজনীয়তা আছে।

হরতালের অপ্রয়োজনীয়তা : বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম দারিদ্র্যপীড়িত একটি দেশ। এ দেশে একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই আছে। বর্ষা মৌসুমে প্লাবন আসে ক্ষণে ক্ষণে। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস সমুদ্র উপকূলবর্তী মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বারবার, টর্নেডোর আকস্মিক তাণ্ডবলীলা গ্রামগঞ্জের অবস্থানকে করে দিয়ে যায় লন্ডভন্ড। আকস্মিক প্রবল বৃষ্টিপাত রাজধানী করে অচল, এমনকি রাজপথে চার চাকার গাড়ির পাশে একই রাস্তায় নৌকায় চড়ে ঢাকাবাসীদের জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এ পরিস্থিতিতে হরতালের মতো আত্মবিধ্বংসী কর্মসূচি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ একদিনের হরতালে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে যে ক্ষতির শিকার হয় তা থেকে আর বের হয়ে আসতে পারে না। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে হরতাল কর্মসূচি সাধারণ মানুষের কাছে একটি উদ্‌বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর যারাই সরকার গঠন করেছেন এবং দেশ পরিচালনা করে আসছেন তারাই হরতালের বিরোধিতা করে আসছেন, কিন্তু ক্ষমতার বাইরে বিরোধী দলে গেলে তারাই আবার হরতাল কর্মসূচি দিয়ে যাচ্ছেন। হরতালের পক্ষ–বিপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন রাজনীতিকরাই।

উপসংহার : স্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের বৈধ হাতিয়ার হলো হরতাল। কিন্তু বর্তমানে 'হরতাল' শব্দটি তার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা হারিয়েছে— সুবিধাবাদি রাজনীতিবিদরাই এজন্য দায়ি। মূলত তাদের কারণেই হরতাল বাংলাদেশের জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। ক্ষমতায় থাকলে হরতাল অবৈধ আর ক্ষমতায় না থাকলে বৈধ রাজনৈতিক দলগুলোকে এ স্থূল সংস্কৃতি ত্যাগ করতে হবে। নতুবা অতীতের মতো জনগণ কর্তৃক তারা ধিকৃত ও পরিত্যক্ত হবেন– এ কথা ধ্রুব সত্য।

১৫৪. বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা ও পরিবার পরিকল্পনা
অথবা, বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা ও প্রতিকারের উপায় *[চ. বো. '১৩]*
অথবা, বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও তার প্রতিকার
অথবা, বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা ও তার প্রতিকার

ভূমিকা

পৃথিবীর সকল দেশে জনসংখ্যা সমস্যা আছে। অধিক জনসংখ্যা অথবা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় কম জনসংখ্যা— এ দুই সমস্যা প্রায় সকল দেশকেই মোকাবিলা করতে হয়। তাই পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশই পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা হ্রাস অথবা বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করে থাকে।

অনুসৃত নীতি : এ সমস্যার সমাধানে মোটামুটিভাবে তিনটি নীতি অনুসৃত হয়ে থাকে। যথা : (১) সংকোচন নীতি, (২) স্থিতিশীল নীতি, (৩) সম্প্রসারণ নীতি।

বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জনসংখ্যা–নীতি অনুসরণ করা হয়। ফ্রান্সে তার প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা খুবই কম থাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সম্প্রসারণ নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল। সম্প্রসারণ নীতির সফলতার জন্য সরকার জনগণকে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে বিবাহ–ঋণ, প্রসূতি ভাতা ইত্যাদি সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। আবার, সুইডেনের স্থিতিশীল নীতিতে একদিকে যেমন বিবাহে উৎসাহদান করা হতো তেমনি অপরদিকে গর্ভপাত এবং অন্যান্য উপায়ে জন্ম নিরোধের ব্যবস্থা ছিল।

সম্প্রসারণ নীতি ও স্থিতিশীল নীতির চেয়ে সংকোচন নীতির ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা কম হলে জাতীয় উৎপাদনের হার এবং জাতীয় পুঁজির পরিমাণ হ্রাস পায়। কিন্তু এতে মাথাপিছু উৎপাদন কম হয় না। ফলে এক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনার তেমন গুরুত্ব নাও থাকতে পারে। আর যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পদের অনুপাতে বেশি হয় এবং তার গতি ক্রমবর্ধমান হয় তবে তার মাথাপিছু উৎপাদন কমে যায় এবং সাথে সাথে অর্থনৈতিক তথা সমাজের সামগ্রিক কাঠামোর ভারসাম্য দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই অধিক জনসংখ্যার ক্ষেত্রে সংকোচন নীতি অপরিহার্য। জনসংখ্যা যাতে দ্রুতগতিতে না বাড়তে পারে সেজন্য সীমিত পরিবারের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। একমাত্র পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমেই জনসংখ্যা সীমিত রাখা সম্ভব।

পরিবার পরিকল্পনা : আমরা অনেকেই পরিবার পরিকল্পনা বলতে শুধুমাত্র জন্ম–নিরোধ ব্যবস্থা বুঝে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ হচ্ছে সুপরিকল্পিত উপায়ে এবং আর্থিক সংগতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে পরিবারের সদস্য সংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা। পরিবার পরিকল্পনার একদিকে যেমন সন্তানহীন পরিবারের সন্তান লাভের পরিকল্পনা থাকে, তেমনি অপরদিক যাতে অধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করতে না পারে তার সুব্যবস্থা থাকে। পরিবারের সুখ ও সমৃদ্ধি সাধন এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নই পরিবার পরিকল্পনার আওতাভুক্ত। বাংলাদেশে জনসংখ্যা অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে এ ভীতিপ্রদ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বহু সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

খাদ্য সমস্যা : জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে খাদ্য সমস্যার প্রধান কারণ হয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এদেশের জনগণের খাদ্যের যোগান কৃষির ওপর নির্ভর করে। জনসংখ্যার কৃষি উপযোগী মাথাপিছু জমির পরিমাণ অর্ধ একর। কিন্তু শুধু বেঁচে থাকার জন্য কমপক্ষে আড়াই একর জমির প্রয়োজন। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা বর্তমান এবং ঘাটতি পূরণের জন্য বাংলাদেশকে প্রতিবছর বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

জাতীয় স্বাস্থ্য : বাংলাদেশে জন্ম ও মৃত্যু হার বেশি। অত্যধিক জন্ম যেমন মা ও সন্তানের স্বাস্থ্যহানি করে, তেমন অধিক মৃত্যু বিশেষ করে অকালমৃত্যু জাতীয় সম্পদের অপচয় ঘটায়। এছাড়া, দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনস্বাস্থ্য, ওষুধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং বাসস্থান সমস্যাকে জটিলতর করে তুলতে পারে।

জাতীয় উন্নয়ন ও মাথাপিছু আয় : অধিক জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি যদি একই গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটলেও মাথাপিছু আয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পেলে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব এবং এতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ জীবনযাত্রার মান অর্জিত হবে। এছাড়া বেকার সমস্যা অধিক জনসংখ্যারই ফলশ্রুতি।

অধিক জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশকে চরম বিপর্যয়ের হাত হতে রক্ষা করতে হলে সংকোচন নীতি অনুসরণ করতে হবে। আর এ সংকোচন নীতির অনুসরণে একমাত্র পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমেই বাংলাদেশের সুখী ও সমৃদ্ধশালী পরিবার গঠন, উন্নত সমাজব্যবস্থা এবং দেশের সার্বিক উন্নতি সাধন সম্ভব।

উপসংহার : বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে হলে ব্যাপক প্রচারণা ও অধিকতর সস্তা মূল্যে উপকরণসমূহের বিতরণ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নারীশিক্ষা এবং সাথে সাথে তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদানের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকলে বাল্যবিবাহ এবং সর্বজনীন বিবাহ লোপ পাবে। সুদূর গ্রামাঞ্চলে জনগণ যাতে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য আবশ্যকীয় ওষুধপত্র ও উপকরণসমূহ অতি সহজে পেতে পারে তার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে একটি বা একাধিক পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্র স্থাপন করা দরকার।

১৫৫. বেকার সমস্যা ও তার সমাধান

ভূমিকা : জীবনে প্রয়োজনের অন্ত নেই সত্য কিন্তু সহজ–সরলভাবে প্রাণধারণের উপযোগী অন্ন, বস্ত্র, সংস্থানের অভাবেও মানুষ আপন সত্তাকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। জীবিকা সংস্থাপনের জন্য মানুষকে কাজ করতে হয়। কেউবা কলম পিষে, কেউবা ব্যাবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে, কেউবা শিক্ষকতা করে এ জীবিকানির্বাহ করে। কিন্তু যখন এরূপ কোনো উপায়ে জীবিকা সংস্থানের উপায় থাকে না, তখন দেখা দেয় বেকার সমস্যা। আধুনিক বিশ্বে বেকার সমস্যা নেই এমন দেশ বিরল। এ সমস্যা যখন প্রকট হয়ে ওঠে তখন গোটা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ার উপক্রম হয় এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

কর্মসংস্থানের সমস্যা : উন্নত দেশে জনশক্তি দেশ গড়ার প্রধান অবলম্বন। সেসব দেশে উৎপাদনের উপাদানগুলো সুপরিকল্পিত উপায়ে কাজে লাগিয়ে কর্মক্ষম লোকদের কর্মসংস্থান করা হয়, ফলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। উন্নত দেশে নিজেদের ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের গতিকে অব্যাহত রাখার জন্য বিদেশ থেকে জনশক্তি আমদানিও করতে হয়। আর অনুন্নত দেশে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে উৎপাদনগুলো কাজে লাগানো সম্ভবপর হয় না; ফলে কর্মক্ষম জনগণের কর্মসংস্থান হয় না, বেকারত্বের অভিশাপে ভেঙে পড়ে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো।

যন্ত্রের দৌরাত্ম্য : যান্ত্রিক যুগের আবির্ভাবের পূর্বে প্রত্যেক দেশই কুটিরশিল্পে সমৃদ্ধ ছিল। বাংলাদেশের কুটিরশিল্পও ছিল বিশ্বের বিস্ময়। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদনের পদ্ধতিতে সূচিত হয় বিরাট পরিবর্তন। তখন থেকে যন্ত্রচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় যন্ত্রহীন শ্রমিকরা পিছু হটতে থাকে। যন্ত্রশিল্পের প্রতাপে আমাদের দেশের মতো অনুন্নত দেশগুলোতেও তারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। আগের দশজন শ্রমিকের উৎপাদন এখন এক দিনে করতে পারে একজন শ্রমিক তার যন্ত্রের সাহায্যে। কাজেই অনুন্নত দেশের শ্রমিকরা যন্ত্রের দৌরাত্ম্যে বেকার হয়ে পড়ছে। উন্নত দেশে ভূমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে উৎপাদনে মনোনিবেশ করা হয় বলে সেখানে বেকার সমস্যা নেই। আর থাকলেও তা তত প্রকট নয়।

সমস্যার জটিলতা : আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাও বেকার সমস্যার অন্যতম কারণ বটে। শিক্ষার হার এখনো শোচনীয়ভাবে কম। হাতে গোনা যেকটি লোক কিছুটা শিক্ষার আলো পেয়েছে তাদের মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়নি। এর ফলে এ দেশে আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে জনসংখ্যা। অন্যদিকে কর্মসংস্থানের অভাবে বেকার থাকছে কর্মক্ষম মানুষ। এই শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকাররা সমাজের আঙিনায় সৃষ্টি করে চলেছে নতুন নতুন অশান্তি আর উপদ্রব। বেকার মানুষ ক্রমে কাজের অযোগ্য হয়ে পড়ে, হতাশ হয়। অনেকে বখাটে হয়ে যায় এবং হতাশার সৃষ্টি করে।

পরিণাম : মধ্যবিত্ত সমাজ বেকারত্বের প্রধান শিকার। তাদের জীবিকার সুষ্ঠু পথ নেই, যেকোনো জীবিকা অবলম্বনের মানসিকতাও তাদের নেই। দেশে কারিগরি শিক্ষার এমন বিকাশ ঘটেনি যে তা অবলম্বনে বেকার সংখ্যা কমানো যায়। উচ্চশিক্ষার দ্বার অবারিত থাকায় বেকার শিক্ষিতেরা আরও বেশি সংকটে পড়ছে। জাতীয় জীবনে বেকার সমস্যা অত্যন্ত ভয়াবহভাবে দেখা দেয়। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে দেয় বেকারের সংখ্যাধিক্য। তাই জাতির বৃহত্তর স্বার্থে বেকার সমস্যার অবশ্যই সমাধান করতে হবে। সমস্যার জটিলতাকে ভয়াবহ বলে বিবেচনা না করে এমন উপায় বের করতে হবে যাতে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে এই সমস্যার অবসান ঘটে। ব্যক্তিজীবনে প্রত্যেককে স্বাবলম্বী হতে হবে। শিক্ষা যাই থাকুক না কেন, শিক্ষার মিথ্যা মোহ ত্যাগ করতে হবে। জীবিকার যেকোনো উপায় অবলম্বনে যাতে কোনো দ্বিধা দেখা না দেয় সেদিকে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে। কৃষি, ব্যাবসাবাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে সবাইকে আগ্রহী হতে হবে।

NABARUN PUBLICATION

সমাধানের উপায় : বৃত্তিমূলক বা কারিগরি শিক্ষার প্রচলনের মাধ্যমে আমাদের দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। যারা স্কুলের পড়া চালিয়ে নিতে পারেনি তাদের জন্য যদি কারিগরি শিক্ষালাভের ব্যবস্থা থাকে তবে সহজেই জীবিকার একটা অবলম্বন হতে পারে। কৃষিকাজের প্রতি মনোযোগী হলে অনেক বেকারের কর্মসংস্থান হবে এবং কৃষি উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। দেশে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হলে বেকারত্বের সংখ্যা কমে আসবে। কুটিরশিল্প স্থাপনও এক্ষেত্রে সহায়ক হবে। সর্বোপরি দেশের সকলের মানসিকতার পরিবর্তন করা দরকার। তাছাড়া আজকাল জার্মানি, ইংল্যান্ড, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মের সংস্থান রয়েছে। চাকরি বিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে আমাদের বেকার যুবকদের সেসব দেশে কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ দিলে বাংলাদেশের বেকার সমস্যা কিছুটা হ্রাস পাবে। তাছাড়া বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য এমন সব পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে নতুন নতুন কর্মের সৃষ্টি হয়।

উপসংহার : দেশে প্রকল্প যত বাড়ছে তার তুলনায় জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে দ্রুততর গতিতে। সর্বনাশা লোকসংখ্যা কমাতে না পারলে বেকার সমস্যার সমাধানের আশা সুদূর পরাহত। এতদ্‌প্রেক্ষিতে আমাদের উচিত সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজ নিজ উদ্যোগে ক্ষুদ্র ব্যাবসা–প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করে আর্থিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করা। এতে এতকাল সুযোগের অভাবে আমরা যে অকর্মণ্য জীবনযাপনে বাধ্য হয়ে নিজেদের শক্তি নষ্ট করছিলাম, সে অপচয় রোধ হবে। দেশের শক্তি ও শ্রী আবার ফিরে আসবে।

১৫৬. বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও দারিদ্র্য বিমোচন

ভূমিকা : বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দারিদ্র্যপীড়িত দেশ। বাংলাদেশে যেসব সামাজিক সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে দারিদ্য প্রধান সমস্যা। দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাতে এ দেশের সমাজজীবন চরমভাবে বিপর্যস্ত। দারিদ্র্য সামাজিক জীবন এবং জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতির ধারাকে ব্যাহত করছে। এ দারিদ্র্য অনেক সময় মানুষকে মৃত্যুর মুখোমুখি এনে দাঁড় করায় এবং একটা জাতিকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে তথা বিপযস্ত ও বিধ্বস্ত করতে একটা চরম অভিশাপ হিসেবে কাজ করে।

দারিদ্র্য : দারিদ্র্য একটি আপেক্ষিক বিষয়। একে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। আভিধানিক অর্থে 'দারিদ্র্য' বলতে অভাবকেই বোঝায়। দারিদ্র্য মানে মৌলিক সামর্থ্যের অভাব। ন্যূনতম খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবসমূহ মৌলিক সামর্থ্যের অভাবের আওতায় পড়ে।

বর্তমানে দারিদ্র্য পরিমাপে 'দারিদ্র্যসীমা' ধারণাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই হিসাবে যারা দৈনিক ২১২২ কিলোক্যালরির কম খাবার পায় তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করে। আর যারা ১৮০৫ কিলোক্যালোরির কম খাবার পায় তারা চরম দারিদ্র্যের শিকার।

সমাজবিজ্ঞানী গিলিন–এর মতে, যাদের জীবনযাত্রার মান তাদের সমাজনির্ধারিত জীবনযাত্রার নিচে তারাই দরিদ্র। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রভাব খুব বেশি। তাই বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দরিদ্রপ্রধান দেশ হিসেবে পরিচিত।

বাংলাদেশের সীমাহীন দারিদ্র্য : বাংলাদেশের সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে সব কিছু হারিয়ে যাবে। দেশে তিন কোটি বেকার। প্রকৃতপক্ষে দেশের মোট জনশক্তির এক বিশাল অংশ কর্মহীন। একটি দরিদ্র দেশের মোট জনশক্তির বিপুলসংখ্যক মানুষের বেকারত্ব অব্যাহত রেখে দেশের সার্বিক উন্নতি কিংবা সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। দেশের উন্নয়ন ও উন্নতির জন্য তাই দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রধান কর্তব্য। দেশের অশান্তি ও অস্থিরতা দূর করতে হলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এই দুঃখ–দারিদ্র্য, অভাব–অনটন দূর করতে হবে।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি : যদিও বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সকল নীতি–পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিগত প্রায় সব সরকারই বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং দারিদ্র্য পরিস্থিতি এখনো উদ্‌বেগজনক। বিভিন্ন তথ্যমতে, দেশে দারিদ্র্য ক্রমহ্রাসমান হলেও এখনো দারিদ্র্যের উপস্থিতি সুবিস্তৃত ও গভীর।

ধনী–গরিবের বৈষম্য বৃদ্ধি : সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেলেও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এর সুফল ভোগ করতে পারছে না। দেশে ধনী আরও ধনী এবং গরিব আরও গরিব হচ্ছে। সমীক্ষার তথ্যে দেখা যায়, সবচেয়ে গরিবদের মধ্যেও শহর–গ্রামের বৈষম্য বেড়েছে। শহরের চেয়ে গ্রামীণ গরিবদের আয় কমেছে অনেক বেশি হারে।

অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, দীর্ঘদিন যাবৎ জাতীয় আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে গরিব জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত রাখা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে গ্রামাঞ্চলকে উপেক্ষা করাই এই বৈষম্য বৃদ্ধির কারণ। শহরগুলোতে এক শ্রেণির মানুষের ভোগবিলাসের পাশাপাশি সবচেয়ে

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাহীন জীবনযাপন প্রকটভাবেই এই বৈষম্যের বিষয়টি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

সমাজে দারিদ্র্যের প্রভাব : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ বর্তমানে দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাতে জর্জরিত হওয়ার কারণে এ দেশের আর্থসামাজিক জীবনে দারিদ্র্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা দারিদ্র্যের প্রভাবমুক্ত। এ দেশের প্রতিটি সমস্যার সাথেই দারিদ্র্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

এককথায় বলা চলে, দারিদ্র্য হলো সকল সামাজিক সমস্যার মূল উৎস এবং আমাদের দেশে জাতীয় উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। দারিদ্র্য শুধু একটি সামাজিক সমস্যাই নয়; বরং বহু সামাজিক সমস্যার জন্মদাতাও। তাই দারিদ্র্য বাংলাদেশের জন্য একটি মারাত্মক অভিশাপ।

দারিদ্র্যের অভিশাপ : দারিদ্র্য হচ্ছে একটি দেশের মানুষের সার্বিক জীবনমানের নিম্ন পর্যায়, উপযুক্ত খাদ্য ও বাসস্থানের অভাব এবং জীবনধারণের উপযোগী পণ্যসামগ্রী সংগ্রহের অক্ষমতা। দরিদ্র সমাজের মানুষ পুষ্টিহীন, শিক্ষাবঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ। জীবনের কোনো আলোই তাদের স্পর্শ করে না। উন্নত জীবনের সব ধরনের সুযোগ–সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। শুধু সীমাহীন বঞ্চনা ও স্বপ্নহীনতা নিয়েই তাদের বেঁচে থাকতে হয়।

জীবননামক বস্তুটি তাদের কাছে অলীক–অর্থহীন বলে মনে হয়। জীবনের প্রায় কোনো স্বপ্ন, কোনো আশা, কোনো সাধ, কোনো বাসনা তারা পূরণ করতে পারে না।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণ : বাংলাদেশে দারিদ্র্যের ব্যাপকতার জন্য কোনো একক কারণ দায়ী নয়; বরং বহুবিধ কারণেই এদেশে দারিদ্র্য ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিস্তারের প্রধান কারণগুলো হলো— দীর্ঘ সময় ধরে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা শোষিত হওয়া, অনুন্নত কৃষিব্যবস্থা, অনগ্রসর শিল্পব্যবস্থা, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা, মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা, কুসংস্কার ও ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপকতা, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র, সম্পদের অসম বণ্টন, মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, নিরক্ষতা ও অজ্ঞতা, ভয়াবহ বেকারত্ব, মহিলাদের কর্মসংস্থানের অভাব, পশাসনিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ব্যাপক আকারে দুর্নীতি ইত্যাদি।

দারিদ্র্য বিমোচনের উপায় : বাংলাদেশ সরকার দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি :** চরম দারিদ্র্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সরবরাহ এবং তাদের আয় বর্ধনকারী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার প্রতিবছর রাজস্ব বাজেট থেকে সম্পদের সংস্থান করছে।

২. **আবাসন প্রকল্প :** গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন, গৃহহীন দুস্থ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৫০ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার ৪৪৭,২০ কোটি টাকা ব্যয়ে আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

৩. **দারিদ্র্য বিমোচন ও ছাগল উন্নয়ন প্রকল্প :** ছাগল পালনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দারিদ্র্য বিমোচনের ও ছাগল উন্নয়ন শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ছাগল পালনের জন্য ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হবে।

৪. **বয়স্কভাতা কর্মসূচি :** দেশের প্রায় প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে দশজন সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও দরিদ্র ব্যক্তিকে মাসিক পাঁচশ টাকা হারে বয়স্কভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এতে দেশে ৪৪ লক্ষাধিক দরিদ্র বয়স্ক ব্যক্তি উপকৃত হচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সার্বিকভাবে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে।

৫. **গৃহায়ন তহবিল :** দারিদ্র্য বিমোচনের নির্দিষ্ট কর্মসূচি হিসেবে গৃহহীন দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর গৃহায়নের জন্য গৃহায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিওসমূহের কর্মসূচি : বাংলাদেশের সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা, করিতাস, স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রভৃতি এনজিওর কার্যক্রম হলো ঋণ প্রদান, শিশু ও বয়স্কদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে আইনগত পরামর্শ প্রদান, মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন, রেশম সম্পদ উন্নয়ন, সেচ কর্মসূচি, নলকূপ স্থাপন ও বিতরণ, পরিবেশসম্মত কৃষি, সামাজিক বনায়ন ও গৃহায়ন কর্মসূচি ইত্যাদি।

অন্যান্য সংস্থার দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি : বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশলী অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড, পল্লি দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

উপসংহার : দারিদ্র্য বাংলাদেশের একটি জটিল ও মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। দারিদ্র্যই বাংলাদেশের জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক এবং দেশের হাজারো সমস্যার জন্মদাতা। তাই যেকোনো মূল্যে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে। কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক ও জটিল বিষয়। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন অর্থনীতিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন ও জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন। বাংলাদেশে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৭ থেকে ১০ শতাংশে উন্নীত করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। এজন্য দেশের সরকার ও সর্বস্তরের জনগণকে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

১৫৭. সামাজিক ব্যাধি : ইভটিজিং ও তার প্রতিকার
অথবা, যৌন হয়রানি

ভূমিকা

আমাদের যাপিত জীবনের এক পাত্যহিক দুষ্ট ক্ষত হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক ব্যাধি ইভটিজিং। সকলের চোখের সামনে একটি বড়ো সমস্যা আমাদের সমাজে দীর্ঘকাল যাবৎ বিরাজ করছে যা নিয়ে হয়েছে বহু আলোচনা–সমালোচনা এবং সভা–সেমিনার। তথাপি সমস্যাটির সমাধান তো দূরের কথা বরং এর প্রচন্ড দাপট দিন দিন বেড়েই চলেছে। দেশের হাজারো সমস্যা ছাপিয়ে ইভটিজিং এখন অন্যতম সামাজিক সমস্যা। আজকের আধুনিক সমাজব্যবস্থায় ইভটিজিং যেন মরণঘাতী। প্রতিনিয়ত এদেশের সব শ্রেণি–পেশার নারীরা কমবেশি এই ইভটিজিং–নামক ভয়াবহ উৎপীড়নের শিকার হচ্ছে।

ইভটিজিং কী : ইভটিজিং শব্দটি— 'Eve' এবং 'teasing' নামক শব্দযোগে গঠিত। যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যথাক্রমে— সৃষ্টি বিবরণে জ্ঞাত পবিত্র বাইবেল ও কোরআনে বর্ণিত প্রথম মানবী বিবি 'হাওয়া বা হবা' ও 'ইভ'–কে নির্দেশ করে এবং 'teasing' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিরক্ত বা উত্ত্যক্ত করা। কিন্তু ব্যাবহারিক অর্থে শব্দটি যৌন হয়রানির এক অমার্জিত বা অশ্লীল (slang) রূপ। ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত ইভটিজিং শব্দটির বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে 'নারীকে উত্ত্যক্ত করা' বা 'উত্ত্যক্ত করা'। তবে এর মধ্যে এই শব্দটির নিহিতার্থ সীমিত নয়; বরং এটা মূলত এক ধরনের Euphemism (ইউফেমিজম)। অর্থাৎ, উত্ত্যক্ত করার আড়ালে যৌনতার নির্লজ্জ প্রবৃত্তি। পাশ্চাত্য দেশ তথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে 'Eve teasing'–কে বলা হয় 'Sexual harassment' বা 'যৌন হয়রানি'। 'Sexual harassment' শব্দটির জন্ম আমেরিকায়। এ শব্দটি প্রথম পরিচিতি পায় ১৯৭৫ সালের দিকে। সাংবাদিক সুসান ব্রাউনমিলার 'In Our Time Memoir of a Revolution' (1999) গ্রন্থ অনুযায়ী ১৯৭৫ সালে কর্নেল অ্যাস্টিভিস্টরা 'Sexual harassment' শব্দটি উদ্ভাবন করেন।

ইভটিজিং কাদের দ্বারা হয় : স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে কাদের দ্বারা এই ঘৃণ্য কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়— এলাকার বখাটে যুবক, বেকার, ভবঘুরে নেশাখোররাই এর সাথে সর্বাধিক জড়িত হয়ে থাকে। তবে আজকাল অনেক সাধারণ ছাত্র ও কিশোররা কুসংঘের প্রভাবে পড়ে এ ধরনের ঘৃণ্য কাজে জড়িয়ে পড়ছে। সব শ্রেণি–পেশার পুরুষরা এমনকি আজকাল তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় বিকৃত আনন্দের বিষয় হিসেবে ইভটিজিংকে বেছে নিয়েছে।

ইভটিজিং–এর ধরন : ইভটিজিং এক প্রকার নারীনির্যাতন হলেও এর ধরন বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। প্রথমত, স্কুলকলেজগামী ছাত্রী, শিক্ষিকা, কর্মপথে যাতায়াতকারী কর্মজীবী নারীসহ প্রতিটি নারীই তার চলাচলের প্রায় সর্বত্রই কোনো না কোনোভাবে ইভটিজিং–এর শিকার হয়ে থাকেন। দ্বিতীয়ত, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহারের অপকৌশলসহ বাচনিক, অবাচনিক কিংবা শারীরিক উপায়ে বখাটেরা ইভটিজিং করে থাকেন।

ইভটিজিং–এর অন্তর্ভুক্ত কাজ : ইভটিজিং–এর অন্তর্ভুক্ত কাজগুলোকে তিন শ্রেণিতে বিভাজন করা সম্ভব। যথা : ১. বাচনিক, ২. অবাচনিক এবং ৩. শারীরিক।

১. **বাচনিক দিক :** নারীকে উত্ত্যক্ত করার নানা বাচনিক কুবুদ্ধিপূর্ণ ইঙ্গিতই বাচনিক দিক। যথা : অশ্লীল বা অশালীন মন্তব্য, শিস বজানো, উদ্দেশ্যপূর্ণ যৌন আবেদনময়ী গান গাওয়া, হুমকি প্রদান, অবৈধ যৌন সম্পর্কের দাবি বা অনুরোধ ইত্যাদি।

২. **অবাচনিক দিক :** নারীকে উত্ত্যক্ত করার নানা অবাচনিক কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিতই ইভটিজিং–এর অবাচনিক দিক। যথা : লম্পট চাহনি, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, উসকানিমূলক তালি বাজানো, যৌন অর্থবাহী ছবি বা ভিডিয়ো দেখানো, অস্বস্তিপূর্ণ অপলক দৃষ্টি, পিছু নেওয়া, মোবাইলে কুরুচিপূর্ণ ম্যাসেজ পাঠানো বা মিস্‌ড্‌কল দেওয়া, উড়ন্ত চুমুর ইঙ্গিত (Flying kiss), চলার পথে বাধা সৃষ্টি প্রভৃতি।

৩. **শারীরিক দিক :** নারীকে বিব্রত বা বিরক্ত করার নানা শারীরিক কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিতকে ইভটিজিং–এর শারীরিক দিক বলা হয়। ঘাড় ও কাঁধে হাত দেওয়া, গা ঘেঁষে দাঁড়ানো, জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়া, শারীরিক সম্পর্কের মতো অপ্রত্যাশিত

যৌনাকাঙ্ক্ষার ব্যবহার, শরীরে ধাক্কা দেওয়া, ব্ল্যাকমেইল বা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা চলমান চিত্র ধারণ করা ইত্যাদি।

ইভটিজিংয়ের ভয়াবহতা/কুপ্রভাব ও ক্ষতি : সমাজের তথাকথিত বয়োজ্যেষ্ঠরা অনেক সময় 'বয়সের দোষ' বা 'মজা করা' বলে ইভটিজিংকে ছোটো করে দেখেন বা আমলে আনতে চান না। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজে ইভটিজিং ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে, যার কুপ্রভাব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়েছে। এর ক্ষতিকর প্রভাব নারীজীবনের সচল জীবনপ্রবাহকে অচল–অসার করে রেখেছে।

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতীয় জীবনে ইভটিজিং–এর কুপ্রভাবগুলো নিম্নরূপ :

(ক) ইভটিজিং–এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাবে নারীরা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

(খ) এর ফলে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(গ) এর ফলে গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(ঘ) এটা এতই স্পর্শকাতর যে এর ফলে আত্মহত্যার সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে।

(ঙ) সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়নও এর ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

(চ) ক্ষেত্রবিশেষে ইভটিজিং–এ অতিষ্ঠ নারী বাধ্য হয়ে চাকরি ছাড়ছে, যা নারীর আত্মনিরাপত্তার পথকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

(ছ) এমনিভাবে ইভটিজিং বিভিন্ন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের চরম ক্ষতিসাধন করে চলছে।

সাম্প্রতিক চিত্র : সাম্প্রতিককালে ইভটিজিং–এর হিংস্র ভয়াল থাবায় ক্ষতবিক্ষত ও অপমানের দহনে জ্বলতে থাকা বহু কিশোরী–তরুণীর আত্মহননের নির্মম পথ বেছে নেওয়া এবং একই সাথে এই ঘৃণ্য অপরাধের প্রতিবাদ করতে গিয়ে জাতি গড়ার মহান শিক্ষক কিংবা মমতাময়ী মা ও অভিভাবকের মৃত্যুতে সৃষ্টি হয়েছে গভীর উদ্‌বেগ। সামাজিক মূল্যবোধ, নীতি–নৈতিকতা, আদর্শ ও জীবনবোধকে গ্রাস করা ভয়ানক এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ এখন সময়ের দাবি।

ইভটিজিং–এর কারণ : আমাদের বর্তমান সমাজে ভয়াবহ ক্যানসার রোগের মতো ইভটিজিং একটি সামাজিক সমস্যা। এর কারণে বেড়েছে নারীর আত্মহনন। দেশব্যাপী ক্ষতিকর এ সমস্যার জন্য নিম্নোক্ত কারণসমূহ দায়ী :

(ক) সমাজের নানা ক্ষেত্রে মূল্যবোধের অবক্ষয়।

(খ) নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গির অভাব।

(গ) অপসংস্কৃতির কুপ্রভাব।

(ঘ) সুস্থ রুচিশীল সংস্কৃতি–চর্চার অভাব।

(ঙ) পারিবারিক বন্ধন ক্ষয়িষ্ণু এবং মাতা–পিতার সচেতনতার অভাব।

(চ) অসৎসঙ্গ, মাদকাসক্তি, বেকারত্ব ও অশিক্ষার প্রভাব।

(ছ) লিঙ্গ বৈষম্যমূলক সামাজিক ব্যবস্থাপনা।

(জ) নারীকে ভোগ্যপণ্য মনে করা।

(ঝ) নারীর কুরুচিশীল পোশাক ও স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতাও অনেকাংশে দায়ী।

(ঞ) ইভটিজিংবিরোধী স্বতন্ত্র আইনের অভাব এবং এই অপরাধ বিষয়ে অজ্ঞতা।

(ট) ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব।

ইভটিজিং আইন ও তার প্রয়োগ : ইভটিজিং আইনগুলো সুস্পষ্ট নয়। আমাদের দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম হওয়ায় তারা ইভটিজিং–এর ঘটনাসমূহ তুচ্ছ ঘটনা বলে অভিভাবক পর্যায়ে বা গ্রাম্য সালিশে মীমাংসা করতে বলেন। তবে দেশে বিদ্যমান কয়েকটি আইনে এ সম্পর্কিত ধারা আছে।

আইন বা অধ্যাদেশ	ধারা
(ক) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০	১০ (২)
(খ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩	৯ ক
(গ) দণ্ডবিধি (অপরাধসংক্রান্ত প্রধান আইন গ্রন্থ)	২৯০–২৯৪, ৩৫৪, ৫০৯
(ঘ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬	৭৬
(ঙ) পেনাল কোড, ১৯৬০	৫০৯

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী, "কোনো পুরুষ অবৈধভাবে তার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোনো নারীর শ্লীলতাহানি করলে বা অশোভন অঙ্গভঙ্গি করলে তার এ কাজ হবে যৌন হয়রানি এবং এ কাজের জন্য উক্ত পুরুষ ৭

বছর অন্যূন ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে ও অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।" কিন্তু এ ধারাটির অপব্যবহার হতে পারে এই আশঙ্কায় ২০০৩ সালে এটি সংশোধন করা হয় এবং দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সংশোধিত আইনটি এখনো কার্যকর হয়নি।

আইনের ধারায় বলা হয়েছে যে, নারীর সম্ভ্রমহানির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোনোও কথা, কাজ অথবা অঙ্গভঙ্গি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ইভটিজিং প্রতিরোধে সাম্প্রতিক আইনি পদক্ষেপ : দেশব্যাপী ইভটিজিং–এর ভয়াবহ বিস্তারে আতঙ্কিত সবাই। পাশাপাশি সরকারও বিব্রতকর অবস্থায়। তাই নারীর নিঃসঙ্গ ও নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইভটিজিং নির্মূল ও প্রতিরোধকল্পে সাম্প্রতিককালে নেওয়া হয়েছে নানা আইনি পদক্ষেপ। যেমন :

(ক) **ভ্রাম্যমাণ আদালত :** ইভটিজিং বন্ধে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারিক ক্ষমতা দিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনে দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারা সংযোজন করা হয়, যা ৯ নভেম্বর ২০১০ থেকে কার্যকর হয়। এ আদালতের মাধ্যমে ইভটিজারদের তাৎক্ষণিক শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট এ ধারা প্রয়োগ করে অপরাধীকে ঘটনাস্থলে বিচার করে সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে।

(খ) **অভিযোগ নম্বর ৭৩৭৩ :** দিন দিন ইভটিজারদের দৌরাত্ম্য বাড়তে থাকায় বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তর অভিযোগ নম্বর '৭৩৭৩' চালু করেছে। এর মাধ্যমে ইভটিজিং–এর দ্বারা শিকার হওয়া নারীরা ফোন করে অভিযোগ করতে পারেন।

(গ) **প্রতিরোধ কমিটি :** উত্ত্যক্তকরণ বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে 'ইভটিজিং প্রতিরোধ কমিটি' গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(ঘ) **শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন–২০১০ :** আইন কমিশন খসড়া প্রণয়ন করেছে। আইনটিতে গুরুতর ও লঘু— এ দুই ধরনের অভিযোগে শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

মোবাইল হেল্পলাইন : কোনো নারী ইভটিজিং–এর শিকার হলে কিংবা হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে মোবাইল হেল্পলাইনে সরাসরি ফোন করে অভিযোগ করতে এবং আইনি সহায়তা নিতে পারবেন।

উত্ত্যক্তকরণ প্রতিরোধ দিবস : ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ নিরাপত্তাবিধানের জন্য সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ার লক্ষ্যে ১৩ই জুন ২০১০ প্রথমবারের মতো সারাদেশে ছাত্রী উত্ত্যক্তকরণ প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। এর আগে ২০০৯ সালের ১৪ই মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ যুগান্তকারী এক রায়ে টিজ করাকে যৌন হয়রানি আখ্যায়িত করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এ বিষয়ে সংসদে কোনো আইন তৈরি না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগের রায়টিকে আইনের মতো বাধ্যতামূলক হিসেবে মেনে চলতে বলা হয়েছে।

ইভটিজিং প্রতিরোধ ও আমাদের করণীয় : বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের অধুনা যুগে ইভটিজিং–এর কারণে শঙ্কিত ও অনিরাপত্তার বেড়াজালে বন্দি নারীর আত্মহনন এখন দেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। নারীর প্রতি এ সহিংসতা ও নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে ইভটিজিং প্রতিরোধের জন্য আমাদেরকে নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করতে হবে :

(ক) সামাজিক আন্দোলন ও প্রতিরোধ জোরদার করা।
(খ) ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ জাগ্রত করা।
(গ) সামাজিক মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর ভূমিকা পালন করা।
(ঘ) নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।
(ঙ) সুস্থ বিনোদন ও রুচিশীল সংস্কৃতির চর্চা ক্রমাগত বৃদ্ধি করা।
(চ) নারীদের উগ্র আধুনিকতা বর্জন এবং শালীন পোশাকের ব্যবহার করা।
(ছ) অপসংস্কৃতির আগ্রাসন রোধ করা।
(জ) মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ও মুক্ত আকাশ সংস্কৃতির ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।
(ঝ) সর্বত্র অশ্লীলতা, যৌন বিকার, কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও অপসংস্কৃতির আগ্রাসন রোধ করা।
(ঞ) স্থানীয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তৎপর ভূমিকা পালন করা।
(ট) বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা।
(ঠ) নারীদের সুরক্ষা ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার জন্য সাহস জোগানো।
(ড) ইভটিজিং রোধে আইন পাশসহ তা কাঠোরভাবে বাস্তবায়ন ও জনসমক্ষে সরাসরি প্রচারের ব্যবস্থা করা।

(ঢ) ইভটিজিংকে সভা, সেমিনার, পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলনের রূপদান করা।

উপসংহার : ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে ইভটিজিং–নামক সামাজিক সমস্যার সমাধান অতীব জরুরি। ইভটিজিং–এর আতঙ্ক থেকে মুক্তি পেয়ে নারী ঘরে–বাইরে থাকুক নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ এবং খুঁজে পাক আপন ঠিকানায় স্বপ্নমঙ্গলময় জীবনের সন্ধান— তাই আসুন গড়ে তুলি ইভটিজিংসহ নারীনির্যাতন–বিরোধী ব্যাপক প্রতিরোধ এবং প্রতিষ্ঠা করি সামাজিক মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ এক পরিচ্ছন্ন সাম্যবাদী সমাজ।

খেলাধুলা

১৫৮. খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা
অথবা, খেলাধুলা শিক্ষার অঙ্গ
অথবা, জাতীয় জীবনে খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা

ভূমিকা : প্রত্যেক মানুষের সুপ্ত বাসনা থাকে— দীর্ঘায়ু হওয়া। মানুষকে দীর্ঘায়ু হতে হলে মনও সুস্থ রাখা একান্ত কর্তব্য। তাই মানুষের মনের পুষ্টিজ্ঞান দিয়ে এবং খেলাধুলা দিয়ে শরীর সুস্থ রাখা কর্তব্য। শারীরিক সবলতা মানসিকভাবে বলিষ্ঠ রাখতে সাহায্য করে। মুক্ত প্রান্তরে বন্ধুবান্ধবের সাথে খেলাধুলা করে মন এবং শরীরে পুষ্টিসাধন করা যায়। খেলাধুলা চিত্তবিনোদনের উত্তম মাধ্যম। জাতীয় জীবনে বিনোদন হিসেবে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। খেলাধুলা শরীর ও মনের যৌথ কল্যাণপ্রসূ বোঝাপড়ার উত্তম মাধ্যম। জাতীয় জীবনে বিনোদন হিসেবে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। শরীর ও মন গঠনের অন্যতম উৎস। খেলাধুলার মধ্যেই মানুষ খুঁজে পায় জীবন বিকাশের উদারতার দিগন্তজোড়া উন্মুক্ততা, জয়ের এক অনমনীয় দুর্বার সংগ্রামী তেজোদীপ্ত কঠোর জয়ী হওয়ার বাসনা।

খেলাধুলার জন্মকথা : খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে ইরাকে প্রথম কুস্তি খেলার প্রচলন হয়। খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ বছর আগে প্রাচীন রোমে ক্রীড়া হিসেবে মল্লযুদ্ধ হতো। খেলাধুলার ইতিহাসে আমরা জানি, খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে প্রাচীন গ্রিসে অলিম্পিক খেলার সূত্রপাত হয়। সেই প্রতিযোগিতায় দৌড়, ঝাঁপ, চাকতি নিক্ষেপ, বর্শা ছোড়া, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি খেলা হতো। পরবর্তীকালে স্কেটিং, বক্সিং পোলা, সাঁতার, ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি অসংখ্য খেলার উদ্ভব হয়েছে।

খেলাধুলার শ্রেণিবিভাগ : খেলাধুলা সাধারণত দুই প্রকার। একটি হচ্ছে ঘরোয়া খেলা অন্যটি বহির্জগতের খেলা। দেশীয় খেলা হা–ডু–ডু, কাবাডি, গোল্লাছুট, কানামাছি, বউচি ইত্যাদি। বহির্জগতের খেলার মধ্যে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, টেনিস, দাবা, ব্যাডমিন্টন, হকি ইত্যাদি।

জাতীয় জীবনে খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব :

১. **মানসিক উন্নয়ন :** খেলাধুলা শরীর গঠনের পাশাপাশি মনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। খেলাধুলায় শিশুরা আনন্দ পায়। তাই ছোটোবেলা থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খেলার ব্যবস্থা করা উচিত। মনের আনন্দ স্ফুরণে ও সজীবতা রাখতে খেলাধুলার সুযোগ দেওয়া উচিত। তাদের একাকী রাখলে, খেলাধুলার জগতে প্রবেশ করতে না দিলে তারা বদমেজাজি, অভিমানী ও অস্থির মেজাজের হয়। তাই আমাদের সবল জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে হলে খেলাধুলার জগৎকে উন্মুক্ত করতে হবে।

২. **শৃঙ্খলাবোধ :** শৃঙ্খলাবোধ শুধু ব্যক্তির নয়, সমগ্র দেশ ও জাতির উন্নতির হাতিয়ার। ক্রীড়াঙ্গনই শৃঙ্খলাবোধের সূতিকাগৃহ, এরই নিয়মিত অনুশীলনে মানুষ আয়ত্ত করে দেহ–মনে শৃঙ্খলা। জীবনের সুস্থতা আর সবলতা প্রকাশ পায়। সমষ্টিগত চেতনার উন্মেষ ঘটে। দলগত ঐক্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়। ব্যক্তির আশা–আকাঙ্ক্ষা পরিণত হয় সামষ্টিক আশা–আকাঙ্ক্ষায়। ব্যক্তিগত দুর্বলতা হারিয়ে যায় দলগত প্রচেষ্টার মধ্যে। গোটা দলই জয়ের প্রত্যাশায় সর্বশক্তি উজাড় করে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে অনুপ্রাণিত হয়। একক শক্তির মহড়া নয় দলগত সংস্থাই প্রধান। আর এই দলগত শৃঙ্খলাবোধই জাতির অগ্রগতির অন্যতম ভিত্তি। সেজন্যেই সমাজ ও রাষ্ট্রে খেলাধুলার এত কদর।

৩. **চরিত্র গঠন :** খেলাধুলা চরিত্র গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। খেলাধুলা এক অনাবিল আনন্দের চিরন্তন উৎস। এই আনন্দের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে শরীর, মন ও চরিত্র। সেই চরিত্র পরবর্তী জীবনে সাফল্যের সোপান। সকলে মিলেমিশে নির্দেশ প্রদান ও মান্য কারার ক্ষমতা অর্জন করে। প্রত্যেক খেলার নিময়কানুন আছে। সেই নিয়ম–কানুন মেনে চলতে হয়। এভাবে নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে। দলীয় খেলায় দরকার সহনশীলতা, সহযোগিতা ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলি। খেলাধুলা সংকল্পের দেয় দৃঢ়তা, হৃদয়ের উদারতা, প্রতিযোগিতার একাগ্রতা ইত্যাদি।

৪. **স্বাস্থ্য গঠন :** স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। সুস্বাস্থ্য গঠনের জন্য খেলাধুলা ও ব্যায়াম অপরিহার্য। শৈশবে ও কৈশোরে খেলাধুলা ও ব্যায়াম স্বাস্থ্য গঠনের সহায়ক। শরীরের পুষ্টি, শারীরিক বৃদ্ধি এমনকি খাদ্যদ্রব্য হজম করার জন্য খেলাধুলা আবশ্যক।

৫. **বিনোদন :** নির্মল আনন্দের উৎস খেলাধুলা। আবাল–বৃদ্ধ–বনিতা খেলাধুলা দেখে আনন্দ লাভ করে। দর্শকমাত্রই খেলাধুলা দেখে আনন্দ লাভ করে। দর্শকদের অনিন্দ্য আনন্দ ভুবনে নিয়ে যায়। তাই তো আজকের দিনে খেলাধুলার এত জনপ্রিয়তা। একজন বিশ্বমানের খেলোয়াড় যেকোনো রাষ্ট্রনায়কের মতো মানবহৃদয়ে আসন করে নেয়। মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী, দিয়াগো ম্যারাডোনা, পেলে, ওয়াসিম আকরাম, ইমরান খান, শচীন টেন্ডুলকার এদেরকে পৃথিবীর সকল মানুষই চেনে। খেলাধুলা আনন্দ দেয় বলে এত জনপ্রিয়।

৬. **ক্লান্তিনাশ :** একঘেয়েমি মানুষকে নিয়ে যায় ক্লান্তির জগতে। তাই যত কর্মবীরই হোক না কেন একসময় সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই অবসাদ বা ক্লান্তি দূর করার জন্য অবশ্যই খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৭. **শিক্ষার উন্নয়নে :** শিক্ষা শুধু পরীক্ষায় পাশ নয়। সমগ্র জাতির উন্নতির উপায় উদ্ভাবন, মানুষের সুপ্ত প্রতিভার উন্মোচন প্রেরণা। দেহ–মনের সমন্বয় বিধানেই আছে মানুষের পূর্ণতা। খেলাধুলার আনন্দে দেহ–মন নেচে ওঠে এবং প্রাণবন্ত হয়। আজকের দিনে সহ–পাঠ্যক্রমিক এবং শিক্ষক্রমের পাঠ্যসূচিতে খেলাধুলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই খেলাধুলা অনাদৃত নয়। যেখানে জীবনবোধ স্বাচ্ছন্দ্য প্রবাহে উজ্জীবিত সেখানে খেলাধুলার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

৮. **খেলাধুলা ও জাতীয়তাবোধ :** জাতীয়তাবোধের জন্ম হয়েছে বলেই আজ বিশ্বে এত রাষ্ট্র। তাই জাতীয়তাবোধ অমূল্য সম্পদ। এই অনুভব করে দেশের সুনাম অর্জনের জন্য জাতির ললাটে এঁকে দিতে চায় বিজয়ের রাজতিলক। যখন কোনো দেশের দল অন্য দেশের সাথে খেলে তখন সে দেশের খেলোয়াড় একপ্রাণ একদেহ নিয়ে খেলায় অবতীর্ণ হয়। জাতীয়তাবোধের চেতনা থাকে বলে প্রত্যেক দলই চারিত্রিক দৃঢ়তায় ইস্পাতকঠিন, অপরাজেয় মনোভাব, নিয়মশৃঙ্খলা অনুসরণে বাধ্যগত, সংগ্রামী দুর্জয় সংকল্পে, ক্রীড়ানৈপুণ্য উজ্জ্বল এবং অনুপম শিল্পশ্রীর আসর হিসেবে পরিগণিত হয় প্রত্যেক দলের খেলা।

৯. **বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ :** খেলাধুলা বিশ্ব শান্তিতে অবদান রাখতে পারে। আজকের যুগে পৃথিবী ছোটো হয়ে আসছে, খেলার দল পাঠিয়ে এ দেশ থেকে অন্য দেশে শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছে প্রীতি সুদৃঢ় করতে। পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে প্রসারিত। ঠান্ডা লড়াইয়ে উগ্র প্রচণ্ড মূর্তি হ্রাস পাচ্ছে। দুইদেশের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। জয়–পরাজয়ের হিসাবটা বড়ো কথা নয়। উন্নতমানের ক্রীড়াশৈলীতে অসংখ্য ক্রীড়ামোদীরা মুগ্ধ হয়, অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করে, প্রীতির হাত বাড়িয়ে দেয়। দেশে দেশে ফুটবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট বিভিন্ন খেলার আসর বিভিন্ন দেশে বসে। এতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব জোরদার হয়।

খেলাধুলার অপকারিতা : মাত্রাতিরিক্ত কোনো কাজই ভালো নয়। এতে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। কোনো কোনো খেলায় খেলোয়াড় মারাত্মক আহত হয়। এমনকি মৃত্যুও হয়। ঢাকার মাঠে রমন ল্যাম্বা ক্রিকেট খেলার সময় মারা যান। তাছাড়া দর্শকদের মাঝে মারামারি হয়।

উপসংহার : খেলাধুলার আব্যশ্যকতা অবশ্যই আছে। দৃঢ় সঙ্কল্প করে মনোভাবকে চলার পথে দেয় সহিষ্ণুতার শিক্ষা, সংকীর্ণতার আবরণকে ছিন্ন করে। পৌরুষকে করে মহীয়ান, গরীয়ান করে নিজেদের। জয়–পরাজয়, সফলতা–ব্যর্থতা মেনে নেওয়ার সুশৃঙ্খল জীবনবোধ; দলীয়, স্বজনপ্রীতির ঊর্ধ্বে উঠে খেলাধুলার অঙ্গনে নতুন প্রতিভাকে অভ্যর্থনা জানানো— পরিচর্যার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বিজয়ী হওয়ার প্রত্যয়। কারণ, খেলার মাঠও সাধনার তীর্থস্থান। কঠোর সাধনা দ্বারা একদিন আমরা বিশ্বের মাঝে স্থান করে নিতে পারব। তবেই দেশ নবজাগ্রত এক চেতনায় উদ্চ্হবুদ্ধ হবে। ফিরে পাবে তার গৌরব, পরবে গলায় বিজয়ের বরমাল্য।

১৫৯. হা–ডু–ডু

ভূমিকা : হা–ডু–ডু বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী একটি গ্রাম্য খেলা। যুগে যুগে সুস্থ দেহ ও মন গঠনের জন্য খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়ে আসছে। ফলে বিভিন্ন দেশের প্রকৃতি, পরিবেশ, মানুষের মন–মানস প্রভৃতির সাথে সম্পর্ক রেখে প্রচলিত হয়েছে নানাবিধ খেলাধুলার। আমাদের বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। এ দেশের মাটিতেও প্রচলন ঘটেছে নানা খেলাধুলার। গ্রামপ্রধান এ দেশটিতে অধিকাংশ খেলাধুলাই গ্রাম্য পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তার মধ্যে হা–ডু–ডু দেশবাসীর একটি অতি প্রিয় খেলা।

বৈশিষ্ট্য : আমাদের দেশে বর্তমানে প্রচলিত খেলাধুলার মধ্যে দেশি–বিদেশি দুধরনের খেলাধুলাই রয়েছে। একসময় এ দেশে দেশি খেলাধুলার খুবই কদর ছিল, বিদেশিদের আগমনের সাথে সাথে কিছু কিছু বিদেশি খেলাধুলারও আমদানি

ঘটেছে। আন্তর্জাতিকতার ফলেও কিছু কিছু বিদেশি খেলাধুলাকে আমাদের গ্রহণ করতে হয়েছে। তবে শত বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলা করেও কিছু কিছু পুরাতন রীতির খেলাধুলা এখনো এ দেশে প্রচলিত রয়েছে। হা–ডু–ডু সেগুলোর মধ্যে অন্যতম।

উপকরণ : হা–ডু–ডু খেলা এ দেশে বহুকাল ধরে চলে আসছে। এ খেলায় বিশেষ কোনো উপকরণের প্রয়োজন হয় না। স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে এ খেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে। এ খেলা অনুষ্ঠানের এত সহজ সুযোগ থাকার ফলেই আমাদের দরিদ্র দেশের জন্য খুবই উপযোগী। হা–ডু–ডু খেলাকে কাবাডি খেলা নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

খেলার নিয়ম : হা–ডু–ডু খেলার জন্য পাঁচ থেকে আটজন খেলোয়াড় নিয়ে দুটি দল থাকে। তারা সামনাসামনি দুটি কোর্টে অবস্থান গ্রহণ করে। একটা বিশেষ মাপে এই কোট প্রস্তুত হয়। দুই দলের মধ্যে রেখা অঙ্কন দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি করা হয় এবং একজন বিচারক থাকেন। তিনিই বাঁশি বাজিয়ে নির্দেশ দিয়ে গোটা খেলাটি পরিচালনা করে থাকেন। বাঁশি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একদলের একজন খেলোয়াড় দম বন্ধ করে অন্য দলের সীমানায় প্রবেশ করে এবং কাউকে স্পর্শ করে নিজের কোর্টে দ্রুত প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করে। এ সময় অন্যদলের খেলোয়াড়গণ সমবেত প্রচেষ্টায় তাকে আটকে রাখতে চায়। যদি তারা আটকে রাখতে সক্ষম হয় অথবা দম ফুরিয়ে গেলে তারা ছুঁয়ে দিতে পারে তাহলে সে 'মরা' বা 'মোর' বলে ঘোষিত হয় এবং সে পর্যায়ে সে আর খেলায় অংশ নিতে পারে না। তবে যদি সে দম বন্ধ রেখে বিপক্ষ দলের কাউকে স্পর্শ করে নিজের কোর্টে ফিরে আসতে সক্ষম হয় তবে যাকে বা যাদেরকে সে স্পর্শ করেছে তারা 'মরা' বা 'মোর' বলে বিবেচিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে অন্যদলের খেলোয়াড়ও একইভাবে আক্রমণ করার সুযোগ লাভ করে। এভাবে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত আক্রমণ ও প্রতি–আক্রমণ চলতে থাকে। যখন কোনো পক্ষের সব খেলোয়াড় 'মারা' যায় তখন সে পক্ষ পরাজিত নির্ধারিত হয়। দম বন্ধ করে রাখার প্রকাশস্বরূপ কোনো ছড়া জাতীয় কথা উচ্চারণ করা হয় অথবা হা–ডু–ড জাতীয় কথাটি বারবার প্রকাশ করা হয়।

উপকারিতা : হা–ডু–ডু খেলা আনন্দদায়ক খেলা। এর উপযোগিতা কম নয়। এ খেলা সহজেই অনুষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য হওয়ায় সমভাবে সকলের উপভোগ্য হয়ে থাকে। এ খেলার জন্য প্রচুর শক্তি ও দমের প্রয়োজন হয় বলে ফুসফুসের খুবই উপকার হয়। তাছাড়া অন্যান্য অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ ব্যাপকভাবে সঞ্চালিত হওয়ার ফলে উত্তম ব্যায়ামের কাজও হয়। শরীর গঠনের জন্য এমন ব্যয়হীন উপকারী খেলা খুব কমই দেখা যায়। এই খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়গণ ছাড়াও দর্শকরা প্রচুর আনন্দ লাভ করে থাকে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এ খেলা খুবই উপযোগী।

অপকারিতা : প্রত্যেক ভালো জিনিসেরই কমবেশি কিছু খারাপ দিকও থাকে। এ খেলায় ঝুঁকি রয়েছে। অনেক সময় অসাবধানতাবশত খেলোয়াড়দের হাত–পা ভেঙে যাওয়া বা অন্যত্র আঘাতপ্রাপ্ত হওয়াও বিচিত্র নয়। এ খেলায় অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

উপসংহার : আমাদের দেশে হা–ডু–ডু খুবই সাধারণ খেলা বলে এর জনপ্রিয়তা অনেক। দেহ–মন উভয়ের উপকার হয় বলে বিদেশি খেলার আগ্রাসনের মধ্যেও গ্রামে এ খেলাটি এখনো টিকে আছে। এ দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কথা বিবেচনা করে এ খেলার ব্যাপক প্রচলন হওয়া প্রয়োজন। তবে সাম্প্রতিক এ খেলার উন্নতি বিধানের জন্য এর সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এখন এ খেলার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। খেলার যে অপকারিতার দিকগুলো রয়েছে তা একটু সাবধানতা অবলম্বন করলেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনা এবং অন্যান্য বিষয়াবলি

১৬০. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় রচিত হয় ১৯৭১ সালে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন–সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের সূতিকাগার। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস–ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এখন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক দেশের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান। সেগুনবাগিচায় ভাড়াবাড়িতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৯৬ সালের ২২শে মার্চ। এটি ছিল একেবারেই ব্যক্তিগত পর্যায়ের উদ্যোগ। বর্তমানে এটি ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত। এখন জাদুঘরের সংগ্রহে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদদের ব্যবহৃত সামগ্রী, অস্ত্র, দলিল, চিঠিপত্র ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় ১৭ হাজারেরও বেশি নিদর্শন। আর ১০২ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নয়তলা ভবন। ভবনের ভূগর্ভস্থ তিনটি তলায় রয়েছে কার পার্কিং, আর্কাইভ, ল্যাবরেটরি, প্রদর্শনশালা ইত্যাদি। নিচতলায় জাদুঘর কার্যালয় ও মিলনায়তন। প্রথম তলায় শিখা অম্লান, ও জাতীয় চার নেতার ব্রোঞ্জনির্মিত ভাস্কর্য, মুক্তমঞ্চ, ক্যানটিন, স্মারক

বিক্রয়কেন্দ্র ও টিকিট কাউন্টার। এখানে একটি হেলিকপ্টার ও একটি বিমানও রয়েছে ছাদের সঙ্গে আটকানো। এগুলো ব্যবহৃত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। দ্বিতীয় তলায় রয়েছে গবেষণাকেন্দ্র ও পাঠাগার। তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় চারটি মূল প্রদর্শনকক্ষ। পঞ্চম তলায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনকক্ষ। প্রথম প্রদর্শনকক্ষের নাম 'আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের সংগ্রাম'। এই প্রদর্শনকক্ষটিতে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হয়ে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত দেশের ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়েছে। ফসিল, প্রাচীন টেরাকোটা, মৃৎপাত্র, শিলাখণ্ডসহ নানা প্রকার নিদর্শনের সঙ্গে রয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনা ও ব্যক্তির আলোকচিত্র। দ্বিতীয় প্রদর্শনকক্ষের নাম 'আমাদের অধিকার, আমাদের ত্যাগ'। এই কক্ষটি থেকেই দর্শক সরাসরি ঢুকে পড়বেন মহান মুক্তিযুদ্ধের পর্বে। ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়বে বিশাল এক সাদাকালো ছবি। স্বাধীনতার দাবিতে রেসকোর্স ময়দানে অগণিত মানুষের বিশাল সমাবেশ, ১৯৭০ সালের ৩রা জানুয়ারি ছবিটি তুলেছিলেন শুক্কুর মিয়া নামের এক আলোকচিত্রী। যে ক্যামেরাটি দিয়ে দৃশ্যটি ধারণ করা হয়েছিল, সেই ক্যামেরাটিও আছে ছবির নিচে। এখানে আছে ৭ই মার্চ র সেই ঐতিহাসিক ভাষণের ছবি। এই গ্যালারির একটি অংশে চমৎকার স্থাপনাকর্মের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতের গণহত্যার ঘটনা। অপারেশন সার্চলাইট নামে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় ঘুমন্ত বাঙালির ওপর ট্যাঙ্ক, কামান ও সাঁজোয়া যান নিয়ে অতর্কিতে হামলা চালায়। পরের দুটি প্রদর্শনকক্ষ চতুর্থ তলায়। এর প্রথমটির শিরোনাম 'আমাদের যুদ্ধ, আমাদের মিত্র'। এখানে আছে ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের জীবনযাত্রা, বিদেশি গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের বড়ো আকারের ডিজিটাল প্রিন্ট। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ হওয়া ও রাজাকারদের তৎপরতা, মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলাযুদ্ধের আশ্রয়স্থল প্রভৃতি। এর পাশাপাশি আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দেশি–বিদেশি যাঁরা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, জনমত সৃষ্টি করেছেন সে দিকগুলো। রয়েছে পণ্ডিত রবিশঙ্করের উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' গানের জর্জ হ্যারিসনের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি, সুরের স্টাফ নোটেশন। শেষ প্রদর্শনকক্ষটির নাম রাখা হয়েছে 'আমাদের জয়, আমাদের মূল্যবোধ'। এতে আছে নৌযুদ্ধের বিভিন্ন নিদর্শন, বিলোনিয়ার যুদ্ধের রেলস্টেশনের রেলিং, ট্রলি, মিত্রবাহিনীর ছত্রীসেনাদের আক্রমণ, দগ্ধ বাড়িঘর প্রভৃতি। শেষ হয়েছে ১৯৭২ সালের স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের অনুলিপিটি দিয়ে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস–ঐতিহ্য সম্পর্কে দেশের মানুষকে সচেতন করতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নানা ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। জাদুঘরের ব্যবস্থাপনায় স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের পরিবহণ ও পরিদর্শন সুবিধাসংবলিত কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এছাড়া একটি গাড়িকে ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে, যাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে একটি ছোটো প্রদর্শনশালাতেও উন্মুক্ত মঞ্চ রয়েছে। এখানে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিশ্বের অপরাপর আটটি দেশের সমভাবাপন্ন জাদুঘরের সঙ্গে মিলে গঠন করেছে 'ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব হিস্টরিক মিউজিয়ামস্ অব কনসান্স'। জাদুঘরের সংগৃহীত স্মারক সংখ্যা দশ হাজারেরও অধিক।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি তথা আমাদের গৌরবময় জাতীয় ইতিহাস–ঐতিহ্যের যথাযথ সংরক্ষণ এবং প্রদর্শনই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের লক্ষ্য। জাদুঘর দেশের ইতিহাস–ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জনসমক্ষে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপন করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বহুমাত্রিক জাদুঘর নয়; তবে বাংলাদেশের জাতীয় জীবন ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি–স্মারক–দলিলপত্র ইত্যাদির একমাত্র ও অন্যতম সংগ্রহশালা। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভুলে না যায় এবং এর সঠিক ইতিহাস জানতে পারে— এটাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান লক্ষ্য।

১৬১. আন্তর্জাতিক নারী দিবস

ভূমিকা :

"সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ–রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা–কিছু মহান সৃষ্টি চির–কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা–কিছু এল পাপ–তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।" — **কাজী নজরুল ইসলাম**

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও আমাদের বাস্তবতায় একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিশ্বজুড়ে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীরা নানা অত্যাচার, লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে। তাই দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত শোষণ ও বৈষম্যের নির্মম শৃঙ্খলাবদ্ধ পরাধীনতার বেড়াজাল ভেঙে নারী প্রতিবাদী চেতনায় বিদ্রোহের অগ্নিমশাল নিয়ে জ্বলে উঠেছে। ইতিহাসের পাতায় আন্দোলনের নতুন মাত্রা হিসেবে সংযোজিত হয় 'নারীমুক্তি আন্দোলন'। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের ঘোষণা দেয়। সারাবিশ্বে প্রতিবছর এ দিনটি পালিত হয়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক নারী দিবস :

১. ১৭৯২ সালে ব্রিটেনে ম্যারি ওয়েলস্টোন ক্রাফট নারী ও পুরুষকে এক মানদণ্ডে বিচারের দাবি জানান। কেবল শিক্ষা নয়, রাজনৈতিক আইনবিধিতে সংশোধনী এনে নারীর অধস্তন অবস্থা বদলে ফেলার দাবি জানান তিনি। পরবর্তী শতকে তার এ দাবি মূল্যায়ন করা হয়।

২. সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বিপ্লবী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ, ইংরেজদের গৃহযুদ্ধ, ফরাসি বিপ্লব প্রভৃতি কারণে পুরুষ সমাজ নতুন নতুন অধিকার ভোগ করে। এসময়ই নারীরা মৌলিক অধিকার হিসেবে রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার, সন্তানের ওপর আইনগত দাবি, সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা ও ভোট দেওয়ার অধিকার লাভ করে।

৩. ১৮৪৮ সালের জুলাই মাসে নিউইয়র্কের সেনেকা ফলস–এর কনভেনশনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভোটাধিকার তথা নারীমুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত বলে মনে করা হয়।

৪. ১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ নিউইয়র্কের একটি সেলাই কারখানায় শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয় নারী শ্রমিকেরা। এর তিন বছর পর ১৮৬০ সালের ৮ই মার্চ নারী শ্রমিকের এক মিছিলে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে যে ইউনিয়ন গঠিত হয়, তা নারী শ্রমিকের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে নেতৃত্ব দেয়। পরবর্তীকালে ১৯১০ সালে কোপেনহেগেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে জার্মান নারী নেত্রী ক্লারা সেভকিন প্রস্তাব করেন ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষণার। সম্মেলনে উপস্থিত বিভিন্ন দেশের নারী প্রতিনিধিরা এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। সেই থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। তবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং প্রসার লাভ করে ১৯৮৪ সালে জাতিসংঘের স্বীকৃতিলাভের মাধ্যমে।

নারী আন্দোলনে পশ্চিমা বিশ্বের ভূমিকা : নারী আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, শুরুতে নারীসমাজে আন্দোলন মূলত নারী শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে ইউরোপ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। এ কারণেই বলা যায়, নারী শ্রমিকদের শোষণের শুরুটা পাশ্চাত্যেই হয়েছিল। এদিক থেকে নারীসমাজের প্রতি শোষণ–নির্যাতনের যে ঐতিহ্য পাশ্চাত্যে রয়েছে তা প্রাচ্যে ততটা ব্যাপক ছিল না। যাহোক, ১৯৮৪ সালে জাতিসংঘ ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দান করার পর থেকে বিভিন্ন দেশে সভা, সেমিনার ও সম্মেলনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে নারীসমাজ। এ ঐক্য, সংহতি ও সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নারীসমাজ একতাবদ্ধ হয়। এ সম্প্রীতি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যেই সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়ে আসছে।

জাতিসংঘের ভূমিকা : ৮ই মার্চ নারী আন্দোলনের ঐতিহাসিক দিনটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য জাতিসংঘের ভূমিকা অপরিসীম। দিনটির স্মরণে ১৯৭৫ সালকে জাতিসংঘ নারীবর্ষ হিসেবে ঘোষণা দেয়। পর্যায়ক্রমে ১৯৭৬–১৯৮৫ দশককে জাতিসংঘ কর্তৃক 'নারী দশক' হিসেবে ঘোষণা নারী প্রগতির উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'আন্তর্জাতিক নারী দশকে' জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রকে তার ঘোষিত নারী অধিকার সনদের নিরিখে জাতীয় পর্যায়ে স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করে ও দিকনির্দেশনা দেয়। পরবর্তী সময়ে মেক্সিকো, কোপেনহেগেন, নাইরোবি ও কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনসমূহেও নারী প্রগতির লক্ষ্যে অনেক বাস্তবভিত্তিক কর্মকৌশল গৃহীত হয়েছে।

নারী দিবসে বাংলাদেশের ভূমিকা : নারীমুক্তি, নারীর স্বাধীনতা, নারীদের সমানাধিকার, আত্মমর্যাদার লড়াইকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার শপথ নিয়েই সারা বিশ্বের নারী–পুরুষ এ দিবসটি পালন করে থাকে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। তবে আমাদের দেশের নারীরাও এর জন্য সংগ্রাম করছে এবং দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করছে। নারীদের মুক্তির অর্থ হচ্ছে সমাজের মুক্তি। সমাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে নারীসমাজের মূল্যায়ন, তাদের উন্নতি। কিন্তু বিষয়টি মনের দিক থেকে মেনে নেওয়ার অবস্থা আমাদের সমাজে এখনো গড়ে ওঠেনি। প্রতিবছর সম্মিলিত নারীসমাজ এ দিবসটি ঘটা করে পালন করছে। এর পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এ দিবসটি পালন করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে নারী দিবসের গুরুত্ব অত্যধিক। যেমন: ধর্মীয় কুসংস্কার, সামাজিক বাধা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রজনন প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতিবন্ধকতা জাতীয় অগ্রগতিকে বিলম্বিত করছে। তাই আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

বিশ্ব নারী সম্মেলন : ১৯৯৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ শতকের সর্বশেষ আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন চীনের রাজধানী বেইজিং–এ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১৮৯টি দেশের প্রায় ৫ হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। বেইজিং নারী সম্মেলনের স্লোগান ছিল 'নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন'। তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে বহুজাতিক কোম্পানির বোর্ডরুম পর্যন্ত নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লড়াইয়ের দৃঢ় অঙ্গীকার ও 'নারী জাগছে'–শীর্ষক ঘোষণার মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলন জাতিসংঘে নারীর মর্যাদাসংক্রান্ত কমিশনের প্রধান ফিলিপাইনের প্যাট্রিসিয়া লিকিউযানান বলেন, "নারীরা মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনতা ভোগ করবে এ আশঙ্কা থেকে প্রজনন, স্বাস্থ্য, যৌনতার মতো অনেকগুলো বিষয় বিতর্কিত হয়েছে। যার মাধ্যমে রক্ষণশীল মানসিকতার লক্ষণ দেখা গেছে।"

বেইজিং সম্মেলনের বিতর্কিত বিষয় : চীনের রাজধানী বেইজিং–এ নারী সম্মেলনের ১৫০ পৃষ্ঠার দলিলের যে বিষয়গুলো নিয়ে সবচেয়ে বেশি তর্ক–বিতর্ক হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে যৌনস্বাধীনতা ও নারীনির্যাতন হ্রাসসংক্রান্ত বিষয়গুলো। আলোচকদের মতে, এ বিষয়গুলো নারী–পাচার, মেয়েশিশুদের পুষ্টিহীনতা ও যৌনতায় বাধ্য করার মতো নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কিন্তু ভ্যাটিকান ও ইসলামি দেশগুলোর প্রবল বাধার মুখে মার্কিন ও ইউরোপীয় কয়েকটি দেশে উত্থাপিত সমকামিতার অধিকারসংক্রান্ত বিষয় চূড়ান্ত দলিল থেকে বাদ পড়ে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, সভ্যতার গোড়াপত্তন ও তার ক্রমবিকাশে নারীর ভূমিকা পুরুষের মতোই। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই নারী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল লক্ষ্যই হলো নারীর ন্যায্য অধিকার এবং সমাজের অগ্রগতি সাধন। তাই নারী ও পুরুষ সমান মর্যাদা ও অধিকার পেলেই আন্তর্জাতিক নারী দিবস যথাযথ মর্যাদা পাবে, অর্জিত হবে নারী দিবসের লক্ষ্য।

১৬২. নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য

[চ. বো. '১৭]

ভূমিকা

"সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ–রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা–কিছু মহান সৃষ্টি চির–কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা–কিছু এল পাপ–তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।" — **কাজী নজরুল ইসলাম**

সাধারণত নাগরিক বলতে আমরা বুঝি কোনো দেশে স্থায়ী বাসিন্দাদের, যারা সে দেশের নাগরিক। নাগরিক অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার নিয়েই মানুষ তার দেশে পরিচিতি লাভ করে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে এই অধিকার রয়েছে। যারা রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে তারা–ই নাগরিক। শব্দগত অর্থে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলা হয়। অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে নাগরিক জীবন বিকাশলাভ করে। অধিকার ও কর্তব্য পালনের দ্বারা একটি দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। সুতরাং নাগরিক জীবন ও শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন উন্নত হয়।

নাগরিক অধিকার : কোনো মানুষ যদি তার কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারে কিংবা চলাফেরা করতে পারে তখন তাকে নাগরিক অধিকার বলে। পৌরনীতিতে অধিকার বলতে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো সুযোগ–সুবিধাকে বোঝায়। অধিকারকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (ক) নৈতিক অধিকার ও (খ) আইনগত অধিকার। আইনগত অধিকারকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

(ক) সামাজিক অধিকার, (খ) রাজনৈতিক অধিকার ও (গ) অর্থনৈতিক অধিকার।

নিম্নে এ অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

সামাজিক অধিকার : সামাজিক অধিকার হচ্ছে নাগরিকের সেই অধিকার, যা সে সমাজ থেকে লাভ করে। সামাজিক অধিকার সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **জীবনধারণের অধিকার :** জীবনধারণের অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান নিশ্চিত করা এবং কেউ যাতে কারও ক্ষতি না করতে পারে সেজন্য রাষ্ট্র আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

২. **চলাফেরার অধিকার :** চলাফেরা মানুষের সামাজিক অধিকার। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে চলাচলের স্বাধীনতাকে চলাফেরার অধিকার বলে। এই অধিকার রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে।

৩. **সম্পত্তি ভোগের অধিকার :** একজন নাগরিক কোনো না কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করে এবং সে যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, তার সেই দেশের সম্পত্তি ভোগের অধিকার আছে। কেউ যাতে জোর করে একজন আরেকজনের সম্পত্তি নিয়ে যেতে না পারে সে ব্যাপারে রাষ্ট্র আইনগত পদক্ষেপ নিতে পারে।

৪. **মতামত প্রকাশের অধিকার :** মতামত প্রকাশ করা প্রত্যেক মানুষের সামাজিক অধিকার। এলাকার মধ্যে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হলে সবারই মতামত প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকে। মতামত প্রকাশের মাধ্যমে নাগরিকবৃন্দ রাষ্ট্রের কাজে অংশগ্রহণ করে।

৫. **গণমাধ্যমের অধিকার :** বিভিন্ন গণমাধ্যম কিংবা সংবাদপত্রের নিরপেক্ষ খবরাখবর প্রকাশ করা হলো গণমাধ্যমের অধিকার। সঠিক জনমত যাচাই–বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা বেশ প্রবল।

৬. **আইনের চোখে সমানাধিকার :** আইন সকলের জন্য সমান এবং সমভাবে প্রযোজ্য হবে। ধর্ম–বর্ণ, নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য এই প্রকার আইন ও বিচারব্যবস্থার নামই আইনের চোখে সমানাধিকার।

এছাড়াও সামাজিক অধিকারগুলোর মধ্যে পরিবার গঠনের অধিকার, ধর্মীয় অধিকার, সভা–সমিতির অধিকার, সংস্কৃতির অধিকার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রাজনৈতিক অধিকার : রাজনৈতিক অধিকার হচ্ছে একজন নাগরিক রাষ্ট্র থেকে যে অধিকার লাভ করে তা। নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার তখনই নিশ্চিত হয় যখন মানুষের চাওয়া–পাওয়ার প্রতিফলন ঘটে। নিম্নে রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার :** রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সংহতি বিপন্ন না করে যেকোনো নাগরিক রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে। বসবাস করার অধিকার মানুষের অন্যতম রাজনৈতিক অধিকার।

২. **নির্বাচনের অধিকার :** নির্বাচন হচ্ছে প্রতিনিধি গঠন করা। ধর্ম–বর্ণ, নারী–পুরুষ সকলে মিলে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকেন। সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার নাগরিকের অধিকার ভোগ করতে পারে।

৩. **সরকারি চাকরিলাভের অধিকার :** জীবনযাপনের জন্য নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারি অফিস–আদালতে চাকরিলাভের অধিকার একটি রাজনৈতিক অধিকার।

৪. **সরকারের সমালোচনা করার অধিকার :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকবৃন্দ সরকারের কাজের সমালোচনা করতে পারেন। এটি একটি স্বীকৃত অধিকার। সরকার যদি জনগণের স্বার্থবিরোধী কাজ করে তাহলে প্রতিবাদ করার অধিকার সকল নাগরিকের রয়েছে।

অর্থনৈতিক অধিকার : অর্থনৈতিক অধিকার হলো মানুষের সঠিকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার। নিম্নে অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. কর্মের অধিকার
২. ন্যায্য মজুরিলাভের অধিকার
৩. অবকাশলাভের অধিকার
৪. শ্রমিক সংঘ গঠনের অধিকার

নাগরিকের কর্তব্য : নাগরিকের যেমন অধিকার আছে তেমন তার কিছু কর্তব্য রয়েছে। আইন দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে নাগরিক কর্তব্য বলে। নিম্নে নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা :** আমরা প্রত্যেকে কোনো না কোনো রাষ্ট্রের সদস্য। রাষ্ট্রের আদেশ ও নিষেধ মান্য করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য বৈদেশিক আক্রমণ কিংবা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময় সকলকে ত্যাগ স্বীকার করে রাষ্ট্রের আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

২. **আইন মান্য করা :** আইনের প্রতি সম্মান দেখানো প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। আইন না মানলে শৃঙ্খলা থাকে না। শৃঙ্খলা না থাকলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। কাজেই প্রত্যেকের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ করার জন্য আইন মেনে চলা নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য।

৩. **সুষ্ঠুভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ :** ভোট প্রদান করা নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য। এই অধিকার সুষ্ঠুভাবে ভোগ করার জন্য ভোট প্রদান করতে হয়। কারণ ভোটের ওপর নির্ভর করে শাসনের উৎকর্ষ। আমরা যদি সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করতে না পারি তাহলে ভালো সরকার গঠন করা যাবে না।

৪. **নিয়মিতভাবে কর প্রদান :** দেশের প্রশাসন প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য নিয়মিতভাবে কর প্রদান করতে হবে। নিয়মিত কর প্রদান করলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থিতিশীল থাকে।

৫. **সুশিক্ষিত করা :** জাতি গঠন ও গুণাবলি বিকাশের জন্য সন্তানদের সুশিক্ষিত করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। তাইতো নেপোলিয়ন একবার তার দেশে মায়েদের বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাদের শিক্ষিত জাতি দান করব।"

বাংলাদেশের সংবিধান ও নাগরিক অধিকার : পৃথিবীর সব দেশই সংবিধানের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করে। বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক অধিকারগুলো সংবিধানে সংরক্ষিত। সংবিধানের ২৬–৪৭ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত এই অধিকারের কথা বলা হয়েছে। প্রধান প্রধান অধিকারগুলো হলো :

১. মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্য আইন বাতিল করা হবে।
২. সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং সবাই আইনের সমানাধিকারী হতে পারবে।
৩. জাতি–ধর্ম–বর্ণ–নারী–পুরুষ কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।
৪. সরকারি চাকরিলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ থাকবে।
৫. বিনা অপরাধে কোনো নাগরিককে গ্রেফতার কিংবা আটক রাখা যাবে না।
৬. জনস্বার্থে সকল নাগরিক শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করতে পারবে।
৭. সকল নাগরিক তার নিজ ধর্ম পালন করবে।
৮. প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার আছে।
৯. সকল নাগরিক আইনসংগতভাবে যেকোনো পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করতে পারবে।
১০. কোনো অপরাধ ব্যতীত কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।

বাংলাদেশের সংবিধান ও নাগরিকের কর্তব্য : নাগরিকের অধিকারের পাশাপাশি নাগরিকের কর্তব্যের কথাও সুস্পষ্ট করে সংবিধানে বলা আছে। নাগরিকের কর্তব্যগুলো হলো : সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা।

সুনাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য : নাগরিক অধিকার ভোগ করা এবং নাগরিকের ওপর আরোপিত কর্তব্য পালন করার প্রথম শর্ত হচ্ছে সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা। রাষ্ট্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধিলাভের জন্য সুনাগরিক প্রয়োজন। সুনাগরিক হওয়ার জন্য চিন্তাভাবনা, মেধা, বিদ্যা ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটাতে হবে। অন্যায়, অবিচার ও দুর্নীতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। দেশপ্রেমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

উপসংহার : স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার দায়িত্বভার বর্তমানে অর্পিত হয়েছে আমাদের ওপর। তাই নাগরিক হিসেবে আমাদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। দেশের দারিদ্র্য ও প্রতিহিংসা দূর করার ক্ষেত্রে সুনাগরিক যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে। এসব দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে একজন আদর্শ নাগরিকের মর্যাদা লাভ করা যায়।

১৬৩. মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আজকের বাংলাদেশ *[কু. বো. '১৯]*

অথবা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম

ভূমিকা

"শাবাশ, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়;
জ্বলে পুড়ে–মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়,"

কবি সুকান্তের এ লাইন কয়টি শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এ কথাগুলোই যেন প্রমাণিত হয়েছিল। আর তাই বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি : স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা যে গৌরববোধ করি, এ গৌরব অর্জনের পেছনে এক ভয়াবহ রক্ত সংগ্রামের ইতিহাস আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি একদিনে সৃষ্টি হয়নি। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পরও পূর্ব–পাকিস্তানের মানুষ তাদের অধিকার ফিরে পায়নি। তারা প্রথম আঘাত হানে বাঙালিদের মাতৃভাষার ওপর। সমগ্র পাকিস্তানে বাঙালিরা সংখ্যায় বেশি হওয়ার পরও বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তাদের সিদ্ধান্ত বাঙালিরা মেনে নিতে পারেনি। এর প্রতিবাদে তারা রাজপথে নেমে আসে। শুরু হয়ে যায় ভাষা আন্দোলন। ক্রমে ক্রমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ৩০শে জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দীন ঢাকায় এসে পূর্বসূরিদের অনুসরণে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর কথাই বলেন। ফলে ভাষা আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে গণ–আন্দোলনের রূপ নেয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বাঙালি ছাত্র–জনতা মিছিল নিয়ে রাজপথে নামে। মিছিলের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে নিহত হন রফিক, জব্বার, সালাম, বরকতসহ আরও অনেকে।

পরবর্তীতে পূর্ব বাংলার জনগণের চাপে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালিরা জয়লাভ করলেও ক্ষমতা দেওয়া হলো না। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ২৫শে মার্চ রাতে ঘুমন্ত বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা হওয়ার পর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। বহু আত্মত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয় বিজয়ের দিন।

স্বাধীনতার চেতনা : দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ জাতি স্বাধীনতার চেতনায় নবযাত্রা শুরু করে। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুরু করে উন্নয়নের ধারা। দেশে শুরু হয় নানা কর্মকান্ড। দেশের রাস্তাঘাটসহ নানা অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো শুরু হয়।

আর জাতীয় জীবনের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মুক্তিযুদ্ধের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে জাতি অগ্রসর হতে থাকে নব নব সব উন্নয়নের দিকে, দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর একটি রাজনৈতিক শক্তি। এর পর নানা চক্রান্ত চলতে থাকে জাতিকে রুখে দেওয়ার জন্য। স্বাধীনতার কয়েক বছর পর দেশের উন্নতি আর অগ্রগতি ব্যাহত হয় বলা যায়। দেশের জনগণ দেশের এসব বিপর্যয়ে আহত হন। অবশেষে আবারও দেশে শুরু হয় গণতন্ত্রের পথে জাতির অগ্রযাত্রা। জাতি গণতন্ত্র, ন্যায় বিচার আর উন্নতির পথেই অগ্রসর হতে শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিনির্মাণ করা শুরু করে দেশের সব ক্ষেত্রে। দেশের মানুষ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় আবারও অগ্রগতি আর উন্নতির দিকে।

দেশের উন্নতিতে জাতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কাজ করে চলেছে। তিরিশ লাখ শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা। শহিদদের এই আত্মত্যাগ জাতিকে করেছে মহীয়ান। মহান এ জাতি বারবার বাধাপ্রাপ্ত হলেও জাতীয় জীবনে এই চেতনাকে উর্ধ্বে তুলে অগ্রসর হচ্ছে। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সামনে তুলে ধরে জাতি অগ্রসর হচ্ছে উন্নতির পথে। এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তুলে ধরা হচ্ছে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নয়নে মন্ত্রণালয় কাজ করে চলেছে। পাশাপাশি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখার জন্য চলছে নানা আয়োজন।

বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা : বাংলাদেশের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। মুক্তিযুদ্ধের করুণ কাহিনি আর বীরত্বগাথা দিয়ে রচিত হয়েছে গল্প, উপন্যাস, নাটক, সংগীত, প্রবন্ধ এবং অসংখ্য কবিতা ও ছড়া।

শওকত ওসমানের 'দুই সৈনিক', সৈয়দ শামসুল হকের 'নীল দংশন', রাবেয়া খাতুনের 'মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী', আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রোটি আওরাত', সেলিনা হোসেনের 'হাঙর নদী গ্রেনেড', হুমায়ূন আহমেদের 'জোছনা ও জননীর গল্প' প্রভৃতি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। শওকত ওসমানের 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' গ্রন্থের সবগুলো গল্পই রচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত গল্প' সংকলন। কল্যাণ মিত্রের 'জল্লাদের দরবার' নাটক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বাংলাদেশের নবীন–প্রবীন প্রায় সকল কবির হাতেই সৃষ্টি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের কবিতা। যেমন : জসীমউদ্‌দীন, সুফিয়া কামাল, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ প্রভৃতি সকল কবিই মুক্তিযুদ্ধের কবিতা লিখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

উপসংহার : দেশ আজ স্বাধীন। দেশের উন্নয়নে জাতি আজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করেছে তাদের প্রতিটি কর্মকান্ডের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাতীয় জীবনে আজ এক বিরাট ভূমিকা পালন করে চলেছে। তবে এখনো অনেক কাজ বাকি। জাতি এ চেতনাকে সাথে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেলে একসময় জাতি উন্নতি করবেই।

১৬৪. আন্তর্জাতিক মে দিবস

[কু. বো. '১৩; চ. বো. '১২; ব. বো. '১২; রা. বো. '১২; ঢা. বো. '১৭]

ভূমিকা :

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?

শ্রমিক–মালিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রতি অবিচারের অবসান ঘটাবার সূতিকাগার বলা হয় মে দিবসকে। শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠান দুর্বার আন্দোলনের রক্তস্রোত স্মৃতি বিজড়িত এই মে দিবস। প্রতিবছর মে মাসের প্রথম তারিখে বিশ্বব্যাপী পালিত ঐতিহাসিক দিবসটি 'মে দিবস' নামে পরিচিত। সারাবিশ্বে প্রতিবছর উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে মহান মে দিবস। প্রায় দেড়শত বছর আগে শ্রমিকদের মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় শ্রমজীবী মানুষের বিজয়ের ধারা। সেই বিজয়ের ধারায় উদ্ভাসিত বর্তমান বিশ্বের সকল প্রান্তের প্রতিটি শ্রমজীবী মানুষ।

মে দিবসের ইতিহাস : আন্দোলনের পথ কখনই মসৃণ ছিল না, মসৃণ থাকে না। ছিল নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে, জুলুম, অত্যাচারে, প্রতিরোধে, ধর্মঘটে, মিছিলে, সংগ্রামী ঐক্যে রক্তলাঞ্ছিত। মে দিবস একদিনে এই আন্তর্জাতিক চেহারা পায়নি। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। রয়েছে অনেক রক্তঝরার কাহিনি। জন্মলগ্ন থেকেই শ্রমিকশ্রেণির ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। শ্রমিকশ্রেণিকে উদয়াস্ত কাজ করতে হবে। আঠারো ঘণ্টা, কুড়ি ঘণ্টা পর্যন্ত ছিল কাজের সময়সীমা। আলেকজান্ডার ট্রাকটেনবার্গ মে দিবসের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন : মে দিবসের জন্মকাহিনি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে কাজের ঘণ্টা কমানোর আন্দোলনের সঙ্গে। ১৮০৬ সালে কারখানায় কুড়ি ঘণ্টা পর্যন্ত ছিল বাধ্যতামূলক কর্মপ্রহর। ১৮২০–১৮৪০ সাল পর্যন্ত দশ ঘণ্টা কাজের দাবিতে অনেক আন্দোলন ও ধর্মঘট হয়। ১৮৬২–১৮৬৩ সালে গড়ে ওঠে ট্রেড ইউনিয়নের রাজনৈতিক ভিত্তি। দাসপ্রথা ওঠে গেল। নিগ্রোরা হলো শ্বেতাঙ্গদের বন্ধু। ঐ সময়ে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। মালিকরা কম মজুরিতে নারী শ্রমিক নিয়োগ করত। ১৮৬৫ সালে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের পর থেকেই সেখানকার শিল্পের বিকাশ ঘটে দ্রুতগতিতে। সেই সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের প্রসারও ঘটে দ্রুত। ১৮৮১ সালের নভেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আমেরিকান ফেডারেশন অভ লেবার'। ১৮৮৪ সালের ৭ অক্টোবর সেখানে চতুর্থ সম্মেলনে গৃহীত হয় এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত, বলা হয় ১৮৮৬ সালের ১ মে থেকে সব শ্রমজীবী মানুষ আট ঘণ্টার বেশি কোনোভাবেই কাজ করবে না। ওই দিনটিতে তাই পাঁচ লক্ষ শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে ধর্মঘটে যোগ দেন। শাসকদল এই ঐক্যবদ্ধ বিশাল শ্রমিক সমাবেশ ও ধর্মঘট দেখে ভয়ে পিছিয়ে যায়। ঐতিহাসিক মে দিবসের জন্ম মে দিবসের মূল প্রতিপাদ্য শ্রমিকদের দাবি–দাওয়া আদায়। আর এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল দেড়শ বছর আগে অস্ট্রেলিয়াতে।

কিন্তু কর্মঘণ্টা কতক্ষণ হবে? : আট ঘণ্টার কর্মদিবসের দাবি এবং কর্মপরিবেশ কিছুটা উন্নত হলেও আজও শ্রমিকদের পেশাগত জীবনে নিরাপত্তা ও মানবিক অধিকারগুলো অর্জিত হয়নি। চলমান করোনা মহামারিতে আবারও স্পষ্ট হয়েছে, এ দেশের বিপুলসংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা, মৌলিক মানবিক অধিকারগুলো কতটা ভঙ্গুর?

তৈরি পোশাকশিল্পের বিপুলসংখ্যক শ্রমিক প্রতিদিন কোথাও না কোথাও বেতনের দাবিতে সমবেত হচ্ছেন, বিক্ষোভ করছেন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস, যা সচরাচর মে দিবস নামে পরিচিত। প্রতি বছর পহেলা মে তারিখে বিশ্বব্যাপী এই দিবস উদ্যাপিত হয়। এটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের উদ্যাপন দিবস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমজীবী মানুষ এবং শ্রমিক সংগঠনসমূহ রাজপথে সংগঠিতভাবে মিছিল ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে দিবসটি পালন করে।

বিশ্বের কতটি দেশে শ্রম দিবসে ছুটি থাকে? : বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে পহেলা মে জাতীয় ছুটির দিন। আরও অনেক দেশে এটি বেসরকারিভাবে পালিত হয়। মে দিবস, শ্রমিক দিবস বা বিশ্ব শ্রমিক দিবস, যে নামেই ডাকা হোক না কেন, দিনটি বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা–সম্মান–সংহতি জানানোর দিন হিসেবেই পালিত হয়ে আসছে ১৯০৪ সাল থেকে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস/মে দিবস ঘটনা : ১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো নগরীর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণ ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে সর্বাত্মক ধর্মঘট শুরু করে। ব্যাপক আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ৩ ও ৪ মে। কিন্তু আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করার জন্য পুলিশ গুলি চালায় এবং ১০ জন শ্রমিক প্রাণ হারায়। সেই সঙ্গে বহু শ্রমিক আহত হয়। গ্রেফতার হয় অগণিত শ্রমিক। গ্রেফতারকৃত শ্রমিকদের মধ্যে ৬ জনকে পরে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। জেলখানায় বন্দি অবস্থায় আত্মহনন করেন এক শ্রমিক নেতা। শ্রমিক আন্দোলনের এই গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৮৯০ সাল থেকে বিশ্বের সকল দেশেই মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয় মহান মে দিবস। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো

শহরের হে মার্কেটের ম্যাসাকার— শহিদদের আত্মত্যাগের স্মরণ করে পালিত হয়। সেদিন দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে শ্রমিকরা হে মার্কেটে জমায়েত হয়েছিল। তাদেরকে ঘিরে থাকা পুলিশের প্রতি এক অজ্ঞাতনামার বোমা নিক্ষেপের পর পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে।

ফলে প্রায় ১০–১২ জন শ্রমিক ও পুলিশ নিহত হয়। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে প্যারিসে প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শিকাগো প্রতিবাদের বার্ষিকী আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে পালনের প্রস্তাব করেন রেমন্ড লভিনে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় কংগ্রেসে এই প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এর পরপরই ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে মে দিবসের দাঙ্গার ঘটনা ঘটে।

মে দিবস উৎসবের তারিখ ঘোষণা : পরে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে আমস্টারডাম শহরে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই উপলক্ষ্যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণের দাবি আদায়ের জন্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বজুড়ে পহেলা মে তারিখে মিছিলের শোভাযাত্রা আয়োজন করতে সব সমাজবাদী গণতান্ত্রিক দল এবং শ্রমিক সংঘের (ট্রেড ইউনিয়ন) প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সেই সম্মেলনে বিশ্বজুড়ে সব শ্রমিক সংগঠন মে মাসের ১ তারিখে 'বাধ্যতামূলকভাবে কাজ না করার' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অনেক দেশে শ্রমজীবী জনতা মে মাসের ১ তারিখে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালনের দাবি জানায় এবং অনেক দেশেই এটা কার্যকর হয়। দীর্ঘদিন ধরে সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট এবং কিছু কট্টর সংগঠন তাদের দাবি জানানোর জন্য মে দিবসে মুখ্য দিন হিসেবে বেছে নেয়। কোনো কোনো স্থানে শিকাগোর হে মার্কেটের আত্মত্যাগী শ্রমিকদের স্মরণে আগুনও জ্বালানো হয়ে থাকে।

পূর্বতন সোভিয়েত রাষ্ট্র, চীন, কিউবাসহ বিশ্বের অনেক দেশেই পহেলা মে একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। সেসব দেশে এমনকি এ উপলক্ষ্যে সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ এবং ভারতেও এই দিনটি যথাযথভাবে পালিত হয়ে আসছে। ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে।

বাংলাদেশ শ্রমিক দিবস পালন : বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকেই মে দিবস সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। সরকারি–বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন দিনটি পালন করতে শোভাযাত্রা, শ্রমিক সমাবেশ, আলোচনা সভা, সেমিনার, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচি নিয়ে থাকে। মে দিবসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক ফেডারেশনসহ বিভিন্ন সংগঠন পৃথক কর্মসূচি পালন করে।

বর্তমানে বাংলাদেশ শ্রমিকদের অবস্থা : বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। একটি দেশের উন্নয়নের অন্তরালে থাকে শ্রমিক–মজুরদের অক্লান্ত পরিশ্রম, ব্যথা–বেদনা। কিন্তু সে অনুযায়ী শ্রমিকদের সুযোগ–সুবিধা বাড়ছে না। যাদের ঘামে এটি একটি ইট সাজিয়ে বড়ো বড়ো ইমারতসদৃশ দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের যথাযথ সম্মান দেওয়া আবশ্যক। শ্রমিকদের যথাযথ মজুরি, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে মে দিবস : দেশ বিভাগের পূর্বে নারায়ণগঞ্জে মে দিবস পালিত হয় ১৯৩৮ সালে। এরপর থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সীমিত পরিসরে মে দিবস পালিত হতো। তবে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিজয় লাভ করলে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো বিপুল উৎসাহ নিয়ে শ্রমিকগণ মে দিবস পালন করে। প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক সেদিন আদমজীতে লাল পতাকা হাতে নিয়ে মিছিল সমাবেশ করেছিল। সামরিক শাসন (১৯৫৮) জারির পূর্ব পর্যন্ত বেশ বড়ো আকারে সমাবেশের মাধ্যমে মে দিবস অনুষ্ঠিত হতো। ১৯৫৮ সালে দাবি ওঠে ১ মে দিনটিকে সরকারি ছুটির দিন করা হোক। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের পর শ্রমিক আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা সূচিত হয়। আওয়ামী লীগ ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে জয় লাভের পর শ্রমিকদের বিরাট একটি অংশ র অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করে। তখন মে দিবস এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে মে দিবস পালিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর শেখ মুজিবুর রহমান মে দিবসকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেন এবং সেই সাথে ১ মে কে রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেন এবং পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে তৎকালীন সরকারপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদানের মধ্য দিয়ে মে দিবসকে জাতীয় দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

উপসংহার : বাংলাদেশে ১ মে শ্রমিক দিবস হিসেবে পালিত হয় এবং ওই দিন সরকারি ছুটির দিন থাকে। দিনটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী তাদের বাণী দিয়ে থাকেন। সরকারি–বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে শোভাযাত্রা, শ্রমিক সমাবেশ, আলোচনা সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান–সহ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি পালন করে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক ফেডারেশন–সহ বিভিন্ন সংগঠন পৃথক কর্মসূচি পালন করে। ২০২১ সালের মে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল– 'মালিক শ্রমিক নির্বিশেষ মুজিববর্ষে গড়বো দেশ'। ২০২২ সালের মে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল– 'শ্রমিক–মালিক একতা, উন্নয়নের নিশ্চয়তা'। ১৯৮৬ সালে ঐতিহাসিক মে দিবসের শতবর্ষ শেষ হয়েছে। মে দিবসের এই দীর্ঘ শতবর্ষের আলোয় অনেক অন্ধকার দূর হয়েছে। সংগ্রামী শ্রেণির সামনে উন্মোচিত হয়েছে নতুন দিগন্ত। দৃঢ় হয়েছে শ্রমিক সংহতি। বিশ্বের এক–তৃতীয়াংশ মানুষ আজ রয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। কিন্তু এখনও জনসংখ্যার বৃহৎ

অংশ পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে মুক্ত নয়। মুক্ত নয় সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আজও প্রবল, পরাক্রান্ত। এখনও তার নির্লজ্জ রণহুংকার থামেনি। তাই দুনিয়াজুড়ে মে দিবসের যে বিজয় অভিযান সেখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে সমাজতন্ত্রের সপক্ষে ও পুঁজিবাদ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির বৈপ্লবিক সংগ্রাম। এই সংগ্রামী চেতনা ও চরিত্রই শ্রমজীবীর ভূষণ। মে দিবস আজ আর শ্রমিকের কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবির আন্দোলন নয়। মে দিবস আজ দুনিয়ার মেহনতি মানুষের সংগ্রামের দিন, সৌভ্রাতৃত্বের দিন। সমাজতন্ত্র কায়েম করার শপথ গ্রহণের দিন। মে দিবস এখন শ্রমিকশেণির সামনে নতুন উষার স্বর্ণ দুয়ার। অনেক রক্তের বিনিময়ে পাওয়া দুর্লভ এক সম্পদ।

১৬৫. স্বাধীনতা দিবস

ভূমিকা : 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়....'

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন। তার এই জন্মগত অধিকার যখন অন্যের দ্বারা লুণ্ঠিত হয় তখনই সে প্রতিবাদ করে ওঠে। সবস্বের বিনিময়ে নিজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। ২০০ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পর বাঙালি জাতিকে দীর্ঘ ২৪ বছর পাকিস্তানি শোষকদের বর্বরোচিত শোষণের নির্মম শিকার হতে হয়। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙালি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মৃত্যুপণ সংগ্রাম শুরু করে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ; তিরিশ লক্ষ প্রাণ আর দুই লক্ষ মা–বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন–সার্বভৌম একটি দেশ বাংলাদেশ। ২৬ মার্চ স্বাধীনতার পথে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর এই গৌরবময় দিনটিই বাংলাদেশের ইতিহাসে 'মহান স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে সমাদৃত।

ঐতিহাসিক পটভূমি : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের স্বপ্নবীজ মূলত বপন করা হয়েছিল সেই ১৯৪৭ সালে, ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের সময়ই। পরবর্তীতে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ক্রমাগত শোষণ, নিপীড়ন, বৈষম্যমূলক আচরণ, ন্যায্য অধিকার প্রদানে অস্বীকৃতি প্রভৃতি আন্দোলনের যাত্রাকে ত্বরান্বিত করে। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার এই পরোক্ষ সংগ্রাম ১৯৭১–এ এসে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। অনিবার্য মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় 'বাংলা' ভূখণ্ড।

ঐতিহাসিক পটভূমির ধারাক্রম : ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ বেনিয়াদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান দুটি আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যোজন যোজন দূরত্ব সত্ত্বেও শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নিয়ে গঠিত হয় নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তান। অদ্ভুত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের শাসকদের অনাচার–অত্যাচার আর সর্বক্ষেত্রে চরম বৈষম্য–বঞ্চনার স্বীকার হয় বাঙালি জাতি। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কেবল অর্থনৈতিক শোষণই নয়, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপরও নিপীড়ন শুরু করে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। তখনই 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে শুরু করে। ১৯৫২ সালে উর্দুকে আবারও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রজনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল নিয়ে রাস্তায় নামে। বর্বর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মিছিলে গুলি চালালে শহিদ হন রফিক, জব্বার, সালাম, বরকতসহ আরও অনেকে। শহিদদের এই পবিত্র রক্তই যেন বাঙালির হৃদয়ে স্বাধীন লাল–সবুজের পতাকার ছবি এঁকে দেয়। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। মুসলিম লীগের অসহায় ভরাডুবিতে নড়বড়ে হয়ে পড়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার ভিত। ১৯৫৬ সালে পুনরায় সরকারি ভাষায় বিতর্ক, আইয়ুব খানের অপশাসন, পাঞ্জাবি ও পশতুনদের ঋণ বাঙালিদের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া প্রভৃতি কারণে বাঙালিদের মনের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯৬৬ সালে বাঙালির স্বাধিকারের দাবিতে ঐতিহাসিক 'ছয়–দফা' দাবি উত্থাপিত হয়। গণবিক্ষোভ প্রতিহত করতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সামরিক শাসনের মাধ্যমে স্বাধীনতাকামী জনগণের ওপর চালাতে থাকে অত্যাচার, নিপীড়ন। ১৯৬৮ সালে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের পুরোধা ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মিথ্যা ও সাজানো 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু প্রবল গণআন্দোলনের মুখে পাকিস্তানি অপশক্তি ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ছেড়ে দেয়। এমনকি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। দফায় দফায় বৈঠক করার পরও ক্ষমতালিপ্সু শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে কালক্ষেপণ করতে থাকে। এমতাবস্থায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল সমাবেশের ডাক দেন। সমাবেশের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি– 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' বলে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। এমন একটি উদাত্ত আহ্বানের জন্যই এতদিন যেন অপেক্ষা করেছিল বাঙালি। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে এই ডাক। সর্বত্র শুরু হয় তুমুল আন্দোলন।

অপারেশন সার্চলাইট : ২৫ মার্চের অন্ধকার রাতে বর্বর পাকিস্তানি পশুশক্তি নিরস্ত্র–ঘুমন্ত বাঙালির ওপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। এশিয়া টাইমসের ভাষ্য অনুযায়ী, "Indians are bastards anyway". সামরিক বাহিনীর বড়ো বড়ো অফিসারদের নিয়ে বৈঠকে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন– "তিরিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা কর, তখন দেখবে তারা আমাদের হাত চেটে খাবে।" সে পরিকল্পনা মতোই ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানি আর্মি অপারেশন সার্চলাইট আরম্ভ করে যার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেওয়া। এরই অংশ হিসাবে সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করে হত্যা করা হয়, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী সমাজ নিধন করা হয় এবং সারা বাংলাদেশে নির্বিচারে সাধারণ মানুষ হত্যা করা হয়।

বাঙালিদের প্রতিরোধ ও স্বাধীনতা অর্জন : ২৫ মার্চ রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রেফতার হওয়ার আগে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য সংগঠকবৃন্দ অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার গঠন করে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। সর্বস্তরের মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, বন্ধুরাষ্ট্রসমূহের সর্বাত্মক সহায়তা, বিশ্ব গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকা তদুপরি তিরিশ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ মা–বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অবশেষে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ।

উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য : স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন ও অসাম্প্রদায়িক, কল্যাণমুখী, মানবিক, প্রগতিশীল স্বতন্ত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। মানুষের মৌলিক অধিকার ও ন্যায়সংগত অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠা, শোষণ, বৈষম্য, অন্যায়ের অবসান ঘটিয়ে ক্ষুধা–দারিদ্র্যমুক্ত একটি সুখী–সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম। এই দিনটি বাঙালির জীবনে বয়ে আনে একই সঙ্গে আনন্দ–বেদনার অম্ল–মধুর অনুভূতি। একদিকে হারানোর কষ্ট অন্যদিকে প্রাপ্তির আনন্দ। তবে শেষ পর্যন্ত সর্বস্ব হারিয়েও স্বাধীনতা প্রাপ্তির অপার আনন্দই বড়ো হয়ে ওঠে প্রতিটি বাঙালির কাছে। গৌরবোজ্জ্বল এই দিনটি প্রতিবছর আসে আত্মত্যাগ ও আত্মপরিচয়ের বার্তা নিয়ে। স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের দায়িত্ব–কর্তব্য। নব উদ্যমে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা নিয়ে আসে এই দিন।

বর্তমান বাস্তবতা : 'কি দেখার কথা কি দেখছি..., তিরিশ বছর পরেও আমি স্বাধীনতাটাকে খুঁজছি...' স্বাধীনতার স্বপ্ন আর বর্তমান বাস্তবতা পর্যালোচনা করলে গায়ক হায়দার হোসেনের এই গানটিই যেন করুণ সুরে বেজে ওঠে মনের কোণে। তিরিশ নয়, তেতাল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে স্বাধীনতার। সুখী–সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ সমাজের স্বপ্ন পূরণ হয়নি আমাদের। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্বের দুর্বিপাকে এখনও আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি। মূল্যবোধের অবক্ষয়, হিংসাত্মক অপরাজনীতি, লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র–রাজনীতি, সীমাহীন দুর্নীতি প্রভৃতি স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লাগাম টেনে ধরে আছে। স্বাধীনতার চেতনা যেন ম্লান হয়ে যেতে বসেছে আর আমরা ক্রমশই যেন পিছিয়ে যাচ্ছি।

সংকট উত্তরণের উপায় : সংকট উত্তরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আশার কথা হলো, আমাদের বর্তমান প্রজন্ম স্বাধীনতার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী। এই প্রজন্মকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার দীক্ষায় দীক্ষিত করতে হবে। এজন্য এদের হাতে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস তুলে দেওয়া জরুরি। জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে সঠিক ইতিহাস সংগ্রহের মাধ্যমে ইতিহাসবিকৃতি রোধের মাধ্যমে তা সম্ভব হতে পারে। দল কিংবা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে ওঠে কল্যাণমুখী রাজনীতির চর্চা করতে হবে।

উপসংহার :

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত
ঘোষণার ধ্বনি–প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে,
দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায় তোমাকে আসতেই হবে হে স্বাধীনতা।

কবি শামসুর রাহমানের মতো প্রতিটি বাঙালির আত্মপ্রত্যয়ী আহ্বানে এসেছে স্বাধীনতা। অর্জিত এই স্বাধীনতা রক্ষা ও এর চেতনা বাস্তবায়নে সব ধরনের সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গড়ার কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের।

১৬৬. একুশে বইমেলা *[ঢা. বো. '১২]*

অথবা, অমর একুশে বইমেলা *[রা. বো. '১৬]*

অথবা, বইমেলায় একদিন *[চ. বো. '১৭]*

ভূমিকা

"বিশাল বিশ্বের আয়োজন
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ

সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ
ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে।" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বই মানুষের পরম বন্ধু। নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সুহৃদ। মানবসভ্যতার অন্যতম প্রাণসত্তা। মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধন। বই শুধু অনাবিল আনন্দ আস্বাদনের উপকরণই নয়, বই মানুষের অগ্রগতির অঙ্গীকার ভাবনা ও জ্ঞানের মহান উদ্‌বোধক। বই দেশ ও জাতির প্রগতির পরিমাপক। বইমেলা অগ্রগতিরই অভ্রান্ত দিকদর্শন। বইপড়াও মানুষের এক দুর্নিবার নেশা। এই নেশাতেই মানুষ ছুটে যায় বইমেলায়।

বইমেলার ইতিহাস : বইমেলার ইতিহাস প্রাচীন। বইমেলার শুর্ বিদেশের মাটিতে, ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে। বৃহৎ মেলার অঙ্গ হিসেবে এর পদচারণা। ১৮০২ সালে আমেরিকার নিউইয়ক শহরে 'Mathew Carry'–এর উদ্যোগে বইমেলার প্রথম আসর বসেছিল। ১৯৭৫ সালে New York-এর Cliton শহরে ১০০ জন প্রকাশক মিলে ৩০,০০০ গ্রন্থ নিয়ে বইমেলার আয়োজন করে। এরপরে ১৯২৭ এবং ১৯৪৯ সালে Frank froot-এর বৃহৎ বইমেলা হলো আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি বিকাশের অন্যতম ক্ষেত্র। বাংলাদেশে বইমেলার আয়োজন ১৯৭৩ সাল থেকে। এখন বইমেলা সর্বত্র উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। বাংলা একাডেমি আয়োজন করছে একুশে বইমেলা। দেশের পালিত হচ্ছে জাতীয় গ্রন্থ–সপ্তাহ গ্রন্থমেলা। শুধু রাজধানী শহরেই নয়, ছোটো–বড়ো মফস্বল শহরেও চলছে এই বইমেলার আয়োজন। ১৯৭৫ সালে মুক্তধারা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এককভাবে একটি বইমেলার আয়োজন করে। তা শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

একুশে বইমেলার সূত্রপাত : অমর একুশে এই দিবসটির জন্য শ্রদ্ধা জানাবার জন্যই সূত্রপাত ঘটে একশে বইমেলার। ভাবতে অবাক লাগে, কোনো সরকারি উদ্যোগ নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে শুরু হয় এই বইমেলা— স্বাধীনতা লাভের সূচনালগ্নে। মুক্তধারা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী চিত্তরঞ্জন সাহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণের মাটিতে পাটি বিছিয়ে বইমেলার আয়োজন করেন। এই নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তির এই উদ্যোগ মহৎ ও অভিনব। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে। এরপর থেকে বাংলা একাডেমির উদ্যোগে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং মেলার ব্যাপ্তি হয়েছে সারা ফেব্রুয়ারি মাস। ১লা ফেব্রুয়ারি মেলা শুরু হয় এবং সমাপ্তি হয় ফেব্রুয়ারির শেষ দিন।

বইমেলার তাৎপর্য : বই জ্ঞান ও আনন্দের প্রতীক। খ্যাতি, মান–সম্মান, অর্থ, শক্তি সবকিছুরই ক্ষয় আছে। কিন্তু বই মানুষের জ্ঞানের তপস্যা, আশা–আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে তাকে অক্ষয় ও অমর করে রাখে। বই জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়। দেশে সুনাগরিক গড়ে তোলার সবচেয়ে উত্তম উপায় হলো সুলিখিত, সৃষ্টিশীল ও মননশীল বই। আর এসব বইয়ের সমাহার হলো বইমেলা। বইমেলা হলো জ্ঞানের ভান্ডার। জাতিকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে বইমেলার ভূমিকা অপরিসীম। বিশ্বকবি **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** বলেছেন, 'মানুষ বই দিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সাঁকো বেঁধে দিয়েছে।' কাজেই বইমেলা যুগের সেতুবন্ধন। বইমেলা বর্তমান বিশ্বে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি মিলন কেন্দ্র। দেশের শিল্প–সাহিত্য–সংস্কৃতির প্রসার ও সমৃদ্ধিতে বইমেলার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বইমেলার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো পাঠককে শুধু বইপড়া নয়, পাশাপাশি বই কেনার প্রতিও আগ্রহী করে গড়ে তোলা।

একুশে বইমেলা : একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছিল রফিক, জব্বার, সালাম, বরকতসহ আরও অনেকে। দিনটি শহিদ দিবস হিসেবে আমাদের দেশে পালিত হয়ে থাকে জাতীয় মর্যাদার সাথে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ দিবসটিকে স্মরণ করে বাংলা একাডেমি মাঠে প্রতিবছর 'একুশে বইমেলা' অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের মেলাগুলোর মধ্যে এটি বৃহত্তম বইমেলা। সাধারণত দেশের প্রধানমন্ত্রী এই মেলা উদ্‌বোধন করেন। মাসব্যাপী একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় অসংখ্য বই। এই মেলাকে সামনে রেখে নবীন ও প্রবীণ কবি–সাহিত্যিকগণ নব উদ্দীপনায় নতুন নতুন বই রচনায় মনোযোগী হন। একুশে বইমেলা লেখক, প্রকাশক ও পাঠক সম্মিলনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে আমাদের একটি সংস্কৃতি ঐতিহ্য হিসেবে রূপ ধারণ করেছে।

একুশে বইমেলার মিলনমেলা : একুশে বইমেলা লেখক, পাঠক, প্রকাশকের ত্রিবেণী সঙ্গম। বইমেলায় আসেন বইপাগল পাঠক। সবাই যে বই কেনেন তা নয়, সৎ পাঠকেরাই বই কেনেন। পাঠক বই কেনার সঙ্গে সঙ্গে লাভ করেন লেখকের সান্নিধ্য। লেখকও পাঠকের বই কেনার উৎসাহ অনুভব করেন। জমে ওঠে সাহিত্যালোচনা ও আলোচনা চক্র। বড়ো বড়ো সাহিত্যিকরা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন। অভিনীত হয় নাটক, দেশের গান, ভাষার গান। চা–কফি গুটিকয়েক খাবারের দোকানে

জমজমাট হয়ে ওঠে বই মেলা। ফলে মেলার প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে আকর্ষণীয়। মেলামাত্রই কর্মব্যস্ত সংসারক্লান্ত মানুষের কাছে দৈনন্দিন তুচ্ছতার বন্ধন থেকে মুক্তি। কবির ভাষায়—

"হেথায় মিশেছে দিশি দিশি হতে
বিপুল জ্ঞানের ধারা
শত শত মনীষীর চিন্তার বাণী
আনন্দে আকুল পারা।"

আমার দেখা একটি গ্রন্থমেলা : ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখ রেডিয়ো, টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আগে থেকেই জানানো হয়েছিল ৭ তারিখে একুশে বইমেলা উদ্‌বোধন হবে। উদ্‌বোধন করবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। প্রতিটি বইয়ের স্টল সাজানো হয়েছে চমৎকারভাবে। সারি সারি স্টলগুলোতে সাজানো নানা রঙের প্রচ্ছদে বইগুলো দেখতে অপূর্ব লাগছিল। বাংলা একাডেমির মূল ভবনের পূর্ব পাশে তৈরি করা হয়েছে বিশাল প্যাভিলিয়ন এবং দক্ষিণ পাশে রয়েছে একটি মঞ্চ। এই মঞ্চে বাংলা সাহিত্য–সর্ম্পকিত নানা ধরনের আলোচনা অনুষ্ঠান হয়, হয় নাটক এবং স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান। দেশের বড়ো বড়ো কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। মেলায় যে গ্রন্থসমূহের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে তাতে মনে হয় পৃথিবীর সকল জ্ঞানীর কথা ও মতাদর্শন এখানে ঘুরে ফিরছে। এখানে সমবেত হয়েছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞানের কথাগুলো। এখানে উপস্থিত হয়েছে জগতের মানুষের সুখ–দুঃখের কথা, প্রেম–ভালোবাসার কথা, দেশপ্রেমের কথা— ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ধর্মের কথা। পৃথিবীর সৃষ্টি কিংবা ধ্বংস কোনো কথাই অনুপস্থিত নেই এখানে। তাই বইমেলা আমাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করে এবং আনন্দিত করে।

মেলার বহিরঙ্গ দৃশ্য : মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রধান তোরণটি সাজানো হয়েছে অত্যন্ত চমৎকারভাবে। ডানপাশের দেওয়ালে ভাষা শহিদ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সংগ্রামী ইতিহাসকে ধারণ করে তৈরি করা হয়েছে একটি সুদীর্ঘ দেওয়াল–নকশা। মেলার ভেতরে বটবৃক্ষের বেদীমূলে তৈরি করা হয়েছে নজরুল মঞ্চ। চারদিকে চক্রাকারে আছে প্রয়াত জ্ঞানী–গুণী মনীষীদের ছবি এবং সাজানো আছে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অমর বাণী। যা দেখলে চোখ জুড়ায় ও মন ভরে যায়। মেলায় প্রবেশ করেই চোখে পড়ে স্টল এবং স্টলে সাজানো বই আর বই। ছোটো–বড়ো প্রায় চারশ স্টল বসেছে মেলায়। তাকে তাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে নানা রঙের নানা লেখকের নানা ধরনের বই। এ যেন বইয়ের মিছিল।

মেলার কর্মব্যবস্থা : একুশে বইমেলায় যেন সকলেই ব্যস্ত। অনেকে তার সাথিকে হারিয়ে খুঁজছে, আবার অনেকে হয়তো তার পুরোনো বন্ধুকে পেয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কুশল বিনিময় করছে। কোথাও বইয়ের বান্ডিল হাতে নিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছে দোকানি কর্মচারী। আবার কোথাও কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে মন্থরগতিতে চলছেন জ্ঞানান্বেষী। এছাড়া বইয়ের বিভিন্ন স্টলে নানা শ্রেণির ক্রেতা। আবার কেউ কেউ ভিড় এড়াতে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে চিন্তাভাবনায় ব্যস্ত। কেউ স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে বই হাতে পাতা উলটাতে ব্যস্ত। আবার কেউ ব্যস্ত রয়েছে কাঙ্ক্ষিত লেখকের বই সন্ধানে। সবাই যেন নানা ব্যস্ততায় কালহরণ করছে।

বইমেলার উপকারিতা : বইমেলায় সাধারণত সৃজনশীল বইয়ের সমাবেশ ঘটে থাকে। বিভিন্ন রুচির পাঠক তাদের পছন্দমতো বই সংগ্রহ করতে পারে বইমেলা থেকে। একুশে বইমেলায় নানা ধরনের অনেক বই পাওয়া যায়। এটি বই সংগ্রহের একটি উপযুক্ত সুযোগ। সকল শ্রেণির পাঠকই মেলায় এসে উপকৃত হতে পারে। শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সবারই রুচিসম্মত বইয়ের সমাবেশ থাকে মেলায়। তাছাড়া বইমেলায় অনেক লেখকের সাথেও পাঠকের সাক্ষাৎ ঘটে। কারণ বইমেলার সময় অনেক লেখকই মেলাপ্রাঙ্গণে আসেন। তাঁরা পাঠকদের অটোগ্রাফ দেন। লেখকদের বইও বিক্রি হয় প্রচুর। এমনিভাবে লেখক, প্রকাশক, পাঠক সকলেই উপকৃত হতে পারে বইমেলার মাধ্যমে।

বইমেলার গুরুত্ব : বর্তমানকালে বইমেলা ও পুস্তক প্রদর্শনীগুলোর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য গ্রন্থ প্রকাশনার জগতে এনেছে অভূতপূর্ব গতি। মেলার সময় বই কেনার উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। পাঠকদের বই কেনার আগ্রহ প্রবীণ ও নবীন লেখদের উদ্‌বুদ্ধ করে তোলে নতুন সৃষ্টির প্রেরণায়। আবার বিক্রি বেড়ে গেলে প্রকাশক বেশি বেশি বই প্রকাশ করেন। সবচেয়ে বড়ো কথা বইমেলার আকর্ষণে অনাগ্রহী পাঠকও কৌতূহলী ও গ্রন্থানুরাগী হয়ে ওঠে। সৎ পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভালো গ্রন্থের প্রচার ও সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে অনুকূল পরিবেশ রচিত হয়। তাই বইমেলার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই কবি তার কবিতার মাধ্যমে বলেছেন—

'বইমেলার আকর্ষণে অনাগ্রহী পাঠকও কৌতূহলী

ও গ্রন্থানুরাগী হয়ে ওঠেন। সৎ পাঠকের সংখ্যা
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে
অনুকল পরিবেশ রচিত হয়।' — জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী।

উপসংহার : বিগত কয়েকটি বইমেলার পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে আমাদের দেশে বইমেলার জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটি নিঃসন্দেহে একটি উত্তম সংবাদ। বই মানুষের মনকে উদার করতে পারে, জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পারে। **প্রমথ চৌধুরীর** ভাষায়, "বই চব্বিশ ঘণ্টা চোখের সম্মুখে থেকে এই সত্যটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ পৃথিবীতে চামড়ায় ঢাকা মন নামক একটি পদার্থ আছে।" এই চামড়ায় ঢাকা মনের বিকাশের জন্য যত বেশি বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে ততই আমাদের মঙ্গল হবে।

১৬৭. ভাষা আন্দোলন

ভূমিকা

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো, একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।।
ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু
গড়ায়ে ফেব্রুয়ারি।।
আমার সোনার দেশের
রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি।।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংঘটিত আন্দোলনই ভাষা আন্দোলন, যা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর প্রমুখ বাংলা ভাষাপ্রেমীর আত্মদানের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি পায়। অবশ্য এ আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল আরও আগে, অন্যাদিকে এর প্রতিক্রিয়া এবং ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রকৃত বিচারে ভাষা আন্দোলন বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে, অন্যদিকে সমগ্র বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়। এটি একইসঙ্গে ছিল তৎকালীন পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিল বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের বীজমন্ত্র।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় : ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। পাকিস্তানের ছিল দুটি অংশ– পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান। পায় দুই হাজার কিলোমিটারের অধিক দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত পাকিস্তানের দুটি অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত দিক থেকে অনেকগুলো মৌলিক পার্থক্য ছিল। সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের বৈঠকে ইংরেজি ও উর্দুভাষা ব্যবহারের পাশাপশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের অধিকার সংক্রান্ত এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ প্রস্তাবের কঠোর সমালোচনা করেন। ফলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে গড়ে ওঠে তমদ্দুন মজলিস ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১০ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ধর্মঘট ডাকার সিদ্ধান্ত হয়। ১১ই মার্চ পালিত সেই ধর্মঘটে পিকেটিংয়ের সময়ে কে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এর কিছুদিন পরে ২১শে মার্চ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় এক ভাষণে ঘোষণা করেন : "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" ২৪ শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে গিয়েও তিনি একই বক্তব্য রাখেন। যখন তিনি উর্দুর ব্যাপারে তার অবস্থানের কথা পুনরুল্লেখ করেন, উপস্থিত ছাত্ররা সমস্বরে 'না, না' বলে চিৎকার করে ওঠে। তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘোষণার প্রতিবাদে তারা বলে, উর্দু নয় বাংলা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যেও গভীর ক্ষোভের জন্ম হয়। বাংলা ভাষার সম–মর্যাদার দাবিতে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন দ্রুত দানা বেঁধে ওঠে। কবির ভাষায়—

সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই সারা বাংলার বুকে

ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।।

ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আবারও উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। এর ফলে পূববাংলার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২৯শে জানুয়ারি সিদ্ধান্ত হয়, ঢাকা শহরে প্রতিবাদী মিছিল–সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সমগ্র পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদ কর্মসূচি ও ধর্মঘটের আহ্বান করে। আন্দোলন দমন করতে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে। ফলে দিনটিতে ঢাকা শহরে সকল প্রকার মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি বেআইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কিন্তু এ আদেশ অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সংখ্যক ছাত্র ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ৯টা থেকে সরকারি আদেশ উপক্ষো করে ঢাকা শহরের স্কুল–কলেজের হাজার হাজার ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রশ্নে পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণের আমতলায় ঐতিহাসিক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্ররা পাঁচ–সাতজন করে ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে চায়। তাঁরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। পুলিশ অস্ত্র হাতে সভাস্থলের চারদিক ঘিরে রাখে। বেলা সোয়া এগারোটার দিকে ছাত্ররা একত্র হয়ে প্রতিবন্ধকতা ভেঙে রাস্তায় নামার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছাত্রদের সতর্ক করে দেয়।

দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্রান্তিলগ্নে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ বন্ধ করতে অনুরোধ জানান এবং ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু ক্যাম্পাস ত্যাগ করার সময়ে কয়েকজন ছাত্রকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আরও অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে পুলিশ ১৪৪ ধারা অবমাননার অজুহাতে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে নিহত হয় রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে। শহিদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে ওঠে। শোকাবহ এ ঘটনার অভিঘাতে সমগ্র পূর্ব বাংলার তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

২১শে ফেব্রুয়ারি–পরবর্তী আন্দোলন : ২১শে ফেব্রুয়ারির ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে বিদ্রোহের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র, শ্রমিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সাধারণ জনতা পূর্ণ হরতাল পালন করে এবং সভা–শোভাযাত্রা সহকারে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। ২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন শফিউর রহমান শফিক। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ফুলবাড়িয়ায় ছাত্র–জনতার মিছিলেও পুলিশ অত্যাচার–নিপীড়ন চালায়। শহিদদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে ওইদিন বিকেল থেকে রাত অবধি কাজ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্ররা নির্মাণ করে ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ মিনার। ২৪শে ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারটি উদ্‌বোধন করেন বাইশে ফেব্রুয়ারি শহিদ হওয়া শফিউর রহমানের পিতা। ২৬শে ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শহিদ মিনারটি উদ্‌বোধন করেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে
রমনার ঊর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার তলায়
যেখানে আগুনের ফুলকির মতো
এখানে ওখানে জ্বলছে অসংখ্য রক্তের ছাপ
সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি।
আজ আমি শোকে বিহ্বল নই
আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই
আজ আমি প্রতিজ্ঞায় অবিচল।

ভাষা আন্দোলনের অর্জন : ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন ভাষাকেন্দ্রিক হলেও তা পুরো বাঙালি জাতিকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। এর ফল হিসেবে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ব্যবধানে

মুসলিম লীগকে পরাজিত করে। একুশের চেতনাকে ধারণ করে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতেহার ছিল ২১ দফা সংবলিত। ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলনের মুখে ১৯৫৪ সালের ৭ই মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৫৫ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জন্য বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো বাংলা ভাষা আন্দোলন, মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, যা বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপিত হয়। দিবসটির এই আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। গবেষকের ভাষায়—

> "১৯৪৭ সালে দেশভাগ হয় এবং তার পর থেকেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংঘটিত আন্দোলনই হচ্ছে **ভাষা আন্দোলন,** যা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছিল ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর প্রমুখ বাংলা ভাষাপ্রেমীর আত্মদানের মধ্য দিয়ে বাংলা **ভাষা** রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি পায়।"

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্য : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নতুন গতি লাভ করে। রচিত হয় ভাষা আন্দোলন–কেন্দ্রিক অনেক কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় একুশের প্রথম সাহিত্য সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' প্রকাশিত হয়। একই বছর মুনীর চৌধুরী কারাগারে বসে কবর নাটক রচনা করেন। আবদুল গফফার চৌধুরী লেখেন গান, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি।' 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতা রচনা করেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী। শামসুর রাহমান রচনা করেন 'বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচনা করেন 'মাগো, ওরা বলে' কবিতা। জহির রায়হান একুশ নিয়ে রচনা করেন উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন (১৯৬৯)'। এছাড়া ওই সময়পর্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বাংলা সাহিত্য চর্চার অন্যতম অনুপ্রেরণা। তাই কবি বলেন—

যারা আমার মাতৃভাষাকে নির্বাসন দিতে
চেয়েছে তাদের জন্যে
আমি ফাঁসির দাবি করছি।
যাদের আদেশে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তাদের জন্য
ফাঁসি দাবি করছি
যারা এই মৃতদেহের উপর দিয়ে
ক্ষমতার আসনে আরোহণ করেছে
সেই বিশ্বাসঘাতকদের জন্য ।
আমি ওদের বিচার দেখতে চাই।

ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রধান তাৎপর্য এই যে, বাঙালি জাতি তার জাতীয়তাবোধ ও অধিকার সম্পর্কে প্রথম সচেতন হয়। ভাষার প্রশ্নে সকল শ্রেণি–পেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এর ফলে পূর্ব বাংলায় গড়ে ওঠে একটি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এরপর যত আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে তার পেছনে কাজ করেছে ভাষা আন্দোলনের উজ্জ্বল স্মৃতি। ভাষা আন্দোলনের প্রেরণায় ১৯৬২–এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬–র ছয় দফা এবং ১৯৬৯–র গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয় অর্জিত হয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। এখনও সেই লক্ষ্য পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। কবির ভাষায়—

এমন এক একটি মূর্তিমান স্বপ্নকে বুকে চেপে
জালিমের গুলিতে যারা প্রাণ দিল
সেইসব মৃত্যুর নামে
আমি ফাঁসি দাবি করছি।

উপসংহার : একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতিসত্তার পরিচয় নির্দেশক দিন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বীর ভাষা–শহিদদের অবদান জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তবে তাঁদের আত্মদান তখনই সার্থক হবে, যখন বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে। কবির ভাষায়—

একটি কবিতা রচনা করার
সেই সব শহীদ ভাইয়েরা আমার
যেখানে তোমরা প্রাণ দিয়েছ
সেখানে হাজার বছর পরেও

সেই মাটি থেকে তোমাদের রক্তাক্ত চিহ্ন
মুছে দিতে পারবে না সভ্যতার কোনো পদক্ষেপ।

১৬৮. মানবাধিকার *[য. বো. '১৪]*

ভূমিকা : সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে যে অধিকারগুলো মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে তা-ই মানবাধিকার। মানবিক অধিকারের পর্যায় ও স্তরগুলো চিহ্নিত হয়েছে মানুষে মানুষে শান্তি, মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তুলতে। সর্বজনীন ঘোষণার মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। মানবাধিকারের মর্মবাণী হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ধনী, গরিব নির্বিশেষে সকল মানুষ সমানাধিকার ভোগ করবে। মানুষের সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রায় থাকবে না কোনো বিভেদের প্রাচীর।

মানবাধিকার কী : মানুষ হিসেবে মানুষের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা ও বিকাশসাধনের প্রক্রিয়াই মানবাধিকার। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ সর্বজনীনভাবে স্বীকৃতি লাভ করাকেই বলে মানবাধিকার। পৃথিবীর দেশে দেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে প্রত্যেকটি প্রজন্ম যেন যথাযথ যত্ন ও পরিচর্যায় লালিতপালিত হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে বেড়ে উঠতে পারে এবং সমানভাবে অধিকার ভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করাই মানবাধিকারের মূলকথা।

মানবাধিকারের প্রেক্ষাপট : জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ভাষা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বহুকাল থেকে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, ঝগড়া- বিবাদ, যুদ্ধ-হানাহানি হয়ে আসছে। গোষ্ঠীবাদ, সম্প্রদায়বাদ, আধিপত্য, সাম্রাজ্যবাদ এসব নানা কারণে দাঙ্গা-সংঘাত আজও অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে সংঘটিত হয়েছে দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ। জাতিগত বিদ্বেষ ছড়িয়ে লাখো মানুষকে এ সময় হত্যা করা হয়েছে। পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা ও পঙ্গু করা হয়েছে লাখো নিরপরাধ মানুষকে। এছাড়া দেশে দেশে রাজনৈতিক সংঘাত এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে মানবাধিকার। আফ্রিকাজুড়ে, ভারতীয় উপমহাদেশে, ইংল্যান্ডে, জিম্বাবুয়েতে বিপন্ন মানুষ বর্ণ ও জাতিবিদ্বেষে জর্জরিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে কিছু মানুষ যেন পরিণত হয়েছে মূঢ়-নিষ্ঠুর পশুতে, কলঙ্কিত করেছে মানবসভ্যতা আর আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে মানবাধিকার। সচেতন বিশ্বমানবের জন্য বিব্রতকর এসব ঘটনার প্রেক্ষাপটে বিশ্বশান্তি ও শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে, মানুষের মধ্যে সাম্য-মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অগ্রাধিকার পেয়েছে।

মানবাধিকারের ক্রমবিকাশ : সুদূর অতীতে মানবাধিকার সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না। পরিবার বা সমাজে যা কিছু প্রচলিত ছিল, তা ছিল স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ ও গতানুগতিক। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের নিজ অধিকার সম্পকে ধারণা এবং তা ক্রমশ পরিচ্ছন্ন রূপ লাভ করে। খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছরেরও আগে পৃথিবীর প্রাচীনতম আইন সংকলন পাওয়া যায় ব্যাবিলনের রাজা হাম্মুরাবির নিয়মাবলিতে। বৌদ্ধধর্মে স্বীকৃতি পেয়েছে মানুষের সমাধিকার ও সমমর্যাদা। সেখানে কোনো ভেদাভেদ নেই। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে মদিনায় বহুধর্মভিত্তিক সমাজে হজরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রণীত 'মদিনা সনদে' সকল নাগরিকের সমধিকারের স্বীকৃতির কথা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে মানবাধিকারের ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে দার্শনিক রুশো, হুগো, জন লক, কার্ল মার্কস প্রমুখ মনীষীদের গ্রন্থে। তবে ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডে প্রণীত 'ম্যাগনাকার্টা'-কে মানবাধিকার প্রথম চার্টার হিসেবে গণ্য করা হয়। এরপর ১৭৭৬ সালে প্রণীত আমেরিকার 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র', ১৭৮৯ সালে রচিত ফরাসি বিপ্লবের 'মানবাধিকার'-এর ডিক্লারেশন, ১৯১৭ সালে রুশবিপ্লবের বাণী মানবাধিকার অর্জনের এক-একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়।

মানবাধিকার-সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণা : ১৯৪৮ সালে ১০ই ডিসেম্বর ফ্রান্সের পারি নগরীতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মানবাধিকার-সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণা গৃহীত হয়। ১৯৫০ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১০ই ডিসেম্বরকে 'মানবাধিকার দিবস' ঘোষণা করে এবং দিবসটি যথাযথভাবে পালনের জন্য সকল রাষ্ট্র ও আগ্রহী সংস্থাকে আহ্বান জানায়। 'মানবাধিকার সনদ'-এ রয়েছে ৩০টি ধারা। এর মধ্যে ১৯টি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত এবং ৬টি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত।

'মানবাধিকার সনদ'-এর মূলকথা : জাতিসংঘ গৃহীত 'মানবাধিকার সনদ'-এ স্বীকৃত মৌলিক অধিকারসমূহ হলো :

১. মানুষ জন্মগতভাবে সমমর্যাদা ও সমধিকার ভোগ করার অধিকারী।
২. জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষেরই বিয়ে করার ও পরিবার গঠনের অধিকার, সম্পত্তি অর্জনের অধিকার এবং সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার রয়েছে।
৩. প্রতিটি মানুষের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার, বাক্‌স্বাধীনতার, ভোট প্রদানের ও স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার অধিকার রয়েছে।
৪. প্রতিটি মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা, বিশ্রাম ও বিনোদনের এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার অধিকার রয়েছে।
৫. সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে প্রতিটি মানুষের রয়েছে কর্মের ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভের অধিকার।
৬. প্রতিটি মানুষের শিক্ষা, ঐতিহ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।

৭. অন্যের স্বাধীনতা লঙ্ঘনের বা অন্যের অধিকার হরণের অধিকার কারও নেই।
৮. মানবাধিকার সনদে উল্লিখিত যেকোনো অধিকার লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বিশ্বে মানবাধিকারের স্বরূপ : জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার সনদ গৃহীত হওয়ার পরও বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা ও ষড়যন্ত্রের ভয়াবহ রূপ প্রকাশ পাওয়ার পর তা চরমভাবে নিন্দিত হয়েছে। কিন্তু অভিযুক্ত দেশ বা দেশগুলোর কারও কোনো শাস্তি হয়নি। অথচ সনদের প্রতি বৃদ্ধাঙুল দেখিয়ে দীর্ঘকাল চলেছে ভিয়েতমান–কম্বোডিয়া যুদ্ধ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, আফগানিস্তান যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধ, ফিলিস্তিন ও সার্বিয়া–হার্জেগোভেনিয়া যুদ্ধ। এসব যুদ্ধ বিগ্রহে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এবং হচ্ছে চরমভাবে। লাখো মানুষ উদ্‌বাস্তু হয়েছে, হাজারো নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, বাড়িঘরে লুটপাট করে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। লাঞ্ছিত হয়েছে কত নারী, খাদ্যাভাবে মৃত্যু হয়েছে কত শিশুর কে জানে!

পৃথিবীর প্রায় দুই–তৃতীয়াংশ মানুষ এখনো চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা এবং নারী–পুরুষের অধিকারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। স্নায়ুযুদ্ধের কারণেও বিশ্ববাসীর কম ক্ষতি হয়নি। পৃথিবীতে দিন দিন দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। অপুষ্টিতে ভুগছে ৮০ শতাংশ শিশু। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে এখনো কোটি কোটি মানুষ বঞ্চিত। দরিদ্র মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সুবিধা ভোগ করতে পারছে না। দরিদ্র তথা উন্নয়নশীল দেশের মানুষ নানা সমস্যায় জর্জরিত। তারা মানবাধিকারের ৩০ ভাগ সুযোগ–সুবিধাও পায় না।

মানবাধিকার ও বাংলাদেশ : ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তাদেরকে পরাজিত করে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদারবাহিনী এদেশের ৩০ লাখ নিরপরাধ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, আড়াই লাখ মা–বোনকে লাঞ্ছিত করেছে, ৬২ হাজার গ্রাম লুটপাট করে পুড়িয়েছে। তাদের অত্যাচার–নিপীড়নে নিজ দেশ ছেড়ে পার্শ্ববর্তী দেশে শরণার্থী হয়েছিল প্রায় ১ কোটি মানুষ। এর সবই মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড যা মানবাধিকারের চরমভাবে লঙ্ঘন করেছে।

এছাড়া 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা'–এর মতো মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত ৫ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে বলে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ শরণার্থীদের। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে মিয়ানমারও মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। আর এ কারণে বাংলাদেশে তারা মানবেতর জীবনযাপন করছে। খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের মানুষ অতি–ধর্ম–বর্ণ–সম্প্রদায় নির্বিশেষে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ বজায় রেখে হাজার বছর ধরে পাশাপাশি অবস্থান করছে। এ দেশের মানুষ অসাম্প্রদায়িক চিন্তা–চেতনায় সমৃদ্ধ। তারপরও এদেশে ছিটেফোঁটা যেসব ঘটনা ঘটে সেগুলো রাজনৈতিক ও দলীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে অথবা ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে। বাড়িঘর ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ বা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। এগুলো অবশ্যই মানবতাবিরোধী। অনেক সময় সন্ত্রাসী ও জঙ্গিগোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা রাজনীতির ছত্রছায়ায় বোমাবাজি করে, গাড়ি ভাঙচুর করে, পেট্রোলবোমা মেরে যাত্রীসহ গাড়ি পোড়ায়, বাড়িঘর–অফিস–আদালতে লুটপাট চালায় ও অগ্নিসংযোগ করে। এতে মূল্যবান প্রাণ ও সম্পদ হারিয়ে জাতি হতবল হয়ে যায়। চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনে এসব ঘটনা খুবই মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক। এছাড়া হিন্দুপাড়া পুড়িয়ে দেওয়া; বৌদ্ধপাড়ায় লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ; মন্দির, প্যাগোডা, চার্চের ক্ষতিসাধন করা এসব অবশ্যই ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিচায়ক এবং নিঃসন্দেহে মানবতাবিরোধী কাজ। অথচ বাংলাদেশের সিংহভাগ উদার, ধর্মপ্রাণ ও সংস্কৃতিমান মানুষ এ ধরনের নৃশংসতা কখনো সমর্থন করে না।

উপসংহার : বিশ্বের মানুষের কাছে অধিকার এখন আর অস্পষ্ট বিষয় নয়। তাই মানুষের মধ্যে অধিকার সচেতনতা বাড়ছে। এ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য প্রয়োজন সততা ও আন্তরিকতা। আর বিশ্বের সকল মানুষের জন্য মানবাধিকার নিশ্চিত করা গেলেই পৃথিবী হয়ে উঠবে সুন্দর।

১৬৯. মানবসম্পদ

মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব *[সি. বো. '১৪]*

ভূমিকা

জন্মই শেষ কথা নয়। কারণ মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেই মানুষের যোগ্যতা বা মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়ে ওঠে না। জন্মের পর মানুষকে নানাবিধ শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে হয়। মানুষকে শিক্ষার্জনের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হতে হয়। স্রষ্টার সৃষ্টি মানবসন্তানকে উন্নততর মানুষে পরিণত করাই শিক্ষার লক্ষ্য। একটি মানুষ কীভাবে মানবসম্পদে পরিগণিত হবে তার ব্যবস্থা করা হয় শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষিত জনশক্তিই দেশের প্রকৃত সম্পদ। এ সম্পদের উন্নতি না হলে দেশ ও জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। তাই মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষাই মানুষকে পরিণত করে সম্পদে।

মানবসম্পদ : আধুনিক বিশ্বে মানুষকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একটি দেশের নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীই সে দেশের মানবসম্পদ। মানবসম্পদ যত কর্মঠ হয় জাতি হয় তত উন্নত। কিন্তু মানবসম্পদ অকেজো বা অকর্মণ্য হলে দেশ ও জাতির জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান বিশ্বে শিক্ষাকে মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার বলে গণ্য করা হয়। উন্নত দেশে শিক্ষা বিভাগ এখন মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ নামে পরিচিত। একজন মানুষকে সম্পদ বলা যায় তখনই যখন সে দেশ ও জাতির সমৃদ্ধিতে সহায়তা করে। শিক্ষার বদৌলতে মানুষ সম্পদ হলে জাতীয় জীবনের জন্য তা হয়ে ওঠে কল্যাণকর। অপরদিকে তার শিক্ষা যখন জাতির জন্য কোনো কাজে আসে না তখন তা জাতির বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি ব্যতীত একটি দেশের উন্নয়ন কিছুতেই সম্ভব নয়।

শিক্ষা ও মানবসম্পদ : সুদক্ষ মানবসম্পদ গঠন ও অগ্রগতি সাধনে শিক্ষার বিকল্প নেই। উন্নত বিশ্বে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বলে সেখানে মানুষ শক্তিশালী সম্পদে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশে শিক্ষার সুযোগ কম। জীবিকার সংস্থান করতে পারে এমন শিক্ষার সুযোগ আরও কম। বিপুল জনসংখ্যার ভারে জাতি বিপর্যস্ত। মানুষ যে হারে বাড়ছে সে হারে শিক্ষার হার বাড়ছে না। তাছাড়া যে ধরনের শিক্ষার ফলে মানুষ সম্পদে পরিণত হতে পারে সে ধরনের শিক্ষার সুযোগ খুবই কম। দেশের পেশাভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন : প্রকৌশল, কৃষি, চিকিৎসা, কারিগরি ইত্যাদি জনসংখ্যার অনুপাতে খুবই কম। পক্ষান্তরে ছাত্রছাত্রীরা কর্মমুখী শিক্ষার সুযোগ না পেয়ে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে বেকারত্ব বরণ করছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এবং সে শিক্ষা ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে কোনো অগ্রগতি বয়ে আনতে পারে না। এ জন্য প্রয়োজন সঠিক শিক্ষা প্রণয়ন করা।

জাতীয় জীবনে শিক্ষা : এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রচলিত শিক্ষা জাতীয় জীবনে কার্যকর হয়ে উঠছে না। এখানে শিক্ষার সঙ্গে জীবিকার সংযোগ নেই, জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষার মিল নেই। অথচ শিক্ষাকে যথার্থ কাজে লাগিয়ে বিশ্বের উন্নত দেশগুলো তাদের জনগণকে প্রকৃত সম্পদে পরিণত করে জাতীয় জীবনে সীমাহীন উন্নতি সাধন করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাপান তার কারিগরি জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বিশ্ব অর্থনীতির সর্বোচ্চ আসনে স্থান করে নিয়েছে। যারা প্রকৃতিকে জয় করে প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে নব নব প্রযুক্তির উদ্ভাবন করে দেশ ও জাতির কল্যাণসাধন করছে তারাই আজ সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। তাই মানুষকে সম্পদে পরিণত করতে হলে আমাদের শিক্ষাক্রমকে কর্মমুখী করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে হবে। সাধারণ উচ্চশিক্ষার মোহ কাটিয়ে কারিগরি শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল হলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমে আসবে। ফলে দেশ পাবে উপযুক্ত মানবসম্পদ।

পরিবর্তনযোগ্য সম্পদের জন্যে শিক্ষা : শিক্ষিত জনগোষ্ঠী একটি দেশের প্রাণশক্তি। অশিক্ষিত মানুষ জড় পদার্থের তুল্য। শিক্ষা না থাকলে মানুষ তার মেধাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারে না। পৃথিবীর যেসব দেশ উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছে সেসকল দেশের জনগণ সুশিক্ষিত। আর যেসব দেশের মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে তাদের বেশিরভাগই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। শিক্ষা মানুষের জ্ঞান ও শক্তির দুয়ার খুলে দেয়। ফলে মানুষ সমৃদ্ধ সম্পদে পরিণত হয়, অঢেল সম্পদের অধিকারী হয় দেশ। কিন্তু জনগোষ্ঠী যদি অশিক্ষিত হয় তবে সম্পদের সদ্ব্যবহার তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তারা অশিক্ষিত ফলে অন্যের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়। তাই মানুষকে দক্ষ সম্পদে পরিণত করতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

সমাজ ও সভ্যতার শিক্ষা : শিক্ষা সমাজ ও সভ্যতার প্রধান বাহক। শিক্ষার সুফলেই বর্তমান সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে একটি ভিত্তির ওপর। এ ভিত্তি দুর্বল হলে জাতিও দুর্বল হয়। এছাড়া বর্তমান বিশ্ব প্রতিযোগিতার বিশ্ব। এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে আর প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারলে জীবনে নেমে আসবে অভিশাপ। আর যারা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবে তারা উন্নত বিশ্বের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কারণে মানুষকে শিক্ষার ব্যাপারে অধিক সচেতন হতে হবে। সে সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে কাজের মানুষ করে গড়ে তোলা যায়, তা–ই জীবনমুখী শিক্ষা। এ জীবনমুখী শিক্ষা বা কর্মমুখী শিক্ষা মানুষকে সম্পদে পরিণত করে তোলে।

যা করা উচিত : বাংলাদেশের মানুষ নানা সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত। দেশের এসব সমস্যার প্রেক্ষিতে শিক্ষা তথা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষ জনশক্তির রপ্তানির ব্যবস্থা করে নিজেদের উন্নয়নের জন্য তৎপর হতে হবে। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে তাদের দক্ষতা দেশীয় উৎপাদনশীল শিল্পকারখানায় ব্যবহার করতে হবে, এতে দেশের অধিক উৎপাদিত পণ্য বিশ্ববাজারে বাজারজাত করার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে সম্পৃক্ত হয়ে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে। সরকার প্রদত্ত সুযোগ–সুবিধার যেমন সদ্ব্যবহার করতে হবে, তেমনি আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা দূর করতে হবে। তবেই দেশের ষোলো কোটি মানুষ মানবসম্পদে পরিণত হবে।

উপসংহার : শিক্ষিত মানবগোষ্ঠীই প্রকৃত মানবসম্পদ। মানবসম্পদকে যুগোপযোগী করতে হলে শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য। শিক্ষার আলো ব্যতীত মানুষের অন্তর আলোকিত হয় না। অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশ ও সমাজের বোঝাস্বরূপ। শিক্ষাই

মানুষের মেধাশক্তিকে জাগ্রত ও বিকশিত করে। শিক্ষাই পারে মানুষের কর্ম অক্ষমতা দূর করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে। সুতরাং মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

বিবিধ

১৭০. সড়ক দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার

ভূমিকা

"বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়
দুঃখ–তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিল সান্ত্বনা
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজকের ব্যস্ততম জীবনে সড়ক দুর্ঘটনা হয়ে পড়েছে এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রতিদিন ঘটছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, শিকার হচ্ছে বহু পথচারী। সমগ্র দেশে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে অসংখ্য মানুষ। যারা প্রাণে বেঁচে যাচ্ছে তারাও বিকলাঙ্গ হয়ে অভিশপ্ত জীবনের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। দুর্ঘটনা সৃষ্টি করে স্বজনহারাদের মর্মান্তিক আর্তনাদ। বর্তমানে সড়ক দুর্ঘটনার পরিমাণ এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এর প্রতিকার না হলে মানুষ আর বাইরে থেকে ঘরে ফিরতে পারবে না। তাই জরুরি ভিত্তিতে এর যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

আলোচিত বিষয় : সংবাদপত্রে যে খবরটি প্রতিদিনের অনিবার্য বিষয়, তা হলো সড়ক দুর্ঘটনা। সড়ক দুর্ঘটনাগুলো ঘটে বিভিন্নভাবে। যেমন : বাস ও মিনিবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে অথবা বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে, ট্রাক অথবা বাস–মিনিবাসের সাথে বেবি টেম্পুর ধাক্কায়, বাস–মিনিবাস ও ট্রাক পেছন দিক থেকে রিকশাকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে। এমনকি পায়ে হেঁটে রাস্তা পার হওয়ার সময়ও অনেক পথচারী দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় না। এসব দুর্ঘটনা দেখে মনে হয় মৃত্যু যেন ওঁত পেতে বসে আছে রাস্তার গলিতে–গলিতে।

সড়ক দুর্ঘটনার কারণ : কারণ ছাড়া কোনো কার্য সংঘটিত হয় না। তাই কারণ ছাড়া দুর্ঘটনা ঘটা অসম্ভব। সড়ক দুর্ঘটনার বহুবিধ কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলো অন্যতম—

১. **অপ্রশস্ত পথ :** আমাদের দেশের অপ্রশস্ত পথ অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। ঢাকা থেকে যাতায়াতের সবচেয়ে ব্যস্ত পথ ঢাকা–আরিচা এবং ঢাকা–চট্টগ্রাম হাইওয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রশস্ত না হওয়াতে এ দুটি পথেই দুর্ঘটনা এবং হতাহতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ঘটে। ট্রাক বাস, মিনিবাস, টেম্পো সবরকম দ্রুতগতির যানবাহনের সঙ্গে পদচালিত ভ্যান, রিকশা ঠ্যালাগাড়ি সবই চলাচল করে এই পথে। ফলে দেখা যায় স্বল্প পরিসর পথে দ্রুত গতিসম্পন্ন গাড়ির সঙ্গে মন্থরগতির গাড়ির একত্রে চলাচলের কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে।

২. **অতিরিক্ত গতি এবং ওভারটেকিং :** সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হচ্ছে গাড়িগুলোর গতিসীমা। অসাবধানতার সঙ্গে অতিরিক্ত গতিতে অন্য একটি চলমান গাড়িকে ওভারটেকের চেষ্টাই সড়ক দুর্ঘটনার মূল কারণ। পুলিশ রিপোর্টে ও বেশিরভাগ দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে অতিরিক্ত গতি এবং চালকদের বেপরোয়া গাড়ি চালানো। দূরপথে যাত্রার আগে গাড়িচালকরা কিছু উত্তেজনাপূর্ণ পানীয় গ্রহণ করে স্টিয়ারিং ধরেন এবং গতিবেগ বাড়িয়ে অন্য গাড়িকে টপকে যেতেই তারা আনন্দ পান। ট্রাকে–কোচে পাল্লা দিয়ে সংঘর্ষ, দ্রুত বেগে পুলে ওঠার সময় দুর্ঘটনা নিদর্শন রয়েছে বেশ কয়েকটি। পুলিশ বিভাগ পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে যানবাহনের অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বেপরোয়া গতি।

৩. **ওভারলোডিং :** ওভারলোডিং মানে পরিমিতির বেশি মাল বহন করা। বেশি ওজনের মালামাল বহন করে গতিসীমা ছাড়িয়ে প্রতিটি ট্রাকই এক–একটি যন্ত্রদানব হয়ে ওঠে। এর ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালকরা প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটায়।

৪. **জনসংখ্যার চাপ ও অপ্রতুল পরিবহণ ব্যবস্থা :** দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যানবাহন। এক হিসাবে দেখা গেছে, রাজধানী ঢাকায় বর্তমানে প্রতি কিলোমিটারে ২৪৭টির মতো গাড়ি চলাচল করে। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার আওতাধীন মোট ২২৩১.৩০ কিলোমিটার সড়কে আনুমানিক গাড়ি চলাচল করে ৫ লাখ ৫০ হাজার। শুধু ঢাকা শহরেই নয়, সমগ্র বাংলাদেশেই গাড়ি ও জনসংখ্যা বাড়ছে দ্রুত হারে। ফলে বেড়ে যাচ্ছে দুর্ঘটনার হারও।

৫. **ট্রাফিক অব্যবস্থাপনা :** বাংলাদেশে সড়কপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫ হাজার কিলোমিটার। এসব সড়ক ও মহাসড়কে প্রতিদিন কয়েক লক্ষ যন্ত্রচালিত যানবাহন চলাচল করছে। কেবল রাজধানী ঢাকায় বাস, মিনিবাস, প্রাইভেটকার, জিপ, পিক আপ, ট্রাক, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল মিলিয়ে কয়েক লক্ষ যানবাহন চলাচল করে। এছাড়াও বৈধ–অবৈধ

রিকশার সংখ্যা কয় লক্ষ তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। অস্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালনো, ট্রাফিক আইনের তোয়াক্কা না করা। অতিরিক্ত যাত্রী বা মালামাল পরিবহণ, চলাচলে অনুপযোগী যানবাহন চালানো, যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং, চলন্ত গাড়িতে ওঠাসহ জনগণের অসচেতনতা, উদাসীনতা পঙ্গু এবং ট্রাফিক আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা সমগ্র ট্রাফিক ব্যবস্থাকেই যেন করে রেখেছে। সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা প্রতি ১০ হাজার যানবাহনে বার্ষিক ৫৮ জন, যা উন্নত দেশগুলোর তুলনায় ২৫ গুণ বেশি।

৬. **আইন অমান্য :** সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ আইন অমান্য করে গাড়ি চালানো। এক জরিপে দেখা গেছে ৯১ শতাংশ চালক জেব্রা ক্রসিংয়ে অবস্থানরত পথচারীদের অধিকার আমলই দেয় না। পাশাপাশি ৮৪ ভাগ পথচারী নিয়ম ভেঙে রাস্তা পার হয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ঢাকা শহরে শতকরা ৯৪ জন রিকশাচালক ট্রাফিক আইন ও নিয়মের প্রাথমিক বিষয়গুলোও জানে না। তারা জানে না ডানে বা বাঁয়ে যেতে হলে কী সংকেত দিতে হবে। কোথায় কীভাবে মোড় নিতে হবে। যারা তা জানে তাদের অধিকাংশই ইচ্ছাকৃতভাবে সিগন্যাল অমান্য করে; দ্রুত এবং দিগ্‌বিদিক শূন্য হয়ে গাড়ি চালায়। ফলে দুর্ঘটনা ঘটছে অহরহ।

সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি : সড়ক দুর্ঘটনার ফলাফল কেবল মানুষের মৃত্যুর ক্ষতি নয়, অপূরণীয় আরও অনেক ক্ষতির বোঝা চাপিয়ে দেয় সাধারণের জীবনে। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে অনেক মানুষ প্রাণে বেঁচে থাকে বটে, কিন্তু জীবনের স্বাভাবিক গতি তারা হারিয়ে ফেলে চিরকালের মতো পঙ্গুত্ব, শারীরিক বৈকল্য আর যন্ত্রণা ও বেদনার ভার বহন করে বেঁচে থাকা সেসব মানুষের সংখ্যা আমাদের দেশে কম নয়।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিকার : সড়ক দুর্ঘটনা বর্তমানে আমাদের সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। মানুষ হয়ে পড়েছে নিরাপত্তাহীন। প্রতিনিয়ত নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান জীবন। তাই দেশ, জাতি, সর্বোপরি দেশের জনগণের কল্যাণের জন্য এ সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করা প্রয়োজন। সড়ক দুর্ঘটনারোধকল্পে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে—

১. চালকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রকৃত লাইসেন্সধারীরা গাড়ি চালনা করে কিনা তা খতিয়ে দেখা।
২. চলন্ত অবস্থায় চালকের সাথে কথা না বলা, ওভারটেকিং প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকা।
৩. অতি পুরাতন রিকন্ডিশন গাড়ির ব্যবহার না করা এবং গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখা।
৪. প্রধান প্রধান ও ব্যস্ত সড়কসমূহে পথচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় ফুটপাত ও ওভারব্রিজের ব্যবস্থা করা।
৫. গাড়ির গতিসীমা নিয়ন্ত্রণে রেখে গাড়ি চালানো, সীমালঙ্ঘনকারীদের শাস্তির বিধান বাস্তবায়ন করা।
৬. সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ট্রাফিক পুলিশদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান, যাতে নিরাপত্তা আইনগুলোর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত ও শাস্তির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।
৭. গাড়ি চালানোর সময় ড্রাইভার যাতে মোবাইলে কথা না বলে সেদিকে লক্ষ রাখা।
৮. গাড়ি চালানোর আগে কোনোরকম উত্তেজনাপূর্ণ পানীয় পান না করা।
৯. প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব পরিহার করা।
১০. সকল জনগণকে সচেতন হতে হবে।

উপসংহার : সড়ক দুর্ঘটনা যত জটিল সমস্যা হোক না কেন আমরা সকলে এর সমাধানে এগিয়ে এলে, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে এ থেকে বহুলাংশে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে। এজন্য সকলকে উদ্‌বুদ্ধ হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। তবেই সড়কপথ হয়ে উঠবে নিরাপদ ও আনন্দদায়ক। নিশ্চিত হবে নাগরিক জীবন। তাই কবির ভাষায়—

জীবন চলুক জীবনের নিয়মে
উন্মুক্ত বিহঙ্গো
সুন্দর এ ধরণীতে তাই
বাঁচি একসঙ্গো

১৭১. প্রতিভা

ভূমিকা

মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের চাবিকাঠি প্রতিভার মধ্যে বিদ্যমান বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বিশ্বে যা কিছু মানবকল্যাণে সৃষ্টি হয়েছে তার পেছনে কাজ করেছে প্রতিভাবানদের অবদান। পরিবেশ–পরিস্থিতি যত জটিলই হোক না কেন প্রতিভার জাদুস্পর্শে তা হয়ে ওঠে সহজ–সরল ও কল্যাণের অনুকূল। তাই যুগে যুগে প্রতিভাধর ব্যক্তিরা যেমন মানবসভ্যতা বিকাশে অবদান রেখেছেন তেমনই তারা লাভ করেছেন অপরিসীম সম্মান।

প্রতিভার সংজ্ঞার্থ ও বৈশিষ্ট্য : 'প্রতিভা' বলতে এমন একটি গুণকে বোঝায় যার মাধ্যমে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। প্রতিভা হলো এক অসাধারণ শক্তি—যা অলৌকিক দান বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেকোনো কাজে সাফল্যের উৎস হলো প্রতিভা। প্রতিভার জাদুস্পর্শে লোহা যেমন সোনায় পরিণত হয়, প্রতিভার গুণ তেমনই সব কর্মে বয়ে আনে আশানুরূপ সুফল। সফলতার নির্ভরযোগ্য চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করে প্রতিভাকে বিধাতার বিশেষ দান বলে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ফলে প্রতিভার স্পর্শে যে সফলতা অর্জিত হয় তার মধ্যে অনেকে অলৌকিকতার সন্ধান করেন। জীবনের বন্ধুর পথও প্রতিভার স্পর্শে ফুল বিছানো পথ হয়ে ওঠে। তখন আর কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা থাকে না। প্রতিভাধর ব্যক্তিকে তাই ব্যতিক্রমধর্মী বলে বিবেচনা করা হয়। প্রতিভা তাঁদের সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে তোলে। সাধারণ মানুষের ঘরে জন্ম নিয়েও তাঁরা হন অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী।

প্রতিভার অলৌকিকতা : প্রতিভা এক বিস্ময়কর শক্তি। একে সৃষ্টিকর্তার বিশেষ দান বলে মনে করা হয়। অনেকের মনে এমন ধারণা আছে যে, প্রতিভার মধ্যে অলৌকিকতা বিদ্যমান। এজন্য প্রতিভাধর ব্যক্তি আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অবশ্য তাদের নিজেদের মনে প্রতিভা সম্বন্ধে কী ধারণা রয়েছে তা তলিয়ে না দেখে মানুষ বাইরে থেকে অলৌকিকতার কথাই ভাবে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বখ্যাত দার্শনিক **ভলটেয়ারের** অভিমত হলো, "প্রতিভা বলে কোনো জিনিস নেই। পরিশ্রম করো, সাধনা করো, প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে।" **এডিসনের** মতে, "প্রতিভা এক ভাগ প্রেরণা আর নিরানব্বই ভাগ কঠিন পরিশ্রম।" সত্যিকার অর্থে প্রতিভা কোনো অলৌকিকতা নয়; সাধনা দ্বারাই অর্জিত হয় প্রতিভা। পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে জীবনে সফলতা আসে।

প্রতিভা ও সাধনা : পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে নিজের কর্মস্পৃহাকে সঞ্চালন করতে পারলে সফলতা লাভ করা যায়। সাধনা দ্বারা জীবনের সব বাধাবিঘ্ন দূর হয়। মানুষ যদি নিরলসভাবে চেষ্টা করে যায় তবে যেকোনো কাজে সফল হতে পারে। পৃথিবীতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে নিরন্তর সাধনার মাধ্যমে জীবনকে সার্থক করা সম্ভবপর হয়েছে। বিধাতা প্রতিভা দেননি বলে জীবনে কিছু করা গেল না—এমন উদ্ভট কল্পনা না করে নিবিড় সাধনা করে গেলে সাফল্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাই প্রতিভার কথা মনের ভেতরে না পুষে পরিশ্রমী মানুষ ক্লান্তিহীন পরিশ্রম ও সাধনা করে যায় এবং পরিণামে সফলতার মালা পরিধান করে। সাধনা ছাড়া প্রতিভার কোনো মূল্য নেই।

প্রতিভার বিকাশ : প্রচলিত একটি কথা আছে, "যত্ন ছাড়া রত্ন মেলে না "। তাই প্রতিভা যতটুকুই থাক না কেন, তার যত্ন নিতে হবে। যত্ন না করলে প্রতিভার বিকাশ ঘটে না। অনেক প্রতিভা যত্নের অভাবে বিকশিত হতে পারে না এবং অকালে লোকচক্ষুর অগোচরে ঝরে যায়। সামান্য পরিচর্যার অভাবে বনের ফুলের মতোই মর্যাদাহীন জীবনযাপন করতে হয়। প্রতিভার প্রয়োজনীয় যত্ন বা লালন করতে পারলে তার সুফল পাওয়া কঠিন কিছু নয়। তাই শুধু বিধাতার দান মনে না করে যত্নের মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হবে। তবেই প্রতিভা সত্যিকারের প্রতিভা হিসেবে মানবজীবনের জন্য কল্যাণকর অবদান রাখতে পারবে।

প্রতিভা বিকাশে অনুকূল পরিবেশ : প্রতিভা বিকাশে অনুকূল পরিবেশের অবদান অপরিসীম। উপযুক্ত পরিবেশই প্রতিভা বিকাশের পূর্বশর্ত। এ ধারণা শুধু বস্তুগত নয় বরং তা হতে হবে প্রজ্ঞাময়, যেখানে প্রতিভা–সাধনার উপযুক্ততা খুঁজে পাওয়া যাবে। অনুকূল পরিবেশের হাতছানিকে উপেক্ষা করে কিংবা বঞ্চিত হয়ে কেউ জগদ্বিখ্যাত হতে পারেনি এবং তা সম্ভবও নয়। তাইতো নজরুলকে আমরা দেখি জীবনসংগ্রামের বাঁকে বাঁকে সহস্র পথে পরিবেশের সন্ধান করতে। প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে মাইকেল মধুসূদন খুব বেশি দূর এগোতে পারেননি কিংবা ভিন্ন পরিবেশে সমাদরও পাননি, তাই শেষবেলায় তারই সন্ধান করতে হয়েছে। সুস্থ ও সহনশীল সমাজব্যবস্থা প্রতিভার শুধু মূল্যায়নই করে না, বরং প্রতিভাবানদের অনুসৃত পথ হিসেবেও কাজ করে।

প্রতিভার বিকাশ ও আমাদের সমাজ : বর্তমানে আমাদের দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে পরমুখাপেক্ষিতার দুষ্টচক্রে। এখানে সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্থবির চাকা প্রতিভা বিকাশের প্রতিকূল। সমাজ–সভ্যতার অলংকার–বিবর্জিত এক নষ্ট সময়ের প্রতিনিধিত্ব করছি আমরা। অথচ আমাদের এ দেশ অমিয় সম্ভাবনার এক দেশ, যেখানে প্রতিভাবানদের বেড়ে ওঠার সব উপকরণই উপস্থিত। সমৃদ্ধ অতীত আর সোনালি ভবিষ্যতের মাঝে প্রতিভা বিকাশের অন্তরায় এ অস্থির সময়কে অতিক্রম করে আমরা অবশ্যই এগিয়ে যাব—এ আমাদের দৃপ্ত প্রত্যাশা।

বিশিষ্ট প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ : যুগে যুগে প্রতিভাবানদের দৃপ্ত পদসঞ্চারে সমৃদ্ধ হয়েছে এ পৃথিবী—ঘোর অন্ধকার আর অমানিশাকে দূর করে তারা জ্বালিয়েছেন জ্ঞানের মশাল। শুধু প্রতিভার গুণেই শতসহস্র বছর পূর্বের জ্ঞানীগুণী সমাজসংস্কারকরা আজও প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার সীমাবদ্ধতাকে ডিঙিয়ে প্রতিভাবানদের অবদান ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর প্রতিটি সমৃদ্ধ জনপদে। এমনই কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় প্রতিভাবান হলেন— গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল, ম্যাক্স ওয়েবার, প্লেটো, ম্যাকিয়াভেলি, রুশো, বিজ্ঞানী এডিসন, নিউটন, সমাজসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, হাজী মুহম্মদ মহসীন প্রমুখ।

উপসংহার : প্রতিভা যে একটি বিস্ময়কর শক্তি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রতিভাধর ব্যক্তিরাই যুগে যুগে সভ্যতাকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার পথনির্দেশ করেছেন। কিন্তু প্রতিভার কাছ থেকে কল্যাণকর কিছু আশা করতে হলে তাকেও যত্ন করতে হয়। যত্ন না করলে সত্যিকারের প্রতিভার বিকাশ ঘটে না এবং তার কাছ থেকে কিছু আশাও করা যায় না।

১৭২. আমরা যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই

অথবা, যুদ্ধ নয় শান্তি

অথবা, যুদ্ধমুক্ত বিশ্ব চাই

অথবা, বর্তমান বিশ্ব ও বিশ্বশান্তি

ভূমিকা

'তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে।' —সুকান্ত ভট্টাচার্য

মানুষ সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই ছিল সংগ্রামপ্রিয় ও শান্তিকামী। সে সংগ্রাম করেছে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে সে অন্বেষণ করেছে খাদ্য–বস্ত্র, অন্বেষণ করেছে আশ্রয়। সে চেয়েছে সুখ–শান্তি, চেয়েছে জীবনের নিরাপত্তা। সমাজ গঠনের পর মানুষ চেয়েছে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা। ফলে মানবসভ্যতার সেই প্রত্যুষমুহূর্ত থেকেই গোত্রে গোত্রে, জাতিতে জাতিতে শুরু হয়েছে দ্বন্দ্ব, কলহ, সংঘর্ষ আর রক্তপাত। কবির ভাষায়— "কখনো কি সংগ্রাম ছাড়া সভ্যতার ঘটেছে বিকাশ? প্রতিটি শস্যের শীর্ষে মানুষের রক্ত খুঁজে পাবে।" যুদ্ধের ফলে অনেক রক্ত ঝরেছে। সভ্যতার বেদীমূল যুগে যুগে রক্তস্রোতে হয়েছে রঞ্জিত। আজ বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ বুঝতে পেরেছে যুদ্ধ মানে সভ্যতার বিনাশ, যুদ্ধ মানে মানুষের অস্তিত্বের অবসান। তাই বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে আজ যুদ্ধবিরোধী স্লোগান— যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই। শান্তি প্রতিষ্ঠায় গঠিত হয়েছে জাতিসংঘ। কিন্তু সে জাতিসংঘও আজ পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। বিশ্ব মানবতা যেন কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে উঠেছে

"আর যুদ্ধ নয়, নয়।
আর নয় মায়েদের শিশুদের কান্না
রক্ত কি, ধ্বংস কি, যুদ্ধ— আর না, আর না।"

যুদ্ধের পটভূমি/অতীত যুদ্ধ : যুদ্ধের ইতিহাস থেকে জানা যায় বিগত সাড়ে পাঁচ হাজার বছরে পৃথিবীর বুকে মোট যুদ্ধ হয়েছে সাড়ে চৌদ্দ হাজার, প্রাণ হারিয়েছে চারশ কোটি মানুষ। একসময় যুদ্ধকে মনে করা হতো শৌর্য–বীর্যের প্রতীক। রাজ্যজয়ের নেশায় মেতেছে মানুষ, বীরের সম্মানে ভূষিত হয়ে জীবন ধন্য হয়েছে কত মানুষের। ইতিহাসের কলঙ্কিত নায়ক হয়ে আজও বিভীষিকার দুঃস্বপ্ন হয়ে আছে কত মানুষ। আমরা এট্রিলা, চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লঙ–এর শোণিত–বিলাসের কথা আজও ভুলিনি। ভুলিনি আলেকজান্ডার, হানিবলের বীরত্বগাথা। কত ধর্মযুদ্ধ, কত সাম্রাজ্যের উত্থান আর পতন। পথে পথে কত রক্ত–স্রোত বয়ে গেছে। কত অসির ঝনঝনা, হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষা।

যুদ্ধের কারণ, ধরন ও প্রকৃতি : যুদ্ধ মানবজীবনের এক চরম অভিশাপ। তবুও যুদ্ধ বাধে, মানবসভ্যতা বারবার হয় রক্তাক্ত। এক শ্রেণির ক্ষমতালোভী অত্যাচারী শাসকের খেয়ালখুশির খেশারত দিতেই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। যুদ্ধ দুই ধরনের— আগ্রাসনমূলক ও আত্মরক্ষামূলক। শক্তিমান রাজশক্তি অতীতে বহুবার আপন শক্তি আর দম্ভ প্রকাশের জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। যার কারণে ধ্বংস হয়েছে বহু জনপদ, অগ্নিদগ্ধ হয়েছে কত নগর, বন্দর, গ্রাম, মানুষের বুকের রক্তে ভিজেছে মাটি, আর সেই সাথে জীবিত মানুষের জীবনে নেমেছে অশেষ দুর্ভোগ। ইতিহাস এমন হাজারো যুদ্ধের সাক্ষী হয়ে আছে। যেমন : গ্রিক–ট্রয়ের যুদ্ধ, নেপলিয়ন আলেকজান্ডারের যুদ্ধ। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মানবতাকে করেছে ভূলুণ্ঠিত। আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে আক্রমণ এবং আক্রমণ প্রতিহত করতে মানুষ মুখোমুখি হয়েছে যুদ্ধের। দেশজয়, রাজ্যজয়— সব যুদ্ধের জন্য মানুষের এই সম্প্রসারণশীলতাই দায়ী। প্রেমাসক্ত ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য রাম–রাবণের যুদ্ধ বেধেছিল। পরস্ত্রী সুন্দরী হেলেনকে যুবরাজ প্যারিস অপহরণ করায় গ্রিক–ট্রয়ের যুদ্ধ বেধেছিল। অহমিকা, রাজ্যলাভ, ক্ষমতা, ছলনার কারণে কুরুক্ষেত্রের ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কুরু ও পাণ্ডবের এ যুদ্ধে কুরু বংশ ধ্বংস হয়েছিল। পলাশির যুদ্ধের পেছনে একদিকে ছিল নবাব ও বাঙালি জাতির দেশপ্রেম অন্যদিকে ইংরেজ ও মিরজাফরদের রাজ্য–ক্ষমতার লোভ।

অতি প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার মূল কারণ প্রধানত একটাই বৈষম্য তাহলো ধন–বৈষম্য, বর্ণ–বৈষম্য এছাড়া প্রেম, ধর্মবিস্তার এবং বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা যুদ্ধের অন্যতম কারণ। বর্ণ–বৈষম্যের জন্যই কিছুদিন আগে আমেরিকার লসএঞ্জেলসে ঘটে গেল স্মরণকালের সবচেয়ে বড়ো দাঙ্গা। এই বর্ণবৈষম্যের জন্য আত্মাহুতি দিতে হয়

শ্রীলঙ্কার প্রেমাদাসা ও দেশনায়ককে; এই একই কারণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীকেও দিতে হয় প্রাণ। পার্শ্ববর্তী দেশের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও অরাজকতার সুযোগ নিয়ে এক দেশ অন্য দেশ দখল করার অপচেষ্টা করে। যেমন : ইরানের অভ্যন্তরীণ সুযোগ নিয়ে ইরাক আক্রমণ করে এবং রাশিয়া আফগানিস্তানকে আক্রমণ করেছিল। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো অপেক্ষাকৃত ছোটো রাষ্ট্রের মধ্যে তাদের মতবাদ প্রচার ও অস্ত্র বিক্রির জন্য যুদ্ধের সৃষ্টি করে। যেমন : আমেরিকা ইরাকে তাদের পেশিশক্তির দ্বারা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

বিগত বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা : নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষায় বিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত হয়েছিল দুটো ভয়াবহ মহাযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছিল ১৯১৪ থেকে ১৯১৯–এর মধ্যে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছিল ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫–এর মধ্যে। এ যুদ্ধ অতীতের সব যুদ্ধকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আজও যার ধ্বংস আর ক্ষতির লোমহর্ষক স্মৃতি বহন করে চলেছে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর দুটি। এ যুদ্ধে পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। বিকলাঙ্গ হয়েছে নয় কোটি মানুষ। চারশ বিলিয়ন ডলার সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের চিতাশয্যা রচিত হলেও পৃথিবীর দিকে দিকে সেই অশুভ শক্তি নানা ছদ্মবেশে মানবতার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত— শান্তি, কল্যাণ এবং সম্প্রীতির প্রতীক রাষ্ট্রসংঘের নানা শুভ প্রয়াস সত্ত্বেও বিশ্বের দিকে দিকে চলছে গোপন চক্রান্ত, চলছে পারমাণবিক ও নক্ষত্রযুদ্ধের ভয়াবহ আয়োজন, চলছে স্নায়ুযুদ্ধের উৎকট মহড়া। "শক্তির ললিত বাণী শুনাইছে ব্যর্থ পরিহাস।" পৃথিবীর মনীষীগণের মতে, "আজ গর্বোদ্ধত সাম্রাজ্যবাদের চিতাশয্যা রচিত হলেও গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে দিকে দিকে কায়েম হয়েছে ধনতন্ত্র।"

পরাশক্তির দেশসমূহ : আমেরিকা ও রাশিয়া সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ক্ষুদ্র দেশগুলো এদের হাতের পুতুলমাত্র। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সমৃদ্ধ সুসজ্জিত এদের সেনাবাহিনী। প্রতিরক্ষা খাতে এদের ব্যয় আকাশচুম্বী। রাশিয়া ও আমেরিকার হাতে যে পারমাণবিক অস্ত্র আছে তাতে যেকোনো মুহূর্তে এরা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আমেরিকা যুদ্ধের নতুন নতুন কৌশল প্রণয়ন করছে। নিরাপত্তা পরিষদ মূলত নিষ্ক্রিয়। জাতিসংঘও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না।

আধুনিক সমরাস্ত্রের ভয়াবহতা : পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা আমাদের দোরগোড়ায়। এককেন্দ্রিক আমেরিকা এখন ইরাক, আফগানিস্তান দখল করেছে বহুজাতিক বাহিনীর নাম করে। এককেন্দ্রিক বিশ্বে রাশিয়া দুর্বল হয়ে পড়েছে। আজ বিশ্বে আণবিক বোমার চেয়ে চার হাজার গুণ শক্তিশালী বোমার সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার। বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর হাতে এই মুহূর্তে ভয়ংকর সব মারণাস্ত্র মজুদ আছে। যুদ্ধ এখন জল–স্থল ছাড়িয়ে মহাকাশে, গ্রহে–উপগ্রহে বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনায় ব্যাকুল। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য বিশ্বের দিকে দিকে জন্ম দিচ্ছে উদ্‌বেগের। যেখানে গোটা বিশ্বের নানা অঞ্চল বিভিন্ন বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত, সেখানে সভ্যতা আজ নীরবে প্রত্যক্ষ করছে মার্কিনিদের তাণ্ডব।

যুদ্ধ ও শান্তি : যুদ্ধ ও শান্তি দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থা। শান্তিকামী মানুষের যুদ্ধ কাম্য নয়। কারণ যুদ্ধ একান্ত পাশবিক। হিংসা–বিদ্বেষ, রক্তপাত এসবই পাশবিক গুণ। অথচ মানুষ হয়েও মানুষই পশুদের চেয়ে বেশি যুদ্ধে লিপ্ত। আবার এটাও সত্য মানুষ যুদ্ধকে বেশি ভয় করে এবং যুদ্ধ এড়িয়ে চলে। বিশ্বব্যাপী শান্তি পরিলক্ষিত হয় না। শুধুই যুদ্ধ আর যুদ্ধ। অশান্ত পৃথিবীর কোথাও এতটুকু শান্তি নেই। ফলে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে এবং তাদেরকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলছে। একদিকে যুদ্ধ অন্যদিকে শান্তি প্রচেষ্টা পাশাপাশি এগিয়ে যাচ্ছে। আর এ শান্তি প্রচেষ্টা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই, এখন তা ক্ষুদ্র সেমিনার থেকে শুরু করে জাতিসংঘের টেবিল পর্যন্ত প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

যুদ্ধের পরিণাম : যুদ্ধ মানবজীবনে কখনো সুফল বয়ে আনেনি। প্রভুত্বকামী, সম্প্রসারণবাদী মানুষের ব্যক্তিগত সমরতৃষ্ণা তাতে চরিতার্থ হলেও মানব ভাগ্যে তা বহন করে অপরিসীম দুঃখ ও ক্ষয়ক্ষতির বিপুল খতিয়ান। অনেক জীব ও সামাজিক সম্পদ হানির ফলে, যেমন : পৃথিবীর অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়, তেমনি কত সোনালি শস্য প্রান্তর পরিণত হয় ধূসর মরুভূমিতে, কতবার কলকারখানা, নগর, রাজধানী ও কত সমৃদ্ধ জনপদ পরিণত হয়েছে মৃতদেহের মহাশ্মশানে। সেই সঙ্গে মহামৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে দিকে দিকে সম্প্রসারিত হয়েছে দুর্ভিক্ষের প্রেতচ্ছায়া। এককথায় যুদ্ধ বিশ্বমানবতার জন্য বয়ে আনে এক মহানির্দিষ্ট চরমতম সর্বনাশ। তাই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বলেছিলেন, "তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি বাধে, তার ধ্বংসের ভয়াবহতা এমন হবে যে, চতুর্থ মহাযুদ্ধ মানুষকে লড়াই করতে হবে আদিমতম অস্ত্র পাথর ও ডালের সাহায্যে।"

বিশ্বশান্তি ও মনীষীদের মতামত : বিশ্বের প্রত্যেক মনীষীই চেয়েছিলেন হিংসা নয় পারস্পরিক সহানুভূতিশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহবস্থানই এ বিশ্বকে শান্তিময় স্বর্গরাজ্যে পরিণত করতে পারে। ফরাসি দার্শনিক রোম্যাঁ রোলা বলেন— "বহু জাতিকে

আমরা স্বীকার করি না; আমাদের কাছে জাতি এক, সে জাতি অনন্য ও বিশ্বব্যাপী। ...এ জাতির প্রত্যেকটি মানুষ আমাদের ভাই।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যুদ্ধকে বলেছিলেন, "এ আমার এ তোমার পাপ।" এ পাপ থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল—

"এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ,
চাহিনে করিতে বাদ প্রতিবাদ।"

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা; সচেতনতা শুরু ও শান্তির অন্বেষণ : পরাশক্তিদ্বয় বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজনীয়তা কিছুটা অনুভব করতে শুরু করে। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ গঠিত হয়। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তারা অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ১৯৯২ সালে এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে বিশ্ব কিছুটা শঙ্কামুক্ত হয়। জাতিসংঘের পূর্ণ বাস্তবায়ন, আঞ্চলিক সহযোগিতা করা সকল রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হওয়া উচিত। কিন্তু জাতিসংঘ তার যথার্থ/ঠিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। জাতিসংঘ পরিণত হয়েছে কতিপয় রাষ্ট্রের হাতের পুতুলে। কবি শামসুর রাহমানের ভাষায়— "জাতিসংঘ পরিণামহীন দেবতার মতো ডানা ঝাপটায় শূন্যতায়।"

আমাদের করণীয় : বিশ্বের বুকে যুদ্ধের ধ্বংসলীলার অবসান ঘটিয়ে পার্থিব মানুষের জন্য শান্তির বার্তা নিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজন চিত্তের মুক্তি। যুদ্ধের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের যা করণীয় তা নিম্নরূপ—

(ক) মানবিক মূল্যবোধ চর্চা, তথা রাজনৈতিক সচেতন হওয়া,
(খ) পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান,
(গ) রাষ্ট্রের জনগণের মৌলিক চাহিদাপূরণ,
(ঘ) প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা,
(ঙ) আঞ্চলিক ও মহাদেশীয় সহযোগিতা সৃষ্টি,
(চ) জাতিসংঘের ঘোষণা বাস্তবায়ন,
(ছ) পারমাণবিক অস্ত্র নিরোধ চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপসংহার : যুদ্ধ মানেই মৃত্যুর বিভীষিকা, যুদ্ধ অর্থই দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ মানবমহিমাকে করে ক্ষত-বিক্ষত, যুদ্ধ মানুষের জীবনে এনে দেয় অনাহার, অর্ধাহার ও অবিচার। সভ্যতাকে দেয় ধর্ষিতার রূপ, শিক্ষাকে করে দেয় স্তব্ধ, মানবতাকে করে অপমান। তাই সমগ্র বিশ্বের মানুষকে একত্রিত হতে হবে এ কলঙ্ক মোচনের জন্য। সত্যিই মানুষ আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তায় আত্মবিলুপ্তির গোপন চক্রান্তে লিপ্ত। যুদ্ধ কখনো মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই আজ পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন সমঝোতা ও সম্প্রীতির। আমরা চাই শান্তি। ধ্বংসাত্মক এটম নয়, আমরা চাই শান্তির এটম; যুদ্ধরত রোবোট নয়, আমরা চাই শান্তির রোবোট। কবির ভাষায়—

"এর চেয়ে এক কাজ কর, যদি পার এটমের সুপ খাও
রোবোটের ঘাড়ে চড়ে নতুন এক পৃথিবী বানাও।"

তাই আর যুদ্ধ নয়, শান্তিতে মানুষ বসবাস করুক, আগামী প্রজন্মের জন্য সুখীসমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ে উঠুক এটাই আজকের পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের অন্তরের প্রার্থনা।

১৭৩. শিশুশ্রম

[দি. বো. '১৩; য. বো. '০৩]

ভূমিকা

গহিন গাঙে সুজন মাঝি বাইছে নাও,
বাইতে দাও।
নরম রোদে শ্যামা পাখি নাচ জুড়েছে ,
নাচতে দাও।
শিশু, পাখি, ফুলের কুঁড়িত সবাইকে আজ
বাঁচতে দাও।

শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আজ যারা শিশু আগামী দিনে তাদের হাতে ন্যস্ত হবে দেশ পরিচালনার গুরুদায়িত্ব। কিন্তু নানা কারণে শিশুরা আজ উপযুক্ত পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত। জীবিকার প্রয়োজনে তারা বাধ্য হচ্ছে হাড়ভাঙা শ্রমদানে।

শিশুশ্রমের কারণ : নানা কারণে শিশুশ্রম সমাজে শিকড় গেড়ে বসে। এখনো আমাদের দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা শতকরা প্রায় সত্তর ভাগ। এরা দারিদ্র্যের জ্বালায় নিজেদের সন্তানদের শিশু-শ্রমিকের বৃত্তি নিতে বাধ্য করে। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সম-আর্থিক বণ্টনের প্রতিক্রিয়ার ফলে শিশু-শ্রমিকের সমস্যা জটিল আকার

ধারণ করছে। রাজনৈতিক বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িকতা, উদ্‌বাস্তু জীবনের ছিন্নমূল, উচ্ছৃঙ্খল পিতা–মাতার নৃশংস আচরণ, পিতা–মাতার মৃত্যু বা পঙ্গুত্ব ইত্যাদি কারণে শিশুশ্রমের প্রবণতা দিনদিন বেড়েই চলেছে। আমাদের দেশে পিতৃ–মাতৃহীন শিশুরাই অধিক হারে শিশুশ্রমে লিপ্ত হয়। বেঁচে থাকার জন্য অনন্যোপায় হয়ে তারা এ পথে পা বাড়ায়। বিদ্যালয়ের প্রতি অনীহাও আমাদের দেশে শিশুশ্রমের একটি অন্যতম কারণ।

বাংলাদেশে শিশুশ্রমের প্রকৃতি : আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং ইউনিসেফ পরিচালিত এক জরিপ অনুযায়ী বিভাগীয় শহরাঞ্চলে প্রায় ৩০১, পুরাতন জেলা শহরে ২০১, নতুন জেলা শহরে ১৮৭, থানা সদরে ১৩৩, পার্বত্য এলাকায় ২৩ এবং পল্লি এলাকায় ৯৪ ধরনের কাজে শিশুরা শ্রম দিচ্ছে। যেমন : কুলি, হকার, রিকশা শ্রমিক, ফল বিক্রেতা, আবর্জনা সংগ্রাহক, ইট–পাথর ভাঙা, হোটেল শ্রমিক, বুননকর্মী, মাদক বাহক, বিড়ি শ্রমিক, ঝালাই কারখানার শ্রমিক, বেডিং স্টোরের শ্রমিক ইত্যাদি। তাছাড়া 'ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম' শীর্ষক এক সমীক্ষায় দেখা যায়, কিছু বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও শিশুরা নিয়োজিত রয়েছে। যেমন : ইলেকট্রিশিয়ান, রাসায়নিক দ্রব্য, উৎপাদনের কারখানায় কাজ, মাদকদ্রব্য বিক্রি ও বহন ইত্যাদি। সমুদ্র–বন্দর এলাকায় শিশু–শ্রমিকদের জোর করে মাফিয়া চক্রান্তে লিপ্ত করানো হয়। এ উদ্দেশ্যে প্রচুর সংখ্যক শিশু অপহরণ করে পার্শ্ববর্তী দেশসহ অন্যান্য দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। চুরি, ছিনতাই, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি কাজে এদের লাগিয়ে এক শ্রেণির সমাজবিরোধী লোক প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। বর্তমানে পোশাক শিল্পের হাড়ভাঙা খাটুনিতেও শিশুদের নিযুক্ত করা হচ্ছে। তাছাড়া শহরবাসী ভদ্রলোকদের বাসার কাজে শিশুরাই প্রধান শ্রমিক হিসেবে প্রাধান্য পায়।

শিশুশ্রম ও নৃশংসতা : শিশুদের শ্রমিক বৃত্তিতে নিয়োগ প্রাচীনকাল থেকেই চলে এসেছে। বর্তমানে সভ্যদেশসমূহে মানুষ যেখানে বিবেকশক্তি ও স্বাধীনতাবোধের বড়াই করে, সেখানেও রয়েছে শিশুশ্রমের মতো মানবাত্মার অপমান ও নির্লজ্জতার উদাহরণ। বিশ্বের সকল শিশুশ্রমিকই মালিকপক্ষের অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়। অধিকারবঞ্চিত শিশুরা তাদের শ্রমকর্তা কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক উভয়ভাবেই নির্যাতিত হয়। দিনভর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও তারা দুইবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। অদক্ষ শ্রমিক বলে তাদের নেই নির্দিষ্ট মজুরি; অথচ আছে অকথ্য নিপীড়ন। সামান্যতম অমনোযোগের অভিযোগে তাদেরকে লাথি ও বেতের ঘা সহ্য করতে হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে বিত্তবানদের গৃহে শিশু–নির্যাতন শুরু হয়েছে। এসকল গৃহে কাজের মেয়ে হিসেবে যারা কাজ করে তাদের সামান্য অপরাধের জন্য গৃহিণী বা গৃহস্বামী অমানবিক শাস্তি দিয়ে থাকে। প্রায় প্রতিদিনই এ ধরনের নৃশংস ঘটনা খবরের কাগজে প্রকাশ পাচ্ছে। এছাড়াও কল–কারখানাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত শিশু শ্রমিকেরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

শিশুশ্রমের পরিণতি : শিশুশ্রম একটি মানবতাবিরোধী কাজ। শুধু বাংলাদেশই নয়, যেকোনো দেশের জন্যই এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কেননা, যে শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ স্রষ্টা, ধীরে ধীরে শিশুশ্রমের কারণে তারা হয়ে ওঠে অযোগ্য এবং অকর্মণ্য। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা সামাজিকভাবে হয়ে পড়ে পঙ্গু। অতিরিক্ত শ্রমদানের ফলে শিশুদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, তারা ভোগে অপুষ্টিজনিত নানা রোগে। ফলে শিশুরা অভিশপ্ত জীবন নিয়ে সমাজে বেড়ে ওঠে।

শিশুশ্রম বন্ধে আমাদের করণীয় : বাংলাদেশে "শিশু ও নারী নির্যাতন আইন–১৯৯৫" বলবৎ থাকলেও এর মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়নি। শুধু, আইন দিয়েই সকল সমস্যার বাস্তব সমাধান সম্ভব নয়। উপযুক্ত শিক্ষার প্রসার এবং দারিদ্র্য বিমোচন ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য সরকারকে শিশু শ্রমিকদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি সমাজকল্যাণমূলক সংস্থাগুলোকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। শিশুশ্রম বন্ধে জনগণকে সচেতন হতে হবে। এক কথায়, যে প্রকারেই হোক বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে শিশুশ্রম রোধ করতে হবে।

উপসংহার : জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিশুশ্রম নির্মূল করা উচিত। শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে বিশ্ব মানবতা আজ সোচ্চার। বিশ্ব শিশু দিবসে শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতি বছর শিশুশ্রম বন্ধের আহ্বান জানানো হয়। আন্তর্জাতিক বিশ্বের সচেতন মানুষেরা শিশুশ্রমের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে। এ সমস্যার সমাধানে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সরকারও সদা সচেতন। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত শিশু অত্যাচার বন্ধ করা। তাদের সুযোগ–সুবিধা প্রদান করা। কবির ভাষায়–

এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস।।

১৭৪. কিশোর অপরাধ: কারণ ও তার প্রতিকার

ভূমিকা

আধুনিক বিশ্বের অসংগঠিত সমাজ ব্যবস্থায় দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়ণের নেতিবাচক ফল হলো কিশোর অপরাধ। পরিবার কাঠামোর দ্রুত পরিবর্তন, শহর ও বস্তির ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ এবং সমাজজীবনে বিরাজমান নৈরাজ্য ও হতাশা কিশোর অপরাধ বৃদ্ধির প্রধান কারণ। অপসংস্কৃতির বাঁধ ভাঙা জোয়ারও এজন্য অনেকাংশে দায়ী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন– 'তের চৌদ্দ বছরের মতো এমন বালাই আর নেই'। এ বয়সের ছেলেমেয়েদের সামনে থাকে অদম্য আশা আর জীবন জগৎ সম্পর্কে থাকে অতিকৌতূহল। অনেক সময় প্রতিকূল পরিবেশের কারণে আশাভঙ্গের বেদনায় হতাশার হাত ধরে নৈরাশ্যের অন্ধকারে পতিত হয় তাদের জীবন। এতে কিশোর বয়সিরা ধীরে ধীরে অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে। কিশোর অপরাধ দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

কিশোর অপরাধ কী : কিশোর বয়সিদের দ্বারা সংঘটিত সমাজে বিদ্যমান মূল্যবোধ ও নিয়মনীতি বিরোধী কাজই কিশোর অপরাধ। তবে সামাজিক মূল্যবোধ রাষ্ট্র, শহর, গ্রাম বা এলাকাভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এক সমাজে যে কাজ বা আচরণ মূল্যবোধ ও নীতিবিরোধী অন্য সমাজে তা নাও হতে পারে। অপরাধ বিজ্ঞানী বিসলার বলেছেন– 'কিশোর অপরাধ হলো প্রচলিত সামাজিক নিয়মকানুনের উপর অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোরদের অবৈধ হস্তক্ষেপ।' আবার অপরাধ বিজ্ঞানী বার্ট বলেছেন– 'কোনো শিশুকে তখনই অপরাধী মনে করতে হবে যখন তার অসামাজিক কাজ বা অপরাধ প্রবণতার জন্য আইনগত ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়ে। মূলত বিশেষ ধরনের অস্বাভাবিক ও সমাজবিরোধী কাজ যা কিশোর–কিশোরীরা সংঘটিত করে তাকে কিশোর অপরাধ বলে।

কিশোর অপরাধের বৈশিষ্ট্য : কিশোর–কিশোরী ও অপ্রাপ্তবয়স্করা চিন্তাভাবনা না করে আবেগের বশবর্তী হয়ে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ দ্বারা অতিসহজে ও স্বল্প সময়ে প্রভাবিত হয়। তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে, কৌতূহলবশত বা নিজেকে জনগণের সামনে প্রকাশ করার জন্য অপরাধ করে থাকে। কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায়। যেমন–

- কিশোর বা অপ্রাপ্ত বয়স্করাই এ ধরনের অপরাধ করে।
- প্রতিকূল পরিবেশে সামাজিক সংগঠন ও কার্যাবলির সাথে তাল মেলাতে না পেরে তারা সমাজবিরোধী কাজে অংশ নেয়।
- এটি সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়ম–শৃঙ্খলার পরিপন্থি কাজ করে।
- কিশোররা নিজের চিন্তা ও কাজকে সঠিক বলে প্রাধান্য দেয়।
- অতি উৎসাহ ও কৌতূহলের বশে উদ্দেশ্যহীনভাবে অসামাজিক কাজ তথা অপরাধ করে।
- যথাসময়ে কিশোররা সংশোধন না হলে কালক্রমে অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে।

কিশোর অপরাধের ধরন ও প্রকৃতি : সামাজিক সমস্যা হিসেবে এবং অপরাধ জগতে কিশোর অপরাধ ক্রমবর্ধমানশীল। গ্রাম অপেক্ষা শহরে কিশোর অপরাধের ব্যাপকতা ও গভীরতা বেশি। বাংলাদেশের সার্বিক দিক বিবেচনায় কিশোর অপরাধ বা অপরাধীকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. শহর এলাকার কিশোর অপরাধী, ২. গ্রাম এলাকার কিশোর অপরাধী, ৩. নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কিশোর অপরাধী, ৪. উচ্চবিত্ত পরিবারের কিশোর অপরাধী।

আর এসকল কিশোর অপরাধীদের মধ্যে প্রধানত যেসব অপরাধ লক্ষ করা যায় তা হলো– জুয়া খেলা; নেশা করা; খেলার মাঠ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মারামারি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি; বাস, ট্রেন ও সিনেমা হলে বিনা টিকিটে যাওয়া, পরীক্ষায় নকল করা, এসিড নিক্ষেপ, রাস্তাঘাটে ছিনতাই, মারপিট, অন্যের বাগানের বা ক্ষেত্রের ফল ও ফসল চুরি করা ইত্যাদি।

কিশোর অপরাধী কারা : কিশোর অপরাধী হলো সেই সকল কিশোর–কিশোরী যারা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা অনুকরণ করতে না শিখে সমাজ বিরোধী চিন্তা ও কাজে অংশ নেয়। বয়সের দিক থেকে সাধারণ ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সি কিশোর কিশোরী দ্বারা সংঘটিত অপরাধই কিশোর অপরাধ। তবে বিভিন্ন দেশে বয়সের তারতম্য রয়েছে। কোনো কোনো দেশে ১৩ থেকে ২২ বছর আবার কোনো দেশে ১৬ থেকে ২১ বছর বয়সি কেউ অপরাধ করলে কিশোর অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হয়। জাপানে ১৪ বছরের, ফিলিপাইনে ৯ বছরের এবং ভারত, শ্রীলংকা ও মিয়ানমারে ৭ বছরের কম বয়সি শিশুদের অপরাধ শাস্তিযোগ্য নয়। বাংলাদেশে ১৮ বছরের কেউ অপরাধ করলে কিশোর অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে। কিশোর অপরাধীদের আচরণ ও কাজকে কম অপরাধমূলক ভাবা হয় ও অপরাধের কারণকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কৃত অপরাধের জন্য শাস্তিপ্রদান না করে সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়।

কিশোর অপরাধের কারণ : শিল্পোন্নত ও পুঁজিবাদী সমাজের মতো বর্তমানে স্বল্পোন্নত সমাজেও কিশোর অপরাধের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাধীনতা–উত্তর বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের প্রবণতা বাড়লেও সাম্প্রতিককালে এ প্রবণতা অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজে বিদ্যমান হতাশা, নৈরাজ্য আর দারিদ্র্য কিশোর অপরাধ সৃষ্টির প্রধান কারণ। শহরের দূষিত পরিবেশে মানবেতর জীবনযাপন ও অশিক্ষা, ক্ষুধা, দারিদ্র্য কিশোরদের চুরি, ছিনতাই, পকেটমারের মতো অপরাধমূলক কাজ করতে বাধ্য করে। মূলত সামগ্রিকভাবে কিশোর অপরাধের প্রধান কারণগুলো হলো– ভগ্ন পরিবার ও পিতামাতার দাম্পত্য কলহ যেখানে আবেগ, ভালোবাসা ও নিরাপত্তার অভাব রয়েছে, চরম দারিদ্র্য ও পিতামাতার অবহেলা, শিশুশ্রম ও জোরপূর্বক শিশুকে কাজে বাধ্য করা খারাপ সঙ্গীর সাথে চলাফেরা করা, পারিবারিক অস্থিতিশীলতা ও অসম্প্রীতি, পিতা বা মাতার পুনর্বিবাহ, মা কর্মজীবী হওয়ায় পর্যাপ্ত শিশুযত্নের অভাব, অতিরিক্ত শাসন, রক্ষণশীলতা ও বাবা–মার পরস্পরবিরোধী মানসিকতা, স্বার্থপর ও ফন্দিবাজ রাজনীতিবিদ কর্তৃক কিশোরদের পিকেটিং–এ ব্যবহার, সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাব এবং অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ইত্যাদি।

সমাজজীবনে কিশোর অপরাধের নেতিবাচক প্রভাব : আজকের কিশোর–কিশোরীরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই কিশোর অপরাধের প্রবণতা দেশ, জাতি ও সমাজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। কিশোর অপরাধের প্রভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শান্তি–শৃঙ্খলার অবনতি ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্ট হয়। শিশু–কিশোর দ্বারা রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে ছিনতাই, চাঁদাবাজি, পকেটমারের মতো অপরাধ জনগণের আর্থ–সামাজিক নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটায়। ছাত্রী অপহরণ, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি কারণে স্কুল–কলেজগামী ছাত্রীরা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। কিশোর অপরাধের কারণে সমাজে মাদকাসক্তি ও যৌনাচার বেড়ে চলেছে যা সমাজজীবনে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। এছাড়া কিশোরদের দ্বারা পিতা–মাতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের অবাধ্যতা, অশোভন আচরণ, পারিবারিক জীবনে শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে। সর্বোপরি কিশোরদের অর্থবহ জীবনকে ধ্বংস করে জাতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ সংশোধনমূলক কার্যক্রম : বর্তমানে বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ সংশোধনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান আছে। বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ সংশোধনের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৪৯ সালে ঢাকায় Brostal School প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে কিশোর আদালত এবং টঙ্গীতে কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এ ছাড়া কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য কিশোর হাজত, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রবেশন, প্যারোলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এসব প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনের ওপর গুরুত্বারোপ করে অপরাধী কিশোরদের সমাজের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনা। আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিশোরদের সংশোধনের ব্যবস্থা করাই এ সকল কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

কিশোর অপরাধ মোকাবিলার সম্ভাব্য উপায় : কিশোর অপরাধের ভয়াবহ পরিণতি উপলব্ধি করে আমাদের সকলের উচিত কিশোরদের অন্ধকার থেকে আলোর জগতে ফিরিয়ে আনা। কিশোর অপরাধ সৃষ্টিতে শুধু কিশোররাই দায়ী নয়। এজন্য দায়ী আমাদের পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থা, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা। তাই সরকারি প্রচেষ্টা ও আইন–শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। কিশোর অপরাধ মোকাবিলায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে :

- কিশোর অপরাধ মোকাবিলায় সর্বপ্রথম এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জেনে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
- কিশোরদের সুষ্ঠু আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে যত্নবান হতে হবে।
- সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র শিশু কিশোরদের জন্য সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিশু–কিশোরদের মানসিক বিকাশে পিতামাতাকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সন্তানের ভালোলাগার ও মন্দলাগাকে বিচার করতে হবে।
- কিশোরের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের জন্য গঠনমূলক পারিবারিক, সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
- দেশে পর্যাপ্ত কিশোর অপরাধ সংশোধন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।
- স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমগুলো শিশুর মানসিক বিকাশের উপযোগী কার্যক্রম ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে।

উপসংহার : কৈশোরকাল মানুষের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের সময়। এ সময় থেকেই মানুষ অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে পরিপূর্ণ জীবন গড়ে তুলতে শুরু করে। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশের কারণে অকালেই সে আশাহত হয়। হতাশা আর নৈরাজ্য জীবনকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়। কিশোরের সুপ্ত প্রতিভা অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় তারা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তাই যেসকল বহুমুখী কারণে কিশোর অপরাধের সৃষ্টি তা রোধ করতে হবে। আমাদের বর্তমান কিশোরদের প্রকৃত মানুষ ও নিরপরাধী হিসেবে গড়ে তুলতে পারলেই জাতির উন্নতি সম্ভব। কিশোর অপরাধ আগেও ছিল, বর্তমানেও আছে। তবে দিন

যত যাচ্ছে তাদের অপরাধগুলো ক্রমেই হিংস্র, নৃশংস ও বিভীষিকাপূর্ণরূপে দেখা দিচ্ছে। খুন, ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার মতো হিংগ্র ধরনের অপরাধ করার প্রবণতা উদ্‌বেগজনকভাবে বেড়ে গেছে এবং এখনো বেড়েই চলেছে। সংঘবদ্ধভাবে প্রকাশ্যে দিনের আলোয় নৃশংসভাবে খুন করা হচ্ছে। পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষার লক্ষ্যে এখনই এর লাগাম টেনে ধরা দরকার। না হলে ভবিষ্যতে এটি খুব ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। *[তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়াদ]*

১৭৫. কিশোর গ্যাং : কারণ ও সমাধানের উপায়

ভূমিকা

আমাদের সমাজে নতুন সংকটের নাম কিশোর! বিস্ময়কর হলেও সত্যি। যুক্তরাজ্যভিত্তিক সাময়িকী 'ল্যানসেট চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডলসেন্ট হেলথ' একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করে। এতে বলা হয়েছে, কৈশোর এখন শুরু হয় ১০ বছর বয়সে। যে কৈশোর দশ বছর থেকে শুরু হয়, সেই বয়স এখন আমাদের কাছে আতঙ্ক! পত্রিকার পাতা থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, গলির মোড় থেকে চায়ের দোকান, গণপরিবহণ থেকে টকশো সব জায়গায় 'কিশোর গ্যাং' বা 'গ্যাং কালচার' নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এই 'কিশোর গ্যাং' বা 'গ্যাং কালচারে' জড়িতদের বয়স হচ্ছে ১০–১৭ বছর।

কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের বৈশিষ্ট্য : কী করে বুঝবে যে, কারা কিশোর গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত আছে? সাধারণত প্রতিটি গ্যাংয়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এমন একটি নির্দিষ্ট নাম ও লোগো থাকে। গ্যাং সদস্যদের মধ্যে সেই নাম ও লোগো শরীরে ট্যাটু করার অথবা দেওয়ালে লিখনের প্রবণতা রয়েছে। তারা নির্দিষ্ট একটি এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে এবং সর্বদা আধিপত্য ধরে রাখার চেষ্টা করে। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গ্যাংয়ের প্রচার–প্রচারণার নেটওয়ার্ক রয়েছে। তারা গ্যাং সংগঠন নিয়ে গর্ববোধ করে এবং গ্যাং সদস্য হিসাবে পরিচিত হয়ে তৃপ্তি অনুভব করে। ক্ষেত্রবিশেষে গ্যাংয়ে একই রকমের জামাকাপড় পরার স্টাইল দেখা যায় এবং কেউ কেউ অথবা সবাই জুয়েলারি ও অলংকার পরিধান করে থাকে। এছাড়া আধিপত্য বিস্তারের জন্য তারা অস্ত্র যেমন : ছুরি, রামদা, হকিস্টিক, বন্দুক ইত্যাদি সংগ্রহে রাখে।

কিশোর গ্যাং গড়ে ওঠার কারণ : সমাজব্যবস্থা, পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাহচর্য, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রের নানাবিধ উপকরণ গ্যাং কালচার তৈরির উপাদান হিসাবে কাজ করে। একই কমিউনিটির ভেতর যখন দরিদ্র শ্রেণি ও উচ্চবিত্তের বসবাস থাকে, তখন উচ্চবিত্তের জীবনযাত্রা দেখে দরিদ্র শ্রেণির সন্তানরা নিজেদের ভাগ্যকে বঞ্চিতদের ভাগ্যের সঙ্গে তুলনা করে হতাশা অনুভব করে। আবার কমিউনিটিতে যখন অস্ত্র ও বিশেষ করে মাদকের দৌরাত্ম্য থাকে তখন গ্যাংয়ের অস্তিত্ব থাকে এবং বিপরীতে আরেকটি গ্যাং তৈরি হতে পারে অথবা ওই গ্যাংয়ের বিদ্রোহী, দলছুট বা বহিষ্কৃত সদস্যরা আরেকটি গ্যাং তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ কমিউনিটিতে যখন গ্যাংয়ে যোগদান করার অভ্যাস অথবা প্রথা হয়ে দাঁড়ায়, তখন একজন অপরকে বা সিনিয়রকে দেখে গ্যাং সদস্য হতে উৎসাহী হয়। কখনো ভিনদেশি কালচারের অনুপ্রবেশে অনুকরণপ্রবণশীল কিশোররা সহিংসতা সম্পর্কে জানতে পারে। তখন সহিংসতায় আকৃষ্ট হয়ে ওই কালচার রপ্ত করতে চায় কিশোররা। তাই পরিবারের করণীয়টা এখানে বড়ো হয়ে দাঁড়ায়।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব : পারিবারিক পরিবেশ অনেক ক্ষেত্রেই এ সমস্যার পেছনে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখে। পারিবারিক বিশৃঙ্খলা অথবা ডিভোর্সের কারণে ভেঙে যাওয়া পরিবারে সন্তানদের মাঝে হতাশা তৈরি হয়। নেশাগ্রস্ত পরিবার যেখানে মাদক/নেশাজাতীয় দ্রব্যের নিয়মিত আসর বসে, সেখানে কম বয়সে অপরাধে জড়িয়ে যাওয়া খুবই নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অনেক সময় দেখা যায়, পরিবারের কেউ গ্যাং সদস্য থাকলেও কিশোররা এ পথে আসতে উৎসাহিত হয়। পরিবারের কোনো সদস্য বা পিতা–মাতা রোল মডেল হতে ব্যর্থ হলে অথবা পিতা–মাতার কর্ম অদক্ষতা ও বেকারত্বের ফলে আর্থিক উপার্জনের জন্য সন্তানদের মাঝে গ্যাং সদস্য হওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। আবার কখনো কখনো কর্মজীবী বা ব্যবসায়ী পিতা–মাতার পক্ষে সন্তানকে সময় দেওয়া দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে গ্যাং তৈরির মধ্য দিয়ে সন্তান একাকিত্ব ও হতাশা দূর করার চেষ্টা করে। একাধিক বিবাহ এবং পারিবারিক অশান্তিও গ্যাং তৈরির কারণ হতে পারে। শিক্ষাব্যবস্থাও এ কালচার গড়ে ওঠার পেছনে কিছুটা দায়ী। যেমন : দুর্বল ছাত্রদের মধ্যে গ্যাং গড়ে তোলার প্রবণতা থাকে। ক্রমাগত শিক্ষকের বঞ্চনা, খারাপ ফলাফল, সহপাঠী দ্বারা বিদ্রুপের শিকার থেকে হতাশা তৈরি হতে পারে। হতাশা থেকে পরে গ্যাংয়ে যোগদানের প্রবণতা তৈরি হতে পারে। স্কুলের পাঠদান প্রক্রিয়া কোনো কারণে ব্যাহত হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা জাগ্রত হতে পারে। ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে মাদককে কেন্দ্র করে আড্ডা ইত্যাদি তৈরি হয়, যা থেকে গ্যাংয়ের উদ্ভব হতে পারে। বন্ধু–বান্ধবের যদি অপরাধপ্রবণতা থাকে বা তারা অপরাধী চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে, মাদক সেবনের প্রবণতা থাকে বা মাদক সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহলে কিশোর গ্যাংয়ে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এভাবে জড়িত হওয়ার

কারণের মধ্যে আরও রয়েছে– ব্যক্তিপর্যায়ে অপরাধ জগতে যুক্ত হওয়ার মানসিকতা, দুর্বল চিত্তের ব্যক্তিত্ব, হিরোইজম দেখানোর প্রবণতা, অনুকরণপ্রবণতা, অল্প বয়সে যৌন আসক্তি বা যৌন আসক্তি হওয়ার ক্ষেত্র ও সুযোগ তৈরি হওয়া।

দেশে কিশোর গ্যাংয়ের বর্তমান অবস্থা : মূলত ২০১৭ সালে উত্তরায় আদনান হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে কিশোর গ্যাংয়ের সহিংসতার নির্মমতা জনসম্মুখে উন্মোচিত হয়। ৬ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে উত্তরার ১৩ নম্বর সেক্টরের ১৭ নম্বর সড়কের ওপর আদনান কবিরকে (১৪) সংঘবদ্ধ গ্যাং মারাত্মকভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। তখন তিনটি গ্যাংয়ের (ডিসকো বয়েস, বিগবস্ ও নাইনস্টার) মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল। এরই ধারাবাহিকতায় আদনানকে ধারালো অস্ত্র ও হকিস্টিক দিয়ে আঘাত করা হয়। ফলে আদনানের মৃত্যু হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে র‍্যাব–১, উত্তরা, ঢাকার একটি আভিযানিক দল উত্তরার ১৪ নম্বর সেক্টরের ১৭ নম্বর সড়ক এলাকায় একটি অভিযান পরিচালনা করে চাঞ্চল্যকর আদনান হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত ৩ নম্বর আসামি এবং ডিসকো বয়েস গ্যাং গ্রুপের দলনেতাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। পরে মূল আসামি তালাচাবি রাজুকেও র‍্যাব গ্রেফতার করেছিল। আমরা জানি, র‍্যাবের হাতে এ সময় একের পর এক গ্যাং ধরা পড়েছে এবং তাদের ধরতে মাঝে মাঝে অভিযান পরিচালনা করেছিল র‍্যাব। ২০১৭ সাল থেকে অদ্যাবধি র‍্যাব ২৭২ জন কিশোর গ্যাং সদস্যকে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। শুধু হত্যাকাণ্ডের পৃথক চারটি ঘটনায় মোট ২০ জনকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। এরপর র‍্যাব ২০১৯ সালে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে মাদক সেবন, ছিনতাই ও চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের সংশোধনাগারে প্রেরণ করেছিল, যা সে সময় দেশে আলোচনার শীর্ষে ছিল। পুলিশ ও র‍্যাব সূত্র বলছে, রাজধানীতে এখন অন্তত ৭০ থেকে ৭৫টি কিশোর গ্যাং সক্রিয় রয়েছে। এদের সদস্য সংখ্যা দেড় থেকে দুই হাজার। রাজধানীর উত্তরা, মোহাম্মদপুর, বৃহত্তর মিরপুর, পুরান ঢাকার লালবাগ ও হাজারীবাগ এলাকায়ই মূলত কিশোর গ্যাং ছড়ানো–ছিটানো (২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১)। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের তথ্যমতে, কেন্দ্রে থাকা কিশোরদের ২০ শতাংশ হত্যা এবং ২৪ শতাংশ নারী ও শিশুনির্যাতন মামলার আসামি। ২০২০ সালের প্রথম ছয় মাসে ৮২১টি মামলায় গ্রেফতারের সংখ্যা ১ হাজার ১৯১। সম্প্রতি ঢাকার উত্তরায় 'অপু ভাই' নামে খ্যাত টিকটক ভিডিয়ো নির্মাতা একটি রাস্তা অবরোধ করে ৭০–৮০ জন মিলে টিকটক ভিডিয়ো তৈরি করছিল। সে সময় রবিন নামে একজন প্রকৌশলী গাড়ি নিয়ে রাস্তা পার হতে গেলে অপুসহ তার দল মিলে মারধর করে ওই ব্যক্তির মাথা ফাটিয়ে দেয়।

সমাধান কীভাবে : ১৯৭০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী গ্যাং কালচারে ব্যাপক সহিংসতা প্রবেশ করে। অনেক ক্ষেত্রেই কিশোর গ্যাংদের নিয়ন্ত্রক বা পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় সমাজের কিছু বড়োভাইয়ের ছায়া থাকে। তবে দলগতভাবে ছায়া প্রদানের চেয়ে অনেকেই মনে করেন ব্যক্তিপর্যায়ে সেল্টার বা ছায়া প্রদানই বেশি হয়ে থাকে। তবে যারাই নিয়ন্ত্রক/পৃষ্ঠপোষক হোক না কেন, তাদের আইনের আওতায় আনতে আমাদের বদ্ধপরিকর থাকতে হবে। সবারই উচিত প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে উঠতি বয়সে নজরে রাখা, তারা কী করছে না করছে সবসময় খোঁজখবর রাখা এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশে সময় দেওয়া। কিশোর অপরাধ কমাতে হলে নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পালটাতে হবে। অপরাধী হিসাবে না দেখে শিশু–কিশোরদের কৃতকর্মকে মানসিক স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা জরুরি। দেশের একটি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত গবেষণায় দেখা যায়, সেখানে থাকা ৫৭ শতাংশ শিশু–কিশোরের মানসিক সমস্যা রয়েছে, যার প্রায় অর্ধেকের কন্ডাক্ট ডিজঅর্ডারের জন্য সুচিকিৎসার প্রয়োজন। আমাদের দেশে পর্যাপ্ত কিশোর সংশোধন কেন্দ্র নেই। গাজীপুরে দুটি এবং যশোরে একটি শিশু কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র আছে। এর মধ্যে গাজীপুরের একটি মেয়েদের জন্য। সব মিলিয়ে এ তিনটির ধারণক্ষমতা মাত্র ৬০০ জনের। এ কারণে আটক শিশুদের বড়ো একটি অংশ কারাগারেই থাকে, উন্নয়ন কেন্দ্রে জায়গা হয় না তাদের। এতে দেখা যায়, আদালতের নির্দেশে কোনো কিশোরকে উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানোর কিছুদিন পর সে জামিনে বেরিয়ে এসে আবার অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। ২০১৮–১৯ অর্থবছরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়ার ক্ষেত্রে বাজেটে বড়ো অংশের অন্তর্ভুক্তিতে মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য বরাদ্দ ছিল ৬৫ হাজার ৬৫০ কোটি টাকা, যা পরবর্তী বছরে গিয়ে দাঁড়ায় ৮০ হাজার ১৯০ কোটি টাকায়। সরকারি ব্যবস্থাপনায় কিশোরদের মনন ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মেধা ও প্রতিভা বিকাশে শিশু একাডেমি, বাংলাদেশ স্কাউটস, গণিত অলিম্পিয়াড, রোবটিকস্ প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতাসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন যেমন– সংগীত, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, লেখালেখি, নাটক ইত্যাদিরও প্রায়োগিক অনুশীলন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া অবস্থার উন্নয়ন করতে হলে কমিউনিটি লিডারশিপ শক্তিশালী করতে হবে, স্কুল কর্তৃপক্ষ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করতে হবে। কমিউনিটিতে সুস্থ বিনোদনও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সন্তানকে বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলির শিক্ষা দিতে হবে, তাকে সময় দিতে হবে এবং একইসঙ্গে সন্তানের আচার–আচরণের ওপর খেয়াল রাখতে হবে যাতে পারিবারিক শিক্ষা সমুন্নত থাকে। স্কুল কর্তৃপক্ষের নিয়মিত খোঁজখবর রাখতে হবে– ক্লাস ঠিকমতো হচ্ছে কি না; স্কুলে মাদক সেবন, র‍্যাগিং ইত্যাদি হচ্ছে কি না। দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকেও এগিয়ে আসতে হবে। গ্যাং সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে ডাটা বেইজ তৈরি করতে পারলে এ সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ। যেসব স্থানে গ্যাং সদস্যরা আড্ডা দেয়, সেসব জায়গায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সরব উপস্থিতি

থাকতে হবে। গ্যাংয়ের পৃষ্ঠপোষক ও নিয়ন্ত্রকদের আইনের আওতায় আনতে হবে। যেকোনো ধরনের অপরাধ বড়ো রূপ নেওয়ার আগে অপরাধীকে গ্রেফতার করতে হবে।

উপসংহার : আঠারো শতকের শেষে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার শহরে কিশোর গ্যাং নিয়ন্ত্রণের জন্য স্যালফোর্ড ল্যাডস ক্লাব নামে ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিল গ্রোভস্ পরিবার, আজ যার বিশ্বব্যাপী পরিচয় ম্যানচেস্টার সিটি ফুটবল ক্লাব নামে। রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল, যিনি স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বৈশ্বিকভাবে পরিচিত, তার হাত ধরেই এ ক্লাব সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। এভাবে শিশু–কিশোরদের সৃজনশীল কাজের পরিবেশ তৈরি করে দিলে এবং উন্নয়নমূলক কাজের দিকে আগ্রহী করে তুলতে পারলে বাংলাদেশেও কিশোর গ্যাং নামক দুঃস্বপ্নের আধিপত্য কমে যাবে বলে আশা করা যায়।

১৭৬. বিশ্বকোষ

ভূমিকা

বিশ্বকোষ হলো কোনো গ্রন্থ বা গ্রন্থমালা, যেখানে জ্ঞানের সকল শাখার নানাবিধ বিষয়ে লেখা সংকলিত থাকে। লেখাগুলো নিবন্ধ আকারে সংশ্লিষ্ট ভাষার বর্ণানুক্রমে কিংবা বিষয় অনুযায়ী সজ্জিত থাকে। পৃথিবীর সকল জ্ঞানশাখা বা শৃঙ্খলার বিষয়াবলি এতে স্থান পায়। তবে এমন বিশ্বকোষও রয়েছে যাতে একটি নির্দিষ্ট জ্ঞানশাখার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লিখিত নিবন্ধ সজ্জিত থাকে। যেমন– আইনকোষ, অর্থনীতিকোষ ইত্যাদি। বাংলায় বিশ্বকোষ শব্দটি ইংরেজি 'এনসাইক্লোপিডিয়া' শব্দের প্রতিশব্দ। একটি বিশ্বকোষ সংকলনে যুক্ত থাকেন নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ। তাঁদের রচিত নিবন্ধগুলো তাই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। বিশ্বকোষে সংকলিত নিবন্ধগুলো সংক্ষিপ্ত হলেও সেগুলো একেকটি বিষয়ের ওপর গভীর ধারণা দেয়। বর্তমানে বিশ্বকোষের মুদ্রিত রূপ ছাড়াও কম্পিউটারে ব্যবহারযোগ্য রূপও পাওয়া যায়।

বিশ্বকোষের বৈশিষ্ট্য : প্রতিটি বিশ্বকোষের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, বিশ্বকোষে অন্তর্ভুক্ত ভুক্তিগুলো সুবিন্যস্ত হতে হয়, যাতে পাঠক দ্রুত এবং অল্প আয়াসে কোনো বিষয়ের তথ্য খুঁজে পায়। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশের কারণে এটি আয়তনে বৃহৎ হয়ে থাকে। কখনো অনেকগুলো খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এটি কোষগ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। তৃতীয়ত, বিশ্বকোষের তথ্যাদিকে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সংগ্রহ করতে হয়। কারণ, নির্ভরযোগ্যতা বিশ্বকোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। চতুর্থত, পরিবর্তিত তথ্যের আলোকে বিশ্বকোষকে নিয়মিত হালনাগাদ করতে হয়। তাই বিশ্বকোষের কাজকে কখনো সমাপ্ত বলে ভাবা যায় না।

বিশ্বকোষের প্রকারভেদ : বেশ কয়েক রকমের বিশ্বকোষ দেখা যায়। বিষয়ের ব্যাপকতার ভিত্তিতে বিশ্বকোষ দুই ধরনের : ১. সাধারণ বিশ্বকোষ। ২. বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোষ। প্রকাশের মাধ্যম বিবেচনায় বিশ্বকোষ দুই ধরনের : ১. মুদ্রিত ও ২. ডিজিটাল। প্রতিষ্ঠানের অধীনে নির্ধারিত বিশেষজ্ঞ কর্তৃক ছাড়াও এক ধরনের বিশ্বকোষ রয়েছে যা স্বেচ্ছাসেবী লেখকরা সংকলন করেন। নিচে কয়েক ধরনের বিশ্বকোষ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. সাধারণ বিশ্বকোষ : এ ধরনের বিশ্বকোষে বিষয়ের ব্যাপকতা দেখা যায়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ এই বিশ্বকোষের ভুক্তিতে কাজ করেন। তাঁদের লেখা নাতিদীর্ঘ নিবন্ধের মাধ্যমে একেকটি বিষয়ের আলোচনা বা তথ্য তুলে ধরা হয়। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' এ ধরনের বিশ্বকোষ।

খ. বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোষ : কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সাধারণ বিশ্বকোষে প্রদত্ত বর্ণনা ছাড়াও আরও গভীর ধারণা পেতে বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোষ ব্যবহার করতে হয়। বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোষগুলো কেবল ওই বিষয়সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। 'আইনকোষ', 'এনসাইক্লোপিডিয়া অভ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিকস' এ ধরনের বিশ্বকোষ।

গ. বৈদ্যুতিন বিশ্বকোষ বা ডিজিটাল বিশ্বকোষ : প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে অনেকেই মুদ্রিত বিশ্বকোষের পরিবর্তে কম্পিউটার বা মুঠোফোনে বিশ্বকোষ ব্যবহার করছে। এগুলোকে বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল বিশ্বকোষ বলা হয়। এ ধরনের বিশ্বকোষ হালনাগাদ রাখা সহজ।

ঘ. স্বেচ্ছাসেবী লেখকদের বিশ্বকোষ : ইন্টারনেটে কিছু বিশ্বকোষ রয়েছে যা স্বেচ্ছাশ্রমে সংকলিত হয়। পৃথিবীর নানা প্রান্ত হতে স্বেচ্ছাসেবী লেখকগণ অনলাইনে বিশ্বকোষকে সমৃদ্ধ করেন। 'উইকিপিডিয়া' এ ধরনের বিশ্বকোষ।

বিশ্বকোষের ভুক্তি : বিশ্বকোষে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এগুলোকে বলা হয় ভুক্তি। অভিধানের চেয়ে বিশ্বকোষের ভুক্তি আলাদা হয়ে থাকে। সাধারণ অভিধানে একটি শব্দের ব্যুৎপত্তি, উচ্চারণ, সংজ্ঞা, বাক্যে প্রয়োগ ইত্যাদি থাকে। কিন্তু বিশ্বকোষের ভুক্তিগুলো হয় দীর্ঘ। বর্ণনা এবং ভাবগত বিবেচনায় এর ব্যাপ্তি অভিধানের চেয়ে বেশি। বিষয়ের শিরোনাম সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে রচিত নিবন্ধই বিশ্বকোষের ভুক্তি। ভুক্তির মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী মানচিত্র, সারণি, ছবি, পরিসংখ্যান কিংবা গ্রন্থপঞ্জিও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অধিকাংশ বিশ্বকোষে ভুক্তি রচয়িতার নাম ভুক্তির নিচে সংযুক্ত থাকে।

ভুক্তির মধ্যে কিছু শব্দ বা শব্দগুচ্ছ আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়। এর অর্থে, এই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দিয়ে আলাদা ভুক্তি রয়েছে। পাঠক প্রয়োজনে সেসব ভুক্তি পাঠ করে নির্দিষ্ট বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা নিতে পারেন। অনলাইন বিশ্বকোষে এগুলো আলাদা রঙের হয় এবং তাতে ক্লিক করলে সেই বিষয়ের আলোচনা সামনে চলে আসে।

পৃথিবীর বিখ্যাত কিছু বিশ্বকোষ : প্রায় দুই হাজার বছর ধরে বিশ্বকোষের চর্চা হচ্ছে। তাবে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে কয়েকজন ফরাসি পন্ডিত Encyclopedia নামে গ্রন্থমালা প্রকাশ করেন। পৃথিবীময় যে জ্ঞান রয়েছে তা সংগ্রহ ও সুবিন্যস্ত করে সমকালীন পাঠক ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এরপর ১৭৬৮–১৭৭১ সালে ইংরেজি বিশ্বকোষ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' প্রকাশিত হয়। এটি এখন ৩২ খন্ডের মুদ্রিত বইয়ে এবং অনলাইনে তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে পায়া যায়। এছাড়া 'এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা', 'কলিয়ার্স এনসাইক্লোপিডিয়া', 'চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়া', 'এভরিম্যানস এনসাইক্লোপিডিয়া' ইত্যাদি বিশ্বকোষ অনুসন্ধানী পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে।

বাংলা ভাষায় রচিত বিশ্বকোষ : বাংলা ভাষায় জ্ঞানকোষ রচনার প্রথম পদক্ষেপ নেন উইলিয়াম কেরির পুত্র ফেলিক্স কেরি। তিনি 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' অবলম্বনে 'বিদ্যাহারাবলী' নামক জ্ঞানকোষ রচনার কাজ শুরু করেন। তবে বাংলা ভাষায় যথার্থ বিশ্বকোষ হলো নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত 'বিশ্বকোষ'। এর প্রথম খন্ড সংকলন করেন রজ্ঞালাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় খন্ড থেকে ২২তম খন্ড পর্যন্ত সংকলন করেন নগেন্দ্রনাথ বসু। এই বিশ্বকোষের কাজ শুরু হয় ১৮৮৬ সালে এবং শেষ হয় ১৯১১ সালে। এছাড়া 'ভারতকোষ' বাংলা ভাষা সংকলিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিশ্বকোষ। এটি ১৮৮১ থেকে ১৮৯২ সালের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায় ও শরচ্চন্দ্র দেব কর্তৃক সংকলিত হয়।

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বিশ্বকোষ–জাতীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান বিশ্বকোষ'–এর নাম উল্লেখযোগ্য। আয়তন, ভুক্তিসমূহের বিন্যাস ও ব্যবহার–যোগ্যতার বিবেচনায় এটি একটি সফল প্রয়াস বলা যায়। নওরোজ কিতাবিস্তান ও মুক্তধারা প্রকাশিত চার খন্ডে সংকলিত 'বাংলা বিশ্বকোষ' (১৯৭২ থেকে ১৯৭৪) একটি সুপরিকল্পিত বিশ্বকোষ, যদিও এটি 'কলাম্বিয়া ভাইকিং ডেস্ক এনসাইক্লোপিডিয়া' অবলম্বনে রচিত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আরও কিছু বাংলা কোষগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত 'বাংলাপিডিয়া' বাংলাদেশে বিশ্বকোষ চর্চায় এ যাবৎকালের শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ। 'বাংলাপিডিয়া' বর্তমানে ১৪ খন্ডে পাওয়া যায়। এর কম্পিউটারে ব্যবহারের সংস্করণ এবং অনলাইন সংস্করণও রয়েছে।

উপসংহার : বিশ্বের সব শৃঙ্খলার ধারণাসমূহ কোনো ব্যক্তির একার পক্ষে ধারণ করা সম্ভব নয়। এমনকি একটি নির্দিষ্ট জ্ঞানশাখার সব বিষয়ও কারো একার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। প্রত্যেকের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে এক জায়গায় বিন্যস্ত করে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়াকে বিশ্বকোষের প্রধান লক্ষ্য। কোষগ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশ্বকোষ শুধু আয়তনেই বড়ো নয়, জ্ঞানচর্চার এক বিপুল ভান্ডারও বটে। তাই প্রতিটি ভাষায় বিশ্বকোষ থাকা জরুরি।

১৭৭. যুবসমাজের অবক্ষয়ের কারণ ও তার প্রতিকার
অথবা, যুবসমাজ ও মূল্যবোধের অবক্ষয়

ভূমিকা : আজকের তরুণরাই আগামী দিনের দেশ ও জাতির কর্ণধার। তরুণ অর্থাৎ যুবসমাজই পারে শত বাধা–বিপত্তি অতিক্রম করে দেশকে স্বপ্নের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে। তাই সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বলেছেন–

'পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যুবসমাজ এখন বিপথে পরিচালিত হচ্ছে। যুবসমাজের অবক্ষয়ের কারণে জাতি হতাশায় নিমজ্জিত। যুবসমাজের অবক্ষয় জাতির বুকে গভীর ক্ষত তৈরি করছে। গোটা সমাজকে ঠেলে দিচ্ছে অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে। আর এই সমস্যার প্রতিকার না হলে দেশ ও জাতি ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হবে।

যুবসমাজ ও অবক্ষয় : অবক্ষয় শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ক্ষয়প্রাপ্তি। মানবজীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে হলে কিছু গুণের প্রয়োজন হয়। আর মানুষের এই গুণগুলো যখনই লোপ পায় বা নষ্ট হয় তখনই শুরু হয় নৈতিক অবক্ষয়। কোনো একটি দেশের আশা–আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হলো যুবসমাজ। তারা কখনো পরাজয় মেনে নেয় না এবং পুরাতনকে নতুন করে গড়তে চায়। কিন্তু এই যুবসমাজ যখন খারাপ পথে ধাবিত হয় তখন সমাজের মধ্যে নানা সমস্যা দেখা যায়। যুবসমাজের অবক্ষয়ের কারণে জাতীয় জীবনে নেমে আসে চরম দুঃখ–দুর্দশা, বিপর্যয় ও হতাশা।

যুবসমাজের অবক্ষয়ের কারণ : আমাদের দেশের যুবসমাজ আজ নানা ধরনের নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হচ্ছে। নিম্নে যুব সমাজের অবক্ষয়ের প্রধান কারণগুলো বর্ণনা করা হলো :

মূল্যবোধের অভাব : জীবনে সৎ, সুন্দর, কল্যাণকর ও শান্তির মাধ্যমে বেঁচে থাকতে হলে কতগুলো গুণের প্রয়োজন হয়। আর এই সব গুণকেই সাধারণত মূল্যবোধ বলা হয়। সামাজিক ও ধর্মীয় এসব মূল্যবোধ যুবসমাজকে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের দিকে পরিচালিত করে। বর্তমান সমাজে এসকল মূল্যবোধের অনুশীলন ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। ফলে যুবসমাজ বিপথগামী হচ্ছে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব : ১৯৭১ সালে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে আমাদের দেশে ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে। এখনও বাংলাদেশ রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বাংলাদেশের রাজনীতি ধীরে ধীরে পেশিশক্তি নির্ভর হয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন বিপথগামী তরুণদের ব্যবহার করছে। আবার বিপথগামী তরুণরা কেন্দ্রীয় এবং জাতীয় নেতাদের প্রশ্রয় পেয়ে আরও বেপরোয়া হয়ে যায়। দুর্বল অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থাও যুবসমাজের অবক্ষয়ের জন্য অনেকাংশে দায়ী। আমাদের সমাজের অনেক ছেলেমেয়ে আছে যারা অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে লেখাপড়া করতে পারে না। এতে তারা শিক্ষার অভাবে নানা কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন হয় এবং বিপথে ধাবিত হয়। তাই অর্থনৈতিক অভাবের কারণে যুবসমাজ তাদের নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে।

অপসংস্কৃতির প্রভাব : আমাদের সমাজের তরুণদের অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হলো বিদেশি সংস্কৃতির নামে এক ধরনের অপসংস্কৃতির প্রসার। বর্তমানে আমাদের চলচ্চিত্রের অশ্লীল নাচ, গান, সংলাপ যুবসমাজকে ক্রমান্বয়ে গ্রাস করে ফেলছে। ডিশ এন্টেনার প্রভাবে বিদেশি অপসংস্কৃতি আমাদের যুবসমাজকে চেপে ধরেছে। তাছাড়া রুচিহীন পোশাক–পরিচ্ছদও অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ।

বেকারত্ব ও মাদকাসক্তির প্রভাব : আমাদের দেশের যেসব তরুণ–তরুণী লেখাপড়া শেষ করে চাকরি পায় না তারা নানা রকম মানসিক হতাশায় ভোগে। চাকরির অভাবে তারা অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। দীর্ঘ সময় এই অবস্থা চলতে থাকলে তাদের ভেতরে ক্ষোভ জন্ম নেয়। আর এই ক্ষোভ থেকেই তারা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা ও অপহরণসহ নানা পাপ কাজে লিপ্ত হয়। আবার কোনো দেশের যুব সম্প্রদায় মাদকাসক্ত হওয়া মানে নৈতিক চরিত্রের চূড়ান্ত অধঃপতন। ফেনসিডিল, গাঁজা, আফিম, ভাং ইত্যাদি মাদকদ্রব্য সর্বত্র পাওয়া যায়। আর এ সুযোগ গ্রহণ করে যুবসমাজ ধ্বংস হচ্ছে।

শিক্ষাঙ্গনের প্রভাব : শিক্ষাক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা ও বিশৃঙ্খলা অনেক সময় ছাত্র–ছাত্রীদের বিপথে পরিচালিত করে। ভর্তির সমস্যা, পরীক্ষা পিছিয়ে নেওয়া, ফল প্রকাশের বিলম্ব, সেশনজট এবং যখন–তখন ধর্মঘট ইত্যাদি ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে মানসিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তাছাড়া যেসব প্রতিষ্ঠানে বোমাবাজি, ককটেলবাজি এবং মারামারি লেগেই থাকে সেসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র–ছাত্রীদের মনে সব সময় ভয়–ভীতি কাজ করে। আবার কখনো দেখা যায় যে, গুটিকয়েক সন্ত্রাসী সমস্ত ছাত্রসমাজকে জিম্মি করে রাখে।

যুবসমাজের অবক্ষয়ের প্রতিকার : কোনো দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে যুবসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই যুবসমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিম্নে যুবসমাজের অবক্ষয়ের কিছু প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

পারিবারিক মূল্যবোধ : প্রতিটি মানুষই কোনো একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। শিশুকাল থেকে সে পরিবারেই বেড়ে উঠে। তারপর সে ধীরে ধীরে সমাজের সাথে পরিচিত হয়। শিশুদের মন শৈশবকালে কাদার মতো নরম থাকে। এই সময় তাদের ইচ্ছামতো গড়ে তোলা যায়। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবারই পারে তাদের সন্তানদের উপযুক্ত মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে।

শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা সমাধান : আধুনিক সমাজব্যবস্থায় সুন্দরভাবে জীবনযাপনের অন্যতম শর্ত হলো শিক্ষা। তাই যুবসমাজকে অন্ধকার থেকে মুক্তির জন্য শিক্ষিত করা প্রয়োজন। দেশের প্রতিটি গ্রামে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া উচিত। আবার যেসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটি রয়েছে সেগুলো সমাধান করা উচিত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার উপযুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে সেশনজট নিরসন এবং উপযুক্ত সময়ে একাডেমি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পরীক্ষা নিতে হবে। এতে যুবসমাজের অবক্ষয় রোধ হবে।

বেকারত্ব হ্রাস ও দারিদ্র্য বিমোচন : আমাদের দেশের অনেক যুবকই বেকার। তাদের উৎপাদনশীল কাজে জড়িত করতে পারলে বেকারত্ব হ্রাস পাবে। আর বেকারত্ব হ্রাস পেলেই যুবসমাজের অবক্ষয়ও কমে যাবে। আবার যুবসমাজের অবক্ষয় থেকে মুক্তি লাভ করতে দরিদ্রতা দূর করতে হবে। দরিদ্র যুবকদের বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীল করে তোলার জন্য সরকারকে বিনা সুদে ঋণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

NABARUN PUBLICATION

ধর্মীয় মূল্যবোধ : ধর্মীয় মূল্যবোধই পারে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে। যুবসমাজের বিরাট একটা অংশ ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে আছে। তাই যুবসমাজকে অবক্ষয় থেকে মুক্তির জন্য ধর্মীয় শিক্ষা অপরিহার্য।

সংস্কৃতির অবাধ প্রসার রোধ : যুবসমাজের অবক্ষয়ের পেছনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে অপসংস্কৃতি। যুবসমাজের বিশাল অংশ এখন বিদেশি সংস্কৃতির প্রতি ধাবিত হচ্ছে। এতে করে তাদের রুচি বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। তাই শিক্ষামূলক এবং সপরিবারে দেখার মতো চ্যানেলগুলো রেখে বাকি চ্যানেলগুলো বন্ধ করার জন্য সরকারের পদক্ষেপ নিতে হবে, নিজেদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট হতে হবে।

উপসংহার : অবক্ষয়কে একটি ভয়াবহ ব্যাধি বলা যায়। বর্তমানে এই ব্যাধি যুবসমাজকে গ্রাস করে ফেলছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। তাই যুবসমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সকলেরই এগিয়ে আসা উচিত। যুবসমাজ সচেতন হলে দেশ ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব হবে।

১৭৮. ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ – গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও নাগরিক দায়িত্ব

ভূমিকা

গণতন্ত্রের প্রাণভোমরা হলো নির্বাচন। জনগণ যখন ভোটের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে, তখনই রাষ্ট্রক্ষমতার প্রকৃত উৎস হিসেবে জনগণের ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে বাংলাদেশের জন্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞার্থ ও মূল চেতনা

গণতন্ত্র এমন এক শাসনব্যবস্থা, যেখানে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ। **আব্রাহাম লিংকনের** বিখ্যাত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী, গণতন্ত্র হলো জনগণের, জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্য পরিচালিত সরকার। এই ব্যবস্থায় জনগণ নিজেদের শাসক নিজেরাই নির্বাচন করে। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। তবে, প্রকৃত গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুর অধিকারও সমানভাবে সুরক্ষিত থাকে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, আইনের শাসন ও সমান অধিকার গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান। নিয়মিত, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন গণতন্ত্রের সবচেয়ে দৃশ্যমান প্রকাশ। 'নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র কল্পনাও করা যায় না। বাংলাদেশের সংবিধানেও গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।'[১] তাই একটি কার্যকর নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পূর্বশর্ত।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ছিল ব্যতিক্রমী ও ঐতিহাসিক। ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর গঠিত হয় ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এই সরকার বারবার অঙ্গীকার করে যে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। দীর্ঘদিন পর একটি অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের সম্ভাবনা জাতির মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করে। 'নির্বাচন কমিশন ২০২৫ সালের ১১ ডিসেম্বর তফসিল ঘোষণা করে এবং ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়।'[২] এই নির্বাচন ছিল গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী গণতান্ত্রিক উত্তরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ছিল সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। জাতি ও আন্তর্জাতিক মহল এই নির্বাচনের দিকে গভীর আগ্রহে তাকিয়েছিল।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা কেন্দ্রীয়। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।[৩] এর দায়িত্ব ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, তফসিল ঘোষণা এবং সম্পূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। কমিশনের নিরপেক্ষতা ও দক্ষতার ওপরই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে। ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা, ভোটগ্রহণের স্বচ্ছতা এবং ফলাফল ঘোষণার সততা নিশ্চিত করা কমিশনের মুখ্য কর্তব্য। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কারচুপি রোধ ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। একটি শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। জনগণের আস্থা অর্জনই এই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য।

ভোটাধিকার: একটি মৌলিক অধিকার

'ভোটাধিকার নাগরিকের অন্যতম মৌলিক ও মূল্যবান অধিকার।'[৪] এটি জনগণের হাতে থাকা সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, যার মাধ্যমে তারা শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তন করতে পারে। বাংলাদেশে আঠারো বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের প্রতিটি নাগরিকের ভোটাধিকার রয়েছে। এই অধিকার ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সবার জন্য সমান। একটি ভোটও গণতন্ত্রে অমূল্য, কারণ প্রতিটি ভোট মিলেই গঠিত হয় জনমত। ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নাগরিকেরা রাষ্ট্র পরিচালনায় সরাসরি অংশগ্রহণ করে। ইতিহাসে এই অধিকার অর্জনের জন্য মানুষ দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ করেছে। তাই ভোটাধিকারকে অবহেলা করা নিজের ক্ষমতাকেই অবহেলা করার শামিল। সচেতন ও দায়িত্বশীলভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ প্রকৃত নাগরিকত্বের পরিচয়।

নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

'ভোটাধিকার যেমন একটি অধিকার, তেমনি এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্বও বটে।'[৫] সচেতন নাগরিকের কর্তব্য হলো প্রার্থী ও দলের কর্মসূচি যাচাই করে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়া। আবেগ, প্রলোভন বা চাপের বশবর্তী না হয়ে বিবেক ও যুক্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াই দায়িত্বশীল ভোটারের পরিচয়। অর্থ বা উপহারের বিনিময়ে ভোট দেওয়া গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। প্রতিটি নাগরিকের উচিত নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করা। ভোট না দেওয়া মানে নিজের মতামত প্রকাশের সুযোগ হারানো। এছাড়া নির্বাচনী প্রক্রিয়া যেন শান্তিপূর্ণ থাকে, তা নিশ্চিত করাও নাগরিকের কর্তব্য। গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখতে সহিংসতা পরিহার ও পরমতসহিষ্ণুতা অপরিহার্য। দায়িত্বশীল নাগরিকত্বই একটি সুস্থ গণতন্ত্রের ভিত্তি।

সুষ্ঠু নির্বাচনের গুরুত্ব

একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি। সুষ্ঠু নির্বাচন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক শান্তি নিশ্চিত করে। জনগণ যখন বিশ্বাস করে যে, তাদের ভোট সঠিকভাবে গণনা হয়েছে, তখনই নির্বাচিত সরকারের প্রতি আস্থা তৈরি হয়। সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার বৈধতা ও নৈতিক কর্তৃত্ব পায়। বিপরীতে, কারচুপিপূর্ণ নির্বাচন জনআস্থা ধ্বংস করে এবং রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। সুষ্ঠু নির্বাচন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতাও বাড়ায়। এটি বিনিয়োগ ও উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। তাই প্রতিটি অংশীজনের দায়িত্ব নির্বাচনকে স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য রাখা। গণতন্ত্রের টেকসই বিকাশের জন্য সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। দলগুলো জনগণের আকাঙ্ক্ষা সংগঠিত করে এবং নীতিনির্ধারণের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ, ইশতেহার ঘোষণা ও জনগণের কাছে জবাবদিহিতা দলগুলোর মুখ্য দায়িত্ব। বিভিন্ন দলের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা গণতন্ত্রকে প্রাণবন্ত করে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থানও দেখা গেছে, যা রাজনৈতিক বিচিত্র্যতা বাড়িয়েছে। দলগুলোর উচিত ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থকে অগাধিকার দেওয়া। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি লালন, পরমতসহিষ্ণুতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দলগুলোর কাছে প্রত্যাশিত। দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলই পারে একটি শক্তিশালী গণতন্ত্র গড়ে তুলতে। জনগণের প্রতি অঙ্গীকার রক্ষাই দলগুলোর প্রকৃত পরীক্ষা।

তরুণ ভোটার ও নতুন প্রজন্মের ভূমিকা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ তরুণ এবং তাঁরাই নির্বাচনের ফলাফলে নির্ণায়ক ভূমিকা রাখতে পারেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে তরুণদের নেতৃত্ব প্রমাণ করেছে যে, নতুন প্রজন্ম দেশ নিয়ে গভীরভাবে সচেতন।[৬] প্রথমবার ভোটদানকারীপ্রাপ্ত তরুণদের মধ্যে উৎসাহ ও প্রত্যাশা থাকে সবচেয়ে বেশি। তরুণ ভোটারেরা প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ এবং তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। তারা পরিবর্তন ও সংস্কারের পক্ষে শক্তিশালী কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতে পারে। তবে তরুণদের গুজব ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। দায়িত্বশীল তথ্য যাচাই ও বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত তরুণদের কাছে প্রত্যাশিত। নতুন প্রজন্মের সক্রিয় ও সচেতন অংশগ্রহণ গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করবে। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গঠনে তরুণ ভোটারদের ভূমিকা অপরিসীম।

গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের ভূমিকা

একটি সুষ্ঠু নির্বাচনে গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন গণমাধ্যম নির্বাচনী তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেয় এবং অনিয়ম তুলে ধরে। নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা ভোটারদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। সুশীল সমাজ ও নাগরিক সংগঠনগুলো নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করে। তারা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে, গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীল হতে হবে এবং উসকানিমূলক বা পক্ষপাতদুষ্ট প্রচার এড়াতে হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া তথ্য ছড়ানো রোধ করা একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। দায়িত্বশীল গণমাধ্যম ও সক্রিয় সুশীল সমাজ গণতন্ত্রের পাহারাদার হিসেবে কাজ করে। তাদের ভূমিকা নির্বাচনকে অধিকতর স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে।

নির্বাচনে কারচুপি ও সহিংসতার ঝুঁকি

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কারচুপি ও সহিংসতা গণতন্ত্রের জন্য বড়ো হুমকি। ভোট জালিয়াতি, কেন্দ্র দখল, ভোটার ভীতি প্রদর্শন ও পেশিশক্তির ব্যবহার নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করে। এসব অপতৎপরতা জনগণের ভোটাধিকারকে অর্থহীন করে দেয়। নির্বাচনী সহিংসতা প্রাণহানি ও সামাজিক বিভেদ সৃষ্টি করে। এই ঝুঁকি মোকাবিলায় শক্তিশালী আইন প্রয়োগ ও নিরপেক্ষ প্রশাসন অপরিহার্য। ভোটকেন্দ্রের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও স্বচ্ছ ভোটগ্রহণ পদ্ধতি কারচুপি রোধ করে। নাগরিকদেরও সচেতন থেকে অনিয়ম প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। সব রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক সহনশীলতা সহিংসতা কমাতে পারে। কারচুপি ও সহিংসতামুক্ত নির্বাচনই প্রকৃত গণতন্ত্রের পরিচায়ক। এই চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করাই একটি পরিণত গণতন্ত্রের লক্ষণ।

নির্বাচন ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

সুষ্ঠু নির্বাচন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অন্যতম পূর্বশর্ত। জনগণের রায়ে গঠিত সরকার বৈধতা পায়, ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস পায়। স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিনিয়োগের জন্য অনুকূল। বিপরীতে, বিতর্কিত নির্বাচন দীর্ঘমেয়াদি সংকট ও বিভাজন তৈরি করতে পারে। শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর গণতন্ত্রের পরিপক্বতার লক্ষণ। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন জাতিকে স্থিতিশীলতার পথে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ এনে দেয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সামাজিক শান্তি ও জাতীয় অগ্রগতির ভিত্তি। তাই সব পক্ষের উচিত নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিয়ে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। স্থিতিশীলতাই উন্নয়নের সবচেয়ে বড়ো চালিকাশক্তি।

গণতন্ত্রে সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার

প্রকৃত গণতন্ত্র হলো সকল নাগরিকের অধিকার সুরক্ষার-ব্যবস্থা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, নারী, প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভোটাধিকার ও অংশগ্রহণ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের কণ্ঠস্বর যেন উপেক্ষিত না হয়, তা নিশ্চিত করা গণতন্ত্রের দায়িত্ব। নির্বাচনে সব শ্রেণির মানুষের নির্বিঘ্ন অংশগ্রহণ সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠা করে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমস্যা সংসদে উত্থাপন ও সমাধানের সুযোগ তৈরি হয় তাঁদের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে। অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রই একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলে। বৈষম্যবিরোধী চেতনায় গড়ে ওঠা গণঅভ্যুত্থানের পর এই অন্তর্ভুক্তি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। সব নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করাই গণতন্ত্রের প্রকৃত সৌন্দর্য।

ভোটার শিক্ষা ও সচেতনতা

একটি সফল গণতন্ত্রের জন্য সচেতন ও শিক্ষিত ভোটার অপরিহার্য। ভোটার শিক্ষা মানুষকে তাদের অধিকার, দায়িত্ব ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করে। সচেতন ভোটার প্রলোভন ও বিভ্রান্তির ফাঁদে পা দেয় না। নির্বাচন কমিশন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যম ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষত গ্রামাঞ্চলেও প্রথমবারের ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি জরুরি। ভোটদান পদ্ধতি, প্রার্থী যাচাই ও গোপন ব্যালটের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। সচেতন ভোটারই যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন করতে পারে। ভোটার শিক্ষা গণতন্ত্রের গুণগত মান উন্নত করে। তাই এটিকে একটি চলমান জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পর্যবেক্ষণ

আধুনিক বিশ্বে নির্বাচনের আন্তজাতিক মাত্রা রয়েছে। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল নির্বাচনের স্বচ্ছতা যাচাইয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সুষ্ঠু নির্বাচন বৈদেশিক সম্পর্ক, বাণিজ্য

ও বিনিয়োগে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর আন্তর্জাতিক মহল বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের দিকে গভীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিল। একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আন্তর্জাতিক আস্থা পুনরুদ্ধার করে। তবে, দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখেই এই সহযোগিতা গ্রহণ করা উচিত। আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা একটি দেশের কূটনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করে। তাই নির্বাচনের স্বচ্ছতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর এই নির্বাচন জনগণের কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রতীক। গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে সচেতন নাগরিক, দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর। ভোটাধিকার একটি পবিত্র দায়িত্ব, যা সততা ও বিবেচনার সঙ্গে প্রয়োগ করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনই পারে একটি শক্তিশালী, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার ভিত্তি স্থাপন করতে।

তথ্যসূত্র

১. *বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১১ (গণতন্ত্র ও মানবাধিকার); "ভোটাধিকার নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার", (দৈনিক নয়া দিগন্ত)।*

২. *ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০২৬, উইকিপিডিয়া; নির্বাচন কমিশনের তফসিল ঘোষণা (১১ ডিসেম্বর ২০২৫) ও নির্বাচন তারিখ (১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।*

৩. *বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, সাংবিধানিক মর্যাদা ও দায়িত্ব সংক্রান্ত তথ্য (সংবিধানের ১১৮–১২৬ অনুচ্ছেদ)।*

৪. *"ভোটাধিকার নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার", (দৈনিক নয়া দিগন্ত); ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র সংক্রান্ত আলোচনা।*

৫. *নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তক আলোচনা (পৌরনীতি ও সুশাসন); সাট অ্যাকাডেমি, নাগরিক দায়িত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর।*

৬. *জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও তরুণ নেতৃত্ব সংক্রান্ত প্রতিবেদন; ছাত্র-জনতার জুলাই অভ্যুত্থানের কালপঞ্জি, বিএসএস নিউজ।*

১৭৯. মূল্যস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের চ্যালেঞ্জ

ভূমিকা

দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষের সবচেয়ে কাছের ও অনুভূত সমস্যাগুলোর একটি হলো দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। বাজারে গেলে চাল, ডাল, তেল, শাকসবজির দাম শুনে যখন মানুষের কপালে ভাঁজ পড়ে, তখনই মূল্যস্ফীতির কঠিন বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ যে-কোনো সরকারের জন্য একটি বড়ো অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ।

মূল্যস্ফীতি কী

মূল্যস্ফীতি হলো একটি অর্থনৈতিক অবস্থা, যেখানে নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য ও সেবার সাধারণ মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। সহজ ভাষায়, মূল্যস্ফীতি মানে টাকার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া। অর্থাৎ, আগে যে টাকায় যে পরিমাণ পণ্য কেনা যেত, মূল্যস্ফীতির ফলে এখন সেই টাকায় তার চেয়ে কম পণ্য কেনা যায়। মূল্যস্ফীতি সাধারণত শতাংশে প্রকাশ করা হয় এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচক। ভোক্তা মূল্যসূচকের (CPI) মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি পরিমাপ করা হয়। সামান্য ও নিয়ন্ত্রিত মূল্যস্ফীতি অর্থনীতির জন্য স্বাভাবিক ও কখনো প্রবৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত মূল্যস্ফীতি অর্থনীতি ও জনজীবনের জন্য ক্ষতিকর। তাই মূল্যস্ফীতিকে একটি সহনীয় মাত্রায় রাখা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য। মূল্যস্ফীতির হার অর্থনীতির স্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি।

মূল্যস্ফীতির প্রকারভেদ

মূল্যস্ফীতিকে এর কারণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। চাহিদাজনিত মূল্যস্ফীতি ঘটে যখন বাজারে পণ্যের চাহিদা সরবরাহের তুলনায় বেশি হয়। ব্যয়জনিত মূল্যস্ফীতি ঘটে যখন উৎপাদন খরচ (যেমন– জ্বালানি, শ্রম, কাঁচামাল) বৃদ্ধি পায়। মাত্রা অনুযায়ী মূল্যস্ফীতিকে মৃদু, মাঝারি, উচ্চ ও অতিমূল্যস্ফীতিতে ভাগ করা যায়। মৃদু মূল্যস্ফীতি অর্থনীতির জন্য সহনীয়, কিন্তু অতিমূল্যস্ফীতি বিপর্যয়কর। কখনো কখনো অর্থনীতিতে স্থবিরতার সঙ্গে মূল্যস্ফীতি একসঙ্গে দেখা দেয়, যাকে স্ট্যাগফ্লেশন বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের মূল্যস্ফীতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ন্ত্রণ কৌশল প্রয়োজন।

কারণ চিহ্নিত করতে পারলে সঠিক সমাধান খুঁজে পাওয়া সহজ হয়। তাই মূল্যস্ফীতির প্রকৃতি বোঝা অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির সাম্প্রতিক চিত্র

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপের মুখোমুখি হয়েছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অস্থিরতা, সরবরাহ-শৃঙ্খলের বিঘ্ন ও অভ্যন্তরীণ নানা কারণে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০২৫ সালে দেশের গড় মূল্যস্ফীতি ছিল প্রায় ৮.৭৭ শতাংশ, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের একটি।

১. টানা প্রায় দ্ই বছরের বেশি সময় ধরে দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে।
২. ২০২৫–২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট বক্তৃতায় মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে একটি প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং মধ্যমেয়াদে তা ৬.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।
৩. বিশেষত খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ছিল অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম বড়ো অর্থনৈতিক পরীক্ষা। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা জনগণের জীবনমানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

মূল্যস্ফীতির বৈশ্বিক কারণ

মূল্যস্ফীতি কেবল একটি অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়, এর বৈশ্বিক মাত্রাও রয়েছে। বিশ্বজুড়ে চলমান যুদ্ধ ও ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। জ্বালানি তেল ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পরিবহন ও উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয়। বৈশ্বিক সরবরাহ-শৃঙ্খলের বিঘ্ন পণ্যের প্রাপ্যতা কমিয়ে দাম বাড়ায়। আমদানিনির্ভর একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এসব বৈশ্বিক ধাক্কায় সহজেই প্রভাবিত হয়। ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধি আমদানি পণ্যের দাম আরও বাড়িয়ে দেয়। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধিও দেশীয় বাজারে প্রভাব ফেলে। তাই বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দেশীয় মূল্যস্ফীতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই বৈশ্বিক কারণগুলো নিয়ন্ত্রণ করা একটি দেশের একার পক্ষে কঠিন। তবে এর প্রভাব প্রশমনে কৌশলী নীতি গ্রহণ সম্ভব।

মূল্যস্ফীতির অভ্যন্তরীণ কারণ

বৈশ্বিক কারণের পাশাপাশি কিছু অভ্যন্তরীণ কারণও মূল্যস্ফীতির জন্য দায়ী। বাজার সিন্ডিকেট ও মধ্যস্বত্বভোগীদের কারসাজি দ্রব্যমূল্য কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে দেয়। চাঁদাবাজি ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পণ্যের দামে যুক্ত হয়। উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থার দুর্বলতাও একটি বড়ো কারণ। মুদ্রার অতিরিক্ত সরবরাহ বা ঋণের সম্প্রসারণও মূল্যস্ফীতি বাড়াতে পারে। বাজার তদারকির অভাবে অসাধু ব্যবসায়ীরা সুযোগ নেয়। মজুতদারি ও কৃত্রিম সংকট তৈরি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এসব অভ্যন্তরীণ সমস্যা সুশাসন ও কার্যকর বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তাই অভ্যন্তরীণ কারণ চিহ্নিত করে সমাধান করাই বেশি কার্যকর।

সাধারণ মানুষের জীবনে প্রভাব

মূল্যস্ফীতির সবচেয়ে কঠিন আঘাত পড়ে সাধারণ মানুষের জীবনে, বিশেষত নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারে।[৪] সীমিত আয়ের মানুষের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে। খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয় বৃদ্ধি পরিবারের বাজেটে চাপ সৃষ্টি করে। অনেক পরিবার বাধ্য হয় খাদ্যতালিকা সংকুচিত করতে বা পুষ্টিকর খাবার বাদ দিতে। সঞ্চয় কমে যায় এবং অনেকে ঋণের ফাঁদে পড়ে। স্থির আয়ের মানুষ, যেমন– বেতনভোগী ও পেনশনভোগীরা, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। মূল্যস্ফীতি দারিদ্র্য ও বৈষম্য বাড়িয়ে দেয়। জীবনযাত্রার মান কমে যাওয়ায় সামাজিক অসন্তোষ তৈরি হতে পারে। শিশুদের পুষ্টি ও শিক্ষার ওপরও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাই মূল্যস্ফাতি কেবল একটি অর্থনৈতিক নয়, একটি গভীর সামাজিক সমস্যাও।

মূল্যস্ফীতি ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা

মূল্যস্ফীতি সামগ্রিক অর্থনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ে নিরুৎসাহিত করে। ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যৎ মূল্য নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে পারে না। মুদ্রার মূল্য হ্রাস বৈদেশিক বাণিজ্যে

প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কমাতে পারে। মূল্যস্ফীতি সুদের হার বৃদ্ধি করে, যা ঋণ ব্যয়বহুল করে তোলে। এর ফলে শিল্প ও উৎপাদন খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও বাধা দেয়। মূল্যস্ফীতি ও মন্দা একসঙ্গে দেখা দিলে অর্থনীতি জটিল সংকটে পড়ে। সামগ্রিকভাবে মূল্যস্ফীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি শ্লথ করতে পারে। তাই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পূর্বশর্ত। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়া টেকসই উন্নয়ন অসম্ভব।

মুদ্রানীতির ভূমিকা

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন মুদ্রানীতির উপকরণ ব্যবহার করে অর্থের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। সুদের হার বৃদ্ধি করে অর্থের প্রবাহ কমিয়ে চাহিদাজনিত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অনুসরণ করছে এবং নীতি সুদহার বাড়িয়ে ১০ শতাংশে উন্নীত করেছে; মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশে না নামা পর্যন্ত এই কঠোর অবস্থান অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।[৫] সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাজারে অতিরিক্ত অর্থের প্রবাহ রোধ করে। তবে অতিরিক্ত সংকোচন আবার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই মুদ্রানীতিতে ভারসাম্য রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মূল্যস্ফীতি ও প্রবৃদ্ধির মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখাও মুদ্রানীতির একটি দায়িত্ব। সুপরিকল্পিত ও সময়োপযোগী মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখে। একটি স্বাধীন ও দক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

রাজস্বনীতির ভূমিকা

মুদ্রানীতির পাশাপাশি সরকারের রাজস্বনীতিও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরকার কর ও সরকারি ব্যয়ের মাধ্যমে অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর শুল্ক ও কর হ্রাস দাম কমাতে সাহায্য করে। সরকারি ভর্তুকি সাধারণ মানুষের ওপর মূল্যস্ফীতির চাপ লাঘব করে। অপ্রয়োজনীয় সরকারি ব্যয় হ্রাস বাজারে অতিরিক্ত অর্থের প্রবাহ কমায়। বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রাখাও মূল্যস্ফীতি প্রশমনে সহায়ক। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া যায়। সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির সমন্বিত প্রয়োগ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে কার্যকর। এই দুই নীতির সঠিক সমন্বয়ই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মূল চাবিকাঠি।

বাজার তদারকি ও সিন্ডিকেট দমন

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর বাজার তদারকি অপরিহার্য। অসাধু ব্যবসায়ী, মজুতদার ও সিন্ডিকেটের কারসাজি দব্যমূল্য কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে দেয়।[৬] নিয়মিত বাজার মনিটরিং ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের কঠোর প্রয়োগ এই সমস্যা রোধ করতে পারে। মজুতদারি ও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সরবরাহ–শৃঙ্খলে মধ্যস্বত্বভোগীদের অযৌক্তিক মুনাফা কমাতে হবে। উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সরাসরি বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। বাজারে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করলে মূল্য স্বাভাবিক থাকে। ভোক্তাদের সচেতনতাও বাজার নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থা মূল্যস্ফাতি প্রশমনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। সিন্ডিকেট দমনে রাজনৈতিক সদিচ্ছা সবচেয়ে জরুরি।

কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা

খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি একটি কার্যকর দীর্ঘমেয়াদি সমাধান। পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন বাজারে সরবরাহ নিশ্চিত করে দাম স্থিতিশীল রাখে। কৃষকদের সার, বীজ ও সেচে ভর্তুকি প্রদান উৎপাদন খরচ কমায়। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও যান্ত্রিকীকরণ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। উৎপাদিত পণ্যের সঠিক সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থা অপচয় রোধ করে। খাদ্য মজুত ও সরকারি বিতরণ ব্যবস্থা সংকটকালে দাম নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। কৃষকেরা ন্যায্যমূল্য পেলে উৎপাদনে উৎসাহিত হন। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে মূল্যস্ফীতির চাপ অনেকটাই কমে। তাই কৃষিতে বিনিয়োগ একটি কৌশলগত অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি একটি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ভিত্তি।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

মূল্যস্ফীতির আঘাত থেকে দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠীকে রক্ষায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার নানা কর্মসূচির মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করতে পারে। খোলা বাজারে বিক্রয় (OMS) ও ভর্তুকিমূল্যে

পণ্য বিতরণ দরিদ্র মানুষকে স্বস্তি দেয়। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও অন্যান্য সহায়তা দুর্বল জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দেয়। কর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক কর্মসূচি মানুষের আয় বৃদ্ধি করে। এসব কর্মসূচি যেন প্রকৃত প্রাপকের কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করা জরুরি। স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত বিতরণ ব্যবস্থা এর সাফল্যের পূর্বশর্ত। সামাজিক নিরাপত্তা মূল্যস্ফীতির সামাজিক প্রভাব প্রশমিত করে। এটি বৈষম্য কমিয়ে সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করে। একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রে এই কর্মসূচি অপরিহার্য।

আমদানিনির্ভরতা হ্রাস

বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির একটি বড়ো কারণ অতিরিক্ত আমদানিনির্ভরতা। আমদানি পণ্যের দাম বৈশ্বিক বাজার ও ডলারের বিনিময় হারের ওপর নির্ভর করে, যা অস্থিরতা সৃষ্টি করে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমদানিনির্ভরতা কমানো প্রয়োজন। দেশীয় শিল্প ও কৃষির বিকাশ এই নির্ভরতা হ্রাসে সাহায্য করে। আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া একটি কার্যকর কৌশল। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির ধাক্কা থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ও হয়। স্বনির্ভর অর্থনীতি বাহ্যিক আঘাতের বিরুদ্ধে অধিক সহনশীল। তাই উৎপাদনমুখী অর্থনীতি গড়ে তোলা একটি দীর্ঘমেয়াদি সমাধান। আমদানিনির্ভরতা কমানো অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বেরও প্রশ্ন।

জনসচেতনতা ও ভোক্তার ভূমিকা

মূল্যস্ফীতি মোকাবিলায় সরকারের পাশাপাশি ভোক্তা ও জনগণের সচেতন ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। সচেতন ভোক্তা অযৌক্তিক দাম প্রত্যাখ্যান করে এবং অপচয় এড়ায়। আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত পণ্য কেনা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়ায়। পরিকল্পিত ও পরিমিত ভোগ মূল্যস্ফীতির চাপ কমাতে সাহায্য করে। ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি রোধ করে। স্থানীয় ও মৌসুমি পণ্য কেনা সাশ্রয়ী ও স্থিতিশীল বাজার গড়ে তোলে। অভিযোগ ও তদারকিতে ভোক্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। পরিবারের বাজেট পরিকল্পনা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস মূল্যস্ফীতির সময় সহায়ক হয়। সচেতন নাগরিক সমাজ বাজার ব্যবস্থাকে স্বাস্থ্যকর রাখে। তাই মূল্যস্ফীতি মোকাবিলা একটি সম্মিলিত দায়িত্ব।

উপসংহার

মূল্যস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ একটি জটিল কিন্তু অপরিহার্য অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, যা সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ নানা কারণে সৃষ্ট এই সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজন সমন্বিত মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি, কার্যকর বাজার তদারকি ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। সরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যবসায়ী ও সচেতন ভোক্তা—সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে। একটি স্থিতিশীল বাজার ও সহনীয় মূল্যস্ফীতিই নিশ্চিত করতে পারে জনগণের স্বস্তি ও দেশের টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতি।

তথ্যসূত্র

১. *"দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি সবচেয়ে বেশি", প্রথম আলো (১১ জানুয়ারি ২০২৬); বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ২০২৫ সালের গড় মূল্যস্ফীতি ৮.৭৭%*

২. *"২০ মাস ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে বাংলাদেশ", বণিক বার্তা; "মূল্যস্ফীতির হার কমার প্রবণতা দেখা গেলেও গতি শ্লথ", বণিক বার্তা (৪ মার্চ ২০২৬)।*

৩. *জাতীয় বাজেট বক্তৃতা ২০২৫–২৬, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (মধ্যমেয়াদে মূল্যস্ফীতি ৬.৫% লক্ষ্যমাত্রা)।*

৪. *উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন, বণিক বার্তা; সিপিডির বিশ্লেষণ (ফাহমিদা খাতুন)।*

৫. *"মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশে না নামা পর্যন্ত সংকোচনমূলক নীতি অব্যাহত", ইত্তেফাক (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬); বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি (নীতি সুদহার ১০%)।*

৬. *দ্রব্যমূল্য, সিন্ডিকেট ও বাজার তদারকি সংক্রান্ত প্রতিবেদন, ঢাকা ট্রিবিউন; ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন সংক্রান্ত আলোচনা।*

১৮০. স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ (LDC Graduation)

ভূমিকা

একটি জাতির অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার ইতিহাসে কিছু মুহূর্ত গর্ব ও সম্ভাবনার প্রতীক হয়ে ওঠে। স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকা থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ বাংলাদেশের জন্য এমনই এক ঐতিহাসিক অর্জন। একসময় যে দেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে অভিহিত করা হতো, সেই বাংলাদেশের এই উত্তরণ বিশ্ববাসীর কাছে এক বিস্ময়।

স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) কী

স্বল্পোন্নত দেশ বা Least Developed Country (LDC) হলো জাতিসংঘ স্বীকৃত এমন দেশ, যেগুলো সর্বনিম্ন আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সূচকে অবস্থান করে। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ প্রথম এই শ্রেণিবিন্যাস চালু করে। এসব দেশ সাধারণত নিম্ন আয়, দুর্বল মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতায় ভোগে। LDC দেশগুলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নানা বিশেষ সুবিধা পায়, যেমন শুল্কমুক্ত বাণিজ্য, সহজ শর্তে ঋণ ও উন্নয়ন সহায়তা। বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। দীর্ঘ কয়েক দশকের চেষ্টায় বাংলাদেশ এই অবস্থান থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। LDC থেকে উত্তরণ একটি দেশের অর্থনৈতিক পরিপক্বতার স্বীকৃতি। এটি প্রমাণ করে যে দেশটি আর সবচেয়ে দুর্বল অর্থনীতির কাতারে নেই। এই উত্তরণ জাতীয় গর্ব ও মর্যাদার বিষয়।

উত্তরণের তিনটি মানদণ্ড

LDC থেকে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (CDP) তিনটি প্রধান মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। প্রথমটি হলো মাথাপিছু জাতীয় আয় (GNI-per capita)–একটি দেশের নাগরিকদের গড় আয়। দ্বিতীয়টি হলো মানবসম্পদ সূচক (HAI), যা পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সাক্ষরতার মান পরিমাপ করে। তৃতীয়টি হলো অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা সূচক (EVI), যা প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক ধাক্কা সামলানোর সক্ষমতা মাপে। উত্তরণের জন্য একটি দেশকে এই তিনটির মধ্যে অন্তত দুটি মানদণ্ড পূরণ করতে হয়। বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে এই মানদণ্ড পূরণে সফল হয়েছে। বিশেষভাবে উলেখযোগ্য যে, বাংলাদেশ তিনটি মানদণ্ডই পূরণ করেছে; ফলে বাংলাদেশই হবে প্রথম দেশ, যারা তিনটি সূচকেই উত্তীর্ণ হয়ে এলডিসি থেকে বের হবে।[১] এটি বাংলাদেশের সর্বমুখী অগ্রগতির প্রমাণ। মানদণ্ডের এই পূর্ণতা উত্তরণকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তি দিয়েছে।

বাংলাদেশের উত্তরণের সময়সূচি

বাংলাদেশের LDC থেকে উত্তরণের একটি নির্দিষ্ট সময়সূচি নির্ধারিত হয়েছে। জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি ধারাবাহিক পর্যালোচনায় বাংলাদেশকে উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করে। সাধারণত উত্তরণের জন্য তিন বছর প্রস্তুতিকাল দেওয়া হলেও, কোভিড ১৯ মহামারির অর্থনৈতিক ক্ষতি সামলে ওঠার জন্য বাংলাদেশকে পাঁচ বছর প্রস্তুতিকাল দেওয়া হয়। এই সময়সূচি অনুযায়ী ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশে উত্তীর্ণ হবে। উল্লেখযোগ্য যে, অন্তর্বর্তী সরকার এই সময়সীমা না পিছিয়ে নির্ধারিত সময়েই উত্তরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আগেভাগে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন। বাংলাদেশের পাশাপাশি লাওস ও নেপালও একই সময়ে উত্তরণের পথে রয়েছে।[২] এই সিদ্ধান্ত দেশের আত্মবিশ্বাস ও সক্ষমতার প্রতিফলন।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির যাত্রা

বাংলাদেশের LDC থেকে উত্তরণ এক দীর্ঘ ও কঠিন অর্থনৈতিক যাত্রার ফল। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দরিদ্র দেশ থেকে আজকের অবস্থানে পৌঁছানো সহজ ছিল না। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। কৃষি, তৈরি পোশাকশিল্প ও প্রবাসী আয় এই অগ্রগতির প্রধান চালিকাশক্তি। দারিদ্র্যের হার উলেখযোগ্যভাবে কমেছে এবং মাথাপিছু আয় বেড়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীর ক্ষমতায়নে অসাধারণ অগগতি হয়েছে। গড় আয়ু বৃদ্ধি ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস মানবসম্পদ উনয়নের পমাণ। অবকাঠামো উনয়নেও বড়ো ধরনের অগগতি হয়েছে। এই সবমুখী অগ্রগতিই বাংলাদেশকে উত্তরণের যোগ্যতা এনে দিয়েছে। বাংলাদেশের এই উন্নয়ন বিশ্বে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

উত্তরণের গৌরব ও মর্যাদা

LDC থেকে উত্তরণ বাংলাদেশের জন্য এক বিশাল গৌরব ও মর্যাদার বিষয়। এটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে। উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে দেশের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। এটি প্রমাণ করে যে দেশটি অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য। উত্তরণ দেশের নাগরিকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় গর্ব সঞ্চার

করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও কূটনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী হয়। এটি দেশের ঋণযোগ্যতা ও আর্থিক বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে সমান মর্যাদায় সম্পর্ক স্থাপনের পথ তৈরি হয়। এই মর্যাদা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। উত্তরণ একটি জাতির আত্মমর্যাদার প্রতীক।

শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা হারানোর চ্যালেঞ্জ

উত্তরণের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো বিভিন্ন বাণিজ্য সুবিধা হারানো। LDC হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) আওতায় বিভিন্ন বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পেত। উত্তরণের পর এই বিশেষ সুবিধাগুলো ক্রমান্বয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। বিশেষত তৈরি পোশাকশিল্প, যা দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস, এতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হতে পারে। শুল্ক আরোপিত হলে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা কমতে পারে। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন GSP–এর আওতায় কিছু সুবিধা ২০২৯ সাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখার সুযোগ রয়েছে।[৩] এই অতিরিক্ত সময় প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও নতুন বাজার অনুসন্ধান এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপায়। দ্বি-পক্ষীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিও সহায়ক হতে পারে। এই চ্যালেঞ্জ সঠিক প্রস্তুতির মাধ্যমে অতিক্রম করা সম্ভব।

রপ্তানি খাতের ওপর প্রভাব

উত্তরণের ফলে রপ্তানি খাত সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে তৈরি পোশাকশিল্প থেকে। শুল্কমুক্ত সুবিধা হারালে এই খাতের উৎপাদন খরচ ও পণ্যের দাম বাড়তে পারে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ অত্যন্ত জরুরি। কেবল পোশাকশিল্পের ওপর নির্ভর না করে নতুন রপ্তানি খাত গড়ে তোলা প্রয়োজন। পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি ও উৎপাদন দক্ষতা উন্নয়নও গুরুত্বপূর্ণ। তথ্যপ্রযুক্তি, ওষুধশিল্প, চামড়া ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা কাজে লাগানো যেতে পারে। উদ্ভাবন ও উচ্চমূল্য সংযোজনই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার চাবিকাঠি। সঠিক কৌশল গ্রহণ করলে রপ্তানি খাত এই উত্তরণের ধাক্কা সামলে নিতে পারবে।

বৈদেশিক ঋণ ও সহায়তার পরিবর্তন

উত্তরণের ফলে বৈদেশিক ঋণ ও উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসবে। LDC দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ এবং বিভিন্ন অনুদান পেত। উত্তরণের পর এসব সুবিধার শর্ত কঠোর হতে পারে এবং সুদের হার বাড়তে পারে। উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণও কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[৪] এর ফলে উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ বাড়াতে হবে। কর আদায় বৃদ্ধি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা প্রয়োজন। বেসরকারি বিনিয়োগ ও বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকর্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনই দীর্ঘমেয়াদি সমাধান। উত্তরণের পর দেশকে আরও আত্মনির্ভর অর্থনীতির দিকে এগোতে হবে।

দক্ষ মানবসম্পদের প্রয়োজনীয়তা

উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ মানবসম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির জন্য শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি অপরিহার্য। তরুণ সমাজকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন। দক্ষ জনশক্তি উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন ও সেবা খাতে অবদান রাখতে পারে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তথ্যপ্রযুক্তি ও আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ রয়েছে, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।[৫] দক্ষ মানবসম্পদ প্রচলিত পণ্য রপ্তানির ঝুঁকি অনেকটা পুষিয়ে দিতে পারে। জ্ঞান ও উদ্ভাবননির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য। তাই শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ সবচেয়ে লাভজনক বিনিয়োগ। মানবসম্পদই একটি জাতির সবচেয়ে বড়ো সম্পদ।

শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যকরণ

উত্তরণ-পরবর্তী টেকসই অর্থনীতির জন্য শিল্পায়ন ও বৈচিত্র্যকরণ অপরিহায। একক খাতের ওপর অতিরিক্ত নিভরতা অথনীতিকে ঝুঁকিপূণ করে তোলে। বিভিন শিল্প খাতের বিকাশ অথনীতিকে স্থিতিশীল ও সহনশীল করে। ভারী শিল্প, প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প ও সেবা খাতের বিকাশ প্রয়োজন। অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যকরণ কমসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে। নতুন নতুন পণ্য ও সেবার উৎপাদন রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করে। উদ্ভাবন ও গবেষণায় বিনিয়োগ শিল্পের পতিযোগিতা বাড়ায়। বিশেষ

অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শিল্পপাক বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়ক। বৈচিত্র্যময় অর্থনীতি বৈশিক ধাক্কা সামলাতে সক্ষম। তাই শিল্পায়ন একটি কৌশলগত অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। বৈচিত্র্যকরণই দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক নিরাপত্তার চাবিকাঠি।

বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উত্তরণ টেকসই করতে অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ অপরিহার্য। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। বিনিয়োগ আকর্ষণে সুশাসন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আইনের শাসন জরুরি। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস ও ব্যাবসা সহজীকরণ বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করে। উন্নত অবকাঠামো, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনিয়োগের পূর্বশর্ত। দুর্নীতি হ্রাস ও স্বচ্ছ নীতিমালা বিনিয়োগের আস্থা বৃদ্ধি করে। বিনিয়োগকারীদের জন্য নিরাপত্তা ও মুনাফা প্রত্যাবাসনের নিশ্চয়তা প্রয়োজন। একটি বন্ধুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ পরিবেশ অর্থনৈতিক উত্তরণকে শক্তিশালী করে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়ক। তাই বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন একটি জাতীয় অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

উত্তরণের সম্ভাবনা ও সুযোগ

উত্তরণ নতুন সম্ভাবনা ও সুযোগও নিয়ে আসে। উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে দেশকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। উন্নত দেশের সঙ্গে সমান মর্যাদায় বাণিজ্য চুক্তি করার সুযোগ তৈরি হয়। দেশের ঋণযোগ্যতা ও আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়ে। উত্তরণ দেশকে উচ্চমূল্যের পণ্য ও সেবা উৎপাদনে উৎসাহিত করে। এটি অর্থনৈতিক কাঠামোর আধুনিকীকরণের সুযোগ এনে দেয়। নতুন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন গ্রহণের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের প্রভাব ও কণ্ঠস্বর শক্তিশালী হয়। সঠিক কৌশল গ্রহণ করলে এই সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগিয়ে দেশ আরও এগিয়ে যেতে পারে। উত্তরণ একটি উচ্চতর অর্থনৈতিক স্তরে পৌছানোর সিঁড়ি। সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তর করাই এখন মূল চ্যালেঞ্জ।

সরকারের প্রস্তুতি ও কৌশল

উত্তরণ–পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারের সুপরিকল্পিত প্রস্তুতি অপরিহার্য। প্রধান উপদেষ্টা আগেভাগেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৬] সরকার একটি সুসংহত উত্তরণ কৌশল প্রণয়ন করছে। রপ্তানি বহুমুখীকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ আকর্ষণ এই কৌশলের কেন্দ্রবিন্দু। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বি-পক্ষীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে অন্তর্বর্তীকালীন সুবিধা আদায়ের চেষ্টা চলছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা হচ্ছে। বেসরকারি খাত ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সমন্বয় করে নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে। আগাম প্রস্তুতিই উত্তরণকে মসৃণ ও সফল করার চাবিকাঠি। সরকারের দূরদর্শী পরিকল্পনা এই ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা রাখবে।

টেকসই উন্নয়নের পথে অগ্রযাত্রা

LDC থেকে উত্তরণ টেকসই উন্নয়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উত্তরণের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করে এই অগ্রগতি কতটা টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক তার ওপর। কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়, সামাজিক ন্যায়বিচার ও পরিবেশ সুরক্ষাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নের সুফল যেন সমাজের সব স্তরে পৌছায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। বৈষম্য হ্রাস ও দারিদ্র্য নির্মূল টেকসই উনয়নের অপরিহায শত। পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু-সহনশীল উনয়ন কৌশল গহণ করা পয়োজন। জাতিসংঘের টেকসই উনয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অজনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। উত্তরণকে টেকসই করতে হলে দীর্ঘমেয়াদি ও সুষম পরিকল্পনা প্রয়োজন। প্রকৃত উন্নয়ন মানে সবার জন্য মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করা। টেকসই অগ্রযাত্রাই একটি জাতির স্থায়ী সমৃদ্ধির ভিত্তি।

উপসংহার

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ বাংলাদেশের জন্য এক ঐতিহাসিক অর্জন ও গর্বের বিষয়। এটি দশকের পর দশক ধরে চলা অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ও মানুষের পরিশ্রমের স্বীকৃতি। তবে এই উত্তরণ যেমন– সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়, তেমনি নানা চ্যালেঞ্জও নিয়ে আসে– বিশেষত বাণিজ্য সুবিধা হারানো ও প্রতিযোগিতার চাপ। সুপরিকল্পিত প্রস্তুতি, রপ্তানি

বৈচিত্র্যকরণ, দক্ষ মানবসম্পদ ও অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়ক হবে। সঠিক কৌশল ও জাতীয় সংকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ এই উত্তরণকে একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত জাতি গঠনের সোপানে রূপান্তরিত করতে পারবে।

তথ্যসূত্র

১. *"এলডিসি উত্তরণ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো দেশের জন্য ক্ষতিকারক", দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সিপিডি (CPD), ১৫ মার্চ ২০২৫ (বাংলাদেশই হবে প্রথম দেশ যে তিন সূচকেই উত্তীর্ণ)।*

২. *"২০২৬ সালেই এলডিসি থেকে উত্তরণ, পেছাবে না সরকার", প্রথম আলো (১৩–১৪ মার্চ ২০২৫); যুগান্তর (১৩ মার্চ ২০২৫); উত্তরণের তারিখ ২৪ নভেম্বর ২০২৬।*

৩. *"এলডিসি থেকে উত্তরণের শেষ ধাপেও পাস, তবে চ্যালেঞ্জ ৪টি", প্রথম আলো; ইইউ GSP সুবিধা ২০২৯ সাল পর্যন্ত অব্যাহত।*

৪. *"এলডিসি উত্তরণ ও পরবর্তী চ্যালেঞ্জ", দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সিপিডি (সহজ শর্তের ঋণ ও নগদ সহায়তা সীমিত হওয়ার আশঙ্কা)।*

৫. *"এলডিসি থেকে উত্তরণ ও পরবর্তী চ্যালেঞ্জ", নিউজ বাংলা২৪ (দক্ষ মানবসম্পদ, আউটসোর্সিং ও ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত)।*

৬. *"২০২৬ সালেই এলডিসি থেকে উত্তরণ", উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত প্রতিবেদন, ওয়েব বাংলাদেশ; প্রেস সচিবের ব্রিফিং।*

১৮১. প্রবাসী আয় ও রেমিট্যান্স যোদ্ধা

ভূমিকা

হাজার মাইল দূরে, প্রিয়জনকে ছেড়ে, অপরিচিত দেশে কঠোর পরিশ্রম করে যাঁরা দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখছেন– তাঁরাই আমাদের 'রেমিট্যান্স যোদ্ধা'। তাঁদের পাঠানো প্রতিটি টাকা কেবল পরিবারের মুখে হাসি ফোটায় না, বরং জাতীয় অর্থনীতির ভিতও মজবুত করে। ২০২৫ সালে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স ইতিহাসের সর্বোচ্চ রেকর্ড ছুঁয়েছে– এটি ৩ কোটিরও বেশি প্রবাসীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের উজ্জ্বল স্বীকৃতি।

রেমিট্যান্স কী এবং কেন গুরুত্বপূর্ণ

রেমিট্যান্স হলো বিদেশে কর্মরত নাগরিকরা তাঁদের উপার্জনের অংশ দেশে পাঠানোর প্রক্রিয়া। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের উৎস, তৈরি পোশাক রপ্তানির ঠিক পরেই অবস্থান করে। রেমিট্যান্স সরাসরি পরিবারের কাছে পৌঁছায় বলে এর দারিদ্র্য বিমোচন প্রভাব অত্যন্ত তাৎক্ষণিক এবং শক্তিশালী। প্রবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মজবুত করেন, আমদানি ব্যয় মেটাতে সহায়তা করেন এবং মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখেন।

ঐতিহাসিক রেমিট্যান্স প্রবাহ– বার্ষিক তুলনা

নিচের সারণিতে গত কয়েক বছরের রেমিট্যান্স প্রবাহের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হলো:

অর্থবছর/বছর	মোট রেমিট্যান্স	প্রবৃদ্ধি	মন্তব্য
২০২০–২১	৳ ২৪.৭৮ বিলিয়ন	৩৬.১%	পূর্ববর্তী রেকর্ড
২০২১–২২	৳ ২১.০৩ বিলিয়ন	–১৫.১%	হুন্ডি বৃদ্ধি
২০২২–২৩	৳ ২১.৯০ বিলিয়ন	+৪.১%	ধীর পুনরুদ্ধার
২০২৩–২৪	৳ ২৬.৮৮ বিলিয়ন	+২২.৮%	শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি
২০২৪–২৫ (ঋণ)	৳ ৩০.৩২ বিলিয়ন	+২৬.৮%	নতুন রেকর্ড (ঋণ)
২০২৫ (ক্যালেন্ডার)	৳ ৩২.৮২ বিলিয়ন	+২২%	সর্বকালের সর্বোচ্চ

সারণি ১: বাংলাদেশের বার্ষিক রেমিট্যান্স প্রবাহ। সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক; The Daily Star (জানুয়ারি ২০২৬); The Financial Express (২০২৫)

২০২৫ সালের রেকর্ড– ইতিহাসের সোনালি অধ্যায়

২০২৫ সাল বাংলাদেশের রেমিট্যান্স ইতিহাসে একটি মাইলফলক বছর। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ ক্যালেন্ডার বছরে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৩২.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার– যা আগের বছরের চেয়ে ২২% বেশি এবং

বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। একমাত্র মার্চ ২০২৫-এ এসেছে ৩.২৯ বিলিয়ন ডলার– একটি মাসে সর্বোচ্চ প্রবাহ। এই অভূতপূর্ব সাফল্যের পেছনে রয়েছে হুন্ডি হ্রাস, বৈধ চ্যানেলে আস্থা বৃদ্ধি এবং প্রবাসীদের দেশপ্রেমের নবজাগরণ।

মাসিক রেমিট্যান্সের ধারা– ঋণ ২০২৫–২৬

ঋণ ২০২৫–২৬ সালেও রেমিট্যান্সের ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত। নিচের সারণিতে মাসওয়ারি তথ্য দেওয়া হলো:

মাস	রেমিট্যান্স আয়	মন্তব্য
জুলাই ২০২৫	৳ ২.৪৭ বিলিয়ন	ঋণ ২৫–২৬–এর শুভ সূচনা
আগস্ট ২০২৫	৳ ২.৪২ বিলিয়ন	স্থিতিশীল প্রবাহ (+৯%)
সেপ্টেম্বর ২০২৫	৳ ২.৬৮ বিলিয়ন	শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি (+১২%)
অক্টোবর ২০২৫	৳ ২.৪৩ বিলিয়ন	+১০.২% প্রবৃদ্ধি
নভেম্বর ২০২৫	৳ ২.৮৮ বিলিয়ন	ঊর্ধ্বমুখী ধারা
ডিসেম্বর ২০২৫	৳ ৩.২২ বিলিয়ন	৯ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ (+২২%)

সারণি ২: মাসিক রেমিট্যান্স প্রবাহ – ঋণ ২০২৫–২৬। সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক, Daily Bangla Post (জানুয়ারি ২০২৬)

প্রধান শ্রমবাজার ও গন্তব্য

বাংলাদেশি প্রবাসীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত। নিচে প্রধান গন্তব্য ও কর্মক্ষেত্রের চিত্র তুলে ধরা হলো:

গন্তব্য দেশ	কাজের ধরন	অবস্থান
সৌদি আরব	সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি কর্মী; নির্মাণ ও সেবা	মোট প্রবাসীর ৩০%
সংযুক্ত আরব আমিরাত	বহুমুখী কাজ; দক্ষ ও অদক্ষ উভয় শ্রেণি	দ্বিতীয় বৃহত্তম
মালয়েশিয়া	উৎপাদন, নির্মাণ, কৃষিখাত	তৃতীয় প্রধান বাজার
কুয়েত, কাতার, ওমান	পরিচ্ছন্নতা, নির্মাণ, গৃহকর্মী	মধ্যপ্রাচ্যের মূল বাজার
যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য	দক্ষ পেশাজীবী ও প্রবাসী সম্প্রদায়	উচ্চ মজুরির বাজার
ইতালি, সিঙ্গাপুর	কৃষি, নির্মাণ ও প্রযুক্তি খাত	উদীয়মান বাজার

সারণি ৩: প্রধান প্রবাসী শ্রমবাজার। সূত্র: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; BMET ২০২৫

রেমিট্যান্স বৃদ্ধির কারণসমূহ

হুন্ডির পতন: আগস্ট ২০২৪-এর রাজনৈতিক-পট পরিবর্তনের পর হুন্ডি নেটওয়ার্ক অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে পুরো রেমিট্যান্সই এখন ব্যাংকিং চ্যানেলে আসছে।

সরকারি প্রণোদনা: সরকার ২.৫% নগদ প্রণোদনা দিচ্ছে বৈধ পথে অর্থ পাঠানোর জন্য। এই সুবিধা প্রবাসীদের আকৃষ্ট করছে।

বিনিময় হার স্থিতিশীলতা: আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বাজারের মধ্যে ব্যবধান কমায় বৈধ চ্যানেলে আসার উৎসাহ বেড়েছে।

দেশপ্রেমের নতুন তরঙ্গ: রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর প্রবাসীদের মধ্যে দেশের প্রতি আস্থা ও ভালোবাসা নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

রেমিট্যান্স ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

রেমিট্যান্স বৃদ্ধির সরাসরি সুফল পড়েছে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে। ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ নাগাদ দেশের মোট রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৩.১৮ বিলিয়ন ডলারে, যা এক বছর আগের ২৫ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। BPM6 মানদণ্ড অনুযায়ী রিজার্ভ ২৮.৫২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে– তিন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের আত্মত্যাগ

রেমিট্যান্স কেবল সংখ্যা নয়– এর পেছনে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের নীরব ত্যাগের গল্প। প্রবাসীরা সন্তানের প্রথম পদক্ষেপ মিস করেন, ঈদে ঘরে ফিরতে পারেন না, অসুস্থ মায়ের শিয়রে বসতে পারেন না। কেউ কেউ বিদেশের মাটিতেই জীবন হারান। অনেকে মানসিক একাকিত্বে ভোগেন। এই নীরব বেদনার মূল্যেই দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে।

পরিবার ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রভাব

রেমিট্যান্সের অর্থ সরাসরি পরিবারের কাছে পৌঁছায় বলে এর সামাজিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী। প্রবাসী পরিবারগুলো উন্নত গৃহনির্মাণ, মানসম্পন্ন শিক্ষা ও পুষ্টিকর খাবারের সুযোগ পায়। গ্রামীণ এলাকায় ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, নতুন ব্যবসা ও উদ্যোগ গড়ে ওঠে। এই আয় ২০০৫ সাল থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় এক কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার উপরে তুলেছে বলে অনুমান করা হয়।

দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশি প্রবাসীদের একটি বড়ো অংশ এখনো অদক্ষ বা স্বল্পদক্ষ শ্রমিক হিসেবে বিদেশে যান এবং তুলনামূলক কম মজুরি পান। দক্ষ জনশক্তি পাঠানোর মাধ্যমে একই সংখ্যক কর্মী থেকে দ্বিগুণ বা তার বেশি রেমিট্যান্স অর্জন সম্ভব। BMET–এর তথ্য অনুযায়ী ঋণ ২০২৪–২৫ পর্যন্ত চার বছরে ৪০ লাখেরও বেশি বাংলাদেশি বিদেশে গেছেন। এই সংখ্যার সিংহভাগ যদি দক্ষ হয়ে যায়, তাহলে রেমিট্যান্স আরও অনেক বাড়বে।

বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর গুরুত্ব

হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাঠালে দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠালে দেশের রিজার্ভ বাড়ে, সরকারি প্রণোদনা পাওয়া যায় এবং পরিবারের অর্থ নিরাপদভাবে পৌঁছায়। সাম্প্রতিক রেকর্ড প্রমাণ করেছে যে বৈধ চ্যানেলে আস্থা বৃদ্ধিই রেমিট্যান্স বৃদ্ধির সবচেয়ে কার্যকর চাবিকাঠি।

প্রবাসীদের সমস্যা ও দুর্ভোগ

রেমিট্যান্স যোদ্ধারা অনেক সময় প্রতারণা, অমানবিক কর্মপরিবেশ ও শ্রম শোষণের শিকার হন। অভিবাসনের সময় দালালচক্রের প্রতারণায় অনেকে সর্বস্বান্ত হন। উচ্চ অভিবাসন ব্যয় তাঁদের ওপর অতিরিক্ত চাপ ফেলে। বিদেশে অসুস্থ হলে বা আইনি জটিলতায় পড়লে অনেকে অসহায় হয়ে পড়েন। দেশে ফেরার পর পুনর্বাসনেও অনেকে সমস্যায় পড়েন।

প্রবাসী কল্যাণে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব

যাঁরা দেশের জন্য এত অবদান রাখছেন, তাঁদের কল্যাণ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। বিমানবন্দরে হয়রানিমুক্ত সেবা, বিদেশে দূতাবাসের সক্রিয় সহায়তা, অভিবাসন ব্যয় হ্রাস এবং প্রবাসফেরতদের পুনর্বাসনে সহায়তা– এসব বিষয়ে রাষ্ট্রকে আরও সক্রিয় হতে হবে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ও বিভিন্ন বিমা প্রকল্পের পরিধি আরও বাড়ানো দরকার।

রেমিট্যান্সের উৎপাদনশীল ব্যবহার

রেমিট্যান্সের অর্থের একটি বড়ো অংশ যদি কেবল ভোগে ব্যয় হয়, তাহলে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রভাব সীমিত থাকে। প্রবাসী বন্ড, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প ও আর্থিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রবাসী পরিবারগুলোকে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে উৎসাহিত করা সম্ভব। CPD–এর প্রখ্যাত গবেষক মুস্তাফিজুর রহমানের মতে, রেমিট্যান্সই এখন দেশের রপ্তানির দুর্বলতাকে সফলভাবে পূরণ করছে।

উপসংহার

প্রবাসী রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির এক অপরিহার্য জীবনধারা। ২০২৫ সালের ৩২.৮২ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড রেমিট্যান্স প্রমাণ করে যে রেমিট্যান্স যোদ্ধারা তাঁদের শ্রেষ্ঠ অবদান রাখছেন। কিন্তু শুধু সংখ্যা দিয়ে তাঁদের ত্যাগ পরিমাপ করা যায় না। দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি, নিরাপদ অভিবাসন, প্রবাসী কল্যাণ এবং রেমিট্যান্সের উৎপাদনশীল ব্যবহার নিশ্চিত করে এই খাতকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব। রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের প্রতি যথাযথ কৃতজ্ঞতা ও মর্যাদার প্রকাশই হবে জাতির পক্ষ থেকে সত্যিকারের সম্মান।

তথ্যসূত্র

১. *The Daily Star- Remittances hit record $32.8b in 2025, shoring up reserves- thedailystar.net, ১ জানুয়ারি ২০২৬*
২. *The Financial Express- Remittances hit record high in 2025- thefinancialexpress.com.bd, ২০২৬*

৩. *The Business Standard- December sees Bangladesh's second-highest remittance inflow $3.22b- tbsnews.net, ১ জানুয়ারি ২০২৬*
৪. *Daily Bangla Post - Bangladesh records a historic $17.17 billion in FY2025–26 remittances - dailybanglapost.com, জানুয়ারি ২০২৬*
৫. *Bangladesh Bank Monthly Remittance Report; Trading Economics- bb.org.bd; tradingeconomics.com*
৬. *The Daily Star - Remittance up by $6.4b in FY25 - thedailystar.net, জুলাই ২০২৫*
৭. *BMET-Overseas Employment Data ঋণ ২০২৪–২৫ – প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়*

১৮২. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ

ভূমিকা

"Artificial Intelligence is the new electricity." [১] – বিখ্যাত AI গবেষক Andrew Ng-এর এই উক্তি বর্তমান বিশ্বের প্রযুক্তিগত বাস্তবতাকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। বিদ্যুৎ একসময় শিল্পবিপ্লবের গতিপথ যেমন বদলে দিয়েছিল, তেমনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence AI) আজ বিশ্বসভ্যতার অর্থনীতি, শিক্ষা, চিকিৎসা, রাজনীতি ও সামাজিক কাঠামোকে দ্রুত রূপান্তরিত করছে। ChatGPT, self-driving vehicle, AI-generated content, smart robot কিংবা automated decision-making system– এসব এখন আর কল্পবিজ্ঞান নয়; বরং আধুনিক জীবনের অংশ। বাংলাদেশও এই বৈশ্বিক প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের বাইরে নয়। "স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে AI-কে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে AI যেমন নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে, তেমনি কর্মসংস্থান সংকট, misinformation, cyber risk I ethical dilemma-এর মতো জটিল প্রশ্নও সৃষ্টি করছে। তাই AI বাংলাদেশের জন্য একই সঙ্গে সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জের প্রতীক।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ধারণা ও বিকাশ

"AI is the simulation of human intelligence in machines." [২] – এই সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো এমন প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে যন্ত্র মানুষের মতো চিন্তা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করে। Machine Learning, Deep Learning, Robotics এবং Natural Language Processing AI-এর গুরুত্বপূর্ণ শাখা। বর্তমানে AI মানুষের ভাষা বুঝতে, ছবি বিশ্লেষণ করতে, রোগ শনাক্ত করতে এমনকি সৃজনশীল লেখালেখিও করতে সক্ষম। ১৯৫০ সালে Alan Turing "Can machines think? " প্রশ্ন উত্থাপন করার পর থেকেই AI গবেষণার ভিত্তি গড়ে ওঠে। আজ OpenAI, Google DeepMind, Microsoft I NVIDIA-এর মতো প্রতিষ্ঠান AI উন্নয়নে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতির পরবর্তী বড়ো পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু এখন AI।

বৈশ্বিক AI প্রতিযোগিতা ও বাংলাদেশের অবস্থান

বর্তমানে AI উন্নয়নকে কেন্দ্র করে বিশ্বে এক নতুন প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন AI supremacy অর্জনের জন্য বিপুল বিনিয়োগ করছে। European Union AI regulation ও ethical AI framework তৈরি করছে। India AI Mission ও Saudi Arabia AI Vision-এর মতো কর্মসূচিও বিশ্বজুড়ে আলোচিত। Oxford Insights-এর Government AI Readiness Index অনুযায়ী, AI প্রস্তুতির দিক থেকে উন্নত দেশগুলো দ্রুত এগিয়ে গেলেও উন্নয়নশীল দেশগুলো এখনও infrastructure ও skilled manpower সংকটে ভুগছে। বাংলাদেশে AI-based startup, automation এবং data science-এর প্রতি তরুণদের আগ্রহ বাড়ছে। তবে research funding, উচ্চমানের AI lab এবং advanced computing infrastructure এখনও সীমিত। ফলে বৈশ্বিক AI প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে AI-এর বিপ্লব

"Education রং no longer limited to classrooms."[৩] – AI শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দিচ্ছে। AI-based adaptive learning system শিক্ষার্থীর দক্ষতা অনুযায়ী আলাদা learning pattern তৈরি করতে পারে। Virtual tutor, automated assessment ও smart classroom শিক্ষাকে আরও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও কার্যকর করছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে, সেখানে AI-powered online education গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে

পারে। Chatbot-based শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের ২৪ ঘণ্টা সহায়তা দিতে সক্ষম। এছাড়া AI translation system বাংলা ভাষায় আন্তর্জাতিক জ্ঞানভান্ডারকে সহজলভ্য করতে পারে। তবে AI-এর অতিরিক্ত নির্ভরতা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই প্রযুক্তি ও মানবিক শিক্ষার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা জরুরি।

কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজারে AI-এর প্রভাব

"AI will transform the future of work."[৪]– World Economic Forum-এর এই পর্যবেক্ষণ বর্তমান শ্রমবাজারের বাস্তবতাকে তুলে ধরে। AI automation repetitive ও routine কাজগুলোকে দ্রুত প্রতিস্থাপন করছে। ব্যাংকিং, customer service, manufacturing I data entry sector-এ automation বাড়ছে। ফলে low-skill workforce সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। তবে একইসঙ্গে AI engineer, cybersecurity expert, prompt engineer, robotics developer ও data analyst- মতো নতুন পেশার চাহিদাও বাড়ছে। বাংলাদেশের তরুণদের future-read skill অর্জন করতে না পারলে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই education system-এ coding, robotics, AI literacy I data science অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

ফ্রিল্যান্সিং ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে AI

বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বড়ো freelancing hub| Fiver, Upwork ও Freelancer-এর মতো platform–এ হাজারো বাংলাদেশি কাজ করছেন। AI tools ব্যবহারের মাধ্যমে graphic design, video editing, content writing ও software development আরও দ্রুত ও উন্নত হচ্ছে। AI-assisted productivity freelancer-দের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা দিচ্ছে। তবে যারা AI ব্যবহারে দক্ষ নয়, তারা ভবিষ্যতে পিছিয়ে পড়তে পারে। "The future belongs to those who can work alongside AI."[৫]– এই বাস্তবতা এখন স্পষ্ট। ফলে freelancing sector-এ AI literacy অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে AI-এর সম্ভাবনা

AI healthcare sector-এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনছে। AI-based software X-ray, MRI ও CT scan বিশ্লেষণ করে দ্রুত রোগ শনাক্ত করতে পারে। Telemedicine system বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দিতে সহায়ক হতে পারে। COVID–19 পরবর্তী বিশ্বে AI-driven disease prediction system-এর গুরুত্ব বহুগুণ বেড়েছে। বাংলাদেশে যদি AI-powered digital health infrastructure তৈরি করা যায়, তবে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় ও সময় উভয়ই কমবে। একইসঙ্গে AI patient monitoring system হাসপাতাল ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করতে পারে।

কৃষিক্ষেত্রে AI

"Smart agriculture এবং the future of food security."[৬]– খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে AI গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের কৃষিখাতে AI-based weather forecasting, pest detection ও soil analysis প্রযুক্তি উৎপাদন বাড়াতে সহায়ক হতে পারে। Drone technology ও smart irrigation system কৃষিকে আরও আধুনিক করবে। কৃষকেরা real-time data পেলে সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। ফলে উৎপাদন খরচ কমবে এবং খাদ্য উৎপাদন বাড়বে।

AI ও সাইবার নিরাপত্তা

ডিজিটাল বিশ্বে cyber attack এখন বড়ো হুমকি। AI cyber defense system হ্যাকিং প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একই সঙ্গে AI-generated deepfake, misinformation ও automated cyber attack নতুন ঝুঁকি তৈরি করছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং sector ও সরকারি database রক্ষায় AI-based cybersecurity system অত্যন্ত জরুরি। Data privacy আইন শক্তিশালী না হলে নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

AI ও নৈতিকতা

"Technology must serve humanity, not replace humanity."[৭]– AI ব্যবহারে নৈতিকতার প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। AI bias সমাজে বৈষম্য বাড়াতে পারে। Facial recognition system ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য হুমকি

হতে পারে। AI-generated misinformation গণতন্ত্র ও সামাজিক স্থিতিশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। UNESCO AI Ethics Recommendation অনুযায়ী, AI ব্যবহারে মানবাধিকার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি।

বাংলা ভাষা ও AI–এর ভবিষ্যৎ

বাংলা ভাষাভিত্তিক AI ecosystem তৈরি করা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা speech recognition, AI translation system ও chatbot প্রযুক্তি ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি বাড়াবে। বর্তমানে বাংলা ভাষার data scarcity AI উন্নয়নের বড়ো বাধা। গবেষণা ও ভাষাভিত্তিক প্রযুক্তি উন্নয়নে বিনিয়োগ না করলে ভবিষ্যতে ভাষাগত বৈষম্য তৈরি হতে পারে।

AI ও স্মার্ট বাংলাদেশ

"Smart Bangladesh Vision 2041" বাস্তবায়নে AI গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। Smart governance, smart healthcare, smart economy ও smart agriculture গঠনে AI বিশাল ভূমিকা পালন করবে। AI-driven digital service নাগরিক জীবনকে আরও দ্রুত, সহজ ও স্বচ্ছ করতে পারে। ফলে প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের পথ আরও সুগম হবে।

বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে AI উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড়ো সমস্যা হলো skilled manpower-এর অভাব, research funding-এর সীমাবদ্ধতা ও advanced infrastructure-এর ঘাটতি। এছাড়া digital divide এখনও বড়ো বাস্তবতা। শহর ও গ্রামের প্রযুক্তিগত বৈষম্য AI ব্যবহারের সুযোগে অসমতা সৃষ্টি করতে পারে। তাই inclusive digital policy অত্যন্ত জরুরি।

ভবিষ্যৎ করণীয়

বাংলাদেশকে AI যুগে টিকে থাকতে হলে education reform, research investment ও skill development বাড়াতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে AI research center গড়ে তোলা প্রয়োজন। একইসঙ্গে AI policy, cyber law I ethical framework আধুনিকায়ন করতে হবে। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও private sector-এর সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া AI-based উন্নয়ন সম্ভব নয়।

উপসংহার

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বাংলাদেশের জন্য এক বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। তবে প্রযুক্তির সুফল পেতে হলে দক্ষ মানবসম্পদ, নৈতিক নীতি ও সঠিক পরিকল্পনা অপরিহার্য। AI-কে ভয় না পেয়ে দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করতে হবে। সঠিকভাবে প্রয়োগ করা গেলে AI বাংলাদেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশাসনকে নতুন উচ্চতায় পৌছে দিতে সক্ষম হবে। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ হবে পযুক্তিনির্ভর, উদ্ভাবনী ও জ্ঞানভিত্তিক– যেখানে AI উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

তথ্যসূত্র

১. *Andrew Ng, Stanford University AI Lecture Series, 2024.*
২. *Russell & Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Pearson Education।*
৩. *UNESCO Global Education Monitoring Report, 2025.*
৪. *World Economic Forum, Future of Jobs Report, 2025.*
৫. *Reuters Technology Outlook, 2025.*
৬. *FAO Digital Agriculture Report, 2024.*
৭. *UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, 2024.*

১৮৩. ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ

ভূমিকা

"Digital transformation is not about technology alone; it is about transforming society." [১]– বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনকে এই উক্তি অত্যন্ত গভীরভাবে তুলে ধরে। একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তি কেবল যোগাযোগের

মাধ্যম নয়; বরং অর্থনীতি, শিক্ষা, প্রশাসন, স্বাস্থ্যসেবা ও নাগরিক জীবনের মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশও গত এক দশকে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" কর্মসূচির মাধ্যমে প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নের একটি নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। এখন দেশ "স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১" বাস্তবায়নের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই রূপান্তরের লক্ষ্য একটি দক্ষ, উদ্ভাবনী, জ্ঞানভিত্তিক ও মানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা। Digital Bangladesh ছিল প্রযুক্তির ভিত্তি নির্মাণের ধাপ, আর Smart Bangladesh সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের জ্ঞাননির্ভর রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা।

ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণা ও সূচনা

"Digital Bangladesh" ধারণাটি ২০০৮ সালের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গুরুত্ব লাভ করে। এর মূল লক্ষ্য ছিল তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া এবং ডিজিটাল বৈষম্য কমানো। Internet connectivity বৃদ্ধি, e-governance, online education এবং ICT-based economy গড়ে তোলাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। এই কর্মসূচির ফলে বাংলাদেশে প্রযুক্তি ব্যবহারের সংস্কৃতি দ্রুত বিস্তৃত হয়। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, online সরকারি সেবা এবং mobile banking সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় বড়ো পরিবর্তন আনে। Digital Bangladesh মূলত প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণ নিশ্চিত করেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রধান অর্জন

গত এক দশকে বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তি খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বর্তমানে দেশে internet ব্যবহারকারীর সংখ্যা কোটি ছাড়িয়েছে। Mobile financial service যেমন– বিকাশ, নগদ ও রকেট আর্থিক লেনদেনকে সহজ করেছে। E-passport, online tax payment, land record digitization এবং digital healthcare system প্রশাসনিক সেবাকে আরও সহজ করেছে। Freelancing sector-এ বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছেছে। ICT export আয়ও ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব অর্জন "ডিজিটাল বাংলাদেশ" ধারণার বাস্তব সফলতার প্রমাণ।

স্মার্ট বাংলাদেশের ধারণা

"Smart Bangladesh is the next evolution of Digital Bangladesh."[২]– Smart Bangladesh মূলত ডিজিটাল রূপান্তরের উন্নত সংস্করণ। এর ভিত্তি হলো চারটি pillar: Smart Citizen, Smart Economy, Smart Government এবং Smart Society। Artificial Intelligence, Internet of Things (IoT), Big Data, Cloud Computing ও 5G technology হবে এর প্রধান ভিত্তি। স্মার্ট বাংলাদেশ innovation-driven ও knowledge-based society গঠনের পরিকল্পনা।

স্মার্ট নাগরিক গঠন

স্মার্ট বাংলাদেশের মূল শক্তি হবে দক্ষ ও প্রযুক্তিবান্ধব নাগরিক। Digital literacy ছাড়া স্মার্ট রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। ভবিষ্যতের নাগরিককে শুধু প্রযুক্তি ব্যবহারকারী নয়; technology creator হতে হবে। Coding, robotics, AI literacy ও critical thinking শিক্ষায় গুরুত্ব বাড়ানো জরুরি। একইসঙ্গে প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহার ও cyber awareness নিশ্চিত করতে হবে। প্রযুক্তিগত দক্ষতার পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

স্মার্ট সরকার ও প্রশাসন

"Good governance depends on smart governance."[৩]– স্মার্ট সরকারের মূল লক্ষ্য হলো দ্রুত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন নিশ্চিত করা। E-governance, digital identity system ও AI-based public service সরকারি সেবাকে আরও কার্যকর করতে পারে। Online service delivery দুর্নীতি ও হয়রানি কমাতে সহায়তা করে। Smart governance নাগরিক ও সরকারের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে আনে। একইসঙ্গে data-driven policy making প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে আরও কার্যকর করে তুলতে পারে।

স্মার্ট অর্থনীতি ও ডিজিটাল বাণিজ্য

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন দ্রুত ডিজিটাল রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। E-commerce, fintech, startup ecosystem ও freelancing sector নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তৈরি করছে। Smart economy cashless transaction ও

digital entrepreneurship–এর ওপর নির্ভরশীল হবে। বর্তমানে mobile banking ও QR-based payment system অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে আরও সহজ করেছে। Artificial Intelligence ও automation উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সহায়তা করবে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

5G প্রযুক্তি ও ভবিষ্যৎ সংযোগব্যবস্থা

5G technology স্মার্ট বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। High-speed internet ও ultra-low latency future smart infrastructure-এর ভিত্তি তৈরি করবে। Smart traffic management, smart healthcare ও autonomous system পরিচালনায় 5G অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 5G technology শিল্প, শিক্ষা ও ব্যবসায় নতুন বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। তবে 5G infrastructure গড়ে তুলতে বড়ো বিনিয়োগ প্রয়োজন।

Internet of Things (IoT) ও স্মার্ট জীবনব্যবস্থা

IoT বা Internet of Things এমন একটি প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে বিভিন্ন যন্ত্র internet–এর মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। Smart home, smart city ও smart agriculture IoT–এর বাস্তব উদাহরণ। বাংলাদেশের শহর ব্যবস্থাপনায় IoT-based traffic monitoring system যানজট কমাতে সাহায্য করতে পারে। একইসঙ্গে energy management system বিদ্যুৎ অপচয় কমাতে পারে। ভবিষ্যতের নগরজীবন IoT technology–এর ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর

"Education must evolve with technology."[৪]–Smart Bangladesh বাস্তবায়নে smart education system অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Virtual classroom, AI tutor ও digital content শিক্ষাকে আরও accessible ও interactive করে তুলছে। Online learning platform প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিশ্বমানের শিক্ষা পৌছে দিতে পারে। COVID–19 pandemic-এর সময় digital education-এর গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তবে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধ ও গবেষণাভিত্তিক শিক্ষাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাস্থ্যসেবায় স্মার্ট প্রযুক্তি

Digital health system ভবিষ্যতের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করতে পারে। Electronic medical record, telemedicine ও AI-based diagnosis স্বাস্থ্যসেবাকে সহজ ও দ্রুত করছে। গ্রামীণ জনগণ online consultation–এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা পেতে পারে। একইসঙ্গে health data analysis রোগের পূর্বাভাস দিতে সহায়ক হতে পারে।

NABARUN PUBLICATION

স্মার্ট কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তা

বাংলাদেশের কৃষিখাতে প্রযুক্তির ব্যবহার খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। Drone technology, soil sensor ও AI-based weather forecasting কৃষকদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। Smart irrigation system পানির অপচয় কমাতে পারে। ফলে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং খাদ্যনিরাপত্তা আরও শক্তিশালী হবে।

সাইবার নিরাপত্তা ও ডিজিটাল ঝুঁকি

ডিজিটাল রাষ্ট্রব্যবস্থার সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো cyber security। Online banking, সরকারি database ও নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য cyber attack-এর ঝুঁকিতে থাকে। Deepfake, misinformation ও digital fraud ভবিষ্যতের বড়ো হুমকি। তাই Smart Bangladesh গঠনে শক্তিশালী cyber security framework অত্যন্ত জরুরি। একইসঙ্গে নাগরিকদের পুনবৎ awareness বৃদ্ধি করতে হবে।

পরিবেশ ও স্মার্ট প্রযুক্তি

Smart technology পরিবেশ সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। Smart energy system বিদ্যুৎ অপচয় কমাতে সাহায্য করে। Renewable energy monitoring ও smart waste management পরিবেশবান্ধব নগরব্যবস্থা গঠনে সহায়ক। Climate change মোকাবিলায় data-driven environmental monitoring অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ

স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো digital divide, skilled manpower–এর অভাব ও infrastructure limitation। গ্রামীণ অঞ্চলে এখনও internet speed ও প্রযুক্তিগত সুবিধা সমান নয়। এছাড়া cyber law ও data protection policy আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। প্রযুক্তির অপব্যবহার সামাজিক বৈষম্যও বাড়াতে পারে।

ভবিষ্যৎ করণীয়

বাংলাদেশকে স্মার্ট রাষ্ট্রে রূপান্তর করতে হলে education reform, research investment ও innovation culture গড়ে তুলতে হবে। একইসঙ্গে ICT sector-এ public-private partnership বাড়ানো জরুরি। প্রযুক্তি যেন কেবল শহরকেন্দ্রিক না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। Smart Bangladesh বাস্তবায়নে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, private sector ও নাগরিকদের সমন্বিত ভূমিকা অপরিহার্য।

উপসংহার

ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে উত্তরণ মূলত একটি প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নযাত্রা। এই রূপান্তরের লক্ষ্য কেবল আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার নয়; বরং একটি দক্ষ, উদ্ভাবনী ও মানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা। প্রযুক্তিকে মানব কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে পারলে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে জ্ঞানভিত্তিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে সক্ষম হবে। "Smart Bangladesh" হবে এমন এক সমাজ, যেখানে প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে আরও সহজ, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ করে তুলবে।

তথ্যসূত্র

১. *UNDP Digital Transformation Report, 2024.*
২. *ICT Division Bangladesh, "Smart Bangladesh Vision 2041".*
৩. *World Bank Governance and Digitalization Report, 2025.*
৪. *UNESCO Global Education Monitoring Report, 2025.*
৫. *Oxford Insights Government Digital Readiness Index, 2025.*
৬. *Reuters Technology and Digital Economy Report, 2025.*

১৮৪. "সাইবার নিরাপত্তা ও তথ্যের সুরক্ষা"

ভূমিকা

"Cyber security is the defining challenge of the digital age."[১]– বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতাকে এই উক্তি অত্যন্ত গভীরভাবে প্রকাশ করে। প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক সভ্যতায় মানুষ যত বেশি internet, cloud system, mobile banking ও digital platform-এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে, ততই বাড়ছে cyber attack, তথ্যচুরি, hacking ও digital fraud-এর ঝুঁকি। বর্তমান বিশ্বে তথ্যকে "নতুন তেল" বলা হয়, কারণ অর্থনীতি, ব্যবসা, প্রশাসন ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রায় সবকিছুই এখন data-এর ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশও দ্রুত ডিজিটাল রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। Mobile financial service, e-commerce, online governance ও social media ব্যবহারের বিস্তার দেশের অর্থনীতি ও সমাজে নতুন গতি এনেছে। তবে এই প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পাশাপাশি cyber crime, online প্রতারণা, data breach ও misinformation বড়ো হুমকি হয়ে উঠেছে। ফলে সাইবার নিরাপত্তা এখন জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রশ্নে পরিণত হয়েছে।

সাইবার নিরাপত্তা কী

"Cyber security means protecting systems, networks and data from digital attacks."[২]– সহজভাবে বলতে গেলে, সাইবার নিরাপত্তা হলো digital system, network ও তথ্যকে অনলাইন আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখার প্রক্রিয়া। Hacking, phishing, ransomware, malware ও identity theft বর্তমানে সবচেয়ে বড়ো cyber threat হিসেবে বিবেচিত। বর্তমান বিশ্বে ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত সবাই cyber attack-এর ঝুঁকিতে রয়েছে। একসময় যুদ্ধ হতো সীমান্তে; এখন যুদ্ধের একটি বড়ো অংশ virtual world-এ সংঘটিত হচ্ছে। তাই cyber security এখন সামরিক নিরাপত্তার মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ডিজিটাল যুগে তথ্যের গুরুত্ব

বর্তমানে তথ্যই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। Social media profile, banking information, medical record, biometric data– সবকিছুই digital form-এ সংরক্ষিত হচ্ছে। Artificial Intelligence ও Big Data economy–এর যুগে তথ্যের মূল্য আরও বেড়েছে। Google, Meta, Microsoft-এর মতো প্রতিষ্ঠান data-driven business model-এর মাধ্যমে বৈশ্বিক অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে। ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হলে শুধু আর্থিক ক্ষতি নয়; বরং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক নিরাপত্তাও হুমকির মুখে পড়ে। তাই তথ্য সুরক্ষা এখন মানবাধিকারের অংশ হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী সাইবার হুমকি বৃদ্ধি

"Cyber crime is expected to cost the world ৳ ১০.৫ trillion annually by 2025."[৩]– Cyber security Ventures-এর এই তথ্য cyber crime-এর ভয়াবহতা তুলে ধরে। বর্তমানে ransomware attack, banking fraud ও state-sponsored hacking দ্রুত বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া ও ইউরোপীয় দেশগুলো cyber warfare সক্ষমতা বাড়াচ্ছে। ২০২৪ ও ২০২৫ সালে বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান cyber attack-এর শিকার হয়েছে। Healthcare, banking ও energy sector সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ফলে cyber security এখন বৈশ্বিক নিরাপত্তা রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের সাইবার বাস্তবতা

বাংলাদেশে internet ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। BTRC-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশে কোটি কোটি মানুষ mobile internet ব্যবহার করছে। Mobile banking, e-commerce ও online governance ব্যবস্থার বিস্তার দেশের অর্থনীতিকে আরও digital করেছে। তবে এর সঙ্গে cyber fraud, hacking ও online scam-ও বেড়েছে। প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায়, mobile banking fraud ও Facebook-based scam সাধারণ মানুষের জন্য বড়ো সমস্যা হয়ে উঠেছে। এছাড়া সরকারি website hacking-এর ঘটনাও উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

ব্যাংকিং খাতে সাইবার ঝুঁকি

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা দেশের ইতিহাসে অন্যতম বড়ো cyber incident হিসেবে বিবেচিত।[৪] এই ঘটনা প্রমাণ করে যে cyber attack জাতীয় অর্থনীতির জন্য কতটা বিপজ্জনক হতে পারে। বর্তমানে online banking ও mobile financial service জনপ্রিয় হওয়ায় banking sector cyber criminal–দের প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। Phishing link, OTP fraud I fake app ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ফলে financial cyber security এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও misinformation

"False information spreads faster than truth in the digital age."[৫]– Social media misinformation বর্তমানে বৈশ্বিক উদ্বেগের বিষয়। Facebook, YouTube ও TikTok-এর মতো platform-এ fake news, propaganda ও deepfake দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশেও, Rse ও misinformation সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। AI-generated fake video ও manipulated image ভবিষ্যতে আরও বড়ো চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। তাই digital literacy ও fact-checking culture অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও data privacy

বর্তমানে মানুষ নিজের অজান্তেই বিপুল personal data online-এ শেয়ার করছে। Location data, browsing history, biometric information ও financial record বিভিন্ন digital platform সংগ্রহ করছে। যদি এই তথ্য ভুল হাতে পড়ে, তবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়তে পারে। European Union–এর GDPR আইন data privacy সুরক্ষায় বিশ্বব্যাপী উদাহরণ তৈরি করেছে। বাংলাদেশেও শক্তিশালী data protection framework প্রয়োজন।

শিক্ষাক্ষেত্রে সাইবার সচেতনতা

"Cyber awareness is the first line of defense."[৬]– Cyber security কেবল প্রযুক্তিগত বিষয় নয়; এটি সচেতনতারও বিষয়। বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে cyber safety education অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। তরুণদের phishing, online scam ও privacy protection সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। Digital literacy ছাড়া smart society গঠন সম্ভব নয়।

Artificial Intelligence ও cyber security

AI cybersecurity-কে আরও শক্তিশালী করতে পারে। AI-based threat detection system real-time attack শনাক্ত করতে সক্ষম। একইসঙ্গে AI cyber criminal-দের হাতেও শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। Deepfake, automated hacking ও AI-driven misinformation ভবিষ্যতের জন্য বড়ো হুমকি। ফলে responsible AI governance অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাইবার যুদ্ধ ও জাতীয় নিরাপত্তা

বর্তমানে cyber warfare আন্তর্জাতিক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অনেক রাষ্ট্র cyber espionage ও infrastructure attack-এর মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। Power grid, বিমানবন্দর, banking network ও communication system cyber attack–এর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে। ফলে cyber security এখন জাতীয় প্রতিরক্ষা কৌশলেরও অংশ।

আইন ও নীতিমালা

বাংলাদেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও cyber tribunal গঠন করা হয়েছে। তবে প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আইনও আধুনিকায়ন প্রয়োজন। একইসঙ্গে cyber law যেন মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থি না হয়, সেটিও নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক মানের balanced cyber policy এখন সময়ের দাবি।

প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ও সরকারের ভূমিকা

Cybersecurity নিশ্চিত করতে সরকার, private sector ও technology company-গুলোর সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। Internet service provider, mobile operator ও fintech company-কে শক্তিশালী security framework তৈরি করতে হবে। একইসঙ্গে CERT (Computer Emergency Response Team)-এর কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করা জরুরি।

বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে cyber security sector-এর বড়ো সমস্যা হলো skilled manpower-এর অভাব। এছাড়া cyber forensic laboratory, advanced monitoring system ও research facility এখনও সীমিত। গ্রামীণ জনগণের মধ্যে cyber awareness তুলনামূলক কম। ফলে digital transformation-এর সঙ্গে cyber vulnerabilityও বাড়ছে।

ভবিষ্যৎ করণীয়

বাংলাদেশকে cyber secure রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে education, law enforcement ও technology investment বাড়াতে হবে। Cyber security research center গড়ে তোলা জরুরি। একইসঙ্গে public awareness campaign চালানো প্রয়োজন। Digital literacy ও ethical technology ব্যবহারের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

উপসংহার

সাইবার নিরাপত্তা এখন আধুনিক সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। প্রযুক্তি যত উন্নত হবে, cyber risk তত বাড়বে। তাই তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা কেবল প্রযুক্তিবিদদের দায়িত্ব নয়; রাষ্ট্র, সমাজ ও প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। শক্তিশালী cyber security framework, সচেতন নাগরিক ও আধুনিক আইনব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ নিরাপদ ডিজিটাল রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। ভবিষ্যতের স্মার্ট সমাজ গঠনে cyber security হবে অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

তথ্যসূত্র

১. *Cisco Cybersecurity Report, 2025.*

২. *IBM Security Intelligence Report, 2024.*
৩. *Cybersecurity Ventures Global Cybercrime Statistics, 2025.*
৪. *বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ চুরি প্রতিবেদন, প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার।*
৫. *Reuters Digital Media Report, 2025.*
৬. *UNESCO Digital Literacy and Cyber Awareness Report, 2024.*

১৮৫. "জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের ঝুঁকি"

ভূমিকা

বর্তমান পৃথিবীতে মানবসভ্যতার সামনে যতগুলো বৈশ্বিক সংকট রয়েছে, তার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সবচেয়ে ভয়াবহ ও দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অতিরিক্ত তাপপ্রবাহ, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, বন ধ্বংস ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এখন কোটি কোটি মানুষের জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করছে। বিজ্ঞানীরা বহু আগেই সতর্ক করেছিলেন যে অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন ও জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার পৃথিবীর পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট করবে। আজ সেই সতর্কবার্তার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি, কারণ দেশের বিশাল উপকূলীয় অঞ্চল, ঘনবসতি ও দারিদ্র্য climate vulnerability-কে আরও জটিল করেছে। ফলে জলবায়ু পরিবতন এখন বাংলাদেশের জন্য কেবল পরিবেশগত সংকট নয়; বরং অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, কৃষি, খাদ্যনিরাপত্তা ও মানবজীবনের অস্তিত্ব সংকটে পরিণত হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা ও কারণ

জলবায়ু পরিবর্তন বলতে পৃথিবীর দীর্ঘমেয়াদি তাপমাত্রা ও আবহাওয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্তনকে বোঝায়। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে পৃথিবীতে greenhouse gas-এর পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড পৃথিবীর তাপ ধরে রাখছে এবং global warming সৃষ্টি করছে। কয়লা, তেল ও গ্যাসের অতিরিক্ত ব্যবহার, বন উজাড় ও শিল্প দূষণ এই সংকটকে আরও তীব্র করেছে। IPCC-এর মতে, গত শতাব্দীর তুলনায় বর্তমান পৃথিবীর তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে। এর ফলে আবহাওয়ার স্বাভাবিক চক্র ব্যাহত হচ্ছে। কখনও অতিবৃষ্টি, কখনও দীর্ঘ খরা, আবার কখনও ভয়াবহ তাপপ্রবাহ দেখা দিচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ভাষায়, "Climate change is no longer a prediction; it is a present reality."[১]

বাংলাদেশ কেন জলবায়ু ঝুঁকিতে

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। দেশের বড়ো অংশ সমুদ্রপৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি অবস্থিত। ফলে sea-level rise-এর কারণে উপকূলীয় অঞ্চল মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে। একইসঙ্গে দেশের বিশাল জনসংখ্যা ও দারিদ্র্য climate resilience কমিয়ে দিয়েছে। পতি বছর লাখ লাখ মানুষ বন্যা, নদীভাঙন ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ক্ষতিগস্ত হয়। World Bank-এর এক পতিবেদনে উলেখ করা হয় যে, "Bangladesh is on the frontline of the global climate crisis."[২] অর্থাৎ, জলবায়ু পরিবতনের সরাসরি আঘাতের মুখোমুখি দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততার বিস্তার

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা এখন বড়ো বাস্তবতা। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে লবণাক্ত পানি ভেতরের দিকে প্রবেশ করছে। খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী ও বরগুনার অনেক এলাকায় কৃষিজমি চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। নিরাপদ পানির সংকটও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ অনেক সময় দূর-দূরান্ত থেকে সুপেয় পানি সংগ্রহ করতে বাধ্য হন। বিশেষজ্ঞদের মতে, লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুর স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে। প্রথম আলো-তে প্রকাশিত "উপকূলে বাড়ছে লবণাক্ততা, বাড়ছে স্বাস্যঝুঁকি" (১২ জুন ২০২৫) প্রতিবেদনে বলা হয় যে, উপকূলীয় অঞ্চলে নিরাপদ পানির সংকট এখন অন্যতম বড়ো মানবিক সমস্যা।[৩]

বন্যা ও নদী ভাঙনের ভয়াবহতা

বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছর বন্যা দেখা দেয়। অতিবৃষ্টি ও উজানের পানির চাপে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়। এর ফলে কৃষিজমি, ঘরবাড়ি ও অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একইসঙ্গে নদীভাঙন হাজার হাজার পরিবারকে গৃহহীন করে দিচ্ছে। যমুনা, পদ্মা ও মেঘনা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে মানুষ প্রতিনিয়ত বসতভিটা হারাচ্ছে। নদী ভাঙনের কারণে অনেক মানুষ শহরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, ফলে নগর দরিদ্রতা ও বস্তিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। Le Monde-এ প্রকাশিত "South Asia Faces Intensifzing Climate Disasters" (২২ জুলাই ২০২৫) প্রতিবেদনে বলা হয় যে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ বন্যা ও নদী ভাঙনের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে।[৪]

ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘূর্ণিঝড়প্রবণ দেশ। সিডর, আইলা, আম্পান ও মোখার মতো ঘূর্ণিঝড় দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ভয়াবহ ক্ষতি করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে cyclone intensity বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন। ঘূর্ণিঝড় শুধু প্রাণহানিই ঘটায় না; বরং কৃষি, মৎস্য, পরিবহন ও অবকাঠামোতেও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি সৃষ্টি করে। দুর্যোগের পর পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন রাষ্ট্রের জন্য বড়ো অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় মানুষ স্থায়ীভাবে জীবিকা হারিয়ে climate refugee-তে পরিণত হয়।

কৃষিক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, খরা ও লবণাক্ততা কৃষি উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ধান, গম ও সবজি উৎপাদন কমে যাচ্ছে। কৃষকের উৎপাদন খরচ বাড়লেও উৎপাদনশীলতা কমছে। FAO-এর মতে, "Climate change threatens global food security more than ever before."[৫] বাংলাদেশের খাদ্যনিরাপত্তার জন্য এটি বড়ো হুমকি। একইসঙ্গে মাছ চাষ ও গবাদিপশু পালনের ওপরও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে।

স্বাস্থ্যঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তন

অতিরিক্ত তাপমাত্রা, দূষণ ও পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। ডায়রিয়া, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ও পানিবাহিত রোগের বিস্তার বৃদ্ধি পাচ্ছে। WHO-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে climate-related disease আগামী দশকে আরও বড়ো স্বাস্থ্য সংকট তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। অতিরিক্ত গরম মানুষের কর্মক্ষমতা ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

জলবায়ু উদ্বাস্তু ও সামাজিক সংকট

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বহু মানুষ নিজেদের বসতভিটা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এদের climate refugee বলা হয়। উপকূলীয় অঞ্চল ও নদী ভাঙনপ্রবণ এলাকার মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। ফলে ঢাকাসহ বড়ো শহরগুলোতে জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে। বস্তিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নগর অবকাঠামোর ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এই পরিস্থিতি সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক সংকট আরও বাড়িয়ে তুলছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও জলবায়ু ন্যায়বিচার

বাংলাদেশ greenhouse gas emission খুব কম করলেও climate change-এর সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার দেশগুলোর একটি। ফলে climate justice এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি বড়ো ইস্যু। উন্নত দেশগুলোর ঐতিহাসিক carbon emission-এর দায় বেশি হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলো। তাই climate finance ও ক্ষতিপূরণ নিয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের অভিযোজন কৌশল

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। Cyclone shelter নির্মাণ, উপকূলীয় বাঁধ, climate-resilient agriculture ও দুর্যোগ পূর্বাভাস ব্যবস্থার উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য। এছাড়া renewable energy ব্যবহারের দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে দীর্ঘমেয়াদে আরও বড়ো পরিকল্পনা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

উপসংহার

NABARUN PUBLICATION

জলবায়ু পরিবর্তন এখন মানবসভ্যতার অন্যতম বড়ো বাস্তবতা। বাংলাদেশ এই সংকটের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি হওয়ায় বিষয়টি আমাদের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ। বন্যা, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড় ও পরিবেশগত বিপর্যয় দেশের অর্থনীতি ও মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলছে। তবে সচেতনতা, বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়; প্রতিটি মানুষের। কারণ নিরাপদ পরিবেশ ছাড়া মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ নিরাপদ নয়।

তথ্যসূত্র

১. *IPCC Climate Assessment Report, 2025.*
২. *World Bank, "Bangladesh and Climate Vulnerability", 2024.*
৩. *প্রথম আলো, "উপকলে বাড়ছে লবণাক্ততা, বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি", প্রকাশ: ১২ জুন ২০২৫।*
৪. *Le Monde, "South Asia Faces Intensifying Climate Disasters", প্রকাশ: ২২ জুলাই ২০২৫।*
৫. *FAO Climate and Food Security Report, ২০২৫।*

১৮৬. "ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং: তরুণদের নতুন কর্মক্ষেত্র"

ভূমিকা

বতমান বিশ্বের কর্মসংস্থানের ধারণা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। একসময় জীবিকা অর্জনের প্রধান মাধ্যম ছিল সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী চাকরি। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তার, দ্রুতগতির ইন্টারনেট এবং বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে কর্মক্ষেত্র এখন আর নির্দিষ্ট অফিসকেন্দ্রিক নেই। আজ একজন তরুণ নিজের ঘরে বসেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করতে পারছেন। এভাবেই ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। বাংলাদেশেও গত এক দশকে এই খাত তরুণ সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। গ্রাফিক নকশা, ওয়েব উন্নয়ন, ভিডিও সম্পাদনা, ডিজিটাল বিপণন, অনলাইন শিক্ষা ও সফটওয়্যার নির্মাণের মাধ্যমে হাজার হাজার তরুণ আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করছেন। ফলে প্রযুক্তি এখন শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়; বরং বেকারত্ব নিরসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের শক্তিশালী হাতিয়ার।

ফ্রিল্যান্সিংয়ের ধারণা ও বিকাশ

"Freelancing is reshaping the global workforce."[১] – বর্তমান শ্রমবাজারের পরিবর্তনকে এই উক্তি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। ফ্রিল্যান্সিং বলতে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য চুক্তিভিত্তিক কাজ করাকে বোঝায়। একজন কর্মী কোনো নির্দিষ্ট অফিসে না গিয়েও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের গ্রাহকের সঙ্গে কাজ করতে পারেন। আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন অনলাইন কাজের মাধ্যম গড়ে ওঠায় এই খাত দ্রুত বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে একজন দক্ষ ব্যক্তি নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বাজারে কাজের সুযোগ পাচ্ছেন। ফলে কর্মসংস্থানের ধারণা এখন আর ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।

আউট সোর্সিংয়ের অর্থ ও গুরুত্ব

আউটসোর্সিং হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজ বাইরের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করানো। উন্নত বিশ্বের বহু প্রতিষ্ঠান ব্যয় কমানোর জন্য সফটওয়্যার নির্মাণ, গ্রাহকসেবা, নকশা নির্মাণ ও তথ্য বিশ্লেষণের কাজ উন্নয়নশীল দেশের দক্ষ তরুণদের দিয়ে করিয়ে থাকে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় কমে এবং দক্ষ জনশক্তিও পাওয়া যায়। বাংলাদেশ, ভারত ও ফিলিপাইনের মতো দেশ বর্তমানে আউটসোর্সিং খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করেছে। বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে প্রযুক্তিনির্ভর যোগাযোগ যত বাড়ছে, এই খাতের গুরুত্বও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রযুক্তি কীভাবে কর্মসংস্থানের ধারণা বদলে দিয়েছে

"Technology has transformed employment beyond geographical boundaries."[২]– তথ্যপ্রযুক্তি কর্মক্ষেত্রের ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। বর্তমানে একজন তরুণ গ্রামের বাড়িতে বসেও ইউরোপ বা আমেরিকার প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করতে পারেন। করোনাকালের পর দূরবর্তী কাজের সংস্কৃতি আরও জনপ্রিয় হয়েছে। এর ফলে

অনলাইনভিত্তিক কাজ এখন সাময়িক নয়; বরং পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রযুক্তির অগ্রগতি মানুষের কাজের ধরন, সময় ও পরিবেশ সবকিছুই বদলে দিয়েছে।

বাংলাদেশের তরুণ সমাজ ও ফ্রিল্যান্সিং

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বড়ো অংশ তরুণ। প্রতিবছর লাখ লাখ শিক্ষার্থী চাকরির বাজারে প্রবেশ করলেও প্রচলিত চাকরির বাজার সেই তুলনায় পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে পারছে না। ফলে ফ্রিল্যান্সিং তরুণদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের পথ তৈরি করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম সম্ভাবনাময় অনলাইন শ্রমবাজার। দেশের তরুণরা দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করছেন।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভূমিকা

ফ্রিল্যান্সিং বর্তমানে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ খাতে পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক গ্রাহকের কাছ থেকে ডলার বা অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আয় দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। প্রথম আলো-তে প্রকাশিত "ফ্রিল্যান্সিংয়ে বাংলাদেশের তরুণদের সাফল্য" (১৮ এপ্রিল ২০২৫) প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, এই খাত দেশের ডিজিটাল অর্থনীতির অন্যতম সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।[৩] একইসঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতেও এই খাত ভূমিকা রাখছে।

নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে ভূমিকা

ফ্রিল্যান্সিং নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। অনেক নারী ঘরে বসেই নকশা নির্মাণ, অনলাইন শিক্ষা, লেখালেখি ও বিপণনসংশ্লিষ্ট কাজ করে আয় করছেন। বিশেষ করে যেসব নারী পারিবারিক বা সামাজিক কারণে বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারেন না, তাদের জন্য এই খাত নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। ফলে নারী উদ্যোক্তা ও প্রযুক্তিনির্ভর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নতুন বাস্তবতা

বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এই খাতে বড়ো পরিবর্তন আনছে। স্বয়ংক্রিয় নকশা, ভাষা সহায়তা ও সফটওয়্যার সহযোগী ব্যবস্থার কারণে কাজের গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে একইসঙ্গে কিছু প্রচলিত দক্ষতার চাহিদা কমে যাওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। তাই ভবিষ্যৎ উপযোগী দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, "The future belongs to those who can work alongside AI."[৪] অর্থাৎ, ভবিষ্যতে টিকে থাকতে হলে প্রযুক্তির সঙ্গে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

শিক্ষাব্যবস্থা ও দক্ষতার ঘাটতি

বাংলাদেশের অন্যতম বড়ো সমস্যা হলো দক্ষতার ঘাটতি। অনেক শিক্ষার্থী সনদ অর্জন করলেও আন্তর্জাতিক কাজের বাজারের উপযোগী দক্ষতা অর্জন করতে পারেন না। ফলে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব বাড়ছে। ভাষাজ্ঞান, যোগাযোগ দক্ষতা, সফটওয়্যার পরিচালনা ও সৃজনশীল চিন্তাশক্তি এই খাতে সফলতার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

গ্রামীণ অর্থনীতি ও নতুন সম্ভাবনা

ইন্টারনেট সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামের তরুণরাও এখন অনলাইনভিত্তিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। এতে শহরমুখী বেকারত্বের চাপ কমতে পারে। একইসঙ্গে স্থানীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অনেক তরুণ নিজ এলাকায় থেকেই আন্তর্জাতিক বাজারে কাজ করে পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করছেন।

এই খাতের প্রধান চ্যালেঞ্জ

এই খাতে সম্ভাবনার পাশাপাশি কিছু বড়ো চ্যালেঞ্জও রয়েছে। আয় অনিশ্চয়তা, ভুয়া গ্রাহক, অর্থ পরিশোধে জটিলতা ও অতিরিক্ত প্রতিযোগিতা কর্মীদের জন্য বড়ো সমস্যা। একইসঙ্গে দীর্ঘ সময় কম্পিউটারের সামনে কাজ করার কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকি ও মানসিক চাপও বাড়ছে। **রয়টার্স**-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, "Digital opportunities also bring digital vulnerabilities."[৫]

সরকারের উদ্যোগ ও ভূমিকা

বাংলাদেশ সরকার তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রযুক্তি পার্ক নির্মাণের মাধ্যমে তরুণদের সক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা আরও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার বিশ্লেষকদের মতে, ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান ক্রমেই অনলাইন ও দক্ষতাভিত্তিক হবে। বাংলাদেশ যদি প্রযুক্তিগত দক্ষতা, সফটওয়্যার উন্নয়ন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক জ্ঞানচর্চায় বিনিয়োগ করতে পারে, তবে এই খাত জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হবে।

উপসংহার

ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং বর্তমান বিশ্বের কর্মসংস্থানের নতুন বাস্তবতা। প্রযুক্তি মানুষের কাজের ধরন ও জীবিকার ধারণাকে আমূল বদলে দিয়েছে। বাংলাদেশের তরুণ সমাজ দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী চিন্তার মাধ্যমে এই খাতে বৈশ্বিক অবস্থান তৈরি করতে পারে। তবে এর জন্য প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষা, প্রযুক্তিগত অবকাঠামো ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। সঠিকভাবে পরিচালিত হলে এই খাত বাংলাদেশের বেকারত্ব নিরসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. *World Economic Forum, Future Workforce Report, 2025.*
২. *IMF, Digital Economy Outlook, 2025.*
৩. *প্রথম আলো, "ফ্রিল্যান্সিংয়ে বাংলাদেশের তরুণদের সাফল্য", প্রকাশ: ১৮ এপ্রিল ২০২৫।*
৪. *Reuters, "AI is reshaping the future workforce", প্রকাশ: ৯ জুন ২০২৫।*
৫. *Reuters, "Digital opportunities also bring for lnerabilities", প্রকাশ: ১১ মে ২০২৫।*
৬. *তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, "লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং উন্নয়ন প্রকল্প প্রতিবেদন", ২০২৪।*

১৮৭. "মাদকের ভয়াবহতা ও যুবসমাজ"

ভূমিকা:

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ভয়াবহ সামাজিক সংকট হলো মাদকাসক্তি। একসময় এটি সীমিত কিছু মানুষের সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হলেও আজ মাদক একটি বৈশ্বিক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে তরুণ সমাজের মধ্যে মাদকের বিস্তার একটি জাতির ভবিষ্যতের জন্য গভীর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইয়াবা, হেরোইন, গাঁজা, আইস, কোকেন ও বিভিন্ন কৃত্রিম মাদক ধীরে ধীরে যুবসমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধবিষয়ক সংস্থা বলেছে, "Drug abuse destroys not only individuals but entire communities."[১]
(মাদকাসক্তি শুধু একজন ব্যক্তিকেই নয়, পুরো সমাজকেও ধ্বংস করে দেয়।)
বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব, হতাশা, সামাজিক অবক্ষয়, অপরাধপ্রবণতা ও নেতিবাচক সাংস্কৃতিক প্রভাব মাদক বিস্তারের অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে। ফলে মাদকের ভয়াবহতা এখন শুধু আইনশৃঙ্খলার বিষয় নয়; বরং মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক সংকট।

মাদকের ধারণা ও এর প্রকৃতি

মাদক এমন এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ, যা মানুষের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে সাময়িক আনন্দ, উত্তেজনা বা প্রশান্তি সৃষ্টি করে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এটি মানুষের শরীর, মন ও সামাজিক জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। ইয়াবা, হেরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজা, কোকেন ও আইস বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মাদকদ্রব্যের মধ্যে অন্যতম। প্রথমদিকে অনেকে কৌতূহল, বন্ধুদের প্রভাব বা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মাদক গ্রহণ শুরু করলেও পরে তা ভয়াবহ আসক্তিতে পরিণত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, "Addiction is a chronic disease that damages both bodz and mind. "[২] (আসক্তি এমন একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ, যা শরীর ও মন– উভয়কেই ধ্বংস করে।)
মাদকাসক্ত ব্যক্তি ধীরে ধীরে নিজের চিন্তাশক্তি, নৈতিকতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

যুবসমাজ কেন মাদকের দিকে ঝুঁকছে

বর্তমান তরুণ সমাজ নানা ধরনের মানসিক ও সামাজিক চাপে রয়েছে। বেকারত্ব, হতাশা, পারিবারিক অশান্তি, একাকিত্ব ও সামাজিক বৈষম্য তরুণদের মাদকের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একইসঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপরাধমূলক সংস্কৃতি ও অশালীন বিনোদনের প্রভাবও বাড়ছে। অনেক তরুণ আধুনিকতা ও স্বাধীনতার ভুল ব্যাখ্যা থেকে মাদক গ্রহণকে "স্টাইল" বা "ফ্যাশন" হিসেবে দেখতে শুরু করেছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে হতাশা ও ব্যর্থতার কষ্ট ভুলে থাকার জন্যও অনেকে মাদক গ্রহণ করে। UNICEF-এর এক গবেষণায় বলা হয়, "Young people facing social isolation are more vulnerable to addiction."[৩]

(যেসব তরুণ সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় ভোগে, তারা মাদকাসক্তির ঝুঁকিতে বেশি থাকে।)

বন্ধু ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব

তরুণদের মধ্যে মাদক বিস্তারের অন্যতম কারণ হলো নেতিবাচক বন্ধুসঙ্গ। অনেক তরুণ বন্ধুমহলের চাপে প্রথমবার মাদক গ্রহণ করে। বন্ধবান্ধবের সঙ্গে নিজেকে আধুনিক বা সাহসী প্রমাণ করার প্রবণতাও এতে ভূমিকা রাখে। "Peer pressure is one of the strongest causes of youth addiction."[৪] (সহপাঠী বা বন্ধুদের চাপ তরুণদের মাদকাসক্তির অন্যতম প্রধান কারণ।)

বর্তমানে অনেক এলাকায় মাদক সহজলভ্য হয়ে পড়েছে। অপরাধচক্র ও মাদক ব্যবসায়ীরা কৌশলে তরুণদের টার্গেট করছে। ফলে সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

মাদকের স্বাস্থ্যগত ক্ষতি

মাদক মানুষের শরীর ও মস্তিষ্ককে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়। দীর্ঘদিন মাদক গ্রহণ করলে হৃদরোগ, কিডনি বিকল, লিভারের সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ ও স্নায়ুরোগ দেখা দিতে পারে। একইসঙ্গে মাদক মানুষের স্মৃতিশক্তি কমিয়ে দেয় এবং মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে। বিষণ্নতা, উদ্বেগ, আত্মহত্যার প্রবণতা ও আচরণগত সমস্যা মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। চিকিৎসকদের মতে, অনেক মাদকাসক্ত ব্যক্তি পরবর্তীতে মানসিক রোগে আক্রান্ত হন। বিশেষ করে ইয়াবা ও আইসের মতো কৃত্রিম মাদক মস্তিষ্কের ওপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলে।

পরিবার ও সমাজে মাদকের প্রভাব

মাদকাসক্তি পুরো পরিবারকে সংকটে ফেলে দেয়। পরিবারে অশান্তি, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও মানসিক ভাঙন সৃষ্টি হয়। অনেক সময় মাদকাসক্ত ব্যক্তি পরিবারের অর্থ চুরি করে বা সহিংস আচরণ করে। একই সঙ্গে সমাজে ছিনতাই, চুরি, খুন ও সন্ত্রাস বৃদ্ধির অন্যতম কারণও মাদক। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়, "Drug trafficking fuels violence and social instability."[৫]

(মাদক পাচার সহিংসতা ও সামাজিক অস্থিরতাকে উসকে দেয়।)

ফলে মাদক একটি জাতির সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য বড়ো হুমকি।

শিক্ষাজীবনে মাদকের নেতিবাচক প্রভাব

মাদকাসক্ত শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি বাড়ে এবং ফলাফল খারাপ হতে থাকে। অনেক শিক্ষার্থী মাঝপথে শিক্ষাজীবন ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ফলে একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অন্ধকারে হারিয়ে যায়। শিক্ষকদের মতে, বর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশে মাদক ব্যবসার বিস্তার একটি বড়ো উদ্বেগের বিষয়।

অপরাধ ও মাদকের সম্পর্ক

মাদক ও অপরাধ একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। মাদকাসক্ত ব্যক্তি নিজের চাহিদা পূরণের জন্য চুরি, ছিনতাই, প্রতারণা বা সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে পারে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্র সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোকে অপরাধকেন্দ্রে পরিণত করছে। বাংলাদেশ–মিয়ানমার সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা পাচারের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত। ফলে মাদক এখন জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও হুমকি হয়ে উঠেছে।

গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক প্রভাব

গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তরুণদের চিন্তা ও আচরণে বড়ো প্রভাব ফেলে। কিছু চলচ্চিত্র, গান ও বিনোদনমূলক উপস্থাপনায় মাদককে আকর্ষণীয়ভাবে দেখানো হয়, যা তরুণদের ভুল বার্তা দেয়। তবে গণমাধ্যম সচেতনতা তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রথম আলো-তে প্রকাশিত "মাদকের বিস্তার নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে" (১৭ মে ২০২৫) প্রতিবেদনে তরুণদের মধ্যে ইয়াবা আসক্তির ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়।[৬]

অর্থনীতি ও জাতীয় উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব

মাদকাসক্ত জনগোষ্ঠী একটি দেশের উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়। কর্মক্ষম তরুণরা মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে জাতীয় অর্থনীতিতে বড়ো ক্ষতি হয়। চিকিৎসা ব্যয়, অপরাধ দমন ও পুনর্বাসনে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। একইসঙ্গে মাদকাসক্তি পরিবারগুলোকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়। ফলে জাতীয় উনয়নও বাধাগস্ত হয়।

ধর্ম, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়

ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাবও মাদক বিস্তারের অন্যতম কারণ। মাদক মানুষের নৈতিকতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ধ্বংস করে দেয়। পরিবারে মূল্যবোধের শিক্ষা দুর্বল হলে তরুণরা সহজেই বিপথে পরিচালিত হতে পারে। তাই পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় সংগঠনগুলোর সমন্বিত ভূমিকা প্রয়োজন।

সরকারের উদ্যোগ ও করণীয়

বাংলাদেশ সরকার মাদক নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান, পুনর্বাসন কেন্দ্র ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন এলাকায় প্রচারণা চালাচ্ছে। তবে শুধু কঠোর আইন প্রয়োগ করলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বাড়ানো জরুরি। একইসঙ্গে পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে।

সচেতনতা ও প্রতিরোধের গুরুত্ব

"Prevention is better than cure."[৭]

(প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম।)

মাদক প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো সচেতনতা বৃদ্ধি। পরিবারে সন্তানদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা প্রয়োজন। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাড়াতে হবে। একইসঙ্গে তরুণদের সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে।

উপসংহার

মাদকাসক্তি বর্তমান সমাজের অন্যতম ভয়াবহ সমস্যা। এটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎকেও ধ্বংস করে দেয়। তরুণ সমাজ একটি জাতির সবচেয়ে বড়ো শক্তি। তাই তাদেরকে মাদকের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা জাতীয় দায়িত্ব। সচেতনতা, শিক্ষা, সুস্থ সামাজিক পরিবেশ ও কার্যকর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মাধ্যমে মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। কারণ একটি সুস্থ ও সচেতন যুবসমাজই পারে একটি উন্নত, মানবিক ও সমৃদ্ধ জাতি গড়ে তুলতে।

তথ্যসূত্র

১. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Drug Report, 2025.
২. World Health Organization, Addiction and Mental Health Report, 2024.
৩. UNICEF Youth Risk Behaviour Study, 2025.
৪. UNESCO Youth Development and Social Risk Report, ২০২৫
৫. UNODC, "Drug trafficking and social instability", প্রকাশ: ১২ মার্চ ২০২৫
৬. প্রথম আলো, "মাদকের বিস্তার নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে", প্রকাশ: ১৭ মে ২০২৫
৭. World Health Organization Prevention Awareness Campaign, ২০২৪

১৮৮. "সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম: আশীর্বাদ না অভিশাপ"

ভূমিকা

বর্তমান যুগকে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ বলা হয়। প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে মানুষের জীবনযাত্রা, চিন্তাভাবনা ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের অন্যতম বড়ো মাধ্যম হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, মেসেঞ্জার ও এক্সের মতো মাধ্যম এখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মুহূর্তের মধ্যেই যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ সমাজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সবচেয়ে বড়ো ব্যবহারকারী। শিক্ষা, ব্যবসা, বিনোদন, সংবাদ ও সামাজিক সচেতনতা তৈরিতে এই মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তবে একইসঙ্গে ভুয়া তথ্য, আসক্তি, মানসিক চাপ, সাইবার অপরাধ ও সামাজিক অবক্ষয়ের মতো সমস্যাও সৃষ্টি করছে। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বর্তমান বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ– এই প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

"Social media has transformed the way humans communicate."[১]

(সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করেছে।)

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ধারণা ও বিকাশ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হলো এমন অনলাইনভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে মানুষ তথ্য, মতামত, ছবি, ভিডিও ও বার্তা আদান-প্রদান করতে পারে। একসময় চিঠি, সংবাদপত্র ও টেলিফোন ছিল যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। কিন্তু ইন্টারনেটের বিস্তার মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম শুধু যোগাযোগেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং শিক্ষা, ব্যবসা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষকে একটি বৈশ্বিক সমাজে যুক্ত করেছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের যোগাযোগকে দ্রুত, সহজ ও স্বল্পব্যয়ী করেছে। বর্তমানে একজন মানুষ পৃথিবীর যেকোনো স্থানে অবস্থান করেও পরিবারের সদস্য বা বন্ধুর সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারছেন। বিদেশে অবস্থানরত মানুষ সহজে নিজেদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারছেন। একইসঙ্গে ভিডিও কল, সরাসরি সম্প্রচার ও তাৎক্ষণিক বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও প্রাণবন্ত হয়েছে। প্রযুক্তির এই অগ্রগতি বিশ্বকে ছোটো করে এনেছে।

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা

বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম শিক্ষার বড়ো মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিক্ষামূলক ভিডিও, অনলাইন ক্লাস ও গবেষণাভিত্তিক আলোচনা থেকে জ্ঞান অর্জন করছে। করোনাকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থাকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অনেক শিক্ষার্থী ইউটিউব ও অন্যান্য মাধ্যমে বিনামূল্যে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। UNESCO-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "Digital platforms have expanded educational access globally."[২]

(ডিজিটাল মাধ্যম বিশ্বব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করেছে।)

এখন একজন শিক্ষার্থী নিজের ঘরে বসেই আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে।

ব্যাবসা ও কর্মসংস্থানে ভূমিকা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বর্তমানে ব্যাবসা ও বিপণনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ছোটো উদ্যোক্তারা এখন অনলাইনের মাধ্যমে সহজে ব্যাবসা পরিচালনা করতে পারছেন। পোশাক, খাবার, হস্তশিল্প ও অনলাইন সেবাভিত্তিক ব্যবসা দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। একইসঙ্গে ডিজিটাল বিপণন, বিষয়বস্তু নির্মাণ ও অনলাইনভিত্তিক প্রচারণা নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। অনেক তরুণ এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন।

সংবাদ ও তথ্যপ্রবাহে ভূমিকা

বর্তমানে সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বের যে-কোনো ঘটনা মুহূর্তের মধ্যেই মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। দুর্যোগ, দুর্ঘটনা বা জরুরি পরিস্থিতিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম

তথ্যপ্রবাহকে আরও দ্রুত করেছে। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষও এখন ছবি ও ভিডিও প্রকাশের মাধ্যমে তথ্য প্রচার করতে পারছে। ফলে নাগরিক সাংবাদিকতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

ভুয়া তথ্য ও গুজবের বিস্তার

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সবচেয়ে বড়ো নেতিবাচক দিক হলো গুজব ও ভুয়া তথ্যের বিস্তার। যাচাই ছাড়াই অনেক মানুষ বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে দেয়। এর ফলে সামাজিক অস্থিরতা, সহিংসতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশেও বিভিন্ন সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমভিত্তিক গুজব বড়ো ধরনের সমস্যা তৈরি করেছে। Reuters Institute–এর প্রতিবেদনে বলা হয়, "False information spreads faster than truth online."[৩]
(অনলাইনে মিথ্যা তথ্য সত্যের চেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।)
এই পরিস্থিতি সামাজিক সম্প্রীতি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে উঠছে।

তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব

অতিরিক্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের কারণে তরুণদের মধ্যে উদ্বেগ, হতাশা ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যের জীবনযাপন দেখে নিজের জীবনকে ব্যর্থ মনে করার প্রবণতাও বাড়ছে। অনেক তরুণ "লাইক" ও "অনুসারী"–নির্ভর মানসিকতায় ভুগছে। একইসঙ্গে অনলাইন অপমান ও সাইবার বুলিং তরুণদের মানসিকভাবে দুর্বল করে তুলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, "Excessive social media use can increase anxiety and depression among youth."[৪]
(অতিরিক্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার তরুণদের মধ্যে উদ্বেগ ও বিষণ্নতা বৃদ্ধি করতে পারে।)

আসক্তি ও সময় অপচয়

বর্তমানে অনেক তরুণ দিনের বড়ো অংশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যয় করছে। এর ফলে পড়াশোনা, খেলাধুলা ও সৃজনশীল কাজের প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আসক্তি মানুষের মনোযোগ ও কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। একইসঙ্গে বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতাও বৃদ্ধি পায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘ সময় পর্দানির্ভরতা মানুষের সামাজিক ও মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে।

পরিবার ও সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষকে ভার্চুয়ালি কাছাকাছি আনলেও বাস্তব সম্পর্কের দূরত্ব বাড়াচ্ছে। পরিবারে একইসঙ্গে বসেও অনেকে নিজেদের মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ফলে আন্তরিকতা ও পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ছে। একইসঙ্গে মানুষ বাস্তব সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তে ভার্চুয়াল সম্পর্কের প্রতি বেশি নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। এতে একাকিত্ব ও মানসিক শূন্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা ঝুঁকি

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের সঙ্গে সাইবার অপরাধও বেড়েছে। ব্যক্তিগত তথ্য চুরি, ভুয়া পরিচয়, অনলাইন প্রতারণা ও সাইবার বুলিং বর্তমানে বড়ো সমস্যা। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। অনেক সময় ব্যক্তিগত ছবি বা তথ্য ব্যবহার করে মানুষকে ব্ল্যাকমেইল করা হয়। ফলে ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে মানুষের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। তবে একইসঙ্গে অনেক নেতিবাচক সংস্কৃতি ও অশালীনতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিবর্তে অনেক তরুণ বিদেশি সংস্কৃতির প্রতি অতিরিক্ত আকৃষ্ট হচ্ছে। পোশাক, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস ও আচরণেও এর প্রভাব স্পষ্ট। তবে ইতিবাচকভাবে দেখলে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বাংলা সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতিকেও বিশ্বব্যাপী পরিচিত করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

রাজনৈতিক সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলনে ভূমিকা

বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, পরিবেশ আন্দোলন ও সামাজিক ন্যায়ের মতো বিষয়গুলো দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। অনেক সামাজিক আন্দোলন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। তবে একইসঙ্গে রাজনৈতিক বিভ্রান্তি ও উগ্রবাদও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তথ্য যাচাইয়ের সংস্কৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

শিশু ও কিশোরদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব

শিশু ও কিশোররা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহারকারী। অল্প বয়সে অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার তাদের মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। খেলাধুলা, বইপড়া ও সৃজনশীল কাজের প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে। UNICEF-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "Children exposed to excessive screen time may suffer emotional and cognitive difficulties."[৫]

(অতিরিক্ত পর্দানির্ভরতা শিশুদের আবেগিক ও মানসিক বিকাশে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।)

সরকারের ভূমিকা ও করণীয়

সরকারকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি, সাইবার অপরাধ দমন ও তথ্য যাচাইব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। একইসঙ্গে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করাও জরুরি। পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেও তরুণদের দায়িত্বশীল ব্যবহার শেখাতে হবে। প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করতে সামাজিক সচেতনতা অত্যন্ত প্রয়োজন।

সচেতন ব্যবহারই সমাধান

"Technology itself is neutral; its impact depends on how people use it."[৬]

(প্রযুক্তি নিজে নিরপেক্ষ; মানুষ যেভাবে ব্যবহার করে তার প্রভাব সেভাবেই নির্ধারিত হয়।)

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে সম্পূর্ণ খারাপ বা সম্পূর্ণ ভালো বলা যায় না। এর সঠিক ব্যবহার মানুষের জীবনকে উন্নত করতে পারে, আবার অপব্যবহার বিপর্যয়ও সৃষ্টি করতে পারে। তাই সচেতন ও দায়িতশীল ব্যবহারই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বর্তমান যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী যোগাযোগব্যবস্থা। এটি যেমন শিক্ষা, ব্যবসা, যোগাযোগ ও সামাজিক সচেতনতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, তেমনি আসক্তি, গুজব, মানসিক চাপ ও সামাজিক অবক্ষয়ের কারণও হয়ে উঠছে। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে আশীর্বাদে পরিণত করতে হলে সচেতনতা, দায়িত্ববোধ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্রযুক্তি তখনই মানবকল্যাণে কাজ করবে, যখন মানুষ তা জ্ঞান, বিবেক ও মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে ব্যবহার করবে।

NABARUN PUBLICATION

তথ্যসূত্র

১. *Reuters Digital Communication Report, 2025.*
২. *UNESCO Digital Learning Report, 2024.*
৩. *Reuters Institute Digital News Report, 2025.*
৪. *World Health Organization Mental Health and Youth Report, 2025.*
৫. *UNICEF Child Development and Screen Time Report, 2024.*
৬. *Oxford Internet Institute Technology Ethics Report, 2024.*

১৮৯. "সড়ক দুর্ঘটনা ও নিরাপদ সড়কের দাবি"

ভূমিকা

বাংলাদেশের অন্যতম বড়ো জাতীয় সমস্যা বর্তমানে সড়ক দুর্ঘটনা। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন সড়ক, মহাসড়ক ও নগর এলাকায় অসংখ্য মানুষ দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। কেউ প্রাণ হারাচ্ছে, কেউ স্থায়ী পঙ্গুত্ব বরণ করছে, আবার অনেক পরিবার চিরদিনের জন্য শোক, অনিশ্চয়তা ও অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে যাচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনা এখন শুধু পরিবহনব্যবস্থার সমস্যা নয়; বরং এটি জননিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব, জনস্বাস্থ্য ও মানবিক সংকটে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, "Road traffic injuries are one of the leading causes of death globally."[১] (সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ।)

বাংলাদেশে বেপরোয়া গাড়ি চালানো, অদক্ষ চালক, ফিটনেসবিহীন যানবাহন, দুর্বল আইন প্রয়োগ, দুর্নীতি ও জনসচেতনতার অভাব সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। ফলে নিরাপদ সড়কের দাবি এখন সাধারণ মানুষের প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনার বর্তমান বাস্তবতা

বাংলাদেশে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। জাতীয় মহাসড়কগুলোতে বাস, ট্রাক, মোটরসাইকেল ও ব্যক্তিগত গাড়ির সংঘর্ষ প্রায় নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। রাজধানী ঢাকাসহ বড়ো শহরগুলোতেও প্রতিদিন ছোটো-বড়ো দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়।[২] একইসঙ্গে আহত ও পঙ্গুত্ববরণকারী মানুষের সংখ্যা আরও বেশি। প্রথম আলো-তে প্রকাশিত "সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মিছিল থামছে না" (২২ জুন ২০২৫) প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, মহাসড়কে দুর্ঘটনার হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৩]

বেপরোয়া গাড়ি চালানো ও অতিরিক্ত গতি

বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ হলো বেপরোয়া গাড়ি চালানো। অনেক চালক অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালান এবং ট্রাফিক আইন মানতে অনীহা প্রকাশ করেন। যাত্রী তোলার প্রতিযোগিতা, দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছানোর প্রবণতা ও দায়িত্বহীন আচরণ দুর্ঘটনার ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। "Over speeding remains one of the deadliest causes of road accidents."[৪]

(অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো সড়ক দুর্ঘটনার সবচেয়ে প্রাণঘাতী কারণগুলোর একটি।)

বিশেষ করে মহাসড়কে দ্রুতগতির বাস ও টাকের সংঘর্ষ ভয়াবহ প্রাণহানির সৃষ্টি করে। অনেক চালক ক্লান্ত অবস্থায় দীর্ঘ সময় গাড়ি চালান, যা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে দেয়।

অদক্ষ ও অপ্রশিক্ষিত চালকের সমস্যা

বাংলাদেশে অনেক চালক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ছাড়াই গাড়ি চালান। অনেক ক্ষেত্রে বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই মানুষ যানবাহন পরিচালনা করছে। অদক্ষ চালকরা জরুরি পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হন। ফলে দুর্ঘটনা অনিবার্য হয়ে পড়ে। দ্য ডেইলি স্টার-এ প্রকাশিত "Untrained drivers remain a major road threat" (১৭ মে ২০২৫) প্রতিবেদনে বলা হয় যে, সঠিক প্রশিক্ষণের অভাব বাংলাদেশের সড়ক নিরাপত্তার অন্যতম বড়ো দুর্বলতা।[৫]

ফিটনেসবিহীন যানবাহনের ঝুঁকি

বাংলাদেশের রাস্তায় অসংখ্য ফিটনেসবিহীন গাড়ি চলাচল করছে। পুরোনো বাস, ত্রুটিপূর্ণ ট্রাক ও ঝুঁকিপূর্ণ গণপরিবহন যাত্রীদের জীবনের জন্য বড়ো হুমকি। অনেক গাড়ির ব্রেক, চাকা বা আলো ঠিকমতো কাজ করে না। তবুও এসব যানবাহন রাস্তায় চলাচল করছে। বিআরটিএ-এর বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, নিয়মিত তদারকির অভাবে ফিটনেসবিহীন যানবাহনের সংখ্যা কমছে না। ফলে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে।

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার ভয়াবহতা

বর্তমানে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। হেলমেট ব্যবহার না করা, অতিরিক্ত গতি, প্রতিযোগিতামূলক চালনা ও ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল দুর্ঘটনার বড়ো কারণ। প্রথম আলো-তে প্রকাশিত "মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বাড়ছে প্রাণহানি" (১৪ জুন ২০২৫) প্রতিবেদনে বলা হয় যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনাই সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির কারণ হয়ে উঠেছে।[৬]

পথচারীদের অসচেতনতা

সড়ক দুর্ঘটনার জন্য শুধু চালক নয়, অনেক সময় পথচারীদের অসচেতনতাও দায়ী। নির্ধারিত স্থান ছাড়া রাস্তা পার হওয়া, ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার না করা ও চলন্ত গাড়ির সামনে দিয়ে দৌড়ে যাওয়ার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে, ব্যস্ত নগর এলাকায় এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। ফলে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে পথচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি।

দুর্বল আইন প্রয়োগ ও দুর্নীতি

NABARUN PUBLICATION

বাংলাদেশে সড়ক আইন থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয় না। ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করেও অনেকে সহজে পার পেয়ে যায়। একইসঙ্গে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার পথে বড়ো বাধা। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দুর্বল নজরদারি ও অনিয়মের কারণে অপরাধীরা শাস্তি এড়িয়ে যায়। ফলে চালকদের মধ্যে দায়িত্ববোধও কমে যাচ্ছে।

মহাসড়কের ঝুঁকি ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা

বাংলাদেশের মহাসড়কগুলোতে দুর্ঘটনার হার তুলনামূলক বেশি। এক লেনের সড়ক, অতিরিক্ত যানবাহন ও দুর্বল অবকাঠামো দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়। একইসঙ্গে অনেক সড়কে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই। বৃষ্টির সময় বা রাতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে আধুনিক অবকাঠামো অত্যন্ত প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন

২০১৮ সালে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় সারা দেশের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামে। এই আন্দোলন সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করতে বড়ো ভূমিকা রাখে। একইসঙ্গে রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনার বিষয়টিও মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। BBC বাংলা-তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয় যে এই আন্দোলন তরুণদের সামাজিক দায়িত্ববোধের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।[৭]

সড়ক দুর্ঘটনা ও অর্থনৈতিক ক্ষতি

সড়ক দুর্ঘটনার কারণে শুধু প্রাণহানিই ঘটে না; বরং জাতীয় অর্থনীতিতেও বড়ো ক্ষতি হয়। আহত ব্যক্তির চিকিৎসা, কর্মক্ষমতা হারানো ও সম্পদের ক্ষতির কারণে বিপুল অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয়। অনেক পরিবার উপার্জনক্ষম সদস্য হারিয়ে দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে যায়। বিশ্বব্যাংকের মতে, উনয়নশীল দেশগুলোতে সড়ক দুঘটনা জাতীয় অথনীতির বড়ো ক্ষতির কারণ।

পরিবার ও মানসিক জীবনে প্রভাব

সড়ক দুর্ঘটনায় শুধু আহত ব্যক্তি নয়, পুরো পরিবার মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। অনেক শিশু বাবা-মা হারিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয়। একইসঙ্গে দুর্ঘটনার ভয় মানুষের মধ্যে মানসিক উদ্বেগ সৃষ্টি করে। ফলে এটি সামাজিক ও মানবিক সংকটে পরিণত হয়েছে।

গণপরিবহণ ব্যবস্থার দুর্বলতা

বাংলাদেশের গণপরিবহনব্যবস্থায় শৃঙ্খলার অভাব বড়ো সমস্যা। যাত্রী তোলার প্রতিযোগিতা, নির্ধারিত স্টপেজ না মানা ও অতিরিক্ত যাত্রী বহনের কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে। একইসঙ্গে চালকদের দীর্ঘ সময় কাজ করানোও দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কালের কণ্ঠ-তে প্রকাশিত "অব্যবস্থাপনায় বাড়ছে সড়ক দুর্ঘটনা" (২ জুলাই ২০২৫) প্রতিবেদনে এই সমস্যাগুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়।[৮]

প্রযুক্তি ও সড়ক নিরাপত্তা

বর্তমানে উন্নত বিশ্বে প্রযুক্তিনির্ভর সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সিসিটিভি নজরদারি, গতিনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সংকেত ও ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ দুর্ঘটনা কমাতে সহায়তা করছে। বাংলাদেশেও প্রযুক্তিনির্ভর সড়ক ব্যবস্থাপনা বাড়ানো প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ ও কঠোর আইন প্রয়োগ দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমাতে পারে।

গণসচেতনতার গুরুত্ব

"Road safety is everyone's responsibility."[৯] (সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সবার দায়িত্ব।)

শুধু সরকার নয়, চালক, পথচারী ও যাত্রী– সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে। ট্রাফিক আইন মেনে চলা, হেলমেট ও সিটবেল্ট ব্যবহার এবং সচেতন আচরণ দুর্ঘটনা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

সরকারের করণীয়

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সড়ক সংস্কার, চালকদের প্রশিক্ষণ, কঠোর আইন প্রয়োগ ও ফিটনেসবিহীন যানবাহন বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। একইসঙ্গে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ জরুরি। গণপরিবহন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ সড়ক

নিরাপদ সড়কের দাবি কেবল আন্দোলনের বিষয় নয়; এটি মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে এখনই কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ প্রতিটি প্রাণ মূল্যবান এবং প্রতিটি দুর্ঘটনা একটি পরিবারের স্বপ্ন ধ্বংস করে দেয়।

উপসংহার

সড়ক দুর্ঘটনা বর্তমান বাংলাদেশের অন্যতম বড়ো জাতীয় সমস্যা। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে এবং বহু পরিবার চিরদিনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বেপরোয়া গাড়ি চালানো, অদক্ষ চালক, দুর্বল আইন প্রয়োগ, অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও অসচেতনতা এই সংকটকে আরও তীব্রতর করেছে। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সরকার, চালক, পথচারী ও সাধারণ মানুষ– সবার সম্মিলিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। সচেতনতা, কঠোর আইন ও মানবিক দায়িত্ববোধের মাধ্যমে একটি নিরাপদ সড়কব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। কারণ নিরাপদ সড়ক শুধু উন্নয়নের অংশ নয়; এটি মানুষের মৌলিক অধিকার।

তথ্যসূত্র

১. *World Health Organization, Global Road Safety Report, 2025.*
২. *বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি, "বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা পরিসংখ্যান প্রতিবেদন", ২০২৫।*
৩. *প্রথম আলো, "সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মিছিল থামছে না", প্রকাশ: ২২ জুন ২০২৫।*
৪. *United Nations Road Safety Campaign Report, ২০২৪।*
৫. *The Daily Star, "Untrained drivers remain a major road threat", প্রকাশ: ১৭ মে ২০২৫।*
৬. *প্রথম আলো, "মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বাড়ছে প্রাণহানি", প্রকাশ: ১৪ জুন ২০২৫।*
৭. *BBC বাংলা, "নিরাপদ সড়ক আন্দোলন: শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের তাৎপর্য", প্রকাশ: ২০১৮।*
৮. *কালের কণ্ঠ, "অব্যবস্থাপনায় বাড়ছে সড়ক দুর্ঘটনা", প্রকাশ: ২ জুলাই ২০২৫।*
৯. *WHO Road Safety Awareness Campaign, 2025.*

১৯০. "বাংলাদেশের নারী ফুটবল দলের সাফল্য"

ভূমিকা

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে নারী ফুটবল দলের সাফল্য সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে গৌরবময় ও অনুপ্রেরণামূলক অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের খেলাধুলায় নারীদের অংশগ্রহণ নানা সামাজিক বাধা, অর্থনৈতিক সংকট ও অবহেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষ করে, ফুটবলের মতো খেলাকে একসময় শুধুই পুরুষদের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হতো। মেয়েরা মাঠে খেলতে গেলে কটূক্তি, অবহেলা ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতো। কিন্তু প্রতিকূল বাস্তবতাকে জয় করে বাংলাদেশের নারী ফুটবল দল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে তারা শুধু একটি ট্রফি জেতেনি; বরং পুরো জাতিকে আত্মবিশ্বাস, গৌরব ও নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছে। এই সাফল্য নারীর ক্ষমতায়ন, আত্মমর্যাদা ও সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ফিফার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, "Women's football is becoming a symbol of resilience and empowerment worldwide."[১] (নারী ফুটবল বিশ্বজুড়ে সংগ্রাম ও ক্ষমতায়নের প্রতীকে পরিণত হচ্ছে।)

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "আমরা শুধু ট্রফি জিততে মাঠে নামি না, আমরা দেশের মেয়েদের স্বপ্ন দেখাতে মাঠে নামি।"[২]

বাংলাদেশের নারী ফুটবলের শুরুর সংগ্রাম

বাংলাদেশে নারী ফুটবলের যাত্রা কখনোই সহজ ছিল না। একসময় সমাজে মেয়েদের খেলাধুলাকে ভালো চোখে দেখা হতো না। বিশেষ করে ফুটবলকে "ছেলেদের খেলা" হিসেবে বিবেচনা করা হতো। গ্রামের মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়ে অনেক

মেয়েকে কটূক্তি, অপমান ও সামাজিক বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছে। পরিবার থেকেও অনেকে সমর্থন পেতেন না। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া অনেক খেলোয়াড়ের জন্য খেলাধুলা চালিয়ে যাওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন। পর্যাপ্ত পুষ্টি, প্রশিক্ষণ, খেলার সরঞ্জাম কিংবা নিরাপদ মাঠ– কোনোটিই সহজলভ্য ছিল না। তবুও অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও স্বপ্নের জোরে তারা এগিয়ে গেছেন। অনেক খেলোয়াড়কে প্রতিদিন কয়েক কিলোমিটার পথ হেঁটে অনুশীলনে যেতে হয়েছে। কেউ কেউ পড়াশোনার পাশাপাশি সংসারের কাজ করেও ফুটবল চালিয়ে গেছেন। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নারী ফুটবলের ভিত তৈরি হয়েছে। **বাফুফের** এক প্রতিবেদনে বলা হয়, "বাংলাদেশের নারী ফুটবল সংগ্রাম দিয়েই নিজের পরিচয় তৈরি করেছে।"[৩]

(বাংলাদেশের নারী ফুটবল প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই নিজের অবস্থান তৈরি করেছে।)

এই সংগ্রামের গল্প বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনেরও ইতিহাস। কারণ সমাজের বাধা ভেঙে মাঠে দাঁড়ানো প্রতিটি নারী ফুটবলারের মধ্যে রয়েছে সাহস, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার প্রতিচ্ছবি।

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ঐতিহাসিক সাফল্য

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সবচেয়ে বড়ো অর্জন হলো সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জয়। এই জয় শুধু একটি টুর্নামেন্ট জয়ের ঘটনা ছিল না এটি পুরো জাতির আত্মবিশাসের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলে ভারত ও নেপালের আধিপত্য থাকলেও বাংলাদেশ সেই ধারণা বদলে দিয়েছে। ফাইনাল ম্যাচে অসাধারণ দলীয় পারফরম্যান্স, কৌশলগত দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস দেশের মানুষকে নতুন গর্বের অনুভূতি দিয়েছে। খেলা শেষ হওয়ার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে মানুষ রাস্তায় নেমে আনন্দ উদযাপন করেছে। প্রথম আলো লিখেছিল, "এই জয় শুধু ফুটবলের জয় নয়, এটি বাংলাদেশের মেয়েদের আত্মবিশ্বাসের জয়।"[৪]

এই অর্জনের ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশের পরিচিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম বাংলাদেশের নারী ফুটবল দলের সাফল্য নিয়ে পতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়েছে। একইসঙ্গে দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে।

সাবিনা খাতুন ও নেতৃত্বের অনুপ্রেরণা

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন বর্তমানে দেশের অন্যতম অনুপ্রেরণাদায়ী ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব। দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা তার জন্য সহজ ছিল না। ছোটোবেলায় সমাজের নানা কটূক্তি ও প্রতিবন্ধকতা সহ্য করতে হয়েছে। অনেক সময় অর্থাভাবে খেলার সরঞ্জামও সংগ্রহ করতে পারেননি। কিন্তু নিজের স্বপ্ন ও পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি দেশের অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। মাঠে তার নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা পুরো দলকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "সংগ্রাম ছাড়া কোনো বড়ো অর্জন সম্ভব নয়।"[৫]

সাবিনা বাংলাদেশের তরুণীদের জন্য সাহস ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। তার জীবনসংগ্রাম প্রমাণ করে যে প্রতিকূলতা যত বড়োই হোক, পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাস থাকলে সাফল্য অর্জন সম্ভব।

গ্রামের মেয়েদের অনুপ্রেরণার উৎস

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই গ্রামাঞ্চল থেকে উঠে এসেছেন। তাদের অনেকেই দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েও স্বপ্ন দেখা বন্ধ করেননি। খেলাধুলার জন্য পরিবার ও সমাজের বিরোধিতা সহ্য করেও তারা নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করেছেন। ফলে আজ গ্রামের বহু কিশোরী নারী ফুটবল দলকে অনুসরণ করে নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। আগে যেখানে গ্রামের মেয়েদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ সীমিত ছিল, এখন সেখানে অনেক পরিবার মেয়েদের মাঠে যেতে উৎসাহিত করছে। এই পরিবর্তন বাংলাদেশের সামাজিক অগ্রগতিরও গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। কালের কণ্ঠ-তে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, "নারী ফুটবল গ্রামের মেয়েদের স্বপ্ন দেখাতে শিখিয়েছে।"[৬]

এই সাফল্যের ফলে গ্রামীণ সমাজে নারীদের ভূমিকা নিয়েও নতুন চিন্তার জন্ম হয়েছে। অনেক পরিবার এখন মেয়েদের শুধু পড়াশোনা নয়, খেলাধুলা ও অন্যান্য সৃজনশীল কর্মকাণ্ডেও অংশ নিতে উৎসাহিত করছে।

নারীর ক্ষমতায়নে নারী ফুটবলের ভূমিকা

নারী ফুটবল শুধু ক্রীড়াক্ষেত্রে নয়; বরং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও বড়ো ভূমিকা পালন করছে। একসময় মেয়েদের খেলাধুলা সমাজে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু বর্তমানে নারী ফুটবল দলের সাফল্য সমাজের সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে দিচ্ছে। এখন মেয়েরা বুঝতে পারছে যে, তারাও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনতে পারে। পরিবারগুলোও মেয়েদের খেলাধুলায় অংশ নিতে উৎসাহিত করছে। একইসঙ্গে নারী খেলোয়াড়দের আর্থিক স্বাবলম্বিতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের এক বিবৃতিতে বলা হয়, "নারী ফুটবলের অগ্রগতি দেশের সামাজিক পরিবর্তনের প্রতীক।"[৭] নারী ফুটবল প্রমাণ করেছে যে নারীরা শুধু ঘরের কাজেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তারা আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। এই সাফল্য দেশের নারীদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অর্থনৈতিক সংকট ও অবহেলার বাস্তবতা

সাফল্য অর্জনের পরও নারী ফুটবলারদের নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। অনেক সময় পর্যাপ্ত বেতন, উন্নত প্রশিক্ষণ বা আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় না। গণমাধ্যমে পুরুষ ফুটবলের তুলনায় নারী ফুটবল কম গুরুত্ব পায়। অনেক খেলোয়াড়কে আর্থিক সংকটের মধ্যেও খেলাধুলা চালিয়ে যেতে হয়। দৈনিক ইত্তেফাক-এ প্রকাশিত "নারী ফুটবলের সাফল্যের আড়ালের কষ্ট" (২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২) প্রতিবেদনে খেলোয়াড়দের জীবনসংগ্রাম বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়।[৮] এই বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, নারী ফুটবলের উন্নয়নে আরও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রয়োজন।

কোচ ও প্রশিক্ষকদের অবদান

নারী ফুটবল দলের সাফল্যের পেছনে কোচ ও প্রশিক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা দীর্ঘ সময় ধরে খেলোয়াড়দের মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত করেছেন। কঠোর অনুশীলন, কৌশলগত পরিকল্পনা ও দলীয় ঐক্যই এই সাফল্যের মূল ভিত্তি। কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন নারী ফুটবলের উন্নয়নে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বহু বছর ধরে তৃণমূল পর্যায়ের মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

জাতীয় ঐক্য ও গৌরবের প্রতীক

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের জয় পুরো জাতিকে একসঙ্গে আনন্দিত করেছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভেদ ভুলে মানুষ একসঙ্গে বিজয় উদ্‌যাপন করেছে। ফলে খেলাধুলা যে জাতীয় ঐক্যের শক্তিশালী মাধ্যম– এই সাফল্য তার বড়ো উদাহরণ। বিটিভির এক বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়, "নারী ফুটবল দলের জয় জাতিকে একসঙ্গে আনন্দিত করেছে।"[৯]

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি

নারী ফুটবল দলের সাফল্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের প্রশংসা করেছে। এতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের পরিচিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। একইসঙ্গে বিদেশি ক্লাব ও প্রশিক্ষকদের নজরেও বাংলাদেশি খেলোয়াড়রা আসতে শুরু করেছে।

সংগ্রাম থেকে সাফল্যের শিক্ষা

"Success is born from struggle."[১০] (সাফল্য সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জন্ম নেয়।)

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের যাত্রা এই সত্যকেই প্রমাণ করেছে। সামাজিক বাধা, দারিদ্র্য ও অবহেলাকে জয় করেই তারা দেশের জন্য গৌরব এনে দিয়েছে। তাদের গল্প সাহস, আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায় ও দেশপ্রেমের গল্প।

উপসংহার

বাংলাদেশের নারী ফুটবল দলের সাফল্য দেশের ইতিহাসে অনুপ্রেরণামূলক অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। এই অর্জন শুধু ট্রফি জয়ের নয়; বরং এটি নারীর আত্মমর্যাদা, সংগ্রাম ও সম্ভাবনার প্রতীক। তারা প্রমাণ করেছে যে, সুযোগ ও সমর্থন পেলে বাংলাদেশের মেয়েরাও বিশ্বমঞ্চে দেশের পতাকা উঁচু করতে পারে। তাই নারী ফুটবলের উন্নয়নে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার– সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। কারণ এসব মেয়েরাই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সাহস, গৌরব ও স্বপ্নের প্রতীক।

তথ্যসূত্র

১. *FIFA Women's Football Development Report*, ২০২৪।
২. *বিটিভি ক্রীড়া সাক্ষাৎকার, সাবিনা খাতুন, সম্প্রচার: অক্টোবর ২০২২।*

৩. *বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে), নারী ফুটবল উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২০২৩।*
৪. *প্রথম আলো, "নারী ফুটবল দলের ঐতিহাসিক জয়", প্রকাশ: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২।*
৫. *দৈনিক ইত্তেফাক, "সংগ্রামের গল্প শোনালেন সাবিনা", প্রকাশ: ১৪ অক্টোবর ২০২২।*
৬. *কালের কণ্ঠ, "নারী ফুটবল গ্রামের মেয়েদের স্বপ্ন দেখাচ্ছে", প্রকাশ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২।*
৭. *বাফুফে নারী ফুটবল উন্নয়ন বিবৃতি, ২০২৩।*
৮. *দৈনিক ইত্তেফাক, "নারী ফুটবলারদের সাফল্যের আড়ালের কষ্ট", প্রকাশ: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২।*
৯. *বিটিভি বিশেষ ক্রীড়া প্রতিবেদন, "নারী ফুটবল দলের জয় ও জাতীয় উচ্ছ্বাস", ২০২২।*
১০. *UNESCO Sports and Youth Inspiration Report, ২০২৪।*

১৯১. "জাতি গঠনে খেলাধুলার ভূমিকা"

ভূমিকা

খেলাধুলা মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি শারীরিক সুস্থতা, মানসিক বিকাশ, শৃঙ্খলা, নেতৃত্বগুণ ও জাতীয় ঐক্য গঠনের অন্যতম শক্তিশালী উপাদান। একটি সুস্থ ও উন্নত জাতি গঠনে খেলাধুলার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বে খেলাধুলা সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বড়ো প্রভাব ফেলছে। ফুটবল, ক্রিকেট, অলিম্পিক বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মানুষকে একত্রিত করে এবং জাতীয় পরিচয়কে শক্তিশালী করে। বাংলাদেশেও খেলাধুলা তরুণ সমাজকে মাদক, অপরাধ ও সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, "Sport has the power to unite people beyond boundaries."[১] (খেলাধুলার এমন শক্তি রয়েছে, যা মানুষকে সব সীমার ঊর্ধ্বে একত্রিত করতে পারে।)

বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে বলেছে, "খেলাধুলা তরুণদের শৃঙ্খলাবোধ, নেতৃত্ব ও দেশপ্রেম শেখায়।"[২]

খেলাধুলা ও শারীরিক সুস্থতা

খেলাধুলা মানুষের শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান যুগে প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাত্রার কারণে মানুষ শারীরিকভাবে কম সক্রিয় হয়ে পড়ছে। ফলে স্থূলতা, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের মতো সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিয়মিত খেলাধুলা শরীরকে সুস্থ, সতেজ ও কর্মক্ষম রাখে। দৌড়, ফুটবল, ক্রিকেট, সাঁতার বা ব্যাডমিন্টনের মতো খেলাগুলো শরীরের পেশি ও হৃদযন্ত্রকে শক্তিশালী করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, "Physical activity is essential for a healthy life."[৩] (সুস্থ জীবনের জন্য শারীরিক কার্যক্রম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।)

খেলাধুলা মানুষের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

মানসিক বিকাশে খেলাধুলার ভূমিকা

খেলাধুলা মানুষের মানসিক বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। খেলাধুলা মানুষের আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য, মনোযোগ ও ইতিবাচক চিন্তাভাবনা বৃদ্ধি করে। খেলোয়াড়রা জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে জীবনের বাস্তব শিক্ষা লাভ করে। তারা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করতে শেখে। একইসঙ্গে দলগত খেলাধুলা মানুষের মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সম্মানের মনোভাব তৈরি করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, খেলাধুলা মানসিক বিষণ্নতা ও উদ্বেগ কমাতেও কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বগুণ তৈরিতে ভূমিকা

খেলাধুলা মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ ও নেতৃত্বগুণ তৈরি করে। একজন খেলোয়াড়কে নিয়মিত অনুশীলন, সময়ানুবর্তিতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে হয়। ফলে তার ব্যক্তিত্ব আরও দৃঢ় ও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। দলগত খেলাধুলার মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতাও তৈরি হয়। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, "খেলাধুলা তরুণদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।"[৪]

জাতীয় ঐক্য গঠনে খেলাধুলা

খেলাধুলা একটি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেশের দল জয়লাভ করলে পুরো জাতি একসঙ্গে আনন্দ উদযাপন করে। রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক বিভেদ ভুলে মানুষ এক পতাকার নিচে একত্রিত

হয়। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জয় বা নারী ফুটবল দলের সাফল্য পুরো জাতিকে একত্রিত করেছে। খেলাধুলা জাতীয় পরিচয় ও দেশপ্রেমের অনুভূতিকে আরও শক্তিশালী করে।

তরুণ সমাজকে অপরাধ থেকে দূরে রাখা

বর্তমানে তরুণ সমাজ নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি। মাদকাসক্তি, অপরাধ ও নেতিবাচক কর্মকাণ্ড থেকে তরুণদের দূরে রাখতে খেলাধুলা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। মাঠে সময় কাটালে তরুণরা শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়। একইসঙ্গে তাদের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হয়। প্রথম আলো-তে প্রকাশিত "খেলাধুলা তরুণদের বিপথগামিতা কমাতে পারে" (১২ জুলাই ২০২৫) প্রতিবেদনে বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন।[৫]

শিক্ষাজীবনে ইতিবাচক প্রভাব

খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও কর্মক্ষমতা বাড়ায়। নিয়মিত খেলাধুলা করলে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমে এবং পড়াশোনায় মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত থাকে তারা সময় ব্যবস্থাপনায়ও বেশি দক্ষ হয়। একইসঙ্গে খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে ভূমিকা

খেলাধুলা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। অলিম্পিক, বিশ্বকাপ বা এশিয়ান গেমস শুধু ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়; বরং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতিরও প্রতীক। জাতিসংঘ বলেছে, "Sport promotes peace, tolerance and mutual understanding."[৬] (খেলাধুলা শান্তি, সহনশীলতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি করে।)

অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে ভূমিকা

বর্তমানে খেলাধুলা বড়ো অর্থনৈতিক খাতে পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সম্প্রচার, বিজ্ঞাপন ও পর্যটনের মাধ্যমে বিপুল অর্থনৈতিক কার্যক্রম সৃষ্টি হয়। একইসঙ্গে কোচিং, ফিটনেস, ক্রীড়া সাংবাদিকতা ও ক্রীড়াসামগ্রী উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশেও ক্রিকেট ও ফুটবলকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম দিন দিন বাড়ছে।

নারী অংশগ্রহণ ও সামাজিক পরিবর্তন

বর্তমানে নারীরা খেলাধুলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সাফল্য সমাজে নারীদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে। খেলাধুলা নারীর আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করছে। একইসঙ্গে পরিবারগুলোও মেয়েদের খেলাধুলায় অংশ নিতে উৎসাহিত করছে।

গ্রামীণ সমাজে খেলাধুলার গুরুত্ব

গ্রামবাংলায় খেলাধুলা সামাজিক বন্ধন তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় টুর্নামেন্ট ও খেলাধুলা গ্রামের মানুষকে একত্রিত করে। একইসঙ্গে তরুণদের সুস্থ বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করে। গ্রামীণ পর্যায়ে খেলাধুলার উন্নয়ন দেশের সামগ্রিক ক্রীড়া অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রযুক্তি ও আধুনিক খেলাধুলা

বর্তমানে প্রযুক্তি খেলাধুলার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভিডিও বিশ্লেষণ, আধুনিক প্রশিক্ষণব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তি খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স উন্নত করছে। একইসঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম খেলোয়াড়দের জনপ্রিয়তা ও আন্তর্জাতিক পরিচিতি বৃদ্ধি করছে।

খেলাধুলা ও নৈতিক শিক্ষা

খেলাধুলা মানুষকে সততা, ন্যায়বিচার ও প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শেখায়। একজন প্রকৃত খেলোয়াড় জয়-পরাজয়কে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে শেখে। ফলে খেলাধুলা মানুষের নৈতিক বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গণমাধ্যম ও খেলাধুলা

গণমাধ্যম খেলাধুলাকে জনপ্রিয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও অনলাইন মাধ্যমের কারণে মানুষ বিভিন্ন খেলার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। একইসঙ্গে খেলোয়াড়দের সাফল্য ও সংগ্রামের গল্প মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

সরকারের ভূমিকা ও করণীয়

খেলাধুলার উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত মাঠ, প্রশিক্ষণকেন্দ্র, আর্থিক সহায়তা ও আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। একইসঙ্গে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভা খুঁজে বের করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, "দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছাড়া আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়।"[৭]

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও খেলাধুলার গুরুত্ব

বর্তমান প্রজন্ম প্রযুক্তিনির্ভর জীবনে ক্রমেই মাঠ ও খেলাধুলা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এটি ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগের বিষয়। সুস্থ ও মানবিক প্রজন্ম গড়ে তুলতে খেলাধুলাকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলাধুলার সুযোগ বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি।

খেলাধুলা ও জাতীয় গৌরব

"Sport creates pride, identity and inspiration for a nation."[৮] (খেলাধুলা একটি জাতির জন্য গৌরব, পরিচয় ও অনুপ্রেরণা তৈরি করে।)

বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাফল্য প্রমাণ করেছে যে, খেলাধুলা জাতির আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খেলাধুলা শুধু বিনোদন নয়; বরং এটি জাতির আত্মপরিচয়ের অংশ।

উপসংহার

খেলাধুলা মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব, দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। তরুণ সমাজকে সুস্থ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। তাই পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র–সবাইকে খেলাধুলার উন্নয়নে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ একটি সুস্থ, সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনে খেলাধুলা অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

তথ্যসূত্র

১. *International Olympic Committee, Sport and Society Report, ২০২৪।*
২. *বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, যুব উন্নয়ন ও ক্রীড়া বিবৃতি, ২০২৫।*
৩. *World Health Organization, Physical Activity and Health Report, ২০২৪।*
৪. *বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড, তরুণ উন্নয়ন কর্মসূচি প্রতিবেদন, ২০২৫।*
৫. *প্রথম আলো, "খেলাধুলা তরুণদের বিপথগামিতা কমাতে পারে", প্রকাশ: ১২ জুলাই ২০২৫।*
৬. *United Nations Office on Sport for Development and Peace, ২০২৪।*
৭. *বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), ক্রীড়া উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২০২৫।*
৮. *FIFA Global Football Culture Report, ২০২৪।*

১৯২. বৈশ্বিক বাণিজ্যযুদ্ধ ও শুল্ক-উত্তেজনা

ভূমিকা

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে বাণিজ্য রাষ্ট্রের ক্ষমতা, কূটনৈতিক অবস্থান, শিল্পনীতি এবং প্রযুক্তিগত আধিপত্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি, চীনের পাল্টা অবস্থান, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা এবং উন্নয়নশীল দেশের উদ্বেগ মিলিয়ে বৈশ্বিক বাণিজ্যব্যবস্থা নতুন অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করে। অতীতে শুল্ক ছিল রাজস্ব আহরণের উপায়; এখন তা রাজনৈতিক চাপ, নিরাপত্তা-যুক্তি এবং শিল্প সুরক্ষার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে বাজারের স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা দুর্বল হয়, উৎপাদন ব্যয় বাড়ে এবং ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হয়। এই প্রেক্ষাপটে বাণিজ্যযুদ্ধকে শুধু অর্থনৈতিক বিরোধ হিসেবে দেখা যথেষ্ট নয়; এটি বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ রূপ।

বাণিজ্যযুদ্ধের ধারণা ও বাস্তবতা

বাণিজ্যযুদ্ধ বলতে বোঝায় এমন এক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি, যেখানে একটি দেশ অন্য দেশের পণ্যের ওপর শুল্ক, কোটা, নিষেধাজ্ঞা বা প্রযুক্তিগত বাধা আরোপ করে এবং প্রতিপক্ষও পাল্টা ব্যবস্থা নেয়। এর উদ্দেশ্য কখনও দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করা, কখনও প্রতিপক্ষকে আলোচনার টেবিলে আনতে চাপ সৃষ্টি করা, আবার কখনও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমর্থন অর্জন করা। কিন্তু সমস্যাটি হলো, শুল্ক আরোপকারী দেশও শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ আমদানি পণ্যের দাম বাড়লে ভোক্তা, উৎপাদক ও খুচরা বাজার সবাই চাপ অনুভব করে। বিশ্বায়নের যুগে একটি গাড়ির যন্ত্রাংশ, একটি মোবাইল ফোন বা একটি পোশাকের কাঁচামাল বহু দেশের সরবরাহ শৃঙ্খল পেরিয়ে তৈরি হয়। তাই এক দেশের শুল্ক সিদ্ধান্ত দ্রুত বহু দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে প্রভাব ফেলে।

২০২৫ সালের শুল্ক-উত্তেজনার পটভূমি

২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কনীতিকে ঘিরে বৈশ্বিক বাণিজ্যে বড়ো ধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়। যুক্তরাষ্ট্র তার বাণিজ্য ঘাটতি, শিল্প উৎপাদন পুনরুদ্ধার এবং জাতীয় নিরাপত্তার যুক্তি সামনে এনে বহু দেশের পণ্যের ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপের পথে হাঁটে। এই নীতির ফলে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার রপ্তানিকারক দেশগুলো তাদের বাজার কৌশল নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সতর্ক করে যে উচ্চ শুল্ক ও নীতিগত অনিশ্চয়তা বিশ্ব পণ্য বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধিকে দুর্বল করতে পারে। ব্যবসায়ীরা আগাম আমদানি বা inventory front loading শুরু করে, যাতে ভবিষ্যৎ শুল্কের বাড়তি খরচ থেকে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু এই স্বল্পমেয়াদি কৌশল দীর্ঘমেয়াদে বাজারকে আরও অস্থিতিশীল করে।

যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পনীতি ও "America First" ভাবনা

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতির পেছনে একটি গভীর শিল্পনীতি কাজ করছে। দেশটি উৎপাদনশীল শিল্প, ইস্পাত, অটোমোবাইল, সেমিকন্ডাক্টর, ব্যাটারি ও কৌশলগত প্রযুক্তি খাতে নিজস্ব সক্ষমতা বাড়াতে চায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমদানি নির্ভরতা অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই শুল্ককে ব্যবহার করা হচ্ছে বিদেশি পণ্যের দাম তুলনামূলকভাবে বাড়িয়ে দেশীয় উৎপাদককে সুবিধা দেওয়ার কৌশল হিসেবে। তবে এই নীতির সীমাবদ্ধতাও আছে। শিল্প ফিরিয়ে আনতে শুধু শুল্ক যথেষ্ট নয়; দক্ষ শ্রমশক্তি, অবকাঠামো, গবেষণা, জ্বালানি ব্যয় ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন প্রয়োজন। শুল্ক যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে দেশীয় শিল্প সাময়িক সুরক্ষা পেলেও প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা হারাতে পারে।

চীন-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিযোগিতা

চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দ্বন্দ্ব বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার সবচেয়ে বড়ো অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রতিফলন। চীন উৎপাদন, রপ্তানি ও প্রযুক্তি সরবরাহে বিপুল সক্ষমতা অর্জন করেছে; অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থা, উচ্চ প্রযুক্তি, ডলার এবং সামরিক জোটের ওপর প্রভাব ধরে রেখেছে। শুল্ক-উত্তেজনা এই প্রতিযোগিতাকে আরও দৃশ্যমান করে। বিরোধ শুধু সস্তা পণ্য বা বাণিজ্য ঘাটতির নয়; কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, চিপ, বৈদ্যুতিক গাড়ি, বিরল খনিজ এবং ডেটা নিয়ন্ত্রণও এর অন্তর্ভুক্ত। ফলে বাণিজ্যযুদ্ধ ধীরে ধীরে প্রযুক্তিযুদ্ধ ও ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে মিশে গেছে। এই অবস্থায় বিশ্ব অর্থনীতি দুই প্রভাববলয়ের দিকে ধাবিত হওয়ার ঝুঁকিতে আছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অবস্থান

ইউরোপীয় ইউনিয়ন একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র, অন্যদিকে স্বাধীন বাণিজ্যনীতি ও নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রবক্তা। তাই মার্কিন শুল্কনীতি ইউরোপকে জটিল অবস্থানে ফেলে। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা যুক্তরাষ্ট্রের বাজার হারানোর ঝুঁকিতে পড়ে, আবার চীনের সঙ্গে অতিরিক্ত নির্ভরশীলতাও তাদের জন্য রাজনৈতিকভাবে অস্বস্তিকর। ফলে ইউরোপ পাল্টা শুল্ক, WTO-তে অভিযোগ, এবং নিজস্ব শিল্প সুরক্ষা প্যাকেজের কথা বিবেচনা করে। কিন্তু ইউরোপের কৌশল সাধারণত সরাসরি সংঘর্ষ নয়; আলোচনার মাধ্যমে নিয়মভিত্তিক সমাধান খোঁজা। এই অবস্থান দেখায় যে, বাণিজ্যনীতি আজ কেবল অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিষয় নয়, পররাষ্ট্রনীতি ও নিরাপত্তা কৌশলের অংশ।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সংকট

WTO প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নিয়মভিত্তিক, স্বচ্ছ ও পূর্বানুমানযোগ্য বিশ্ব বাণিজ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য। কিন্তু বড়ো শক্তিগুলো যখন একতরফা শুল্কনীতি গ্রহণ করে, তখন WTO-র কার্যকারিতা প্রশ্নের মুখে পড়ে। বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার দুর্বলতা, আপিল বডির সংকট এবং বড়ো অর্থনীতির রাজনৈতিক চাপ সংস্থাটিকে সীমাবদ্ধ করে। তবু WTO-র গুরুত্ব শেষ

হয়ে যায়নি; বরং বর্তমান সংকট দেখায় যে একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মঞ্চ কতটা প্রয়োজন। যদি প্রতিটি দেশ নিজস্ব শক্তি দিয়ে নিয়ম লিখতে শুরু করে, তবে ক্ষুদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই WTO সংস্কার এবং বহুপাক্ষিক বাণিজ্যব্যবস্থা পুনরুজ্জীবন জরুরি।

সরবরাহ শৃঙ্খল ও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন

শুল্ক-উত্তেজনার বড়ো প্রভাব পড়ে global supply chain-এ। আগে কোম্পানিগুলো কম খরচের উৎপাদনস্থল বেছে নিত; এখন তারা রাজনৈতিক ঝুঁকি, শুল্ক, নিষেধাজ্ঞা ও নিরাপত্তা বিবেচনা করে উৎপাদন স্থানান্তর করছে। "China plus one", near-shoring, friend-shoring ইত্যাদি ধারণা জনপ্রিয় হচ্ছে। এতে ভিয়েতনাম, ভারত, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশ নতুন সুযোগ পেতে পারে। তবে সুযোগের সঙ্গে চ্যালেঞ্জও আছে: অবকাঠামো, শ্রমদক্ষতা, পরিবেশ মান, দ্রুত কাস্টমস ব্যবস্থা এবং নীতির ধারাবাহিকতা না থাকলে বিনিয়োগ আকর্ষণ কঠিন। ফলে শুল্কযুদ্ধ দুর্বল দেশকে যেমন– ঝুঁকিতে ফেলে, তেমনি প্রস্তুত দেশকে নতুন বাজার ধরার সুযোগও দেয়।

ভোক্তা ও মূল্যস্ফীতির ওপর প্রভাব

শুল্কের সরাসরি অর্থ হলো আমদানিপণ্যের দাম বৃদ্ধি। ব্যবসায়ীরা বাড়তি শুল্কের পুরোটা নিজেরা বহন করে না; তার একটি অংশ ভোক্তার ওপর চাপানো হয়। ফলে পোশাক, ইলেকট্রনিকস, গাড়ি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত পণ্য বা শিল্পকাঁচামালের দাম বাড়তে পারে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ায় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সুদের হার বাড়াতে বাধ্য করে। সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ কমে, কর্মসংস্থান চাপের মুখে পড়ে এবং অর্থনীতির গতি ধীর হয়। তাই শুল্ককে দেশপ্রেমিক নীতি হিসেবে প্রচার করা হলেও এর সামাজিক ব্যয় ভোক্তা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বহন করতে হয়।

উন্নয়নশীল দেশের ঝুঁকি

উন্নয়নশীল দেশগুলো সাধারণত বৈশ্বিক বাজার, রপ্তানি আয় ও বিদেশি বিনিয়োগের ওপর বেশি নির্ভরশীল। বড়ো অর্থনীতির শুল্কযুদ্ধ তাদের নীতিনির্ধারণে অস্থিরতা তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, পোশাক রপ্তানিকারক দেশগুলো যদি প্রধান বাজারে উচ্চ শুল্কের মুখে পড়ে, তবে অর্ডার কমে যেতে পারে। আবার চীনের পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়লে কিছু অর্ডার অন্য দেশে সরে আসতে পারে। তাই একই পরিস্থিতি ঝুঁকি ও সুযোগ– দুটিই তৈরি করে। উন্নয়নশীল দেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো রপ্তানি বৈচিত্র্য, পণ্যের মানোনয়ন, দ্রুত বন্দরসেবা, বাণিজ্য চুক্তি এবং দক্ষ কূটনৈতিক দরকষাকষি। শুধু কম মজুরি দিয়ে ভবিষ্যৎ বাজার ধরে রাখা সম্ভব হবে না।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রপ্তানি, বিশেষত তৈরি পোশাক, বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস। বৈশ্বিক শুল্ক-উত্তেজনা বাংলাদেশের জন্য দ্বিমুখী বাস্তবতা তৈরি করে। একদিকে প্রধান বাজারে আমদানি ব্যয় বাড়লে ক্রেতারা অর্ডার কমাতে পারে; অন্যদিকে চীনের বিকল্প উৎস খুঁজতে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলো বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দিকে তাকাতে পারে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে হলে শ্রম অধিকার, পরিবেশ মান, উৎপাদন দক্ষতা, বন্দর সক্ষমতা ও কাস্টমস সহজীকরণে উন্নতি দরকার। একই সঙ্গে জুট, চামড়া, ওষুধ, কৃষিপণ্য, হালকা প্রকৌশল ও আইসিটি সেবা রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনা জরুরি। বাণিজ্যযুদ্ধের যুগে কেবল একটি পণ্য বা একটি বাজারের ওপর নির্ভরতা নিরাপদ নয়।

প্রযুক্তি ও কৌশলগত পণ্য

আজকের বাণিজ্যযুদ্ধের কেন্দ্রে আছে প্রযুক্তি। সেমিকন্ডাক্টর, টেলিকম সরঞ্জাম, AI চিপ, সৌর প্যানেল, ব্যাটারি ও বিরল খনিজকে এখন কৌশলগত সম্পদ হিসেবে দেখা হচ্ছে। কোনো দেশ যদি এসব পণ্যে প্রতিপক্ষের ওপর নির্ভরশীল থাকে, তবে সংকটকালে তার শিল্প উৎপাদন ও প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বিপন্ন হতে পারে। এ কারণে শুল্কের পাশাপাশি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগ যাচাই, প্রযুক্তি নিষেধাজ্ঞা এবং তথ্য নিরাপত্তা আইনও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ফলে বাণিজ্যনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার সীমারেখা ক্রমে অস্পষ্ট হচ্ছে। ভবিষ্যতের বাণিজ্য সংঘাত শুধু বন্দরে পণ্য আটকে দেওয়া নয়, বরং ডেটা, সফটওয়্যার, চিপ এবং গবেষণা নিয়ন্ত্রণের লড়াই হবে।

কূটনীতি ও জোট রাজনীতি

NABARUN PUBLICATION

শুল্ক-উত্তেজনা আন্তর্জাতিক কূটনীতিকে নতুনভাবে সাজায়। দেশগুলো শুধু পণ্য বিক্রি করে না; তারা বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক সম্পর্কও গড়ে। যুক্তরাষ্ট্র মিত্র দেশগুলোকে নির্দিষ্ট সরবরাহ চেইনে যুক্ত করতে চায়, চীন বেল্ট অ্যান্ড রোড ও আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে, আর ইউরোপ পরিবেশ ও মানবাধিকার মানকে বাণিজ্যনীতির সঙ্গে যুক্ত করছে। ফলে যে দেশগুলো কূটনৈতিকভাবে ভারসাম্য রাখতে পারে, তারা বেশি লাভবান হয়। ছোটো রাষ্ট্রগুলোর জন্য একপক্ষীয় আনুগত্যের বদলে বহুমুখী সম্পর্ক, বাজার বৈচিত্র্যতা এবং আন্তজাতিক আইননির্ভর অবস্থান গ্রহণ অধিকতর বাস্তবসম্মত।

অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ বনাম মুক্তবাণিজ্য

বাণিজ্যযুদ্ধের মূলে আছে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ও মুক্তবাণিজ্যের দ্বন্দ্ব। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ দেশীয় শিল্প, শ্রমিক ও উৎপাদন সুরক্ষার কথা বলে; মুক্তবাণিজ্য বলে প্রতিযোগিতা, দক্ষতা ও কম দামের কথা। বাস্তবে কোনো দেশই পুরোপুরি মুক্তবাণিজ্য বা পুরোপুরি সুরক্ষাবাদ অনুসরণ করে না। প্রশ্ন হলো ভারসাম্য কোথায় হবে? অতিরিক্ত সুরক্ষাবাদ অদক্ষ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখে, আবার পুরোপুরি উন্মুক্ততা দুর্বল শিল্পকে ধ্বংস করতে পারে। তাই যুক্তিসংগত শিল্পনীতি, সময় সীমাবদ্ধ সুরক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি একসঙ্গে দরকার।

সম্ভাব্য সমাধানের পথ

বাণিজ্যযুদ্ধ থামাতে প্রথম প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা। বড়ো অর্থনীতিগুলোকে বুঝতে হবে যে শুল্ক দিয়ে সাময়িক দরকষাকষি সম্ভব হলেও স্থায়ী সমৃদ্ধি আসে সহযোগিতা থেকে। WTO সংস্কার, আঞ্চলিক বাণিজ্য সংলাপ, স্বচ্ছ ভতকি নীতি, প্রযুক্তি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের ন্যায্যতা এবং বিরোধ নিস্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা দরকার। একই সঙ্গে দেশগুলোকে দেশীয় শিল্প শক্তিশালী করতে হবে, কিন্তু তা যেন আন্তর্জাতিক নিয়ম ভেঙে না হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রয়োজন দক্ষ বাণিজ্য কূটনীতি, বাজার গবেষণা, পণ্যের মান উন্নয়ন এবং দ্রুত নাতি প্রতিক্রিয়া।

উপসংহার

বৈশ্বিক বাণিজ্যযুদ্ধ ও শুল্ক-উত্তেজনা আমাদের শেখায় যে অর্থনীতি কখনও রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। শুল্কের সিদ্ধান্ত কারখানা, কৃষক, বন্দর, ভোক্তা, বিনিয়োগকারী এবং কূটনীতিক– সবার জীবনে প্রভাব ফেলে। ২০২৫ সালের উত্তেজনা বিশ্বায়নের সীমাবদ্ধতা, সরবরাহ শৃঙ্খলের ভঙ্গুরতা এবং বড়ো শক্তির প্রতিযোগিতাকে সামনে এনেছে। তবে সংকটের মধ্যেও সুযোগ আছে। যে রাষ্ট্র দ্রুত নীতি বদলাতে পারে, পণ্যের মান বাড়াতে পারে এবং বহুমুখী কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে, সে নতুন বিশ্ব বাণিজ্যব্যবস্থায় নিজের অবস্থান শক্ত করতে পারবে। শুল্কের দেয়াল যত উঁচু হোক, টেকসই সমাধান শেষ পর্যন্ত সংলাপ, নিয়ম এবং পারস্পরিক নির্ভরতার মধ্যেই খুঁজতে হবে।

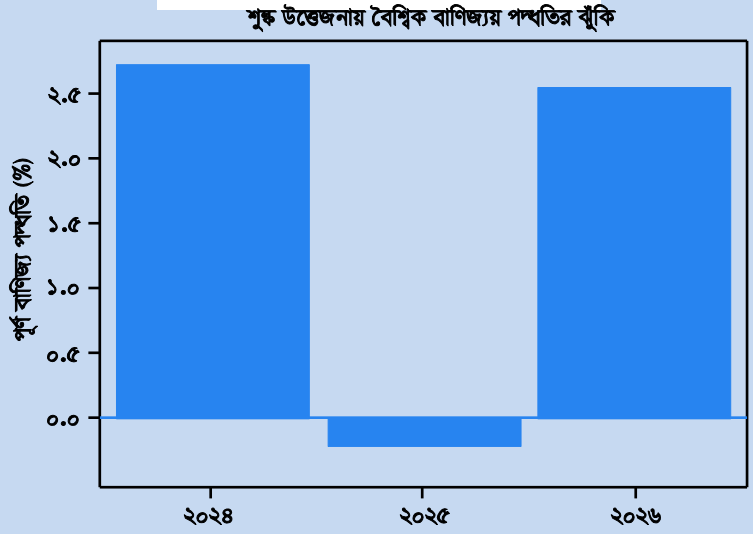

চার্ট ১: WTO-র ২০২৫ সতর্কতা অনুযায়ী শুল্ক-উত্তেজনা বৈশ্বিক পণ্য বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধিকে নেতিবাচক দিকে ঠেলে দিতে পারে; ২০২৬ সালে পুনরুদ্ধারও নীতিগত অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভরশীল।

১৯৩. রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও শান্তি-প্রক্রিয়া

ভূমিকা

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও গভীর প্রভাববাহী সংকটগুলোর একটি। ২০২২ সালের পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের পর যুদ্ধটি শুধু দুই রাষ্ট্রের ভূখণ্ডগত বিরোধে সীমাবদ্ধ থাকেনি; এটি ইউরোপীয় নিরাপত্তা, NATO-এর ভূমিকা, জ্বালানি বাজার, খাদ্য নিরাপত্তা, সামরিক ব্যয় এবং আন্তর্জাতিক আইন নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। ২০২৬ সালের শুরুতে "Coalition of the Willing" ও নিরাপত্তা নিশ্চয়তার আলোচনা দেখায় যে বিশ্ব যুদ্ধের ক্লান্তি অনুভব করলেও শান্তির পথ এখনও জটিল। কারণ শান্তি মানে শুধু অস্ত্রবিরতি নয়; নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, বিচার, পুনর্গঠন এবং ভবিষ্যৎ আক্রমণ ঠেকানোর বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থাও এর অংশ।

যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি

রাশিয়া-ইউক্রেন সম্পর্কের সংকট হঠাৎ তৈরি হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার পর ইউক্রেন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে শুরু করে। রাশিয়া এটিকে নিজের নিরাপত্তা ও প্রভাববলয়ের জন্য হুমকি হিসেবে দেখে। ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখল এবং দনবাস অঞ্চলে সংঘাত এই উত্তেজনাকে স্থায়ী রূপ দেয়। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আক্রমণ আন্তর্জাতিক আইন, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং সীমান্তের অখণ্ডতা নিয়ে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ সৃষ্টি করে। ফলে যুদ্ধের পটভূমিতে ইতিহাস, পরিচয়, নিরাপত্তা ধারণা এবং বড়ো শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা একইসঙ্গে কাজ করেছে।

আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন

জাতিসংঘ সনদের মূলনীতি হলো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং বলপ্রয়োগের নিষেধ। ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার আক্রমণ এই নীতির সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে আসে বলে পশ্চিমা দেশগুলো দাবি করে। রাশিয়া পাল্টা নিরাপত্তা উদ্বেগ, রুশভাষী জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা এবং NATO সম্প্রসারণের যুক্তি তুলে ধরে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে নিরাপত্তা উদ্বেগ অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ড দখলের অনুমতি দেয় না। এই কারণেই যুদ্ধটি শুধু আঞ্চলিক সংঘাত নয়; এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ–পরবর্তী নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার জন্য একটি বড়ো পরীক্ষা।

মানবিক বিপর্যয়

যুদ্ধের সবচেয়ে করুণ চিত্র দেখা যায় সাধারণ মানুষের জীবনে। শহর ধ্বংস, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, স্কুল বন্ধ, শিশুদের মানসিক ট্রমা এবং পরিবার বিচ্ছেদ– এসব যুদ্ধের অদৃশ্য ক্ষত। UNHCR-এর তথ্য অনুযায়ী ইউক্রেনে লক্ষ লক্ষ মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত এবং কয়েক মিলিয়ন মানুষ বিদেশে আশ্রয় নিয়েছে। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে মানবিক সহায়তার প্রয়োজন বাড়ে, কিন্তু সহায়তা পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে। মানবিক সংকট কেবল আশ্রয় বা খাদ্যের প্রশ্ন নয়; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানসিক সেবা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক পুনর্গঠনও এর সঙ্গে যুক্ত।

ইউক্রেনের প্রতিরোধ ও রাষ্ট্রীয় পরিচয়

রাশিয়ার সামরিক শক্তির তুলনায় ইউক্রেন শুরুতে দুর্বল মনে হলেও দেশটি দ্রুত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই প্রতিরোধ শুধু সেনাবাহিনীর নয়; সাধারণ নাগরিক, স্থানীয় প্রশাসন, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, স্বেচ্ছাসেবী ও প্রবাসী ইউক্রেনীয়দের সম্মিলিত ভূমিকা এতে আছে। যুদ্ধ ইউক্রেনের জাতীয় পরিচয়কে আরও দৃঢ় করে। ভাষা, সংস্কৃতি, পতাকা, ইউরোপমুখী আকাঙ্ক্ষা এবং স্বাধীনতার চেতনা নতুন শক্তি পায়। দীর্ঘ যুদ্ধ ইউক্রেনীয় সমাজকে ক্লান্ত করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংকল্পকে আন্তর্জাতিকভাবে দৃশ্যমান করেছে।

রাশিয়ার কৌশল ও সীমাবদ্ধতা

রাশিয়া যুদ্ধকে নিরাপত্তা, ঐতিহাসিক দাবি এবং পশ্চিমা প্রভাব প্রতিরোধের ভাষায় ব্যাখ্যা করে। সামরিকভাবে তারা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, দখলকৃত অঞ্চল ধরে রাখা, জ্বালানি অবকাঠামো লক্ষ্যবস্তু করা এবং সময়ক্ষেপণ কৌশল ব্যবহার করে। তবে যুদ্ধ দীর্ঘ হওয়ায় রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা, সামরিক ক্ষয়, প্রযুক্তি আমদানির সীমাবদ্ধতা এবং কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার

চাপ তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে রাশিয়া, এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়িয়ে পশ্চিমা চাপ কমানোর চেষ্টা করছে। তাই রাশিয়ার কৌশল একদিকে সামরিক, অন্যদিকে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক পুনর্বিন্যাসের ওপর নির্ভরশীল।

NATO ও পশ্চিমা সহায়তা

NATO সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়নি, কিন্তু ইউক্রেনকে অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, গোয়েন্দা তথ্য, আর্থিক সহায়তা ও রাজনৈতিক সমর্থন দিয়েছে। এই সহায়তা ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়ালেও রাশিয়া এটিকে পশ্চিমা হস্তক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরে। পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন উদ্বেগ আছে: কেউ দ্রুত সহায়তা বাড়াতে চায়, কেউ যুদ্ধ বিস্তৃত হওয়ার ঝুঁকি বিবেচনা করে সতর্ক। ফলে NATO-এর ভূমিকা ভারসাম্যপূর্ণ: ইউক্রেনকে পরাজিত হতে না দেওয়া, কিন্তু সরাসরি NATO-রাশিয়া যুদ্ধ এড়ানো। এই সূক্ষ্ম ভারসাম্যই যুদ্ধের কূটনৈতিক জটিলতা বাড়িয়েছে।

Coalition of the Willing

২০২৫–২৬ সময়ে "Coalition of the Willing" ধারণাটি ইউক্রেনের সম্ভাব্য শান্তি-চুক্তির পর নিরাপত্তা নিশ্চয়তা নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে আসে। ইউরোপীয় দেশগুলোর একটি অংশ মনে করে, শুধু কাগুজে প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট নয়; ভবিষ্যৎ রুশ আক্রমণ ঠেকাতে প্রশিক্ষণ, নজরদারি, সামরিক উপস্থিতি বা পুনর্গঠন সহায়তার মতো বাস্তব ব্যবস্থা দরকার। Euronews–এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে প্যারিসে প্রায় ৩৫ দেশের নেতারা ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। তবে এই উদ্যোগের বড়ো প্রশ্ন হলো: কোন দেশ কত দূর পর্যন্ত ঝুঁকি নেবে, যুক্তরাষ্ট্র কতটা backstop দেবে, এবং রাশিয়া এমন ব্যবস্থাকে কীভাবে দেখবে।

শান্তি আলোচনার জটিলতা

শান্তি আলোচনা বলতে কেবল যুদ্ধবিরতি ঘোষণাকে বোঝালে ভুল হবে। ইউক্রেন চায় ভূখণ্ডের অখণ্ডতা, যুদ্ধাপরাধের বিচার, ক্ষতিপূরণ এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চয়তা। রাশিয়া চায় দখলকৃত অঞ্চলের বাস্তবতা স্বীকার, NATO প্রসার সীমিত করা এবং নিষেধাজ্ঞা শিথিল। পশ্চিমা দেশগুলো চায় এমন সমঝোতা, যাতে ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন থাকে এবং ইউরোপীয় নিরাপত্তা দুর্বল না হয়। এই তিন ধরনের প্রত্যাশার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই শান্তি–প্রক্রিয়া ধীর, অনিশ্চিত এবং বহুস্তরীয়। তবু যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে উভয় পক্ষের ক্ষয় বাড়ে, ফলে আলোচনার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

জ্বালানি বাজারে প্রভাব

রাশিয়া দীর্ঘদিন ইউরোপের প্রধান গ্যাস সরবরাহকারী ছিল। যুদ্ধের পর নিষেধাজ্ঞা, পাইপলাইন সংকট এবং রাজনৈতিক অবিশ্বাস ইউরোপকে জ্বালানি উৎস বৈচিত্র্য করতে বাধ্য করে। তরলীকৃত পাকতিক গ্যাস, নবায়নযোগ্য জালানি, নরওয়ে ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরবরাহ এবং সঞ্চয়নীতি ইউরোপকে ধীরে ধীরে রশনিভরতা কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু এই রপান্তরের মূল্য ছিল উচ্চ: শিল্প উৎপাদন ব্যয়, গৃহস্থালি বিদ্যুৎ বিল এবং সরকারি ভর্তুকি বেড়ে যায়। জ্বালানি বাজারের এই অস্থিরতা দেখায় যে, নিরাপত্তা শুধু সামরিক নয়; জ্বালানি অবকাঠামোও জাতীয় নিরাপত্তার অংশ।

খাদ্য ও সার নিরাপত্তা

ইউক্রেন ও রাশিয়া উভয়ই গম, ভুট্টা, সূর্যমুখী তেল ও সারের বৈশ্বিক বাজারে গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধের কারণে কৃষিজ উৎপাদন, বন্দর ব্যবহার, কৃষ্ণসাগরীয় রপ্তানি এবং সার সরবরাহ ব্যাহত হয়। এর প্রভাব পড়ে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার আমদানিনির্ভর দেশে। খাদ্যের দাম বাড়লে দরিদ্র পরিবার বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ তাদের আয়ের বড়ো অংশ খাদ্যে ব্যয় হয়। যুদ্ধ তাই শুধু ইউরোপের নিরাপত্তা সংকট নয়; এটি বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নও। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কূটনৈতিক উদ্যোগের মাধ্যমে খাদ্য করিডর চালু রাখা মানবিক দায়িত্ব।

বিশ্ব অর্থনীতিতে চাপ

যুদ্ধ বৈশ্বিক অর্থনীতিকে একাধিক পথে চাপ দেয়। জ্বালানি ও খাদ্যের দাম বাড়ে, সরবরাহ শৃঙ্খল অস্থির হয়, বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকিপূর্ণ বাজার থেকে সরে যায় এবং সরকারগুলো প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়ায়। উন্নয়নশীল দেশগুলো একই সঙ্গে আমদানি ব্যয়, ঋণের সুদ, ডলার সংকট এবং মূল্যস্ফীতির চাপ অনুভব করে। যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাব সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে

সীমাবদ্ধ থাকে না; তা নিত্যপণ্য, পরিবহন, কৃষি উৎপাদন, মুদ্রানীতি ও বাজেট ঘাটতিতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে শান্তি কেবল নৈতিক প্রয়োজন নয়, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতারও শর্ত।

সামরিক ব্যয় ও নিরাপত্তা মানসিকতা

রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ ইউরোপসহ বিশ্বব্যাপী প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়িয়েছে। SIPRI জানায়, ২০২৪ সালে বিশ্ব সামরিক ব্যয় ২.৭ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি হয় এবং এক দশক ধরে সামরিক ব্যয় ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। এই প্রবণতা দেখায় যে, রাষ্ট্রগুলো নিরাপত্তাকে আবার কেন্দ্রীয় অগ্রাধিকার হিসেবে দেখছে। তবে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির সামাজিক মূল্য আছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলবায়ু অভিযোজন বা দারিদ্র্য বিমোচনে যে অথ ব্যয় হতে পারত, তার বড়ো অংশ অস্ত্র ও পতিরক্ষায় চলে যায়। নিরাপত্তা পয়োজনীয়, কিন্তু যুদ্ধ নিভর নিরাপত্তা ধারণা দীঘমেয়াদে মানবিক উনয়নকে ক্ষতিগস্ত করতে পারে।

তথ্যযুদ্ধ ও প্রচারণা

এই যুদ্ধের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তথ্যযুদ্ধ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, রাষ্ট্রীয় পচারমাধ্যম, সাইবার হামলা, ভুয়া খবর এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার যুদ্ধের অংশ হয়ে উঠেছে। কোনো হামলার দায়, হতাহতের সংখ্যা, যুদ্ধক্ষেত্রের সাফল্য বা শান্তি প্রস্তাব–সবকিছুই তথ্যযুদ্ধের মাধ্যমে জনগণের ধারণা প্রভাবিত করে। গণতান্ত্রিক সমাজে মুক্ত সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ হলেও যুদ্ধকালে তথ্য যাচাই কঠিন হয়। তাই নাগরিকের জন্য media literacy, স্বাধীন সাংবাদিকতা এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য। যুদ্ধক্ষেত্র যেমন–মাটিতে, তেমনি মানুষের মনের মধ্যেও চলে।

বাংলাদেশের অবস্থান ও শিক্ষা

বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সার্বভৌমত্বের সম্মান এবং আন্তর্জাতিক আইনের পক্ষে অবস্থান করে। রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ বাংলাদেশের জন্য কয়েকটি শিক্ষা রেখে গেছে। **প্রথমত**, দূরের যুদ্ধও খাদ্য, জ্বালানি ও সার আমদানির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে। **দ্বিতীয়ত**, একক উৎসের ওপর নির্ভরতা ঝুঁকিপূর্ণ; তাই আমদানি উৎস বৈচিত্র্য দরকার। **তৃতীয়ত**, কূটনৈতিক ভারসাম্য ছোটো রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশকে নীতিগতভাবে শান্তি, সংলাপ ও মানবিক সহায়তার পক্ষে থাকতে হবে, একই সঙ্গে নিজস্ব অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী করতে হবে।

স্থায়ী শান্তির শর্ত

স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে কয়েকটি শর্ত জরুরি। **প্রথমত**, যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা থাকতে হবে। **দ্বিতীয়ত**, ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা কাগুজে প্রতিশ্রুতির বাইরে বাস্তব প্রতিরক্ষা সক্ষমতায় রূপ নিতে হবে। **তৃতীয়ত**, মানবিক করিডর, বন্দী বিনিময়, শিশু প্রত্যাবর্তন ও পুনর্গঠন সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে। **চতুর্থত**, আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নকে পুরোপুরি উপেক্ষা করলে ভবিষ্যৎ সংঘাতের বীজ থেকে যাবে। শান্তি মানে কেবল বন্দুক নীরব হওয়া নয়; মানুষের নিরাপদে ঘরে ফেরা, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা টিকে থাকা এবং আস্থার পুনর্গঠন।

উপসংহার

রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বকে দেখিয়েছে যে একবিংশ শতাব্দীতেও ভূখণ্ড, নিরাপত্তা ও প্রভাববলয়ের রাজনীতি কতটা শক্তিশালী। যুদ্ধের মূল্য শুধু সৈন্য বা অস্ত্রে মাপা যায় না; তা শরণার্থী শিশু, ভাঙা শহর, শীতের অন্ধকারে বিদ্যুৎহীন পরিবার, উচ্চ খাদ্যমূল্য এবং বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার মধ্যেও প্রকাশ পায়। ২০২৬ সালের শান্তি–প্রক্রিয়া আশার দরজা খুললেও বাস্তবতা কঠিন। তবু কূটনীতি ছাড়া বিকল্প নেই। ন্যায়ভিত্তিক শান্তি, বিশ্বাসযোগ্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তা, মানবিক পুনর্গঠন এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সম্মান–এই চার স্তম্ভ ছাড়া স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। যুদ্ধের শেষ লক্ষ্য জয় নয়, মানবতার নিরাপদ ভবিষ্যৎ হওয়া উচিত।

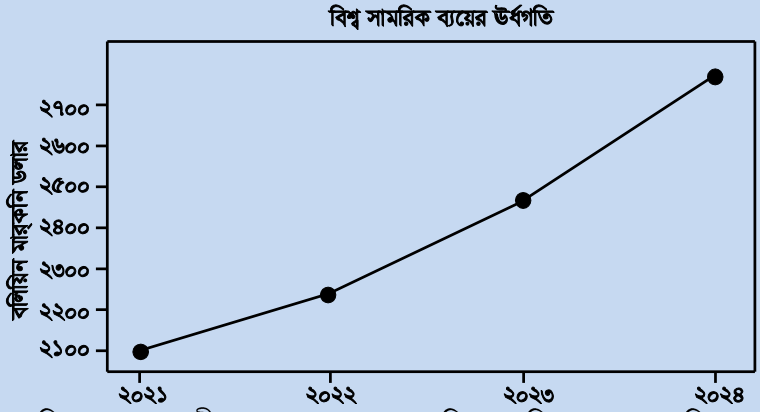

চার্ট ২: SIPRI–র প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০২১–২০২৪ সময়ে বিশ্ব সামরিক ব্যয় ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে; রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ ও বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা এই প্রবণতাকে ত্বরান্বিত করেছে।

তথ্যসূত্র

১. *World Trade Organization (WTO), Global Trade Outlook and Statistics, April 2025 and October 2025 updates.*
২. *UNCTAD, Global Trade Update, March 2025.*
৩. *Euronews, reports on US tariffs, global trade uncertainty and IMF/WTO warnings, 2025.*
৪. *European Parliament, US tariffs: economic, financial and monetary repercussions, July 2025.*
৫. *Reuters, reports on US tariff policy and USMCA/China trade measures, 2026.*
৬. *Euronews, "Coalition of the Willing meets in Paris to discuss security guarantees for Ukraine, " 6 January 2026.*
৭. *Euronews, "Coalition of the Willing calls for transatlantic unity for Ukraine, " 11 December 2025.*
৮. *UK Parliament House of Commons Library, Proposals for a Coalition of the Willing in Ukraine, January 2026.*
৯. *UNHCR, Ukraine Emergency and Ukraine country situation updates, 2025-2026.*
১০. *SIPRI, Trends in World Military Expenditure 2024, April 2025.*
১১. *World Bank, Commodity Markets Outlook and food security updates on impacts of war and commodity shocks.*
১২. *United Nations Security Council briefings and humanitarian updates on Ukraine.*

১৯৪. মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ ও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে প্রভাব

ভূমিকা

একুশ শতকের তৃতীয় দশকে এসে মানবসভ্যতা আবারও প্রত্যক্ষ করেছে যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ। ২০২৬ সালের শুরুতে ইরানকে কেন্দ্র করে যে সংঘাত দানা বাঁধে, তা কেবল একটি আঞ্চলিক বিরোধ হয়ে থাকেনি–তার কম্পন গিয়ে পৌঁছেছে বিশ্ব অর্থনীতির স্নায়ুকেন্দ্রে। তেলের পাইপলাইন থেকে শুরু করে রুটির দাম পর্যন্ত, যুদ্ধের আঁচ লেগেছে সর্বত্র। এই রচনায় দেখানো হয়েছে কীভাবে একটি যুদ্ধ একই সঙ্গে জীবন ও জীবিকা–উভয়কেই বিপন্ন করে তোলে।

সংঘাতের প্রেক্ষাপট ও বিস্তার

সংঘাতের সূচনা: ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বপরিকল্পিত হামলার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সূচনা হয়, যা ২০২৪ ও ২০২৫ সালের উত্তেজনার ধারাবাহিকতার এক বড়ো উল্লম্ফন।

পাঁচ সপ্তাহের লড়াই: Encyclopædia Britannica–র তথ্য অনুযায়ী, পাঁচ সপ্তাহেরও বেশি লড়াইয়ের পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান ৭–৮ এপ্রিল যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়, যাতে ইসরায়েলও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বহুপাক্ষিক জড়িত হওয়া: পারমাণবিক কর্মসূচি, প্রক্সি মিলিশিয়াদের প্রতি সমর্থন এবং আঞ্চলিক আধিপত্যের দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধে ইসরায়েল, ইরান, যুক্তরাষ্ট্র ও বিভিন্ন প্রক্সি শক্তি জড়িয়ে পড়ে।

মানবিক ক্ষয়ক্ষতি

হাজারো প্রাণহানি: Britannica জানায়, এই সংঘাতে ইরান ও লেবাননে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়, আর ইসরায়েল ও উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলোতে নিহত হয় কয়েক ডজন।

লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত: আল–জাজিরার সরাসরি পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হিসেবে নিবন্ধিত হয়; কেবল ৮ এপ্রিল একদিনেই হামলায় ৩০০–র বেশি মানুষ নিহত ও অন্তত ১,১৫০ জন আহত হন।

দৈনন্দিন জীবনে আঘাত: যুদ্ধ কেবল রণাঙ্গনে সীমাবদ্ধ থাকেনি–অবকাঠামো ধ্বংস, ইন্টারনেট অন্ধকার ও মৌলিক সেবায় বিঘ্ন সাধারণ নাগরিকদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

জ্বালানি সরবরাহে বিপর্যয়

হরমুজ প্রণালির সংকট: বিশ্বের অন্যতম স্পর্শকাতর তেল–করিডর হরমুজ প্রণালিতে চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়, ফলে এশিয়ার নানা অংশে জ্বালানি সংকট দেখা দেয় এবং তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিশ্ব অর্থনীতিতে।

তেলের দামে উল্লম্ফন: Middle East Council on Global Affairs–এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বৈশ্বিক তেল ও গ্যাস সরবরাহ প্রায় ২০ শতাংশ কমে যাওয়ায় ব্যারেল প্রতি দাম ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যায়–যা একটি বৈশ্বিক মন্দা ডেকে আনার মতো যথেষ্ট।

অর্থনৈতিক ধাক্কা

ইরানের পঙ্গু অর্থনীতি: যুদ্ধের সরাসরি ব্যয়, কয়েক দশকের নিষেধাজ্ঞা ও মুদ্রার অবমূল্যায়ন মিলিয়ে ইরানের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়; রিয়ালের মান ২০১৮ সালের পর থেকে ৯০ শতাংশেরও বেশি হারিয়েছে।

ইসরায়েলের আর্থিক বোঝা: ৩০ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত হিসাবে, ইসরায়েলের অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়।

স্ট্যাগফ্লেশনের আশঙ্কা: টেকসই উচ্চ তেলের দাম একই সঙ্গে মন্দা ও মূল্যস্ফীতির দ্বৈত সংকট–স্ট্যাগফ্লেশন–সৃষ্টির ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে বলে অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করেন।

উপসংহার

এই যুদ্ধ আমাদের আরেকবার মনে করিয়ে দিয়েছে–আজকের বিশ্ব একটি অভিন্ন জালে বাঁধা। এক অঞ্চলের বারুদের গন্ধ অন্য মহাদেশের মানুষের ভাতের থালায় গিয়ে পৌঁছায়। তাই যুদ্ধ থামানো কেবল কূটনৈতিক দায় নয়, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার শর্তও বটে। শান্তির পথই একমাত্র টেকসই পথ।

সূত্র: Encyclopædia Britannica; Al Jazeera; AP News; Middle East Council on Global Affairs।